Published with the Financial Assistance of Sangeet Natak Academy, New Delhi

ত্রিপুরা থিয়েটার

শারদ সম্ভার-২০২০

পঞ্চদশ বর্ষ

(২০০৬ থেকে নিয়মিত)

Tripura Theatre is indexed in UGC Care List
ত্রিপুরা থিয়েটার ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত

TRIPURA THEATRE
Since 2006
Festive Issue - 2020
Vol - 15, Issue - 1

ত্রিপুরা থিয়েটার

শারদ সম্ভার- ২০২০

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

নাট্যদল - কর্তৃক উপস্থাপিত

পঞ্চদশ বর্ষ

সেপ্টেম্বর - ২০২০

প্রচ্ছদ - অপরেশ পাল, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, আগরতলা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে - মাইক্রো গ্রাফিক্স, আগরতলা

ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত

মূল্য - ২৫০ টাকা

TRIPURA THEATRE

A Journal on Theatre and Performing Arts

A Publication of Tripura Theatre (Drama Group), Agartala

15th Year, September - 2020

UGC Care List Sl. No. 1, Discipline - Art & Humanities

Sub- Arts & Humanities (All), Focus Subject - Visual Arts & Performing Arts

Cover Design - Aparesh Paul, Eminent Artist, Agartala

Type Setting and Printed at

MICRO GRAPHICS, Mantribari Road, Agartala.

Published by Tripura Theatre

Price ₹. 250.00

সম্পাদক- বিভু ভট্টাচার্য

উপদেষ্টামন্ডলী - অধ্যাপক শ্রী সরোজ চৌধুরী ও শ্রী শিশির দেব

সম্পাদকমন্ডলী

বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য, শেখর সি দত্ত, মিহিরকান্তি ভট্টাচার্য ও কমল মজুমদার

সম্পাদকীয় সহায়তা

পার্থ সেনগুপ্ত, অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

দপ্তর - হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা - ৭৯৯০০১ ত্রিপুরা।

০৩৮১-২৩০৪৭৭৫, ৯৪৩৬১২৬৮৪৬/

৯৪৩৬৪৫০১৯৩, ৯৪৩৬১৩৭৭২৯, ৭০০৫১২২৯২৪

bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান

ত্রিপুরা থিয়েটার দপ্তর, জ্ঞান বিচিত্রা- আগরতলা, নবসাহিত্য কেন্দ্র- আগরতলা,
পুস্তকালয়- খোয়াই, পাতিরাম- কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা
এবং একাডেমি সংলগ্ন ভাস্করের দোকান- কলকাতা।

TRIPURA THEATRE

Editor - Bibhu Bhattacharjee

Advisor - Prof. Soroj Chowdhury & Sri Sisir Deb, Agartala

Editorial Board

Biprajit Bhattacharjee, Sekhar C Datta, Mihir Kanti Bhattacharjee, Kamal Majumder

Editorial Assistance

Sri Partha Sengupta, Abhijit Bhattacharjee & Sri Debabrata Mukhopadhyay

Office

Hospital Road Extension Gandhighat, Agartala - 799001, Tripura
0381-2304775,9436126846 / 9436450193, 9436137729, 7005122924
Mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

Website : www.tripuratheatre.com

Available at

TT's Office, Gnyan Bichitra & Naba-Sahitya Kendra- Agartala, Pustkalaya- Khowai,
Patiram- College Street, Kolkata and Bhaskars' Shop near Akademi of Fine Arts- Kolkata

আপনি কি জানেন?

ত্রিপুরা রাজ্য সর্বাধিক ভূমিকম্প প্রবন অঞ্চল **জোন-৫** এ অবস্থিত

ভূমিকম্পের সময় জীবন বাঁচাতে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করুন:

যদি আপনি ঘরের ভেতরে থাকেন -

- ভূমিকম্পের সময় টেবিলের বা খাটের নীচে, ঘরের ভিতরের দিকের কর্ণারে, মজবুত দরজার নীচে এবং ঘরের ভিতরে জায়গায় আশ্রয় নিন এবং নিজের মাথাটাকে ঢেকে রাখুন।
- কাঁচের জিনিষ, জানালা, দরজা, অসুরক্ষিত অবস্থায় রাখা জিনিষ (আলমারি, তাক, ছবি, টিউব লাইট, ফ্রিজ এবং অন্যান্য জিনিষপত্র) থেকে দূরে থাকতে হবে।
- বিছানার উপর থাকলে সেখানেই থাকুন এবং বালিশ দিয়ে মাথাকে ঢেকে রাখুন।
- ভূমিকম্প থামলে পর সোজা খোলা আকাশের নীচে চলে যান।
- ঘর থেকে বাইরে বেরোনোর সময় ধাক্কাধাক্কি বা হুড়োহুড়ি করবেন না।

যদি আপনি বাইরে থাকেন -

- দালান, বড় গাছ, বৈদ্যুতিন পিলার এবং বিদ্যুত পরিবাহী তার থেকে দূরে থাকুন।
- খোলা জায়গায় থাকলে কম্পন থামা পর্যন্ত সেখানেই থাকুন।

যদি চলন্ত গাড়িতে থাকেন -

- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি থামিয়ে শান্তভাবে বসে থাকুন।
- দালান, বড় গাছ, বৈদ্যুতিন পিলার এবং বিদ্যুত পরিবাহী তারের নীচে দাড়াবেন না।
- ভূমিকম্প থামার পর গাড়ি থেকে নেমে খোলা জায়গায় চলে যান।
- ভূমিকম্প থামার পর সাবধানে চলুন। যথাসম্ভব ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা, ব্রীজ এড়িয়ে চলুন।

ভূমিকম্পের কোন পূর্বাভাস পাওয়া যায় না।
তাই, অযথা গুজবে কান দেবেন না এবং গুজব ছড়াবেন না।

☞ ***মনে রাখবেন,*** *আপনার স্বপ্নের বাড়ি তৈরীর পূর্বে ইঞ্জিনিয়ারের বা প্রশিক্ষিত রাজমিস্ত্রির পরামর্শ নিন।*

রাজস্ব দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
জনস্বার্থে প্রচারিত
বিপর্যয়ের পূর্বাভাস জানতে বা জরুরী অবস্থায় যোগাযোগ করুন
রাজ্য নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র-১০৭০ (টোল ফ্রি) / ২৪১৬০৪৫ জেলা নিয়ন্ত্রন কেন্দ্র-১০৭৭,আবহাওয়া দপ্তর - ২৩৪২২৯৫/২৩৪২২৫৩
Email: seoctripura@gmail.com/scrtripura@gmail.com
Wed site: www.tdma.tripura.gov.in
(সর্বদা সতর্ক ও সজাগ থাকুন, বিপর্যয় থেকে নিজের ও অন্যের জীবনকে রক্ষা করুন।)

সূ চি প ত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৯
শ্রদ্ধায় স্মরণ : মধু দেববর্মা	নারায়ণ দেব	১০
শ্রদ্ধায় স্মরণ : ইব্রাহিম আলকাজি	নিজস্ব প্রতিবেদক	১১
শ্রদ্ধায় স্মরণ : উষা গাঙ্গুলী	নিজস্ব প্রতিবেদক	১২
উৎপল দত্ত'র দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার	পার্থ বন্দোপাধ্যায়	১৩ - ২১
ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়, অভিনয় শিক্ষা	পবিত্র সরকার	২২ - ৩০
গরিবের থিয়েটার	রথীন চক্রবর্তী	৩১ - ৩৫
নাট্যের ভাষা	সৌমিত্র বসু	৩৬ - ৪২
দৃশ্য, দৃশ্যমানতা ও দৃশ্যান্তর	অশেষ গুপ্ত	৪৩ - ৪৮
মিথুন >মু >মুথুস> মিথ	প্রবীর গুহ	৪৯ - ৫৩
মৃচ্ছকটিক : একটি সমীক্ষা	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	৫৪ - ৬১
খালেদ চৌধুরীর শিল্প ভাবনা	শান্তনু দাস	৬২ - ৭৭
বাদল সরকার ও থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব	শুভঙ্কর ঘোষ রায়চৌধুরী	৭৮ - ৮৭
প্রবাসে নাট্যের বশে: ফুজাইরাহ	আশিস গোস্বামী	৮৮ - ৯৪
অতিমারী ও থিয়েটারের যুদ্ধ	শ্যামল ভট্টাচার্য্য	৯৫ - ৯৮
নাট্যপত্রিকা : সেদিন থেকে আজ	দেবাশিস বন্দোপাধায়	৯৯ - ১০৮
ক্রান্তিকালের সংকট : উপস্থাপনা ভাবীকাল নিয়ে দুয়েকটি ভাবনা	মনুজেন্দ্র কুনড়ু	১০৯ - ১১৪
ককবরকে কবিগুরুর 'মুকুট'	নন্দকুমার দেববর্মা	১১৫ - ১১৬
নাট্য ও সংস্কৃতির জগতে ভাইরাস	প্রশান্ত সেনগুপ্ত	১১৭ - ১২০
মাইম : শব্দ নিঃশব্দের মণিমঞ্জুষা	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	১২১ - ১২৯
প্রাগজ্যোতিষ নাট্য উৎসব-২০২০	শেখর সি. দত্ত	১৩০ - ১৩৪
Dhrupad Music in Theatre	Dr. Kamala Dhyani	135 - 140
Rich Art of Mithila	Dr.Triloknath Jha	141 - 147
Theatre of Pandemic	Biprajit Bhattacharjee	148 - 152
N.S.D, Agartala Centre - Activities		153 - 160
S.N.A, Agartala Centre - Activities		161 - 166

সূচিপত্র

নাটক	লেখক	পৃষ্ঠা
Play - Stay Yet A While	M.K. Raina	167 - 204
অন্য পৃথিবী	চন্দন সেনগুপ্ত (প্রয়াত)	২০৫ - ২২৪
ওথেলো (অনুবাদ)	কমল রায়চৌধুরী	২২৫ - ২৭৬
অয়দিপাউস রেক্স	কুন্তল মুখোপাধ্যায়	২৭৭ - ২৯০
হারায়ে খুঁজি	অপূর্ব দে	২৯১ - ৩০৯
পথ ভোলা এক পথিক	শিবংকর চক্রবর্তী	৩১০ - ৩৩০
আশ্চর্য মানুষ	মৈনাক সেনগুপ্ত	৩৩১ - ৩৪৬
কালকের লুকুল্লুস	অনুপ কুমার রায়	৩৪৭ - ৩৫৪
6 : 1 (সিক্স ঃ ওয়ান)	সংগীতা চৌধুরী	৩৫৫ - ৩৭৯
সুপ্ত বাসনা	শংকর বসুঠাকুর	৩৮০ - ৪০৩
পুতুল নাচের কথা	সমীর বিশ্বাস	৪০৪ - ৪১১
জননী	মৃণাল দে	৪১২ - ৪২২
আজকের প্রমেথিউস	সঞ্জয় আচার্য	৪২৩ - ৪৩৯
বান্ধঅ কেন দালান ঘর	পার্থ মজুমদার	৪৪০ - ৪৬১
রাইমা সাইমা	সঞ্জয় কর	৪৬২ - ৪৮৫
জর্জ ফ্লয়েড, উই কান্ট ব্রিদ টু	বিভু ভট্টাচার্য	৪৮৬ - ৪৯৫

ত্রিপুরা থিয়েটার

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা-৭৯৯০০১: ত্রিপুরা

ত্রিপুরা থিয়েটারের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বছরে ন্যূনতম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, সঙ্গে পুরনো, দু'বছরে একবার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব, বছরে একবার মহালয়ায় নাটকের বই (ত্রিপুরা থিয়েটার) প্রকাশ, সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ; এই নিয়ে ত্রিপুরা থিয়েটারের পথ চলা,

২০০৬ থেকে নিয়মিত।

আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনা

রচনা ও নির্দেশনা - বিভু ভট্টাচার্য

ধরতী আবা, **নয়া আন্দাজ**, **স্বামী বিবেকানন্দ** (২০১৪ সালে এনএসডি আয়োজিত ডিব্রুগড়ে পূর্বোত্তর নাট্যোৎসবে যোগদান), **পাণিপথের ৪র্থ যুদ্ধ**, **চক্রব্যূহ**, **কাবুলিওয়ালা** (এনইজেডসিসি আয়োজিত গৌহাটিতে শিল্পগ্রাম উৎসবে যোগদান) **ও কঙ্কাল** (রবীন্দ্র গল্পের নাট্যরূপ), ছোট নাটক **অল্পমধুর** প্রভৃতি।

- চলতি প্রযোজনা -

'বাপুজী' (এনএসডি আয়োজিত প্রাগজ্যোতিষ নাট্যোৎসবে-২০২০, ইটানগরে যোগদান) সঙ্গে **'অলকা'**, **'মতিজানের মেয়েরা'** প্রভৃতি।

নাট্যোৎসব

প্রতি দু বছরে একবার 'বামাপদ মুখোপাধ্যায়' আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব ২০১২ থেকে নিয়মিত (করোনার জন্য ২০২০তে হয়নি)

নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনা

বছরে একবার, ২০০৬ থেকে নিয়মিত।

২০২০ সাল থেকে বইটি ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়।

——— যো গা যো গ ———

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন ঃ গান্ধীঘাট ঃ আগরতলা - ৭৯৯০০১ ঃ ত্রিপুরা
ফোন ঃ ০৩৮১২৩০৪৭৭৫/০৯৪৩৬১২৬৮৪৬/০৯৪৩৬৪৫০১৯৩
Email-bibhubhattacharjee@rediffmail.com/
kamal.majumder111@gmail.com
website : www.tripuratheatre.com

Presenting the official website of Tripura Theatre, A new destination for theatre lovers

www.tripuratheatre.com

নাট্যপ্রেমীদের জন্য সুখবর
ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যদলের নতুন অনলাইন ঠিকানা।

সম্পাদকীয়

" এ এক অদ্ভুত আঁধার--" শুধু আমাদের দেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতি। শেক্সপীয়রের সময়ে বিউবনিক প্লেগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর স্প্যানিশ ফ্লু পর্যন্ত অতিমারীর নানা বিবরণ আমরা ইতিহাসে পড়েছি। কিন্তু বাস্তব যে কত নির্মম এবার তা উপলব্ধিতে এলো। ধনী গরীব একাকার। এমন সমদর্শিতার অবকাশ কি আমরা পেতাম অতিমারী না হলে? মানুষ আর প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক বলেই জানি। কিন্তু গত একশ বছর ধরে মানুষ প্রকৃতিকে তো কম দোহন করেনি! পরিবেশবিদরা প্রায় প্রত্যহ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছিলেন। উষ্ণতা বাড়ছে, মেরু প্রদেশে বরফ গলছে, ওজন লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সমুদ্রে প্লাস্টিক জমছে, বন ধ্বংস হচ্ছে! সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পৃথিবীকে নির্মল করার কথা কেউ কানেও তোলেনি।

অন্যদিকে প্রকৃতিকে নিংড়ে সামান্য কিছু মানুষ দিন দিন অতি সম্পদশালী হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র এক শতাংশ মানুষ পঁচাশি শতাংশ সম্পদের মালিক। অসাম্য বাড়ছে। কারণ সম্পদ কেন্দ্রিভূত হচ্ছে। তাই প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে যে বিরোধ সেটা মানবজাতিকেও আলোড়িত করতে উদ্যত হয়েছে। জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনাতো একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এটা তো দাবানল সৃষ্টির ইঙ্গিত।

প্রচলিত ধারণায় নাট্যশিল্পীরা অত্যন্ত সংবেদনশীল, পাশাপাশি সমাজ সচেতনও বটে। সুক্ষ্ম অনুভব প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে সব সময়ই ক্রিয়াশীল। ঘটনাবহুল জীবন, প্রয়োজন সদা সতর্ক পর্যবেক্ষণ। নাটক আবার কবে বা কিভাবে মঞ্চে আসবে সেটা বড় সমস্যা নয়। সব সংকটের যেমন ধীরে ধীরে সমাধান হয় তেমনি নাটকও আবার হবে। গত শতাব্দীর অতিমারীর পরও তাই হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মানবজাতির অস্তিত্বই সংকটে। জরুরী বিষয় হলো মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন এবং তৎপরবর্তিকালে নাট্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষের মতামত গ্রহণ । প্রয়োজন সেইসব মতামতকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা। তাই চাই নতুন, সময়োপযোগী লেখা। অতিমারীর লকডাউন কালে কবি সাহিত্যিক নাট্যশিল্পীদের কাছে এটাই সময়ের দাবি।

পরিশেষে একটা সুখবর দিই। ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যপত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অর্থাৎ ইউ জি সির কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পনের বছর ক্লান্তিহীন প্রয়াসের পর আমরা সম্মানিত, অনুপ্রাণিত।

ত্রিপুরা থিয়েটারের বিদগ্ধ লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা-সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন।

বিভু ভট্টাচার্য

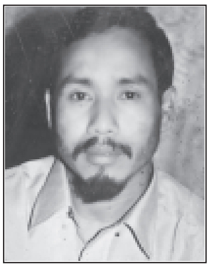

মননে স্মরণে

ত্রিপুরার অন্যতম প্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব মধু দেববর্মা

নারায়ণ দেব

মধুসূদন দেববর্মা ১৯৬৫ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর সুপারিবাগান, কৃষ্ণনগর, আগরতলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে একটি বাংলা নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি নাটকের আঙিনায় পা রাখেন।

মধু দেববর্মা অভিনয় ও নির্দেশনার শিক্ষা লাভ করেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রয়াত পদ্মশ্রী হেইসনাম কানহাইলাল ও তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট অভিনেত্রী সাবিত্রী দেবীর কাছ থেকে। তিনি ছিলেন কানহাইলালের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব উৎসবে তাঁর নির্দেশিত 'চেথুয়াং' নাটকটি প্রথম স্থান লাভ করে এবং মধু দেববর্মা শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি নাটকে নির্দেশনার জন্য জাতীয় ও রাজ্যস্তরে বহু সম্মানে ভূষিত হন। শারীরিক অভিনয়ে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর নির্দেশিত নাটক সমূহ।

তিনি লাম্প্রা ট্রাষ্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। মধু দেববর্মা নাটক 'চেথুয়াং' নিয়ে আইজলে এনইজেডসিসি আয়োজিত ন্যাশনাল থিয়েটার ফ্যাস্টিভেলে যোগদান করেন । ১৯৯৮ এ সাউথ এশিয়ান ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পে মঞ্চস্থ করেন নাটক "খোকরাঙ শিয়াল"। দীর্ঘদিন প্রোগ্রাম অব স্কুল অব পারফর্মিং আর্ট কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রশিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ২০০০ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার জাতীয় নাট্যশালায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন করেন নাটক "রাহুমুক্তি"। এছাড়া ২০০০ সালে করিমগঞ্জে এসএনএ আয়োজিত মাল্টি লিঙ্গুয়েল থিয়েটার ওয়ার্কশপ এবং ২০০৩ সালে কেরলে অল ইণ্ডিয়া অক্টেভে নাটক 'খোকরাঙ শিয়াল' -এর সফল মঞ্চায়ন করেন। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা , ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার আর্থিক সহায়তায় লাম্প্রা ট্রাষ্ট আগরতলায় থিয়েটার ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ২০০৩ সালের ওয়ার্কশপে নাট্যব্যক্তিত্ব পদ্মশ্রী কানহাইলাল মুখ্য প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

মধু দেববর্মা প্রায় ২১টি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - চেথুয়াঙ, চামারি, গোমতী, স্বর্ণমৃগ, সকাল, খোকরাঙ শিয়াল (নীলবর্ণ শৃগাল), একলব্য ও ঘটোৎকচ। এর মধ্যে ঘটোৎকচ ব্যতীত বাকি সবগুলি নাটকের রচয়িতা তিনি নিজে। নাট্যক্ষেত্রে রাজ্যের এই কৃতি সন্তান দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ৯ই মার্চ ২০২০ ভোরবেলা প্রয়াত হন।

ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যবক্তিত্ব মধু দেববর্মার স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

শ্রদ্ধায় স্মরণ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় নাট্যব্যক্তিত্ব
ইব্রাহিম আলকাজি

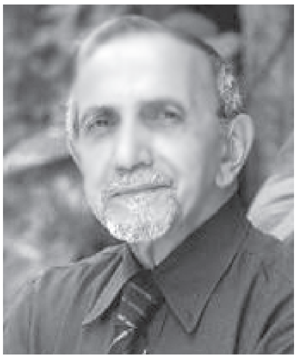

জন্ম- ১৮ অক্টোবর, ১৯২৫ **মৃত্যু- ৪ আগস্ট, ২০২০**

ভারতীয় নাট্যজগতে ইব্রাহিম আলকাজি ছিলেন একজন দৃঢ় চরিত্রের অবিসংবাদীত নাট্যশিক্ষক, খুবই শৃংঙ্খলাপরায়ণ মানুষ এবং একজন বিশেষজ্ঞ নাট্য-পরিচালক। তিনি লণ্ডনের রয়েল একাডেমী অব ফাইন আর্টস থেকে ফেলোশীপ লাভ করেন। ভারতে যখন এনএসডি গঠিত হয়, বলতে গেলে, সৃষ্টির পর থেকেই দায়িত্বে বৃত হন ইব্রাহিম আলকাজি এবং একে এগিয়ে নিয়ে যান। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৭ এনএসডির ডিরেক্টর ছিলেন। ভারতের ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত নাটক, দেশীয় লোকধর্মী নাটক এবং নানা প্রদেশ থেকে স্থানীয় ভাষায় গুণগত উন্নত মানের সমসাময়িক নাটক জাতীয় স্তরে তুলে এনে এনএসডিকে সমৃদ্ধ করে প্রকৃত জাতীয় নাট্য বিদ্যালয় রূপে গড়ে তুলেছিলেন। এন এস ডি রিপার্টারী তাঁরই সৃষ্টি।

তিনি জীবনে বহু জাতীয় -পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালে সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার ,৬৬ সালে পদ্মশ্রী, ৯১ এ পদ্মভূষণ এবং ২০১০ সালে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁকে বলা হয় Father of Indian Theatre.

ত্রিপুরা থিয়েটার তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করছে।

প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব
ঊষা গাঙ্গুলির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলা থিয়েটার জগতে ইন্দ্রপতন ঘটিয়ে প্রয়াত হলেন বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব ঊষা গাঙ্গুলি। গত ২৩শে এপ্রিল, ২০২০, নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রবাদপ্রতিম এই অভিনেত্রী এবং নির্দেশক। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৯৪৫ সালে জন্ম, রাজস্থানের যোধপুর শহরে। ভারতনাট্যম তালিম প্রাপ্ত ছিলেন, পরে কলকাতায় এসে শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ থেকে হিন্দি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। মাতৃভাষা হিন্দি হলেও বাংলা থিয়েটারে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাছাড়া সক্রিয় সমাজকর্মী হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সত্তর ও আশির দশকে হিন্দি থিয়েটারের রূপায়ণ এবং প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এককথায় বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দি থিয়েটারের প্রবর্তক এবং স্তম্ভ ছিলেন তিনি।

ভবানীপুর কলেজে, ১৯৭০ সালে, শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। পাশাপাশি সঙ্গীত কলা মন্দিরে যোগ দিয়ে শূদ্রক রচিত, মৃচ্ছকটিকম' অবলম্বনে 'মিট্টিকিগাড়ী' নাটকে বসন্তসেনার অভিনয় দিয়ে তাঁর প্রথম অভিনয় জীবনে হাতেখড়ি। ১৯৭৬ এ রঙ্গকর্মী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই দলের প্রযোজনায় 'মহাভোজ', 'রুদালি', 'কোর্টমার্শাল', এবং 'অন্তর্জলিযাত্রা'র মতো নাটকগুলো পরিবেশিত হয়।

১৯৯৮ সালে পরিচালনার জন্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় ইবসেনের নাটক 'আ ডলস্‌হাউস' অবলম্বনে 'গুড়িয়াঘর' -এ অভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও পেয়েছিলেন ঊষা গাঙ্গুলি। তাঁর প্রয়াণে একজন অভিভাবক এবং পথ নির্দেশক হারালো বাংলা থিয়েটার।

ত্রিপুরা থিয়েটারের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে প্রণাম জানাই।

উৎপল দত্তর দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন :

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায় (দুজনই প্রয়াত)

(আগরতলার বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী শ্রী ঝলক মুখার্জী ২০১৫ সালের গোড়ায় কথায় কথায় আমাকে একটি "শিল্প সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক" এর কথা বলেন। নাম পর্বান্তর। জানুয়ারী ১৯৯৫-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা, হাজরা রোড থেকে প্রকাশিত সাময়িকীটি পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। ১১২ পৃষ্ঠার (এ-ফোর) বই জুড়ে প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার রয়েছে। ৮৮'র সেপ্টেম্বর থেকে ৬ ফেব্রুয়ারী ৮৯ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি গ্রহন করেছেন শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সুবীর মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘতম এই সাক্ষাৎকারে রয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল দত্তের প্রায় ৪৫ বছরের বিশাল থিয়েটারী কর্মকাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞতা-মথিত উপলব্ধি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও অকপট কথোপকথন। বর্তমান সময়ে নাট্যকর্মীদের উপকারে আসবে ভেবে, 'পর্বান্তর' সাময়িকীর প্রতি ঋণ স্বীকার ও শ্রী ঝলক মুখার্জীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা ত্রিপুরা থিয়েটারে সাক্ষাৎকারটি পর্যায়ক্রমে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবার অষ্টম কিস্তি - সম্পাদক)।

পা. ব. : এখন ধরুন আপনি যে সুযোগটা পাচ্ছেন— ছোট ছোট অনেক দলই সে সুযোগটা পায় না। তারা ধরুন স্টেজটা সাতদিন নিতেই পারছে না। এক দুদিনের বেশী স্টেজ রিহার্সাল দিতে পারছে না। ফলে তাদের অসুবিধে ভোগ করতে হয়।

উ. দ. : ড্রেস রিহার্সাল বা স্টেজ রিহার্সাল যে স্টেজেই দিতে হবে তার কোন মানে নেই। অনেক জায়গাতেই দেয়া যায়। স্টেজটা যত বড় তত বড় মাপের একটা জায়গা আছে সেই খানে করি। সেটার যে স্টেজ সেটা আমাদের পক্ষে বেশি ছোট। আমরা সেটা ব্যবহার করি না। ওর যে স্লোপটা, সেইখানে করি।

পা.ব. : আলো? সেখানে আলোর ব্যবস্থা আছে?

উ.দ. : হ্যাঁ, যখন আলোর প্রয়োজন হয়, সমর নাগ সেইখানে গিয়ে আলো করে। আসল কথা হচ্ছে নিজেদের কি বলবো সিরিয়াসনেস। এটাকে একটা শিল্প বলে মানলে এবং আমি কতখানি সিরিয়াস তার ওপরে নির্ভর করবে এগুলো গোড়া থেকে আয়োজন করতে পারি কিনা? সে ছোট বড় দলের কোন ব্যাপারই নেই। কেনই বা এরা ছোট থাকে তাও তো বুঝি না। ছোট কি আবার ? এরা কি সারাজীবন শিশুই থাকবে! বাড়েন না কেন? বড় হন না কেন? অনেক দল আছে আমরা ছোট দল। কেন, ছোট দল কেন? পি এল টির বয়স কত? পি এল টি তো সেদিন তৈরি হল। '৬৯ -উনসত্তর সালে।

পা. ব. : তাহলেও। পি এল টি যখন তৈরি হয়েছে তার আগে পি এল টির অনেকের মধ্যেই লিটল থিয়েটারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল তো—

উ.দ. : তা ছিল হয়তো। কিন্তু এল টি জি থাকাকালীন আমি শুনেছি—এল টি জির অনেক আগে তৈরি এমন দলও নিজেদের বলে ছোট আর এল টি জি বড়। আসলে বড় হচ্ছে না ওরা মানসিক দিক থেকে ছোট থেকে গেছে। ওরা খোকা। এই খোকামি আর যাবে না ওদের। আমরা ছোট দল। না ছোটোমিটা কাটিয়ে বড় হোন। বড় হওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে নাটক সম্পর্কে একটা অ্যাডাল্ট, একটা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। এই অ্যামেচারের দৃষ্টি নিয়ে বহুদিন কাটানো হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা অ্যামেচার। হুঁ, সমস্ত দৃষ্টিটা হচ্ছে সৌখিন। হলেও হয়, না হলেও হয়। আসল তো আমার কাজ হচ্ছে অপিসে। এই সন্ধ্যেবেলায় একটু সবাই আসি তার জন্য আর কতটা কষ্ট করা যায়। এইরকম একটা ভঙ্গী, এরকম একটা মনোভাব রয়ে গেছে। এইটাকেই কাটাতে হবে। সেই জন্যেই ছোট দলের কথাটা চট করে মুখে আসে। দশ বছর বারো বছর পরেও কেন একটা দল বলে যে আমি ছোট দল। আমি এখন সবচেয়ে বড় দল নই কেন? হবেই, হবেই তো বড় দল- কনস্যান্ট বাড়বে তো! আসলে ওসব কিছু নয়। আমি, আমার টাকা নেই। আরে টাকা কারুরই নেই। এই সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের টাকা থাকবে না। কে বলেছে? আমার জন্য বড় বড় স্পনসর এসে দাঁড়াবে নাকি, লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে? তা তো হবে না। এর ভেতরেই করতে হবে। এর ভেতরেই হয়ে চলেছে। সব দলই এর ভেতরেই কাজ করে যাচ্ছে। তো মাঝে মাঝে এক একটা প্লে লাগতে হবে, হিট করাতে হবে। তবে তো আসবে টাকা। এখন দশ বছরের existance'এ একটাও যদি হিট না করে প্লে, তবে আসবে না পয়সা। শুধু খরচই হতে থাকবে। এই ছোট দলদের মুসকিল হচ্ছে— আমি ভেবে দেখেছি— ওদের কোন প্লে দর্শকদের ভাল লাগে না। দর্শক যে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাউস ফুল করে দিয়েছে— এমনটা ঘটেনি ওদের জীবনে। তাই ছোট দলই থেকে গেছে। মানসিক দিক থেকেও ছোট। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে অ্যাকাডেমিতে অভিনয় করেন দোতলা বন্ধ করে, যাতে নীচটা অন্তত একটু ভর্তি দেখায়; এরকম দল তো ছোট থেকে যাবেনই সারা জীবন। হ্যাঁ রবীন্দ্র সদন নিতে পারে না, ভয়। ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এভাবে করলে তো থিয়েটার করাই উচিত নয়। ছেড়ে দিলেই তো হয়। শো এগিয়ে এলে পুস সেলের হাঙ্গামা শুরু হ'ত এককালে। এখন দেখছি সেটা একটু কম। পুস সেলে এসে টিকিট বিক্রি করতে চেষ্টা করছেন কমরেডরা বাড়ি বাড়ি। আরে এভাবে থিয়েটার করলে কি হবে। এটা তো অ্যামেচার ব্যাপার। না-না, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে মানুষ স্বতঃ-

স্ফূর্তভাবে এসে টিকিট কিনবে তবে তো সেটা থিয়েটার হবে। তাই এক-আধটা নাটক লাগতে হবে। লোকের ভাল লাগলে তবে টাকা আসবে। তখন রিহার্সাল দেওয়ারও ঘর পাওয়া যাবে এবং তখন গোড়ার থেকেই ড্রেস রিহার্সাল করবার পয়সা থাকবে। সবই হবে।

পা. ব. : নাটক মঞ্চস্থ করবার সময় গ্রীণরুমে কি ধরনের ডিসিপ্লিন থাকা উচিত?

উ. দ. : নিথর নিস্তব্ধতা- নিথর নিস্তব্ধতা। একটা আওয়াজ কোথাও হবে না। একটা কথাও কেউ বলবে না। একান্ত প্রয়োজনীয় নাটক সংক্রান্ত কোনো কথা থাকলে ফিসফিস করে বলতে হবে। সেটা হবে সাজঘরে। ব্যাকস্টেজ, উইংসের পেছনে কোন কথাই নেই। কোনো কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

পা. ব. : এক্ষেত্রে প্রপারটিজ যা থাকবে সেগুলো যথাস্থানে থাকবে, সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এবং পরিচালক দু'তরফেই দেখে নেবে, সেগুলো ঠিকঠাক জায়গায় আছে কি না।

উ. দ. : এবং সেগুলো নীরবে নিয়ে ঢুকবে অ্যাকটর এবং বেরিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দেবে।

পা. ব. : এটা আমরা প্রায়ই দেখি— বাইরে আওয়াজ হচ্ছে, এ হচ্ছে সে হচ্ছে ভীষণ রকমের একটা chaos হয়। বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রুপের থিয়েটার দেখতে গেলে প্রায়ই হয়।

উ.দ. : আইডিয়াল ব্যাকস্টেজ ডিসিপ্লিন হচ্ছে এখন ইয়েতে, অ্যাকাডেমীতে। চৈতালি রাতের স্বপ্ন। বিশাল প্রোডাকশন। বিশাল। তাতে যদি সামান্যতম, ইনডিসিপ্লিন হয় তাহলে মানে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে ব্যাকস্টেজে। অসাধারণ ডিসিপ্লিনের পরিচয় দিচ্ছে ছেলেমেয়েরা।

পা. ব. : যদিও আপনি আগে বলেছেন, তবুও এক দুই তিন করে বললে ভাল হয়। কণ্ঠস্বর তৈরি করার ব্যাপারে অভিনেতারা কি কি উপায় গ্রহণ করতে পারে, যার ফলে একটা ডেফিনিট ডেভলাপমেন্ট হয়?

উ. দ. : এটা বলা যায় না। এটা আমাদের রিহার্সাল কিভাবে হয় সেটা দেখলে পরে পরিস্কার হবে। পর্দা, গলার পর্দা ওপরে তোলবার, ওপরের পর্দায় গলাটা পৌঁছে দেবার তরিকা। গলার ভল্যুম বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গলাটার সুরটা চড়তে থাকবে। অনেকে আছে গলাটাকে নীচে রেখেই চেঁচাবার চেষ্টা করে। এই গলা ড্যামেজড হয় এবং আর গলা বাড়ে না। বেশীরভাগ দলে এইরকমটা করতে গিয়ে গলা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু গলা যখন আমি তুলব তখন অটোমেটিক্যালি যদি সুরও ওপরের দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকে। এবং এখন দেখতে হবে এক একজন অভিনেতা কতখানি তুলতে পারছেন। প্র্যাকটিস করে করে আরও তুলতে হবে। তারপর আরও সুরটা তুলতে হবে— তারপর আরও তুলতে হবে। এইভাবে আস্তে আস্তে একদম

তিনটে অক্টেভ ছাড়িয়ে যাবে। মানুষের গলা, পারে তা ইজিলি। ইজিলি না হোক উইথ প্র্যাকটিস। তিন সপ্তক ওপরে গলা সে পৌছে দিতে পারে। মানুষের গলা এভাবেই তৈরি হয়। যেটা আনইউজড থেকে যায়, অনেকের গলায়। অ্যাকটারের গলা তা হওয়া উচিত নয়। তার সবটাতেই গলা খেলাতে পারা চাই, যথেচ্ছ। এভাবে শেখানো হয়।

পা. ব. : কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি ধরুন শরীর গঠন। ব্যাপারটা আছেই, এক্ষেত্রেও কি কি সাধারণ মেথড আমরা নিতে পারি?

উ.দ. : এক্সারসাইজ আছে সব। বিশেষ করে অ্যাক্টরদের এক্সারসাইজ। হাঁটা-চলা -বসা -ওঠা- পড়ে যাওয়া। পড়ে যাওয়া - স্টেজে পড়া তো খুব কঠিন জিনিস। একদম না লাগিয়ে, লাগবে না একদম অথচ ধপাস করে পড়া। ঘুঁষি মারা, ঘুঁষি খাওয়া। এগুলো সব রিহার্সালেই আসে। কেননা, সব নাটকেই থাকে, বেশীর ভাগ নাটকেই ওগুলো থাকবেই তো। চলাফেরা-ওঠা-ঢোকা- বেরোনো, এই করতে করতে অভিনেতারা শেখে। অনেক অভিনেতা আছেন যখন আসেন প্রথম দলে, তখন খুব অকওয়ার্ড। তারা কোনো ক্রাউড সিনে অভিনয় করতে গেলে পাশের অভিনেতা জখম হন। তাদের ভীমবাহু সঞ্চালনে এবং তারা ঢুকতে বেরোতে চেয়ার টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খান। তারা ন্যাচারালি অকওয়ার্ড পিপল। কিন্তু কিছুদিন রিহার্সালে এবং ট্রেনিংএ থাকার পর ঠিক হয়ে যায়। আর ওরকম হয় না। তবে একজন আলমেটলি আমাদের দল থেকে এক্সপেলড্ হয়েছিল। কেননা একটি নাটকে তিনি অনবরত আর একজনকে জখম করতেন। অবশেষে তাকে আমরা বলতে বাধ্য হই, 'আপনি আসুন'। 'লেনিন কোথায়' নাটকে তিনি সৈনিকের পার্ট করতেন আর আমাদের এক অভিনেতাকে প্রহার করার কথা, তিনি এমন প্রহার করতেন যে আমাদের অ্যাক্টরটি কাহিল [হাসি]।

পা. ব. : আপনি একটা জায়গায় বলেছেন যে আমাদের দেশে অনেকেই থিয়েটার করেছেন, থিয়েটার শিখিয়েছেন। কিন্তু অভিনয় শিল্পের তত্ত্ব বাংলাদেশে নেই। এখন আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আপনার কি মনে হয়, আপনি সেরকম কোনো তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন?

উ.দ. : মাথার মধ্যে যে একেবারই পৌছে নি, তা না। মানে ঐ থিয়োরেটিক্যালি চিন্তার দিক থেকে হয়তো পৌছেছে। কিন্তু সেটা লিপিবদ্ধ করার মত ক্ষমতা হয় নি। যার জন্যে আবার অন্য স্কিল লাগে। সে স্তানিস্লাভস্কি, ব্রেখটরা করেছেন। লিখতে বসে অনেক সময় দেখা যায় যে আমি যা লিখলাম সেটাই আমার চিন্তা নয়। আর যা চিন্তা করছি ,যেটা,সেটা প্রকাশ করতে পারছি না। তাই ওভাবে তো হয় না। কারণ জিনিসটা এতই অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা ব্যাপার। কেননা পরিচালক অভিনেতাকে শেখাতে শেখাতে—, দেখিয়ে দিতে দিতে একটা জিনিস আয়ত্ত্ব করেন। সে নিজেও

তো আর সব আগে থেকে জানে না। সে ডিরেক্ট করতে করতে একটা নাটকের হদিস পায়। চরিত্রের হদিস পায়। সুতরাং জিনিসটা লিখে তো প্রকাশ করতে হয় না সব, মানে খুব প্রতিভাশালী পরিচালক না হলে–ব্রেখট ট্রেখটরা ছাড়া বা গ্রতস্কি।

পা. ব. : এ প্রসঙ্গে আপনি আর এক জায়গায় বলেছিলেন যে, অভিনেতার মানস জগতকে ধরে নাড়া দিতে পারে এমন চিন্তা বাংলাদেশে কেউ করতে পারে নি, এটা যদি একটু খুলে বলেন।

উ.দ. : মানে এমন একটা নাড়া দেবে অভিনেতাদের যে অভিনেতারা বসতে পারবে না, শুতে পারবে না, অনবরত চিন্তা করতে বাধ্য হবে, তাদের স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে আসতে হবে, হঠাৎ মনে হবে এতদিন যা করেছি সব বাজে, ভুল, এরকমভাবে কেউ নাড়া দিতে পারে নি, — যেমন দিয়ে ছিলেন স্তানিস্লাভস্কি ইউরোপিয়ান অভিনেতাদের। কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। এমন কোনো চ্যালেঞ্জিং তত্ত্ব আসতে পারে নি আমাদের সামনে যে অভিনেতারা উদ্বিগ্ন হন, চঞ্চল হয়ে ওঠেন যে আমাদের আর্ট বাচাতে হবে, আমরা ভুল পথে চলেছি।

পা. ব. : আত্মপ্রত্যয় ছাড়া অভিনেতা হওয়া যায় না এবং আমাদের দেশে অভিনেতাদের অধিকাংশই হীনমন্যতায় ভোগে। নিশ্চয়ই সেটা কাটাবার একটা রাস্তা আছে।

উ.দ. : নিশ্চয়ই।

পা. ব. : একজন পরিচালক হিসেবে আপনি কিভাবে তাকে হেল্প করবেন। তার নিজস্ব চেষ্টা সে তো আছেই।

উ.দ. : এইটা সামগ্রিক মানসিকতার ব্যাপার। এটা পড়াশোনা, নিজেকে চেনা, সবের সঙ্গেই জড়িত। নিজেকে ঘৃণা না করে নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখা। এটা তো বহুদিনের প্রসেস। নিজেকে নিয়ে গর্ব করুন।

এটা একটা ফ্যাক্টর। অবশ্য এটা অহেতুক দম্ভের ব্যাপার নয়। অতি বাজে দম্ভ যদি উপস্থিত হয় তবে সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অন্য জিনিস। তার বিশ্বাস থাকবে যে আমি পারি। আমি পারি, বলতে গেলেই যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে— তাহলে আমি বুঝি, আমি চরিত্র বুঝি, আমি সমাজকে বুঝি, আমি আমার জীবন সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে এসব কিছু সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। শুধুমাত্র সেইরকম মানুষেরই -যার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে- রাজনীতি, সমাজ, মানুষ সব সম্পর্কে। শুধুমাত্র তারই এরকম আত্মপ্রত্যয় থাকে, আজকের দিনে, জটিল জীবনে, তাই, আমি তো সেই অভিনেতাকে বলব— তুমি পড়াশোনা কর, তুমি মার্কসবাদ লেনিনবাদ অধ্যয়ন কর। তুমি শেক্সপীয়র পড়, তুমি উপন্যাস পড়। প্রচুর উপন্যাস পড় তুমি। ডিকেন্স পড়। পড়তে পড়তে ও আস্তে আস্তে বুঝবে আমি একেবারে জানি না তা নয়। আমি জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু পারলেও চরিত্র, কোন নাটকের একটা চরিত্র যদি আমি দেখি তাহলে আমি বুঝতে পারি যে

এই চরিত্রটা ভাল হয়েছে না - খারাপ হয়েছে। এই চরিত্রটা ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন নাট্যকার না পারেন নি— এইটুকু আমি বিশ্লেষণ করতে পাচ্ছি। যে মুহূর্তে তার এটা জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রত্যয় আসে। অ্যান অ্যাক্টর মাস্ট অলসো বি এ ক্রিটিক। ক্রিটিক অফ দি প্লে রাইট। এবং এই ক্রিটিসিজমের ক্ষমতা যেই অভিনেতার মধ্যে আসে অমনি তার আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। এইটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা। যে অভিনেতা নাট্যকারের কাছে গলবস্ত্র থাকে, নতমস্তকে সব মেনে নিতে থাকে, নাট্যকার যা বলছে তাই বেদবাক্য— তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে। কিন্তু যে চ্যালেঞ্জ করে — সামনাসামনি না হোক, মনে মনে — পার্টটা অভিনয় করার আগে সে মনে মনে নানা প্রশ্নও করছে—যে এখানে একটু গ্যাপ এখান একটু ভুল হচ্ছে— যে, এ ধরণের লোক এরকম চিন্তাই করতে পারে না— এরকমে যে নানা প্রশ্নও তুলছে, এগুলো রিহার্সালে বেরিয়েও আসে, সে, তার আত্মপ্রত্যয় আছে। সে নাট্যকারের সঙ্গে সমানে সমানে তর্ক করছে। কিন্তু একই সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও সে করছে। সেই লোককে আমি বলব আত্মপ্রত্যয়ী লোক। সে অভিনয় করতে পারে।

পা.ব. : আপনি স্তানিস্লাভস্কি থেকে ব্রেখটও বলেছেন— স্তানিস্লাভস্কি অভিনেতাদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন– সৃষ্টিশীল অভিনেতা, অনুকরণশীল অভিনেতা এবং উৎকট, তার মানে তিন ধরনের অভিনেতা তো গ্রুপে থাকে। পরিচালকের তো চেষ্টা হবে যাতে সমস্ত লোককেই আমরা সৃষ্টিশীল অভিনেতাতে পরিণত করে তুলতে পারি। এই প্রসেসটা তো বেশ লং প্রসেস। এই প্রসেস কিভাবে চালান - যাতে এক একটা স্তর অতিক্রম করা যায়।

উ. দ. : সে চোখে দেখা যায় না।

পা. ব. : তবু আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয় কিছু বলতে পারেন। যার থেকে আমরা অল্প স্বল্প বুঝতে পারি। তারপর তো প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছেই।

উ. দ. : কি হয়— আমার অভিজ্ঞতায় হঠাৎ একটা প্লেতে একজন অভিনেতা নিজেকে প্রমাণিত করেন। হঠাৎ একটা প্লেতে, একটা পার্টে। তার আগে পর্যন্ত সে একজন জাস্ট বেয়ারলি টলারেবল অভিনয় করত। সে গলাটলা ঠিক রেখে, ব্যাপার হচ্ছে ঐ যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রিহার্সালের কথা আমরা বলেছি– সেখানে বাজে অ্যাক্টর, খারাপ অ্যাক্টর, উৎকট অ্যাক্টর নাটকের সর্বনাশ ঘটাতে পারে না। এমনভাবে জিনিসটা বাঁধা হয় যে সে নাটকটার বারোটা বাজাতে পারে না। সে ডিস্টার্ব করে আশপাশের অ্যাক্টরদের। কিন্তু দর্শকের চোখে সে এমন কিছু বিপর্যয় ঘটাতে পারে না যে নাটকটার বারটা বেজে যাবে । যদি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নাটকটাকে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু পরিচালক তো জানে যে এ বাজে অ্যাক্টর। কিন্তু তারপরে একটা সময়– একটা কোনো পার্টে হঠাৎ সে নিজেকে

বিকশিত করে। প্রত্যেকে —যতজন এখন আমাদের গ্রুপে ভাল অভিনয় করছে, প্রত্যেকের লাইফে এসেছে একটা পার্ট, একটা ফেজ- যেটার পর থেকে সে অভিনয় করছে। যেমন উদাহরণ ধরা যেতে পারে। কনক মৈত্র। সে এলো আমাদের এখানে থিয়েটার ওয়ার্কসপ থেকে। দম নেই, একটা সেন্টেন্স একদমে বলতে পারে না। কিরকম টেইল ড্রপ, একটা সেন্টেন্সের শেষটুকু শোনা যায় না। তারপর ব্যারিকেডে লান্টের পার্ট। তারপর থেকে সে আমাদের অন্যতম বেস্ট অ্যাক্টর। রজত— সে আবৃত্তি করত, কিন্তু অভিনয়ের অ-ও জানতো না। রামমোহন রায় করল। তারপর থেকে অভিনয় ইমপ্রুভড হয়ে গেছে। রামমোহন রায় ওকে সিলেক্ট করা হয়েছে চেহারার জন্য। গোঁফটা দিলে একদম রামমোহন রায়। কিন্তু রামমোহন রায়ের থ্রু দিয়ে ও নিজেকে বিকশিত করল। এরকম প্রত্যেকে। কোনো না কোন পার্টে, প্রত্যেকে কখনো না কখনো নিজেকে তুলে ধরেছে ওপরে। রবি ঘোষ বলতে পারি। ইয়েতে, অবস্য ওর first performance' এই ওর ইয়েটা দেখা গেছিল, মানে স্কিল।

পা. ব. : হ্যাঁ, একটা হকারের রোলে।

উ.দ. : তারপরে অঙ্গারে এসে সে এস্টাব্লিস্ট করল নিজেকে। এবং একটা প্লে-ই কোয়াইট এনাফ টু ডেভেলাপ দি অ্যাক্টর।

পা. ব. : আর একটা প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে আপনি একটা কথা বলেছিলেন; আমরা আগে শুনতাম। থিয়েটার সম্বন্ধে তখন আমরা অ-ও জানতাম না। অভিনেতার এক্সপ্রেসন।আপনি বলেছিলেন, যে অভিনেতা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলবে তার সঙ্গে তার যে এক্সপ্রেশনটা বেরিয়ে আসবে, সেটাই এক্সপ্রেশন। আগের লোকেরা এরকম একটা বড় ভুল করলেন কি করে?

উ.দ. : আগেকার লোকেরা তো অনেক কিছুই ভুলটুল করেছেন। এক্সপ্রেশন বলে কোন কথা নেই। সে সব এক্সপ্রেশন আমি দেখেছি। বেয়াল্লিশ -তেতাল্লিশ সালে, উফ্! এক একটা নাট্যশালায়। হাস্যকর ছাড়া কিছু বলা যায় না তাকে। এক্সপ্রেসন বলে কিছু নেই। এক্সপ্রেশন কথাটাই নেই। এক্সপ্রেশনটা তো আলাদা কিছু নয়। অভিনেতা যা অনুভব করছেন তার বহি:প্রকাশ যতটা হবার সেটা তো হচ্ছেই। অভিনেতাকে আলাদা করে কিছু করতে হয় না। সে প্রকৃতিই করে দিচ্ছে। আর যদি তিনি কিছু feel-ই না করেন— অভিনেতা, সে আলাদা। তার মানে খারাপ অভিনেতা । এক্সপ্রেশনের কোন দোষ নেই।

পা. ব. : এই প্রসঙ্গেই আপনি বলেছেন যে দৃষ্টি মানে অভিনেতার চোখ যাকে খুব ইম্পর্টান্ট জিনিস বলা হয়, মানে যত স্থৈর্য্য থাকবে, প্রশান্তি ....

উ.দ. : এই যে স্তানিস্লাভস্কির স্কুলিং। তাতো বটেই, চোখই তো আসল। চোখই তো আসল। চোখ পিট পিট করলে কোনোরকম এক্সপ্রেশন তা দাঁড়াবে না,বোঝা

যাবে না মনোভাবটা কি এই চরিত্রটির। বর্তমানে লোকটা কি ভাবছে, এই যে স্টেজের ওপর বসে আছে এর মনোভাবটা কি? চোখ পিট পিট করলে তো কিছুই বোঝা যাবে না। দর্শককে জানতে হবে তো যে লোকটার মানসিক ভাবটা এখন এই। তো সেটা, চোখ হচ্ছে একমাত্র পথ যা দিয়ে আমি জানাতে পারি। মুশকিল হচ্ছে চোখ বেশীদূর থেকে দেখা যায় না, অডিটোরিয়ামে। তাই আমার পুরো বডি আমাকে হেল্প করতে হবে। কিন্তু বডিটা নড়বেই না, যদি আমার চোখ পিট পিট করতে থাকে, চোখ যদি চঞ্চল হয়ে পড়ে। বডি রেসপন্ড করবে না আমার। আমি যদি চোখকে কন্ট্রোলে আনি, তাহলে দেখব পুরো বডিটাই আমার কন্ট্রোলে আসছে। বড় পিকিউলিয়ার। চোখকে কন্ট্রোলে আনলে পরে দেখবেন পুরো বডিটা কন্ট্রোলে এসেছে। এই যে মায়ারহোল্ডের একটা essay আছে। Uses of the eyes. (হাসি)।

পা. ব. : তা এইসব এসে-টেসে তো অনুবাদও করা দরকার, বাঙলায়--- আমাদের পাবার জন্য।

উ.দ. : হ্যাঁ, তা তো দরকার। ইংরেজিতেতো পাওয়া যাচ্ছে না। সব পাব্লিসড হয়েছে এক সময়।

পা.ব. : এবার আপনি যেসব নাটক পরিচালনা করেছেন- সে সিক্সটি ফাইভ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত, অগ্নিশয্যা পর্যন্ত, কোন কোন নাটকে আপনার মনে হয়েছে যে পরিচালক হিসেবে বা তার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারছি।

উ.দ. : কোনোটাই না। (হাসি)।

পা.ব. : তা সত্বেও । কোনো একটাতে মনে হতে পারে আমি অনেকটা পেরেছি।

উ.দ. : মানে আপেক্ষিক— মানুষের অধিকারে। মানুষের অধিকারেতে সাদার্ন ইউ এস এ'র যে atmosphere তৈরি করা হয়েছিল, অ্যালবামা, ভীষণ কঠিন, অসম্ভব কঠিন ব্যাপার। অত কম উপকরণ দিয়ে দক্ষিণের , দক্ষিণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা আবহাওয়া খানিকটা ধরে দেয়া কলকাতার স্টেজে, দুর্জয় কঠিন ব্যাপার ছিল। সেটা খানিকটা পেরেছিলাম। সঙ্গীতও সেখানে অকাট্যভাবে হেল্প করেছিল আমাকে। রেকর্ডেড মিউজিক use করেছিলাম আমরা। ওইটেই, যা চেয়েছিলাম, তার কাছাকাছি। তো, আমি আবার তাতে অভিনয়ও করছিলাম, সবটা দেখতে পাইনি তো। বাইরে থেকে না দেখলে আবার প্লে বোঝা যায় না। মুশকিল হচ্ছে, আমি তখন বেশির ভাগ প্লেতেই অভিনয় করতাম। তাই আমি অনেক প্লে-ই দেখতে পাইনি। .... আর বলা যেতে পারে বাংলা ওথেলো। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শেক্সপিয়ার, খানিকটা আমরা পেরেছিলাম। এইতো, আর কি।

পা.ব. : আর কোন নাটকের নাম করতে পারছেন না?

উ. দ. : না-না। আর কি? (হাসি)।

পা. ব. : টিনের তরোয়াল?

উ.দ. : অনেক গলদ ছিল। অনেক গণ্ডগোল।

পা.ব. : আপনি দুটো নাটক বললেন, সেখানে আপনি সাফল্যের কাছাকাছি গিয়েছিলেন। আপনি আপনার সমকালীন অন্য কোন প্রযোজনা দেখেছেন যেখানে পরিচালকের কাজ সফল, সাকসেসফুল মনে হয়েছে?

উ.দ. : রক্তকরবী। যদিও একটা সমালোচনা আছে। রক্তকরবী একটা ভীষণ নাটক-তার ভয়ঙ্করতাটা কখনো মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল, বড় সুন্দর, বড় কবিত্বময়, মনে হচ্ছিল চৈতালি রাতের স্বপ্ন। তার সেটে, তার আবৃত্তি ভালো, অভিনয়। আসলে গোটা পুঁজিবাদের ভয়াবহ চেহারা, শ্রমিকদের দুমড়ে-মুচড়ে, নিংড়ে দিচ্ছে। সেই ভয়ংকর চেহারাটা যেন ছিল না, নইলে অসাধারণ প্রোডাকশন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল যেটা, রবীন্দ্রনাথ যে থিয়েটারে কত এফেকটিভ ও পাওয়ারফুল, থিয়েটারের জন্যই রবীন্দ্রনাথের লেখা। থিয়েটার যে রবীন্দ্রনাথ খুব ভালো বুঝতেন - সেটার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের নাটক থিয়েটারে হয় না এরকম বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ওকে। শম্ভুবাবু রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রতিষ্ঠিত করলেন থিয়েটারে। এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বাঙলা থিয়েটারে। আরও আমাদের স্মরণ করা দরকার যে বাঙলা থিয়েটারে। রবীন্দ্রনাথ সাকসেসফুলি প্রোডিউসড হয়েছে, বহুদিন থেকে। সেই নৌকাডুবি -গিরিশবাবু একবার করেছিলেন নৌকাডুবি। তার পাণ্ডুলিপি তো করেইছেন। রবীন্দ্রনাথ সাকসেসফুলি বাঙলা পেশাদার-নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই থিয়েটারের সঙ্গে মিশতে দেবে না।

পা. ব. : শিশির ভাদুড়ির যে সব প্রযোজনা আপনি দেখেছেন সেখানে পরিচালক হিসেবে -অভিনেতা হিসেবে বলছি না- স্মরণীয় নাটক কোনগুলো?

উ. দ. : ষোড়শী—ষোড়শী! প্রচণ্ড পাওয়ারফুল।

(ক্রমশ:)

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায়

ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়, অভিনয়শিক্ষা

পবিত্র সরকার

নাটক হল মানুষের একটি শিল্প। এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ সচেতন শিল্পসৃষ্টি মানুষ ছাড়া অন্য কেউ করে না। অনেকে বলে বাঁদরেরা ছবি আঁকে, কোকিলেরা গান গায়। তাই তাদেরও তো শিল্প আছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কারণ বাঁদরেরা কোন্টা কী রং জানে না, তারা ক্যানভাস, তুলি কিছুই তৈরি করেনি। কোকিল গানের, সপ্তক কাকে বলে জানে না। শিল্পের সঙ্গে থাকে তার তত্ত্ব, তার প্রকরণ, তার উপকরণ। এগুলি বাঁদর বা কোকিলের নেই। শুধু অসচেতন সুন্দর প্রকাশ শিল্প নয়। পৃথিবীতে অনেক সুন্দর বস্তু প্রকৃতি সৃষ্টি করে, পাখির গান, অরণ্য, গাছের ফুল, সন্ধ্যার রক্তিম আকাশ। সেগুলি শিল্প নয়। শিল্প মাত্রেই মানুষের সৃষ্টি।

নাটক মূলত ভাষার শিল্প, যদিও ভাষা ছাড়াও নাটক হয়। কিন্তু আমরা অন্য এক জায়গায় (কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা ২০১০) বলেছি যে, ভাষা আছে বলেই নির্বাক নাটক অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, মানুষের ভাষা তৈরি না হলে তার নৈ:শব্দ কোনও অর্থ পেত না।

এই নাটক হল জীবনের অনুকরণ— এ কথা আড়াই হাজার বছর আগে আরিস্তোতল বলেছেন, একটু আগে বা পরে (পণ্ডিতেরা ঠিক করতে পারেন নি) আমাদের ভরতমুণিও বলেছেন। যেটা বলেন নি, তবে তাঁদের কথা থেকে হয়তো অনুমান করা সম্ভব যে, আর কোনও শিল্প নাটকের মতো এত 'জীবন্ত' অনুকরণ নয়। আর কোনও শিল্পে -ছবি হোক, কবিতা হোক, গান হোক, স্থাপত্য হোক, যা তৈরি হয় তাতে জ্যান্ত আস্ত মানুষ থাকেনা, থাকে অন্য কিছু। সিনেমাতেও মানুষ থাকে, কিন্তু তারা ছবিতে ধরা মানুষ, মঞ্চের উপরে রক্তমাংসের মানুষ নয়। নাটকের অভিনয়ে (অভিনয়ই আসলে নাটক, শুধু পাঠ বস্তুটা সেই অর্থে নাটক নয়) মঞ্চে রক্তমাংসের মানুষকে থাকতেই হয়। গর্ডন ক্রেইগ মানুষ ছাড়াও নাটকের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু এখনও পৃথিবীর প্রায় সব নাটক হচ্ছে মানুষ নিয়ে।

বলতে পারেন, পুতুল নাটকও তো হয়, কিংবা পশুপাখির বা রোবটের বা ভূতের নাটক। কিন্তু এগুলোও এক অর্থে মানুষেরই নাটক। কারণ পুতুল, পশুপাখি, রোবট, ভূত, রাক্ষক-খোক্ষস- সবই মানুষের প্রতিকল্প।

তাই নাটকে যারা অভিনয় করে, যেটুকু সময়ের জন্যেই হোক, তাদের দুটো জীবনের মধ্যে, দুটো অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রায়ই চলাফেরা করতে হয়। অবশ্যই তারা নিজেদের জীবনই বেশিরভাগ সময় যাপন করে, সেটা ছাত্রের, শিক্ষকের, কেরানির, যন্ত্রবিদের, দর্জির বা ডাকপিয়নের জীবন হতে পারে। কিন্তু নাটকে যখন সে মঞ্চে ওঠে, তখন তার আর -

একটা পরিচয়, আর একটা জীবন। তখন সে সম্রাট শাহাজান বা 'রক্তকরবী'র নন্দিনী, তখন তার সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়। হ্যাঁ, নাটকেও নানা দৃশ্য থাকে, সব দৃশ্যে সকলের অভিনয় থাকে না। তখন হয়তো অভিনেতা গ্রিনরুমে এসে বিশ্রাম নেন, এমনকি সহ-অভিনেতাদরে সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও করেন। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের সামাজিক পরিচয়ে ফিরে আসেন, মঞ্চে না থাকলে সে সুযোগ তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁর গায়ে চরিত্রের পোশাক থাকে, তাঁকে মানসিকভাবে অন্তত দু-ঘন্টা সওয়া দু-ঘন্টার জন্য এই চরিত্রটির মধ্যে বাঁচবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

সিনেমার অভিনয়ের সঙ্গে নাটকের অভিনয়ের অনেক তফাত। সিনেমায় একটা দৃশ্য তোলা হয় নানা ফাঁক দিয়ে, সব কিছু ঠিক করে, ভাগে ভাগে, খণ্ডে খণ্ডে। কখনও আগেরটা পরে, পরেরটা আগে। অনেক সময় শুটিংয়ের তারিখ অনেক পরে-পরে পড়ে, তাতে অভিনেতারা কখনওই গল্পের পুরো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় না। ফিল্মের সম্পাদক আর পরিচালক মিলে পুরো ছবিটা খাড়া করেন। অভিনেতারা নিশ্চয়ই পুরো চিত্রনাট্যটা জানেন, পরে পুরো ছবিটাও দ্যাখেন, কিন্তু অভিনয়ের সময় তাঁদের ওই সমগ্রের, একটা পুরো গল্পের মধ্যে বাঁচার, একটানা কারও সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে যাওয়ার, অভিজ্ঞতা হয় না। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাতেও সমর্থ অভিনয় দরকার হয় এবং তার শিল্পীকেও নানারকম চর্চার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ফিল্ম বা সিরিয়ালের অভিনয়কে আমি খাটো করে দেখছি না। শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, একটানা একটা আখ্যানের মধ্যে অন্তত ফিল্মের অভিনেতাদের থাকার দরকার হয় না।

তাই শিল্প হিসেবে নাটক আর জীবন অনেক কাছাকাছি। আমরা আর আমাদের নানা শিল্প- এ দুয়ের সম্পর্ক যদি হিসেব করি, তা হলে হয়তো দেখব যে, আমরা গান বেশি শুনি, কারণ ঘরে বসে গান শোনার অনেক এবং সুলভ, সুযোগ আছে। সিনেমা দেখার সুযোগও আজকাল টেলিভিশন মোবাইলের কম্পিউটারের কল্যাণে অনেক বেড়ে গিয়েছে, যাদের সময় আর সুযোগ আছে তাঁর এই নিয়ে সময় কাটান। ছবি, ভাস্কর্য আমরা আগ্রহী ছাড়া সকলে সবসময় দেখে উঠতে পারি না, স্থাপত্য দেখার জন্যে তো দূরে দূরে যেতে হয়। তবু বই, অ্যালবাম আর টেলিভিশনের কল্যাণে কিছুটা অংশ মেটাই। আর আসল কথা এই যে, গান ছাড়া অন্য শিল্প আমরা রস গ্রহণ যতটা করি, অংশগ্রহণ ততটা করতে পারি না। অবশ্যই অনেকে নানা শিল্পের শিল্পী হয়। কিন্তু সেসব শিল্পের মধ্যে আমরা জড়িয়ে যাই না, শিল্প সৃষ্টি আমাদের থেকে আলাদাই থাকে। ছবিতে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, কবিতা-গল্পে জ্যান্ত মানুষ থাকে না, প্রতিকল্পিত মানুষ থাকে। নৃত্যেও পাই জ্যান্ত মানুষ, কিন্তু সে সব সময় আমাদের মতো মানুষ নয়। একটু সাজানো, অন্য সময়ের, অন্য বাস্তব প্রতিবেশের মানুষ। নাটকে থাকে আমাদের অনেক বেশি চেনা মানুষ, নাটকের অভিনয় আমাদের সেই জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ এনে দেয়।

প্রশ্ন হল, সুযোগ থাকলেই বা তাতে অংশগ্রহণ কেন করব? এ ব্যাপারে আমার

একটা 'দর্শন' আছে। 'দর্শন' কথাটা বেশি ভারী আর অহংকারী শোনালে আপনাকে ওটা শোনেননি বা (এই লেখায়) পড়েননি বলে মনে করবেন। আমি ভাবি, মানুষ যেহেতু মানুষ হয়ে জন্মেছে, এবং যেহেতু একমাত্র মানুষই শিল্পসৃষ্টি করেছে, সেহেতু এই শিল্পের সঙ্গে মানুষের অন্তত তিনটি সম্পর্ক হওয়া দরকার। এটা সম্পর্ক স্রষ্টার, অর্থাৎ যে শিল্প সৃষ্টি করছে। ছবি আঁকছে, সুর তৈরি করে গান লিখছে, মূর্তি গড়ছে, নাটক করছে, লিখছে, কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখছে, সিনেমা তৈরি করছে। সেটা আমরা সকলে হতে পারি না, আমাদের মধ্যে সে প্রতিভা থাকে না বা থাকলেও তা বিকশিত হওয়ার পরিবেশ পায় না। আর দ্বিতীয়ত, স্রষ্টাদের পাশাপাশি দরকার অনেক অভিকার বা performer, যারা হয়তো সৃষ্টি করতেও পারে না, কিন্তু স্রষ্টাদের তৈরি শিল্প বা পরিবেশন বা অভিকরণ করবে- গায়ক, বাদক, মুদ্রাকর, প্রদর্শক ইত্যাদি। আর তৃতীয়ত দরকার এই সব শিল্পের অজস্র উপভোক্তা বা consumer, যারা শুধু শুনবে, দেখবে, আর ওই 'রসগ্রহণ' করবে।

এমন হতেই পারে যে কেউ একাই তিনটে ভূমিকা পালন করছে, সেটা অসম্ভব নয়। তেমন প্রতিভাবান আমাদের মধ্যে অনেক দেখা দিয়েছেন। আর তৃতীয় ভূমিকাটা তো তুলনায় সহজ, আমরা প্রায় সকলেই হতে পারি। সকলের কাছে সমান সুযোগ নেই, কিন্তু তা সত্বেও আমরা গান শুনি, ছবি দেখি, নাচ, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি দেখি। এই উপভোক্তা এবং 'ক্রেতা' না থাকলে কোনও শিল্পেরই বেঁচে থাকা এবং এগিয়ে চলা সম্ভব হত না।

আসলে কোনও প্রাকৃতিক যোগাযোগে আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, আর (আমার মতে) একটামাত্র জীবন পেয়েছি, তাই উপরের এই তিনটের মধ্যে অন্তত একটা ভূমিকা নিতে না পারলে আমাদর মানুষ হয়ে জন্মানোই অর্থহীন হয়ে যায়। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে অনেক আগে, তার ভাষার সৃষ্টিও পঞ্চাশ থেকে তিরিশ হাজার বছর হল। তবু কৃষিকাজের সূত্রপাত থেকে ধরলে দশ হাজার বছর বয়স হল মানুষের সভ্যতার। তাতে মানুষ - নানা দেশের মানুষ, আশ্চর্য সব সৃষ্টি করেছে সমস্ত শিল্পে— সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে— তার কিছুমাত্র যদি আমরা আস্বাদন না করতে পারি তাহলে আমাদের মানুষের জীবন সার্থক হয় না। সবাই হয়তো প্যারিসের ইউটিউবে ল্যুভর জাদুঘরে গিয়ে পৃথিবীর মহান সব শিল্পীদের ছবি দেখার সুযোগ পাবে না, কিন্তু অ্যালবামে ইউটিউবে তা দেখে অন্তত দুধের সাধ ঘোলে তো মেটাতে পারি আমরা। আর বেটোফোনের নবম সিম্ফনি থেকে শুরু করে পল রোবসনের গান তো আমরা শুনতেই পারি।

কিন্তু অংশ নেওয়া? যোগ দেওয়া? ধরা যাক্, ওই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকার জন্য আমাদের ডাক পড়ল। আমরা গান বা সুর তৈরি করতে পারব না, কিন্তু গাইতে বা বাজাতে তো শিখতেই পারি। আমরা নাটক লিখতে পারব না, কিন্তু নাটকে অভিনয় তো করতেই পারি। আর সবচেয়ে বড় কথা, নাটক দেখতেও পারি, সেটা তো সবচেয়ে সহজ ভূমিকা।

আচ্ছা, দর্শক থেকে, ধরা যাক, আমরা অভিকার বা performer হতে চাই।

নাটকে অভিনয় করতে চাই। এই চাওয়া এখন আর কোনও অন্যায় নয়, কারও ভুরু বিশেষ কুঁচকে যায় না এ কথা শুনলে। যারা অভিনয় করতে আসে, তারা অনেকেই নানা লক্ষ্য নিয়ে আসে। একটা লক্ষ্য হল ভালো অভিনেতা হওয়া, যা হলে নানা জায়গায় সুযোগ পাওয়া যায়। ফিল্মে, সিরিয়ালে, ওয়েব-সিরিজে-অর্থাৎ নাটককারও জীবিকা হয়ে উঠতেই পারে, অনেকের যেমন হয়েছে। তাই দেখি আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাটকের বিভাগে প্রচুর ছেলেমেয়ে পড়তে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ থাকতেই পারে যে, অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে নাটকে এসে পড়েছে। কিন্তু অনেকেই তা নয়। এই বাকিরা নিশ্চয়ই একটা-কিছু প্রত্যাশা নিয়েই আসে, তাদের অভিভাবকদেরও হয়তো প্রত্যাশা থাকে। অবশ্যই আমাদের দেশে এখনও নাটক বা অভিনয় একটা সুনিশ্চিত জীবিকা হয়ে ওঠেনি। অভিনয় করলেই মঞ্চ থেকেই সিরিয়ালে ফিল্মে সুযোগ পেয়ে তারকা হয়ে যাব, এমন সম্ভাবনা সকলের ক্ষেত্রে সত্য হয় না। তা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নাটক পড়তে আসে। জীবিকা অনিশ্চিত জেনেও আসে। প্রশ্ন তো থাকেই যে, এই সমাজে কোন জীবিকাই বা সুনিশ্চিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজমেন্টের বাইরে! হয়তো তারা ভাবে, কম্পিউটার বা ওইরকম কিছু শিখে অন্য কোনও একটা কাজ জুটিয়ে নেব, পাশাপাশি নাটক করব। আমাদের এই মিশ্র অর্থনীতির সমাজ যত লোক নাটক করে তার একটা খুব কম অংশকেই সুনিশ্চিত উপার্জনের সুযোগ দেয়।

আরও সমস্যা আছে বা ছিল। সমাজের নৈতিক আপত্তি একটা তার মধ্যে। আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাটক করা নিয়ে যে মধ্যবিত্তের সংশয় ছিল— নাটকের লোকেদের চরিত্র খারাপ হয় ইত্যাদি, তা গত শতকের মাঝামাঝি থেকে ক্রমে কেটে যেতে থাকে। ব্রাহ্ম নেতা অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রের গল্প আমরা সকলেই জানি। পথে একজন তাঁর কাছে স্টার থিয়েটারে কীভাবে যাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করায় তিনি বিরক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'জানি না!' তাঁর পরেই এই সৎ মানুষটির মনে হল তিনি মিথ্যা কথা বললেন। তখনই এগিয়ে যাওয়া লোকটিকে পিছন থেকে ডেকে তিনি বলেলেন, 'এই শোনো, শোনো, আমার ঠিক উত্তর হল, 'জানি কিন্তু বলব না।'

নাটক সম্বন্ধে আমাদের সমাজের এই বিরাগ পরে ক্রমশ কেটে যায়। তার হয়তো দুটো কারণ আমরা দেখাতে পারি। এক, একটা ইতিবাচক, আশাব্যঞ্জক কারণ- শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা, প্রথমদিকে রাজনীতির প্রেরণায়, পরে নিছক শিল্পের প্রতি ভালোবাসায়— বা দুটোতেই আগ্রহ নিয়ে ক্রমশ নাটকে আসতে শুরু করে। ১৯৪৪ -এর পর থেকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ এই পরিবর্তনটা ঘটায়। আর শিশিরকুমারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত লোকেরাও নাটকে আসতে শুরু করেন, যদিও 'চরিত্র খারাপ' - এর পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারবেন কি না জানি না। আর ধর্ম, দেশপ্রেম ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় নাটকেরও সম্মান বাড়ে। দ্বিতীয়ত, 'চরিত্র খারাপ' - এর জন্য একা নাটকের ক্ষেত্রকে দায়ী করা চলে না এটা পরিষ্কার হতে থাকে। যাই হোক, বাঙালি মধ্যবিত্তরা নাটককে শিল্পের আর একটা এলাকা হিসেবেই দেখতে শুরু করে, এবং নিছক দর্শক না

হয়ে, নিজেদের আর নিজেদের সন্তানদেরও এর সঙ্গে যুক্ত হতে বাধা দেয় না। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য আর গীতিনাট্যগুলিও স্কুলকলেজে জনপ্রিয় হতে থাকে এবং তাও যেহেতু এক ধরনের নাটক, তাতেও আমাদের ছেলেদের, বিশেষত মেয়েদের যোগদান বাড়তেই থাকে।

নাটকের একটা নেশাও ছিল বইকি। আমারই অনেক বন্ধুবান্ধবকে দেখেছি, নাটক ছিল তাঁদের জীবনসর্বস্ব। আমরা জানি, শিশির কুমার ভাদুড়ি অধ্যাপনার নিশ্চিত ও সফল জীবন ছেড়ে নাটকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অনেকে জীবিকা আর নাটক-দূ-কূল বজায় রেখে চলতে পারেন, অনেকে একটাকে ছাড়েন, আর-একটাকে ধরে থাকেন। নিজের যৎসামান্য নাটক করার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমার উচ্চারণে লোকে হাসিতে ফেটে পড়ছে, স্তব্ধ হয়ে চোখের জল ফেলছে, এমনকি কখনও কখনও উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দিচ্ছে এমন অভিজ্ঞতা অভিনেতার চৈতন্যকে আলোড়িত করে, তার ওই সাড়া বার বার পাওয়ার জন্যে নেশা ধরে যায়, সে নিজের একটা ভিতরকার শক্তি উপলব্ধি করতে চায়। নিজের ভিতরকার অজানা সম্ভাবনা আবিষ্কারেরও একটা নেশা আছে। এই কারণেই চেখফের (ইংরেজী অনুবাদে) 'সোয়ান সং' নাটিকার বৃদ্ধ অভিনেতা শূন্য প্রেক্ষাগৃহে মাত্র একজন দর্শকের (আসলে প্রমটারের) সামনে তাঁর সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়গুলি একে একে করে দেখিয়েছিলেন, যা বাংলায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। এটা যাকে আত্মপ্রেম বা নার্সিসিজম বলে তা নয়। এটা হল নিজেকে, নিজের ভিতরকার সম্ভাবনা আর শক্তিকে আবিষ্কারের নেশা। এই নেশার জন্য নাটককে ধরে থেকেছেন এরকম বন্ধু আমার কম নেই। সব রকম অনিশ্চয়ের ঝুঁকি নিয়েও। তাঁদের প্রতি আমার অনন্ত শ্রদ্ধা।

আগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নাটক রাষ্ট্রের পোষকতা পেত, এখন সমাজতন্ত্র-বর্জন করা কোন্ দেশের কি অবস্থা জানি না। আমাদের দেশে এখন তো তবু সরকারি- অনুদান-, কোম্পানীর স্পন্সরশিপ আরও নানা উৎস থেকে নাটকের আয় কিছু তৈরি হয়েছে। কিন্তু ষাট -সত্তরের বছরগুলিতে, আমরা যখন নাটকের সঙ্গে একটু-আধটু যুক্ত হয়েছিলাম তখন অবস্থাটা বেশ খারাপ ছিল । তখন থেকেই নাটকের মানুষদের মধ্যে 'পেশাদার' হওয়া না -হওয়া নিয়ে তর্ক চলেছে, আজও পর্যন্ত তার কোনও মীমাংসা হয়নি। আমার 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ' বইয়েও এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, গ্রুপ থিয়েটারের নানা বিতর্ক নিয়ে লেখাতে। সেখানে যা বিশ্বাস করেছি আর বলেছি এখানে আবার তাই বিশ্বাস করি বলেই বলি, যে আমাদের এই অর্থনীতিতে নাট্যকর্মীদের পক্ষে পুরো পেশাদার হওয়া সম্ভব নয়। ফিল্মে- সিরিয়ালে সফল অভিনেতা হলে অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু সে সুযোগ সকলের কাছে আসে না।

এর অনেকগুলি কারণ আছে। এক, ইউরোপ আমেরিকায় যেমন হয়, টিকিট কেটে নিয়মিত নাটক দেখা এখনও আমাদের সাংস্কৃতিক অভ্যাস হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ যাত্রার সঙ্গে যদি তুলনা করি, যাত্রার যে প্রবল আকর্ষণ মফস্বলের জনজীবনে এখনও আছে, আমাদের গ্রুপ থিয়েটারে নাটক সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তৈরি করতে পারে নি। মধ্যবিত্তের

বাইরে তার দর্শকসংখ্যাও সীমিত। দুই, ওই টিকিট -কাটা দর্শকের নিশ্চয়তা নেই বলেই যাত্রার মতো পেশাদার গোষ্ঠী গ্রুপ থিয়েটারে নেই বা তৈরি হয়নি। এটা বোঝার জন্য বাংলার পেশাদার থিয়েটারের মৃত্যুর কারণগুলি আমাদের বুঝে দেখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রথম পেশাদার থিয়েটার তৈরি হয়েছিল, তখন তার ভিত্তি ছিল সমবায়মূলক-কিন্তু তা বেশিদিন টেকেনি। ১৮৮০ থেকেই ব্যক্তির মালিকানার অধীন হয় বাংলা পেশাদার থিয়েটার, এবং অভিনেতা থেকে সকলেই মাইনে - করা কর্মচারী হয়ে যায়। তার একটা নিশ্চিত আয় ছিল, কিন্তু আবার জনপ্রিয়তার দিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হত। গিরিশচন্দ্র শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' তিন রাত্রির বেশি চালাতে পারেন নি। তাই গ্রুপ থিয়েটার যে ধরনের নাটক করতে চায়, তা একটা নির্ভরযোগ্য বেতন পাবে— তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কাজেই বহু লোককে সেই দু-নৌকায় পা দিয়েই চলতে হবে। অর্থাৎ দিনে একটা চাকরি বা জীবিকা যাপন করবে, আর সন্ধ্যেবেলা থেকে অভিনয় করবে বা নাটকের কাজ করবে। গ্রুপ থিয়েটারের 'আদর্শ' অনেক সময় তার ঝুঁকিও হয়ে দাঁড়ায়।

৩

তা হলে আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা নাটকে যেতে দেব কেন? অনেক অভিভাবক - অভিভাবিকার মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে। এর উত্তর এই যে, যারা ডাক্তার -ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার মতো মেধাবী বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে, তাদের বাইরে কি সুনিশ্চিত জীবিকার সম্ভাবনা খুব বেশি আছে? আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা ছবি আঁকতে চায় বা গান গাইতে চায় বা নাচতে চায়, বা সাহিত্য পড়তে চায় তাদেরও আমরা অনেক সময় নিরুপায় হয়ে ওসব লাইনে শিক্ষা নিতে দিই। সাবধান করে দিই যে, একটা চাকরি তো চাই-ই, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। অর্থাৎ শিল্পটা করো একটা partime হিসেবে, একটা avocation হিসেবে। ইচ্ছেয় দিই আর অনিচ্ছায় দিই, আগে যেমন বলেছি, তাতে আমাদের সমাজ আর সংস্কৃতির লাভ হয়, আমাদের জীবনেরও সৌন্দর্য বাড়ে। বাড়িতে একটি ছেলে বা মেয়ে পাখির মতো গান গাইছে, বা ছবি এঁকে ঘর ভরিয়ে দিচ্ছে, এতে কোন বাড়ি না আনন্দিত থাকে। তেমনই নাটকে আগ্রহ থেকে একটি ছেলে বা মেয়ে আবৃত্তি করে আমাদের কানকে তৃপ্ত করছে, তাতেও বাড়ির সাংস্কৃতিক যাপন অনেক সমৃদ্ধ হয়। বাড়ির কেন, পাড়ার এবং সমাজেরও। একটু ভাবালু কথা বলবার ঝুঁকি নিয়েই বলি, বাড়তি টাকাপয়সার চেয়ে এগুলির দাম কম নয়। আমি নিজে কতকগুলি কারণে আমাদের সন্তানদের নাটকের অনুশীলন করানোর পক্ষপাতী, ভবিষ্যতে তারা নাটক করবে কি না করবে, সে সম্ভাবনার বাইরে গিয়েও। এক, আবৃত্তির কথা আগে বলেছি। বাড়ি কবিতায় মুখরিত থাকছে, এতে বাড়ির সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ঐশ্বর্য পাচ্ছে, বাড়িতে ভালো গলার গানের যে ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি। নাটক শেখারই একটা বাই-প্রোডাক্ট হল আবৃত্তি, অবশ্য আজকাল আলাদা করে আবৃত্তি শেখানোরও অনেক শিক্ষক আর ইশকুল হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নাটকের অভ্যাস করতে করতে, আমার উচ্চারণটা অর্থাৎ আমার

মাতৃভাষার মান্য বা স্টান্ডার্ড রূপটা কেমন করে বলতে হয় সেটা আমার বেশ দূরস্ত হয়ে যায়। নাটক আমাকে আমার ভাষার ঠিকঠাক উচ্চারণটা শেখায়। সেই সঙ্গে অন্যদরে উপভাষাও বলতে শেখায়, সেটা একটা আলাদা দক্ষতা। কিন্তু ভাষার মান্যরূপের কথাই বলি। এটা তো সকলেরই জানা যে, আমরা কেউ প্রায় আমাদের ভাষাটা ঠিকঠাক বলি না। কেউ গাঁক-গাঁক চিৎকার করে বলি, কেউ মিনমিন করে বলি, যার অর্ধেক শোনা যায় না, কেউ হড়বড় করে বলি কথার ঘাড়ে কথা ছুড়ে দিয়ে, কেউ আবার এত ধীরে সুস্থে বলি যে, শ্রোতাদের ঘুম পেয়ে যায়। কারও শব্দের শেষটা জড়িয়ে বা অস্পষ্ট হয়ে যায়, কেউ বাক্য শেষ করি না, কেউ একটা বাক্যে আর-একটা বাক্যকে ঢুকিয়ে দিই। ফলে আমাদের অনেকের কথা বলার শৈলী খুবই মামুলি, আমাদের কথা শুনে কেউ ভাবে না, বাহ, লোকটা তো বেশ কথা বলে, শুনি তো একটু ওর কথা!

নাটক শিখতে গেলে এই কথা বলার শিল্পটা আমাদের বুঝতে হয়। কোন ধ্বনির কী উচ্চারণ, কথার মধ্যে কোথায় জোর দিতে হয়, কোথায় কোন সুর লাগাতে হয়, কথাকে কীভাবে স্পষ্ট চেহারা দিতে হয়-নাটক করতে গেলে আমাদের সেসব শিক্ষা হয়। তাতে মানুষ হিসেবে আমাদের একটা অস্ত্রে ধার পড়ে। সে অস্ত্রটা কী? তার নাম ভাষা, যা মানুষ ছাড়া আর কারও নেই। আর এই ভাষাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু যে নাটক করবে তার জন্য নয়, যে রাজনৈতিক নেতা হবে তাকে অনেক বক্তৃতা দিতে হবে। যে শিক্ষক-অধ্যাপক হবে, যে কোনও চাকরির জন্য যে ইন্টারভিউ দেবে, যে উকিল- অ্যাডভোকেট হবে, যে ব্যবসার পার্টির সঙ্গে দরাদরি করে চুক্তি করবে— এমনকি যে আড্ডা দেবে— সকলকেই এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তার কথাটা লোকে শুনতে পায়, শুনতে চায়। তাতেই যুদ্ধের অর্ধেকটা জয় অর্জিত হয়। অর্থাৎ নাটকের বাইরেও নাটকের প্রশিক্ষণের প্রচুর উপযোগিতা আছে, যা, আমার মতে, অন্য কোন শিল্পের প্রশিক্ষণে নেই। অন্তত আমার ভাষাকে , কথা বলার শৈলীকে সাজিয়ে দেয় এমন শিল্প আর নেই। শুধু গান বা আবৃত্তির জন্য আমার ভাষা দূরস্ত করার দরকার তা নয়, আমার জীবনের জন্যও দরকার।

অবশ্যই নাটক করতে না শিখেও অনেকে চমৎকার কথা বলে, তা আমরা দেখেছি। হয়তো তাদের বাড়ির প্রতিবেশে ওই ভালো কথা বলার চর্চা আছে, হয়তো সে কোনও শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বা অভিনেতাকে অনুকরণ করেছে তাঁর কথা বলা ভালো লেগেছে বলে। কিন্তু নাটকের চর্চা করতে করতে যেমন একটা স্পষ্ট ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে, এমন আর কিছুতে হয় না।

আর একটা কথা আমার খুবই মনে হয়, অন্তত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমার তাতে প্রচুর উন্নতি হয়েছে, যদিও আমি নাটকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এক পলাতক সৈনিক। তা হল, এক সঙ্গে মিলে কাজ করার শিক্ষা। আর সে কাজের কোনও জাত নেই, কৌলীন্য নেই। সেটা এক ধরনের অহংকার আর স্বার্থপরতা বিসর্জন দেওয়ার শিক্ষা। নিজের ছোট বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে সহযোগিতা, পরস্পর নির্ভরতার শিক্ষা। তুমি

অধ্যাপক হও আর যাই হও, তোমাকে তোমার দলে ডাকপিয়ন সদস্যের সঙ্গে সুটকেস ধরে ট্রেনে তুলতে হবে, কিংবা ট্যাক্সির ডিকি থেকে নামাতে হবে। সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসে খাবার, একই মাটির ভাঁড়ে চা খেতে হবে, একই ঢালাও শয্যায় শুতে হবে। যাকে কমিউন ব্যবস্থা বলে, সাময়িকভাবে হলেও তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বহুরূপীর সময় থেকে নাটকের দলের শৃঙ্খলা এক সময় কমিউনিস্ট পার্টির আদলে তৈরী হয়েছিল, এখনও হয়তো তার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। আমার-আপনার সন্তান যদি এই শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যায় তবে স্বার্থপরতা শিখবে না, সমাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। যাকে আজকালকার ভাষায় human resource development বলে অনেক ব্যাপক অর্থে তা সত্য হবে।

এই শৃঙ্খলার একটা দিক হল একটা কাজ নিখুঁতভাবে করার শিক্ষা। আপনারা জানেন, বেশিরভাগ নাটকের লোকেরা খুব খুঁতখুঁতে হয়। একটা কাজ যতক্ষণ না তাদের মনোমত হচ্ছে ততক্ষণ তারা ছাড়বে না, আপনাকেও বার বার সেটা করে কাজটা ভালোভাবে তুলে দিতে হবে। তাতেই আবার আর-একটা শিক্ষা হয়, কোনটার পরে ঠিক কী আসবে তার সতর্ক হিসেব রাখা, তার একটাও ফসকে গেলে চলবে না। শুধু চরিত্রের সংলাপে নয়, মঞ্চে কোন জিনিসের পরে কোন জিনিস ঢুকবে, উইংসের পিছনে তা সাজিয়ে রাখা, তারপর ঠিক সময়ে তা অভিনেতার হাতে তুলে দেওয়া, যে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করবে তাকে ঠিক সময়ে ঠিক শব্দটি বাজানো, ঠিক সময়ে ঠিক আলোটি ফেলার ব্যাপারে অতি সতর্ক নজর রাখতে হয়। কোনও ক্ষেত্রে মানুষ কর্মী হিসেবে অনেক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। তাতে সমাজেরই উপকার হয়। যে যাই করি, সেই জায়গায় উপরের দিকে পৌঁছোতে হলে এই কাজ প্রাণপণে নিখুঁতভাবে পরম্পরা মেনে করার শিক্ষা একটা বড় শিক্ষা, সেটা নাটকে যত ভালোভাবে হয়, অন্য কোথাও সেভাবে হয় না। প্রতিভাদের কথা হয়তো আলাদা। কিন্তু আমরা যারা প্রতিভাবান নই, তাদের কাছে এ শিক্ষা খুব জরুরি মনে হয়েছিল।

অবশ্যই একদল অভিভাবক থাকতেই পারেন যারা ভাববেন, ইশ, আমার ছেলে/মেয়ে অত খাটতে যাবে কেন? বাড়িতে সে কত আদরে থাকে! আমি জানি না, এঁদের মতো অভিভাবক আজকাল আছেন কি না। যদি থাকেন তাঁদের বিবেচনা তাঁদের, কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিলে আখেরে তাদের ভালোই হবে।

আরও একটা, হয়তো একটু বেশি বড় কথা-আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আবার ওই শিল্পের জায়গায় ফিরে যাই। এ কথা উপরেও বলেছি যে, নাটক এমন একটা শিল্প যা শুধুই মানুষের জীবন দেখায়। যখন দেবদেবী, পশুপাখি, রাক্ষক-খোক্কস বা রোবট নিয়ে নাটক হয় তাও এক ধরনের মানুষেরই কথা দাঁড়ায়, মানুষেরই ছদ্ম রূপ ওই সব প্রাণীরা। নাটক দেখে আমরা তাই অন্য মানুষের, পৃথিবীর নানা সম্রাটের সুখ, সম্রাটের দুঃখ; বস্তির শ্রমিকের সুখ, বস্তির শ্রমিকের ছেলের বা মেয়ের দুঃখ। গ্রিসের থেবেসের রাজার ভয়ংকর দুঃখ, আমেরিকার ধর্মঘটি শ্রমিকের বা কালো মানুষের অন্য সুখ, অন্য দুঃখ। সে সুখদুঃখের কোনও দেশ নেই, জাতি নেই, ধর্ম নেই, রং নেই, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নেই-

তা মানুষের সুখদুঃখ।

গল্প-উপন্যাস বা নাটক পড়লেও অবশ্য এই সুখদুঃখের খবর পাওয়া যায়, যা আমাদের হাসায়, কাঁদায়, নানাভাবে আলোড়িত করে। কিন্তু নাটক দেখলে যেমন একেবারে কাছের থেকে সুখদুঃখগুলিকে বুঝতে পারি, এমন আর কিছুতে পারি না। নাটক করলে আরও বেশি তার মধ্যে ঢুকি, আমি তাদের সেই অভিজ্ঞতাকে আমার নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার চেষ্টা করি। কারণ, যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, আমাকে তো তার চরিত্রটার মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়।

তাতে আমার যাকে বলে মানবিক অস্তিত্বের বিস্তার তাই হয়। আমি হরিপদ কেরানি, কিন্তু আমি আকবর বাদশার মহিমাকে কিছুটা যেন বুঝতে পারি, আমি নন্দিতা সাধুখাঁ, আমি যেন অয়দিপাউসের রানি ইয়োকাস্তের হাহাকারকে আমার সমস্ত শিরাস্নায়ু দিয়ে গ্রহণ করি। আমি বাস্তবে যা কোনও দিন হতে পারব না, আমি নাটকের কাল্পনিক জীবনে সেইসব মহৎ সুখ আর মহৎ দুঃখের স্বাদ নিতে পারি। এমন জিনিস কোনও শপিং মলে কিনতে পাওয়া যায় না। আমার আপনার সন্তান যেন এই মানুষের বিশাল সুখদুঃখের খবর বা আস্বাদ কিছু পেতে পারে। তাদের মনুষ্যত্বই আরো সমৃদ্ধ হবে।

কাজেই 'তার নাটক দিয়ে একটা জাতিকে চেনা যায়' - এ কথাটা নানা অর্থে সত্য হয়ে উঠতে পারে। কারণ, অন্যান্য শিল্পের মতোই, নাটক একটা জাতির মানবিক ভিত কেমন হবে তা খানিকটা স্থির করে দেয়।

লেখক : পবিত্র সরকার, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

গরিবের থিয়েটার

রথীন চক্রবর্তী

কথা ছিল, আমরা গরিবের থিয়েটার গড়ে তুলব।

গরিব কথাটা শুনতে খারাপ লাগে। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা যে থিয়েটারটা তৈরি করব সেটা হবে 'পিপল্‌স থিয়েটার।' যে-কথাটা নিয়ে বিস্তর ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন রম্যাঁ রল্যাঁ। জনগণের নাটক, বা একটু ছোট করে, গণনাট্য। তা নিয়ে গত শতকের মাঝের দিক থেকে বেশ কয়েক দশক ধরে চর্চা চলেছে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং আরও কিছু জায়গায়। আসলে আমরা বলতে চেয়েছি, দরিদ্রের থিয়েটার নয়, দারিদ্রের থিয়েটারও নয়, একান্তভাবেই সংগ্রামী মানুষের থিয়েটার। একথা আমরা বলেছি, কখনও দৃপ্তকণ্ঠে, কখনও বলেছি ম্রিয়মান ভাষায়। কারণ থিয়েটার কতটা সংগ্রামী হবে তা নির্ভর করে সংগ্রামের দৃঢ়তা ও ব্যাপ্তির উপর। এই বিশ্লেষণে আমরা নিশ্চয়ই খুশি হওয়ার মতো খুব একটা প্রশস্ত জায়গা পাব না, কারণ ষাট ও সত্তর দশকের পর আমরা সংগ্রামের ধারাকে যেন ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে দেখেছি। নানা প্রতিকূলতার বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধ্য-বাধকতায় আমরা কখনও কখনও খুব জোরালো আত্মসমর্পণও করেছি। এক অদ্ভুত এবং প্রায়-অনিবার্যতা আমাদের চিহ্নিত করেছে অসহায়, কর্ম-অক্ষম, মতাদর্শগতভাবে দেউলিয়া কিছু মানুষ হিসেবে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক অত্যন্ত রিক্ততায় আমাদের দেগে দিয়েছে, যে কারণে কিছু কোলাহল ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার মতো একটু পদক্ষেপও আমরা খুঁজে পাইনি।

একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে বিপুল হইচই হয়েছিল, আগে এবং পরে প্রায় বছর কয়েক ধরে। উঠতে-বসতে, হাঁটতে -চলতে, খেতে -ঘুমোতে হাজার হাজার বার ধরে উচ্চারিত হতে দেখেছি একটি শব্দ 'নিউ মিলেনিয়াম'। এই নতুন শতাব্দী কেমন হবে তা নিয়ে কাজের এবং অকাজের গবেষণার অন্ত ছিল না। কারণ মনে রাখতে হবে, গত শতকের সত্তর আশির দশকেই সারা বিশ্বে উত্তাল নৃত্য শুরু হয়ে গেছে অনৈতিক উদারনীতির এবং নয়া -সংস্কারের, শুরু হয়ে গেছে বিশ্বায়নের রথযাত্রা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির একের পর এক আত্মসমর্পণ নয়া-সাম্রাজ্যবাদের কাছে। সেই গবেষণা এখনও জারি আছে, বিশ্বের দেশে দেশে নানা আবরণ ও ছদ্মবেশে। সেই সময় সীমান্ত অতিক্রমণকালে আমাদের মনে হয়েছিল, যে শতাব্দী চলে গেল তা কী দিয়ে গেল আমাদের, যা নিয়ে আগামী শতাব্দী মানুষের মতো পথ চলতে পারে? বিংশ শতাব্দী কী রেখে গেল একবিংশ শতাব্দীর মানুষের জন্য যা নিয়ে অন্যতর দিগন্তের সন্ধান করতে পারবে নতুন শতাব্দীর থিয়েটারের লোকজন? গরিবের থিয়েটারের কথা না-হয় বাদই দিলাম, এই শতাব্দী কি জনগণের থিয়েটারকে কিছুটা শক্ত -পোক্ত করতে পেরেছে? আমাদের থিয়েটার মূলত মধ্যবিত্তের থিয়েটার, একদা এ-কথা বলেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে আর একটি কথা: আমাদের থিয়েটারের দর্শক অবশ্যই মধ্যবিত্ত দর্শক, আমরা তাঁদের

জন্যই থিয়েটারটা করি। অজিতেশ সেই সময়ে যে জনমণ্ডলীকে 'মধ্যবিত্ত' বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই জনমণ্ডলী কি সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে? দেখা যাবে, সেদিনের মধ্যবিত্ত অভিধায় রেখাকৃত সেই দর্শকের একটা বড় অংশই চলে গছে দারিদ্র্যের দেশে। কিছু অংশ নয়া-মধ্যবিত্ত অর্থনীতির পিয়াসী। আমাদের নাট্য, যাকে বলি গ্রুপ থিয়েটার, জনগণের কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সে ভাবনা করার মতো শক্তিও বোধহয় আজ আমাদের নাট্যকর্মীদের নেই।

বিংশ শতাব্দীকে বলা যায় 'মতবাদের যুগ'। কার্যত, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই মতবাদিক ভাবনা-চিন্তার সূচনা। বিরাটভাবে না হলেও ঊনবিংশ শতকের উত্তরাধিকার নিয়ে বিংশ শতাব্দী মতবাদিক বিকাশ থেকে মতবাদিক সংঘাতের, এবং তা থেকে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হয়েছে অবিরত। বিপ্লবী প্রয়াস এবং প্রতিবিপ্লবী নকশা প্রায় পাশাপাশি হেঁটেছে। এর মধ্যেও ছিল সংঘাত। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে চলনের দুরত্ব ছিল সামান্যই। বাস্তবতাবাদ এবং বাস্তব-বিরোধীতাবাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে একই সঙ্গে। এর মধ্যেও ছিল সংঘাত। এবং সংঘাতেরও অভ্যন্তরে সংঘাত। এমন এক বিপুল জটিলতা থাকা সত্বেও বিংশ শতাব্দী হয়ে উঠেছিল এক রমণীয় উদ্যান। যেখানে ছিল হাজার চিন্তার সমাবেশ। অনৈতিকতা কিছু ছিল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু তাকে ঠেকানোর মতো বা প্রতিবাদ করার মতো নৈতিক ভাবনার স্পর্ধাও কিছু কম ছিল না। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপুল সম্ভার, আমরা পেয়েছি রাশি রাশি চিন্তাশীল নক্ষত্র। এই সূত্রেই থিয়েটার নিয়ে আমরা অনেক কাজের সুযোগ পেয়েছি। আমাদের মধ্যে যেমন ছিলেন স্তানিস্লাভস্কি, বের্টল্ট ব্রেশট, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, জাঁ পল সার্ত্র- যাঁরা সংস্কৃতির প্রসারণে অনেক কিছু দিয়েছেন; তেমনই পেয়েছি ইয়ের্জি গ্রোতভ্স্তি, আউগুস্তো বোআল, দারিও ফো- যাঁরা বীভৎস উদ্যম নিয়ে আমাদের ভৎর্সনা করেছেন অচলায়তন নির্মাণের কারণে এবং পথ দেখিয়েছেন নতুন কিছু করার।

আমরা প্রাণিত হয়েছিলাম এবং কথা দিয়েছিলাম, একটি প্রকৃত গরিবের থিয়েটার আমরা গড়ে তুলব। কিন্তু, অন্তত এখন পর্যন্ত সেই কথা রাখার কোনও পরিচয় আমরা রাখতে পারি নি।

২. দরিদ্রের থিয়েটার। মানে, পুওর থিয়েটার।

এই শব্দবন্ধের ব্যবহার শুরু করেছিলেন পোল্যাণ্ডের নাট্যকার -তাত্ত্বিক-অভিনেতা ইয়ের্জি গ্রোতভ্স্কি। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, সাধারণ, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য আমাদের থিয়েটার করতে হবে। কিন্তু, এই পুওর থিয়েটার কি হবে দারিদ্র্যের বেশভূষা নিয়ে এক প্রতিমার বুদ্ধিহীন, চর্চাহীন, নিষ্প্রাণ এক চালচিত্র? এই জিজ্ঞাসাকে প্রায় ধমক দিয়েই থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন গ্রোতভস্কি। তাহলে কী ভাবে গড়ে তোলেন সালঙ্কারা অথচ অস্পষ্ট সেই মূর্তি, যাকে আমরা মঞ্চায়িত করব?

গ্রোতভ্স্কি পুরু চশমার ওপার থেকে বলেন: 'আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করেন, 'আপনার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার প্রোডাকশনের উৎস কী?' তখন আমি যথেষ্ট বিরক্ত

হই। এক্সপেরিমেন্টাল কথাটাকে এমনভাবে উচ্চারণ করা হয় যেন নতুন কোনও পদ্ধতি বা কৌশল নিয়ে একটা খেলা করার ব্যাপার। একটু ইধার-উধার করা। মনে করা হয়, কিছু ভাস্কর্যসমৃদ্ধ অথবা ইলেকট্রনিক কর্মকাণ্ড, চলতি মিউজিক, অভিনেতাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানা কৌশল- এইসব মিলেমিশে থিয়েটার একটা নতুন কিছু ঘটাবে। আমি সেটা জানি। আমাদের থিয়েটার ল্যাবরেটরির প্রোডাকশনের গতিমুখ কিন্তু অন্যদিকে, অন্য নিশানায়। প্রথমত, আমরা ইলেক্টিসিজমকে বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা করি। থিয়েটারটাকে একটা কম্পোজিট ডিসিপ্লিন হিসেবে ভাবার প্রচলিত ধারাকে আমরা প্রতিরোধ করি। সুপরিস্ফুটভাবে থিয়েটারটা কী তা আমরা জানা এবং বোঝার চেষ্টা করি। কী কী জিনিস অন্যান্য পারফর্মেন্স থেকে থিয়েটারটাকে আলাদা করে দেয়, চশমাটাকেই পাল্টে দেয়, তা আমরা জানার এবং চিত্রায়িত করার চেষ্টা করি। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রযোজনা, আমাদের কাজ অভিনেতা-দর্শকের সম্পর্ককে সুচারুভাবে তদন্ত এবং অবলোকন করতে চায়। সেই কারণেই আমরা মনে করি, থিয়েটার-আর্টের মূল কেন্দ্র হল অভিনেতা -অভিনেত্রীর পার্সোনাল এবং সিনিক -টেকনিক'। গ্রোতভস্কি একথা বলছেন। ১৯৬৮ সালে।

গ্রোতভ্স্কির জন্ম ১৯৩৩ সালে। পোল্যান্ডের র্জেসজো-তে। ছোট থেকেই গ্রোতভ্স্কির প্রধান ভালোবাসার বিষয় ছিল থিয়েটার। ক্রাকওয়ে স্টেট থিয়েটার এবং মস্কোতে তিনি যান অভিনয় এবং পরিচালনা নিয়ে পড়াশুনা করতে। তারই প্রাসঙ্গিকতায় তাঁর পরিচালনায় ক্রাকওয়েতে মঞ্চস্থ হয় ইওনেস্কোর 'দ্য চেয়ারস'। ১৯৫৮ সালে পোল্যান্ডের ওপেলোতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত ভাবনায় প্রতিষ্ঠা করেন 'থিয়েটার অব থার্টিন রো'জ। কিছুদিন বাদে এই সংগঠনটি পরিণত হয় 'থিয়েটার ল্যাবরেটরি'তে। যেখানে গ্রোতভ্স্কি পরিপূর্ণ ভাবে থিয়েটারকে চিনতে, থিয়েটারকে জানতে এবং থিয়েটারের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছেন। এখানেই, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চালাতে অভিনয় এবং পরিচালনার এক নবতম ব্যাখ্যায় তিনি উপনীত হন। বলা যেতে পারে, অনুভবের ও প্রকাশের এক নতুন প্রাঙ্গণে তিনি উপস্থিত হন এক তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি নিয়ে, যাকে তিনি বলছেন 'থিয়েটার অব সোর্সেস'। এই ভাবনা-চিন্তাই এক সুসংহত তত্ত্বের জন্ম দেয়, 'পুওর থিয়েটার'। শিরোনামে আমরা যাকে বলেছি 'গরিবের থিয়েটার।' গ্রোতভ্স্কির এই সময়ের প্রযোজনা, 'অ্যাকোক্যালেপ্সিস কাম ফিগুরিজ'। আমরা অধিকাংশই নাটকটি পড়ার সুযোগ পাইনি। তবে, গ্রোতভ্স্কির সঙ্গে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং তাঁর আত্মকথনে এই নাটকের কাহিনি এবং তার বিন্যাসের ছেঁড়াছেঁড়া কিছু কথা জানা গিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, গ্রোতভ্স্কির ভেতর থেকে এক অন্য গ্রোতভস্কি যেন এখানে বেরিয়ে আসছেন: কনভেনশনাল থিয়েট্রিক্যাল পারফর্মেন্স থেকে 'প্রোজেক্ট'-এর অলিন্দে। সেখানে তখন আর শুধু থিয়েটার ল্যাবরেটরির কর্মীরাই থাকছেন না, তাতে অংশগ্রহণ করছেন সমাজের নানা স্তরের ও নানা জীবিকার মানুষ। গ্রোতভ্স্কি তাঁর থিয়েটারকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে আনেন এবং তাকে ছড়িয়ে দেন এক বিস্তৃত আঙিনায়, কখনও চার দেওয়ালের সাদামাঠা হলঘরে, কখনও গভীর পাহাড়ী উপত্যকায়, কখনও নীরবতাজড়িত অরণ্যে। প্রথাগত

থিয়েটারের সাধারণ ভাবে ব্যবহার্য নানা বস্তু ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায়: অভিনেতা -অভিনেত্রীদের চলাফেরা, দেহ ও হাতের সঞ্চালনে উঠে আসে পরিবেশ পরিস্থিতি; মুখ ও চোখের অভিব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনার পায়ের শব্দ, সংলাপ তখন গ্রন্থনা। গ্রোতভ্স্কির বক্তব্যের সূত্র ধরেই রিচার্ড শেখনার লিখেছেন- এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে যে আর্তি কাজ করছে তা হল 'এক্সটার্মিনেশন অব মাইমেটিক' এবং 'মাস্ক অব রিপ্রেজেন্টেশন।'

ঠিক এই জায়গাটিতে প্রবেশের বিষয় নিয়ে আমি অন্যত্রও কিছু আলোচনা করেছি, কিন্তু তা আমার পাঠককে বিতৃষ্ণ করবে বলে মনে হয় না। নাট্যের প্রস্তুতিতে নাটমঞ্চে বা নাট্যাঙ্গণে দর্শকের উঠে আসা নিয়ে আরও অনেকেই ভাবিত হয়েছেন, যেমন আউগুস্তো বোআল তাঁর 'লেজিসলেটিভ থিয়েটারে', যা 'থিয়েটার অব দ্য অপ্রেশড'- এর ঠিক পূর্বের পদসঞ্চার; লিখেছেন হ্যারল্ড পিন্টার, সত্য আর মিথ্যার সীমারেখা নির্ণয়ের তত্ত্বে; এবং লিখেছেন রিচার্ড শেখনার যা দু-তিন ছত্র আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গ্রোতোভ্স্কির পরিবেশনা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে; জনতাকে কথার, শব্দের, প্রতিবাদের মধ্যে টেনে এনে তাকে জারিত করে; এবং দর্শককে এক বিশাল দায়িত্বের অংশীদার করে তুলে। এখানে, এর মধ্যে, এক ব্যাপক সাফল্যের স্বাদ গ্রোতোভ্স্কি নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছিলেন, তা না হলে গতানুগতিক পথে না চলে তিনি প্রতিনিয়ত থিয়েটারের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে একের পর এক নতুন ছবি এঁকে যাবেন কেন? বিশেষ করে সত্তর এবং আশি, গত শতকের এই দুটি দশক ধরে অভিনেতা দর্শক সম্পর্কে সমন্বয় নিয়ে ধারাবাহিকভাবে থিয়েটারের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান গ্রোতোভ্স্কি তাতে তিনি এতই পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠেন যে ভাবনাগত আশ্রয় ছেড়ে, আবার কথাটি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করছি, তিনি অনুগামী হন 'থিয়েটার অব সোর্সেস' - এর প্রতি।

এই নাম একান্তভাবেই তাঁর, অভিলাষ এবং প্রাপ্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি যখন ভীষণভাবে এক আকর্ষণ বোধ করেন বিশ্বের অন্যতম এই প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি, মানুষের গড়ে তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল সূত্রের শামিয়ানার নীচে দাঁড়িয়ে। যে সূত্রের ব্যবহারিক নাম হতে পারে সংযোগ-স্থাপনার তত্ত্ব। শুধু বিভিন্ন পেশার ও জীবিকার, সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের মানুষের সঙ্গে (রাজনৈতিকভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত, সামাজিকভাবে একেবারেই প্রান্তিক হয়ে থাকা এবং অর্থক্ষমতাহীন ও দরিদ্র) এবং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারের কাজ করার মধ্যেই তিনি শিল্প রচনার স্বপ্নে বিভোর বা বিহ্বল কোনওটাই হয়ে রইলেন না; বরং নিজেকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীদেরও ছড়িয়ে দিলেন ভূগোলের সমস্ত সীমারেখাকে ভেঙে দিয়ে এক নতুন প্রান্তলোকে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে, বিভিন্ন সংস্কৃতির রং-কে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সংস্কৃতি চেতনার নির্যাসকে একটু একটু করে তুলে নিয়ে তিনি ব্রতী হন সেই তিলোত্তমাশিল্প রচনায় যা প্রকৃত অর্থেই হয়ে ওঠে এক আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত অনুসন্ধান; নিজেকে জানা, মানুষকে জানা, এবং প্রায়শই কথার মারপ্যাঁচে বিমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে ওঠে যে গভীর রহস্যজনক সত্যটি সেই মানবতাকে জানা। এই প্রয়াসের মধ্যে ফাঁকি কতটা ছিল বা আছে এবং কতটা

ছিল ভান তা আমরা জানি না, কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি যে গত শতকের সত্তরের দশক থেকেই বারবার আক্রান্ত হয়েছেন, প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল উভয় শিবির থেকেই, তা তো আমাদের অজানা নয়! গ্রোতোভ্স্কি মনে করতেন, থিয়েটার হল মানুষের জীবনের চূড়ান্ত বাস্তব প্রতিচ্ছায়া। তাকে তাই চূড়ান্তভাবেই এবং চূড়ান্ত নিজস্ব রূপেই দেখা উচিত, সমস্ত বাহুল্যের প্রলোভনকে সরিয়ে রেখে। সেই কারণেই থিয়েটার হল ততটাই ঋজু, একজন মানুষ যতটা ঋজু হয়; ততটাই রাজনৈতিক, যতটা রাজনৈতিক হয়ে ওঠে একজন মানুষের জীবন; এবং ততটাই আনন্দের যতটা আনন্দ একজন মানুষ চায়। থিয়েটারের কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ; রাজনীতিও নয়, বিনোদনও নয়। অর্থাৎ শিকড়ের সন্ধানে আরও গভীরে যাওয়া, আরও গভীরে, যে যাত্রার কোনও শেষ নেই।

৩. আমাদের এই আলোচনাটা কিন্তু 'পুওর থিয়েটার' তত্ত্ব নিয়ে নয়। আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ইয়ের্জি গ্রোতোভ্স্কি বা থিয়েটার সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্ব-ভাবনা নিয়েও নয়। গ্রোতোভ্স্কির পদচারণার বেশ কয়েক বছর আগে 'পিপলস্ থিয়েটার ' বইটি লিখেছিলেন রম্যাঁ রলাঁ। সেখানে তত্ত্বকেন্দ্রে আদ্যন্ত উপস্থিত ছিল মানুষ, পিপ্‌ল। যে 'পিপ্‌ল'-এর জন্য তাদের চিরকালীন শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। সেই 'পিপ্‌ল'-কে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবেই বিবেচনাবোধ করেছিলেন তিনি; যার বা যাদের একটি সামাজিক 'আইডেনটিটি' থাকবে, যারা শুধু রাজনীতি - করনেওয়ালা বা রাজনীতির বিরুদ্ধবাদী নয়। ফলে 'চৌদ্দই জুলাই' - এর মতো নাট্য যেমন সেখানে থাকবে, তেমনি 'হয় বদন' -এর মতো ফ্যান্টাসি -ভরা নাট্যেরও উপস্থিত থাকা জরুরি। রাজনীতির স্পষ্ট বার্তা যেমন থাকবে, তেমনই থাকবে, বিনোদন। আবার, এই বিনোদন হবে যেমন একটি আবশ্যিক উপাদান, তেমনই তার দায়িত্ব থাকবে সুস্থ এ সংগ্রামী জীবন গড়ে তোলার বার্তায় দর্শককে উদ্বুদ্ধ করা। রলাঁ এখানে থামলেন, আর এখান থেকেই যাত্রা গ্রোতোভ্স্কির, অনুসন্ধানের শুরু । মানুষের জং-ধরা মস্তিস্ককে শাণিত করে যুক্তিবোধ প্রতিষ্ঠা করা। যে মানুষ নিরন্তর অত্যাচারিত এই চলতি শাসনতন্ত্রে।

আমাদের এখানেই গ্রোতোভ্স্কির আখ্যানকে থামিয়ে দিলে চলবে না। রলাঁ দর্শকদের মধ্যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণিকে, যারা সমাজের চাকাকে নিরন্তর চালনায় ব্যস্ত রাখে। থিয়েটারকে কিন্তু আরও এগোতে হবে, আরও অনেক দূর, মানুষের দুনিয়ায়। জীবনেরই তাগিদে। বিশিষ্ট চিন্তক ও সমাজবিদ পাউলো ফ্রেইরি বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণি বীভৎসভাবে নিপীড়িত, কিন্তু তাদের থেকেও বীভৎসতম অত্যাচারিত হল শোষিত শ্রেণি, দেশের সমাবিষ্ট মানুষের। সারা বিশ্বজুড়ে অগণন।

আমাদের থিয়েটার করতে হবে এই 'অত্যাচারিত' শ্রেণির জন্য, পুঁজিবাদের থাবার মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া 'অপ্রেশড ক্লাস'-এর জন্য, যদি থিয়েটারের কাজ করতেই হয় ।

লেখক : রথীন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব, থিয়েটার ও পারফর্মিং আর্ট বিষয়ক গবেষণাপত্র 'নাট্যচিন্তা' এর সম্পাদক।

নাট্যের ভাষা

সৌমিত্র বসু

যাদবপুরে পড়াতাম বাংলা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক বিভাগে পড়াতে এসে নানারকম কৌতূহলের মুখোমুখি হতে হল। বহু মানুষ জিজ্ঞেস করতেন, ওখানে বুঝি শুধু নাটক পড়ানো হয় ? কী কী নাটক? অর্থাৎ সাহিত্য নিয়ে যারা পড়ে তাদের যেমন সাহিত্যের নানা সংরূপের বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়, অধিকাংশ মানুষের আন্দাজ হল, নাটক নিয়ে যারা পড়ে তাদের শুধুই নাটক পড়তে হয়, দেশী বিদেশী নানা ধরনের নাটক। তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়েছে, নাটক নাম দেওয়া হলেও এটা আসলে নাট্যকলা বিভাগ, ইংরেজিতে বললে থিয়েটার ডিপার্টমেন্ট, এখানে নাটক 'পড়ানো' হয় না,নাট্যাভিনয়ের নানা কলাকৌশল শেখানো হয়। নানা কলাকৌশল বলতেঅভিনয় তো? শুধু অভিনয় যে নয়, নাটক থেকে নাট্য যখন তৈরি হয়ে ওঠে তখন সে নানা উপাদানকে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা আলাদা শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে চায়, এ কথা বোঝানো বেশ শক্ত হত। বেশি কথা আর কি বলব, এই ভুল বোঝার অবকাশটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রভারতীর পূর্বতন অধ্যাপকেরাই, যাঁদের হাতে এই বিভাগের শুরু আর বাড়বৃদ্ধি। তাঁরা নাট্য বিভাগ না রেখে এর নাম দিলেন নাটক বিভাগ-- তবে কি মনে মনে তাঁদেরও এই বিশ্বাস ছিল, নাটক ব্যাপারটা মূলত সাহিত্য, তার সঙ্গে প্রযোজনায় যা কিছু মিশছে, সে সবের গুরুত্ব তত বেশি কিছু নয়?

নাট্য বিভাগের অধ্যাপকেদের মধ্যে এমন ধারণা থাকাটা অন্যায় বলেই মনে করব, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বহু মানুষ নাটক বা চলচ্চিত্র দেখতে যাবার সময় বলে থাকেন, বই দেখতে যাচ্ছি। মধ্যস্বত্বভোগী বাবুদের বাগান বাড়িতে যখন য়ুরোপীয় ধাঁচায় অভিনয় করা শুরু হল, সেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ, তখন প্রাসাদ মঞ্চের নাট্যের পরিচয় ছিল নাটককারের নামে, অন্য কলাকুশলীদের গুরুত্ব সেখানে খুব কম। রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক হচ্ছে , বা মধুসূদনের, বা দীনবন্ধু মিত্রের। যা লেখা আছে তার বাইরে প্রযোজক বা অভিনেতার এক পা চলার যো ছিল না, এমন কি সধবার একাদশীর কোনো অভিনয়ে নিমচাঁদের অভিনেতা অটলকে লাথি মেরে চলে গিয়েছিলেন, সে অভিনয় দেখে মুগ্ধ দীনবন্ধু বলেছিলেন, তিনি নিজের নাটকে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখে দেবেন। ইতিহাসের অমোঘ পরম্পরা মেনেই লিখিত নাটকের ওপর এই সম্পূর্ণ নির্ভরতা থেকে বাংলা নাট্য বহুকাল হল বেরিয়ে এসেছে। থিয়েটারের ভাষা যে সাহিত্যের একে আলাদা একটি ভাষা, সেটা স্বীকার করা হয়ে থাকে এখন, কিন্তু থিয়েটারের ভাষা ঠিক কী, তাই নিয়ে থিয়েটারের দর্শক বা কলাকুশলীরাও খুব নিশ্চিত বলে আমার অন্তত মনে হয় না।

নাটক আর নাট্য বা প্রযোজনার মধ্যে বেশ বড়সরো কিছু ফারাক আছে, আর সেই ফারাকগুলোকে বলা যেতে পারে ভাষার ফারাক। অ্যারিস্ততলের সেই বিশ্লেষণ আমরা সকলেই জানি, অনুকরণ যদি হয় যে কোন শিল্পের মূল ভিত্তি, তাহলে এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পের তফাৎটা তৈরি হতে পারে সেই অনুকরণের মাধ্যম(Medium of imitation), উদ্দেশ্য (Object of imitation) আর অনুকরণের ধরন (Manner of imitation) দিয়ে। ছবি বা সংগীত তৈরি করতে যে মাধ্যমের সাহায্য লাগে, সাহিত্য লিখতে লাগে অন্য মাধ্যম, রং , তুলি বা কণ্ঠস্বরের জায়গায় উচ্চারণযোগ্য শব্দ এবং অথবা কাগজ কলম, সেই সূত্রে ছবি বা অন্য সংরূপের থেকে সাহিত্য আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার অনুকরণের মাধ্যম দিয়ে। তেমনি, সাহিত্যের যে দুটো ভাগের কথা বলছেন অ্যারিস্ততল, সেই কাব্য এবং নাটক আলাদা হয়ে যাচ্ছে অনুকরণের ধরন দিয়ে। কাব্যের বেলা ওই উচ্চারণযোগ্য শব্দই হল শেষ কথা, হরফের মাধ্যমে কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করাই হল সাহিত্যের কাজ। নাটক যিনি লেখেন, তাঁকে কিন্তু শুধুমাত্র মুখের ভাষার কথা ভাবলে চলে না, যদিও সাহিত্যের ভাষাতেই লিখছেন, তবু সচেতন নাটককারকে মনে রাখতে হয় তাঁর রচনাতে এমন কিছু পরিসর থাকা চাই যা সাহিত্যের ভাষা থেকে নাট্যের ভাষায় তাঁর লেখাটুকুকে নিয়ে যেতে পারবে।

সাধারণভাবে ভাষা বলতে আমরা বুঝি মুখের ভাষা, যার সঙ্গে কথন প্রক্রিয়া জড়িত। আভিধানিক অর্থেও ভাষা বলতে মূলত কথনযোগ্য ভাষাকেই বোঝায় । সংস্কৃত কলেজের প্রকাশনায় A Tri-Lingual Dictionary নামের গ্রন্থে ভাষা বলতে বোঝানো হচ্ছে বাক্য, সংস্কৃতাদি বাক্য, প্রতিজ্ঞাসূচক বাক্য, রাগিনীবিশেষ। ১ অর্থাৎ উচ্চারণযোগ্য শব্দ দিয়ে তৈরি ছাড়া ভাষার অস্তিত্বই স্বীকার করা হচ্ছে না সেখানে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে ভাষা অর্থে কথন শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ২ ইংরেজি অভিধানের শরণ নেওয়া যাক। language শব্দটির আভিধানিক অর্থ বলা হচ্ছে - 1. The means of human communication, consisting of the use of spoken or written words in structured way. 2. the system of communication used by a particular community or country,3. a particular style of speaking or writing, 4. a system of symbols and rules for writing programmes.

তাহলে, অধিকাংশ অভিধানে ভাষা শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কথনের অনুষঙ্গ, আভিধানিক মানেতে ভাষা মানুষের উচ্চারণযোগ্য শব্দ দিয়েই তৈরি হয়। অথচ, ভাষার এই সংজ্ঞা যে আদৌ সম্পূর্ণ নয় তা তো আমরা সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি। সেই কারণেই, ভাষার আর একটি প্রকারের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, উচ্চারণযোগ্য ভাষার সঙ্গে তফাৎ করবার জন্যে তার নাম দেওয়া হয়েছে Non Verbal Language বা অকথন যোগ্য ভাষা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কণ্ঠস্বর বাদ দিয়ে শরীরের বাকি অংশ দিয়ে সংযোগ গড়ে তোলার উপায় এই ভাষা-- We also define non verbal communication as the transfer and exchange of messages in any and all modalities that do not

involve words... ৪ কিন্তু কেবলমাত্র কথা বা শব্দ ব্যবহার করা আর না করার তফাৎটুকুই নয়, ওই বইয়ে আরো বলা হচ্ছে, The exact boundary of non verbal communication, as part of communication, is a point of contention. ৫ মানুষ যা কিছু দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে তাই হল তার ভাষা। তার পায়েল নেলপালিশ থেকে মাথার চুল, তার পোশাকের নির্বাচন থেকে তার তাকিয়ে থাকা, সবটার মধ্যে দিয়েই সে নিজেকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়, অন্যকে নিজের কথা বোঝাতে চায়, সেই তার ভাষা।

এই কথাটুকু মনে রেখে আমরা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রাখবার চেষ্টা করতে পারি। ক. ভাষা নিয়মাধীন, তার শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ আছে, শব্দ সাজানোরও তাই। এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই নির্দিষ্টতা নিতান্ত যান্ত্রিক নয়, শব্দের অর্থ প্রসঙ্গ অনুসারে অল্পবিস্তর পালটে যেতে পারে, বাক্যে শব্দ সাজানোর নিয়মকেও নমনীয় করে রাখা সম্ভব, তবু নিয়মের অস্তিত্ব তাতে মুছে যায় না। যাকে বলা হচ্ছে Non Verbal Language তার বেলাও একই কথা। মানুষের যে কোনো প্রকাশকেই নির্দিষ্টতায় বেঁধে ফেলা অসম্ভব। খ. ভাষা প্রতীকি, অর্থাৎ তার নিজের কোনো মানে নেই, সে মানে আমরা তৈরি করে নিয়েছি। আর গ. ভাষা সামাজিক, সমাজের প্রয়োজনেই তার জন্ম , তার বিন্যাসও সেই সামাজিক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই ঘটে থাকে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যও যে Non Verbal Language - এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নিশ্চয় আলাদা করে বলবার দরকার হবে না। যাকে বলছি অনুচ্চারণযোগ্য ভাষা, সেখানে শব্দভান্ডারের কোনো প্রয়োজন নেই বটে, কিন্তু শব্দবিহীন যে সব ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে মানুষ সংযোগ তৈরি করে তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, অর্থহীন শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করলে যেমন, তেমনি নিয়ম বহির্ভূত ইঙ্গিত দিয়েও যা বলতে চাই তা বোঝানো যাবে না। Non Verbal ভাষাও আসলে কিছু সংকেত, তার নিজের কোনো মানে নেই, এবং সর্বোপরি,সমাজের প্রয়োজনেই তার জন্ম, তার বিন্যাস এবং তার বিবর্তন।

ভাষাকে কয়েকটি দিক থেকে দেখা যায়। ক. Lexicon (শব্দভান্ডার) Phonology (কথনরীতি), Morphology (শব্দনির্মাণ), Syntax (বাক্যের অন্বয়), Discourse (শব্দ সংযোগের নিয়ম) সাহিত্য যেমন মুখের ভাষার সাহায্য ছাড়া তৈরি হতেই পারে না, নাট্য কিন্তু তেমনটা নয়, তার ভাষার নানাবিধ ধরণ আছে। যেমন কোনো নাট্য তৈরি হতে পারে উচ্চারণ নির্ভর ভাষাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র শারীরিক ভাষার ওপর ভর করে। তার সঙ্গে নাট্যের অন্যান্য উপাদানগুলি যুক্ত হতে পারে, নাও হতে পারে। আবার, শরীরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র উচ্চারণনির্ভর ভাষার ওপর নির্ভর করে তৈরি হতে পারে প্রযোজনা-- বেতার নাটক যার উদাহরণ। বেতার নাটকে অভিনয়শিল্পীদের দেখা যায় না, শ্রুতি নাটকে দেখা যায়, কিন্তু সেই শারীরিক উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করাই নিয়ম, অর্থাৎ অভিনেতা অভিনেত্রী চমৎকার দামি পোশাক পরে হত দরিদ্র মানুষের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন, দর্শক তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে অস্বীকার করেন তখন। কিন্তু নাট্য বলতে তার খন্ডিত ভাষা আমাদের চোখের সামনে ভাসার কথা নয়, তাকে আমরা তার সামগ্রিক রূপেই অর্থাৎ মঞ্চ নাটকের

বেশেই দেখতে চাইব।

তার আগে বুঝে নেওয়া যাক থিয়েটার বা নাট্য বলতে কী বোঝায়। পিটার ব্রুকের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞাটি সামনে রাখতে চাই--I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst someone is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged. ৬. কোনো একটি পরিসরে এক বা একাধিক মানুষের আচরণ যদি দর্শকের সামনে ঘটে তাহলে তার মধ্যেই নাট্যের শর্ত নিহিত থাকে। নাটকের দায় নেই হুবহু বাস্তবকে দর্শকের সামনে পেশ করার। তার জগৎকে বলা যেতে পারে ধরে নেওয়ার জগৎ, কেবলমাত্র সংলাপের সূত্রে অথবা সামান্য কিছু ইঙ্গিতকে মান্য করে দর্শক মঞ্চের ওপর যে কোনো দৃশ্য কল্পনা করে নিতে পারেন। ফাঁকা একটি পরিসরে শুধু কয়েকজন মানুষ মিলে একটি নাটকের অভিনয় করা সম্ভব, কিন্তু আমরা সকলেই জানি, সেই নিরাভরনতার মধ্যে নাট্য আটকে থাকে নি, সে আরো নানা উপকরণ তার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

নাট্যের সেই উপাদানগুলো কী? প্রখ্যাত পোলিশ চিহ্নবিজ্ঞানী Tadeusz Kowzan তাঁর একটি নকশায় দেখিয়েছেন, নাট্য মোট তেরোটি পথ ধরে তার দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি অভিনেতা নির্ভর , কোনোটি বা দৃশ্যের ভাষা, কোনোটি শ্রবণের। এদের মধ্যে আছে - মুখের ভাষা,তার দুটি ভাগ, word, tone, এরা হল অভিনেতার উচ্চারণযোগ্য ভাষা। এর পরে আসছে যে ভাষা অভিনেতা শরীর দিয়ে প্রকাশ করেন। যেমন, mime, gesture, movement. । অভিনেতাকে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যে চিহ্নগুলোর সাহায্যে , তারাও তো ভাষার কাজ করছে, যেমন makeup, hairstyle, costume. অভিনেতাকে বাদ দিয়ে কিছু ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে, যেমন props,decor, lighting. তার বাইরে আছে music, sound effects. বলে রাখা দরকার, কাউজানের এই তালিকার সঙ্গে আরো দুটি মাধ্যম যোগ করেছেন পন্ডিতেরা, এক, চলচ্চিত্রের ব্যবহার, যা নাট্যাভিনয়ের মধ্যে ঢুকে অন্য একটা সংযোগের পরিসর তৈরি করে, আর দুই, অভিনয়ের স্থান। অ্যাকাডেমিতে আর ধরা যাক শান্তিনিকেতনের গৌর প্রাঙ্গণে একই নাটকের অভিনয় বেশ কিছুটা আলাদা হয়ে যায়, ভাষার ধরন পাল্টে যায় তার।

কিন্তু নাট্যের ভাষার সামগ্রিক পরিচয় এই তালিকা থেকে পাওয়া যাবে না বলেই এই লেখক বিশ্বাস করে। বরং বিষয়টা অন্য দিক থেকে বিবেচনা করা যাক। আমরা সকলেই জানি, নাট্যে অভিনেতা এবং দর্শক একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের মধ্যে যে ভাষার আদানপ্রদান ঘটে তাকে শারীরিক আদানপ্রদান বলা যেতে পারে। যদি তাই হয়, তবে যে সব পথ দিয়ে মানুষ বা প্রাণময় জগৎ তার চারপাশের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে নাট্যও সেই সব পথকেই ব্যবহার করার অধিকারী। অর্থাৎ , চোখ দিয়ে দর্শক নাটক দেখছেন, কান দিয়ে শুনছেন যেমন, তেমনি নাক দিয়ে তিনি গ্রহণ করতে পারেন গন্ধ, জিভ দিয়ে স্বাদ নিতে পারেন, ত্বকের সাহায্যেও সংযোগ তৈরি করা সম্ভব, সহজ কথায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সব

কটি ইন্দ্রিয় দিয়েই নাটকের রস গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই অনুযায়ী তৈরি হয়ে উঠতে পরে নাট্যের ভাষা। তবু যে নাট্যকে কেবলমাত্র চোখ আর কানের উপভোগ্য বলেই মনে করার চল আছে তার কারণ সম্ভবত এই দুটি ইন্দ্রিয় অনেকটা দূর থেকে রসাস্বাদন করতে পারে, নাক জিভ বা ত্বকের কিন্তু শারীরিক নৈকট্য দরকার হয়। আমরা যদি লোকনাটক বা লোককৃত্যগুলিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব, তার উপস্থাপনায় চোখ আর কান ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয়গুলিরও ভূমিকা থাকতে পারে। ধূপ বা গুগগুলের গন্ধ সেখানে নাট্যের ভাষা হয়ে আসতে পারে, আসতে পারে প্রসাদ ভক্ষণের আনন্দ, আলিঙ্গণ বা প্রণামের রোমাঞ্চ।

নাট্যের ভাষা ব্যবহার নিয়ে আরো কিছু কথা বলবার আগে একটি জরুরি বিষয়ের উত্থাপন করা দরকার। এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে ভাষা ব্যবহারের ধরন সামাজিক স্তরভেদে নানারকম হয়ে থাকে, দুজন গ্রাম্য এবং প্রথাগত অর্থে অশিক্ষিত চাষী যে ভাষায় কথা বলেন, দুজন শহুরে পরিশীলিত মানুষের ভাষা এক রকম হতে পারে না কখনো। আবার, সেই চাষী যখন সেই পরিশীলিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেন তাঁর ভাষা খানিকটা আলাদা হয়ে যায়, ঠিক তেমনই, পরিশীলিত মানুষটিও চাষীর সঙ্গে কথা বলবার সময় ভাষা ব্যবহারে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন। পাঠক বুঝতেই পারছেন, এটি খুব ছোট একটি উদাহরণ, সমাজের নানা স্তরে ভাষা ব্যবহারের অজস্র ধরন ছড়িয়ে থাকে। বস্তুত, ভাষা ব্যাপারটা আসলে ব্যক্তিগত , প্রতিটি মানুষের ভাষা ব্যবহার অন্যের থেকে খানিকটা আলাদা, আমরা একটা গড় বৈশিষ্ট্যকে ধরে নিয়ে এদের মধ্যে সারূপ্য খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। নাট্যের ভাষা ব্যাপারটা তাই। যাকে বলা যেতে পারে Target Audience বা উদ্দিষ্ট দর্শক, তার কথা ভেবে যেমন নাট্যশিল্পীরা তাঁদের ভাষা ব্যবহার করেন, তেমনি অভিনয়শিল্পীরাও তাঁদের নিজস্ব বোধবুদ্ধির স্তর অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করে থাকেন, আবার দর্শকও সেই শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁদের গড় ধারণা থেকে প্রয়োজনটির ভাষাভঙ্গিতে অভ্যস্ত হতে চান। যেমন ধরা যাক, কোনো লোকনাট্যের অভিনয় যদি কলকাতার অভিজাত রঙ্গমঞ্চে হয়, তবে অভিনয়শিল্পীরা সচেতন বা অবচেতনে এই বিশেষ পরিবেশের মত করে নিজেদের প্রস্তুত করে নেন, দর্শকও আবার লোকনাট্যের আঁকাড়া ধরনকে গ্রহণ করবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।

নাট্য একটি যৌথ শিল্প,কথনের মত একক মনের প্রকাশ নয়। একজন মানুষ যখন কথা বলেন,তখন তাঁর ভাষায় আরো বহু স্বর এসে মেশে, বহুযুগের ভাবনা চিন্তা অভিজ্ঞতা স্মৃতি-- এ তো আমরা সকলেই জানি। নাট্যে এই বহুস্বরের প্রয়োগ বেশ কিছুটা অন্যরকম। সেখানে একজন নির্দেশক বা অধিনায়ক থাকতে পারেন, তিনি গোটা কাজটা ভাগ করে দেন আরো বেশ কিছু শিল্পীর মধ্যে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অভিনয়ের শিল্পী, কেউ মঞ্চ পরিকল্পনার, কেউ আলোকসম্পাতের, কেউ বা রূপসজ্জার ইত্যাদি। নিজের নিজের শিল্পবোধের শর্তে তাঁরা নাটকটিকে বিশ্লেষণ করেন, তার মধ্যে নিজস্ব শিল্পরূপের প্রয়োগ ঘটাতে চান। এঁদের সবার ওপরে নির্দেশক থাকলেও, আলাদা আলাদা শিল্পীর আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহারকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে পারেন না,সাধারণত দেওয়ার চেষ্টাও

করেন না।

কাউজানের দেওয়া তেরোটি উপাদানের মধ্যে প্রথম দুটিকে আমরা সাহিত্যের অন্তর্গত করতে পারি। word বলতে বোঝাচ্ছে শব্দ, বা শব্দ দিয়ে তৈরি করা সাহিত্যকে। Toneপড়ছে মৌখিক সাহিত্যের এলাকায়,অর্থাৎ, সাহিত্যটি কেমন করে বলা হল তার ওপর তার অর্থ অনেকটা পর্যন্ত নির্ভর করে। একটা খুব চালু উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি কাল সকালে তোমার বাড়ি । যাব-- এই বাক্যে আমি শব্দের ওপর জোর পড়লে যে অর্থ দাঁড়াবে, কাল, সকালে বা তোমার- এর ওপর জোর পড়লে ঠিক সেই অর্থ দাঁড়াবে না। খুব চিৎকার করে বললে তার মানে এক রকম, ফিসফিস করে বললে আর এক রকম। কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গি সাহিত্যের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিন চার এবং পাঁচ বর্গের ভাষাকে বলা হয়েছে দৃশ্যবাহিত ইঙ্গিত বা Visual Signs। দৃশ্যবাহিত ইঙ্গিত বা সহজ ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে ছবি, তাকে বিশ্লেষণ করলে পাব রেখা (Lines) রঙ, (Colour), আকার (Form) , সংস্থাপন (Composition), বুনোট (Texture), আলো (light) । মনে রাখতে হবে , এদের প্রত্যেকের সঙ্গে জুড়ে থাকে নানা ধরনের অনুষঙ্গ, তারা কখনো সর্বজনীন, কখনো বা দেশকালের সংস্কৃতির দ্বারা নির্দিষ্ট। যেমন ধরা যাক, একটু উল্লম্ব সরলরেখা দেখে আমাদের মনে যে অনুষঙ্গ তৈরি হয়, শায়িত রেখা দেখে তা হয় না। লাল রঙ মনের মধ্যে যে আবেদন গড়ে তোলে, নীল রঙ তা করে না। সাদা পোশাক আমাদের দেশে বিধবারা পরে থাকতেন, এখনো পরেন অনেকে, পাশ্চাত্যে এটি বিয়ের পোশাক। আমাদের দেবতা কৃষ্ণ বা রাম কালো, পাশ্চাত্যে সে রঙ শোকের সংকেত দেয়। আবার ধরা যাক, লাল বা সবুজ তার প্রকৃতিজাত অর্থ ছাড়িয়ে কখনো রাজনৈতিক অনুষঙ্গে অর্থ তৈরি করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর আকার, তাদের সংস্থাপন আমাদের সচেতন বা অনেক সময়েই অবচেতন মনে নানা ভাব তৈরি করে দেয়। নাট্যের ভাষা এইসব ভাবকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। বিশেষ করে মনে রাখতে হয় সংস্থাপন বা (Composition)-এর কথা। নির্দেশককে মনে রাখতে হয় অভিনেতাদের দিয়ে তিনি মঞ্চে নানা ধরনের ছবি তৈরি করতে চাইছেন, নাট্যঘটনা, চরিত্রের অবস্থান প্রভৃতিকে যে ছবি ব্যঞ্জনাময় করে তোলে।

বিষয়টি বোঝাবার জন্য একটি উদাহরণ দিতে চাই। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপী প্রযোজনা করেছিলেন সফোক্লিসের রাজা অয়দিপাউস নাটক। নাটকের শুরুতে প্রসাদের সামনে দর্শকের পেছন ফিরে নতজানু বসে থাকত প্রার্থীর দল, পরনে তাদের কালচে রঙের আলখাল্লা, মূল মঞ্চ থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে প্রাসাদের তোরণ, প্রার্থীদের হাহাকার শুনে সেই তোরণে উজ্জ্বল পোশাকে গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়াতেন অয়দিপাউস। ধনুকের মত বাঁকা পিঠ প্রার্থীদের বিপরীতে থাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজার দেহ আলাদা মর্যাদা পেত। এ নাটকের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। নাটকের শেষে হতমান হতগর্ব সেই রাজা ওই তোরণ দিয়ে নেমে আসবেন প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে, সূচনার বিপরীত ছবি তৈরি হবে তখন। কিন্তু এ কথাও বলে রাখা দরকার, মুখের ভাষার মত, এই ছবির ভাষারও কোনো

অনিবার্য নির্দিষ্টতা নেই। এমনটা হতেই পারে, এই ছবি তৈরি হয়ে উঠছে নির্দেশকের অবচেতন থেকে, কোনো সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে নয়। মনে পড়ে অন্য থিয়েটার প্রযোজিত আত্মগোপন নাটকে এই লেখক বিভূতি নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী তাকে পরালেন ধুতি আর পাঞ্জাবী, দুটি রঙচঙে পোশাক পরা যুবকের সঙ্গে বৈপরীত্য তৈরি করে। পাঞ্জাবীর রঙ কী হবে জানতে চাইলে তিনি বললেন, শম্ভুদা একধরনের লালচে গেরুয়া পরেন সেই রঙের। বলা বাহুল্য, ব্যক্তিত্ববান মানুষ বলতে বিভাস চক্রবর্তীর মনের মধ্যে যে ছবি ভেসে ওঠে, পাঞ্জাবীর রঙ নির্বাচনের পেছনে যে ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশ ঘটে, তা দর্শকের বুঝতে পারার কোনো সম্ভাবনা নেই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি এইভাবেই সচেতন বা অবচেতনের নিজস্ব নির্বাচন লেখক তাঁর রচনায় নিয়ে আসেন না?

নাটকে ব্যবহৃত শব্দও এইভাবে নানা অনুষঙ্গ তৈরি করতে পারে। একটি বাক্যকে শুধু কণ্ঠের নানা মোচড়ে কত রকম মানে তৈরি করে দেওয়া যায় তা তো আমরা সকলেই জানি। নির্দেশক অনেক সময়ে নানা ধরনের কণ্ঠকে ব্যবহার করে নাটকীয় সংঘাত তৈরি করতে পারেন। নাটক রক্তকরবী নামে একটি অত্যন্ত মূল্যবান বইয়ে শম্ভু মিত্র দেখিয়েছিলেন, রক্তকরবী নাটকে কিশোরের বয়:সন্ধিকালীন কণ্ঠের পরেই কেমন করে অধ্যাপকের ভারি গলা বৈপরীত্য তৈরি করে। এর বাইরে আছে আবহ সংগীত, আছে নানা জাতীয় পার্থিব শব্দ, যাকে ইংরেজিতে sound effects বলা হয়ে থাকে। পরিবেশ রচনার জন্য এর ব্যবহার হতে পারে, আবার কখনো কখনো তা নাট্যঘটনাকে বাঙময় করে তোলার কাজেও লাগে। এই আত্মগোপন নাটকেই, বিমানবন্দরের পাশে একটি বাড়িতে তীব্র কিছু ঘটনা ঘটছে, চূড়ান্ত মুহূর্তে হঠাৎ প্রবল শব্দে উড়ে যায় একটি বিমান, সে শব্দ মুহূর্তটির আততিকে প্রকাশ করে, কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিকের শব্দ হয়ে থাকে না আর।

এইসব কিছুর সমবায়েই নাট্যের ভাষা। রক্তকরবীর অধ্যাপক যেমন নন্দিনীর ফুল নিয়ে তার রঙের তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করে ফুলটিকে চিনতে পারেন নি, ভাষাতাত্ত্বিক যেমন ভাষাকে নানাভাবে কাটাছেঁড়া করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের রহস্য তাঁর সেই বিশ্লেষণে অধরাই থেকে যায়, তেমনি নাট্যের ভাষার উপাদানগুলিকে আলাদা আলাদা করে দেখলে তার সামূহিক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এই একই সঙ্গে বলতে চাই, সাহিত্য সমালোচনার মত নাট্য সমালোচনাও নাট্যদর্শনের স্বাদ দিতে পারে না। তার জন্য উচ্চারণযোগ্য ভাষার মত নাট্যের ভাষার কাছে যেতে হবে, তার সংকেতগুলো শিখতে হবে, তার প্রকাশভঙ্গিতে অভ্যস্ত হতে হবে।

লেখক : সৌমিত্র বসু, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব।

দৃশ্য, দৃশ্যমানতা ও দৃশ্যান্তর

লোকনাট্যের নাটকীয়তা এবং ত্রিপুরার উদ্বাস্তু বাঙালি চেতনার প্রেক্ষিতে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

অশেষ গুপ্ত

We can never understand unless we grasp the ways in which it shows what cannot be seen. (Mitchell, 1986, p-39. quoted in M. Bleeker, p-1)

এই বিশ্ব দৃশ্যমান এবং এই দৃশ্যমানতার[১] (visuality) সাথে সম্পৃক্ত বোধ ও বুদ্ধির পরিপূরক বিন্যাস। দৃশ্যমানতা, তা আক্ষরিক অর্থেই হোক (অক্ষরের সাহায্যে অথবা পাঠযোগ্যতায়), অথবা হোক চিত্রিত বা মঞ্চে উপস্থাপিত, মানবমনে নির্মাণ করে পরিকল্পিত প্রতিচ্ছবি। নিরাকার অর্থে যে 'না-আকার' ব্যাপারটা ছিল, বর্তমানে তা কেবলমাত্র বস্তুবাদ বহির্ভূত নিরাকারত্বে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক মাধ্যম নিরাকার তত্ত্বকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে। সেখানে নিরাকার মানে শুধুমাত্র আকারহীন নয়, নিরাকার এখানে এক আশ্চর্য অপার্থিব (Virtual) জগত, যেখানে প্রেম, ভালোবাসা, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি সমস্ত মানব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাব ও অনুভবের অবাধ প্রকাশ, তবে তা বাস্তব, শরীরী বা স্পৃশ্য অর্থে নয়। এখানে বলে রাখা উচিত সামাজিক মাধ্যমের তৈরি করা দৃশ্যমানতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বর্তমান প্রজন্ম। সামাজিক মাধ্যম তার অমিতশক্তিতে গঠন করে ধারণা, মত, দর্শন এবং চিন্তা। আপাত দৃশ্যনির্ভর দৃশ্যমানতার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় পাল্টায় দেশ, জনমত নির্ধারিত হয়, আমূল বদলে যায় সম্পর্কের রসায়ন। এই আন্তর্জাল[২] নির্ভর দৃশ্যমানতা নিজের স্বঘোষিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঔদ্ধত্যে বাস্তবজগতের সীমানা পেরিয়ে দৃশ্যান্তরে পৌঁছে যায়। তবে তার গন্তব্য কোন অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক জগতে নয়, সে নিজেই নির্মাণ করে এক অপার্থিব (Virtual) জগত যা শরীরী বা স্পৃশ্য নয়। ফটোশপ এবং অন্যান্য যান্ত্রিক মাধ্যমে তৈরি হয় এক প্রপঞ্চময় মায়া। এই অপার্থিব দৃশ্যমানতা তাই পাঠক, শ্রোতা ও দর্শককে ভাবায় - কারণ এখন আর তাদের শব্দ বা অক্ষর থেকে কষ্ট করে দৃশ্যে অনুবাদ করে নিতে হয় না - অবলীলায় ভাবনা ও বোধ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আন্তর্জাল ও সামাজিক মাধ্যমের কারসাজিতে। এই বোধ হয় দৃশ্যমানতার উত্তর সত্য[৩] (post truth) ।

দৃশ্যমানতা (visuality) শব্দটির অর্থ ও ব্যপ্তি কতটুকু তা বুঝতে উদাহরণের প্রয়োজন। যদি প্রশ্ন করা হয় জন্মভূমিকে কিভাবে অনুধাবন সম্ভব, আমি বলব দৃশ্যমানতার সাহায্যে। আমার কাছে আমার জন্মভূমি কয়েকটি দৃশ্যের সমষ্টি, এবং সেই দৃশ্যগুলোই আমাকে দৃশ্যান্তরে যেতে সাহায্য করে। আমাকে বোঝায় আমার চেতনায় (consciousness) জন্মভূমি নামক স্থানটির দিকনির্দেশ কি। এই শব্দটি উদ্দীপক হয়ে আমার চেতনায় সযত্নে রক্ষিত সেই দৃশ্যগুলোর সঙ্গে বাস্তবের দৃশ্য ও নিসর্গকে মেলায়, তার ফলে সৃষ্টি হয় এক অন্যমাত্রিক

দৃশ্যমানতা। তাই সবমিলিয়ে দৃশ্যমানতা ব্যাপারটাই আমার কাছে বহুমাত্রিক। আমার জন্মভূমির সাথে সম্পৃক্ত দৃশ্যমানতায় তাই নিশি এরাতে বাঁকা চাঁদ ওঠে, কালো দিঘির প্রেক্ষাপটে শালিক ও বকেরা ডানা ঝাপটায়, আঙ্গিনায় কেউ অবিরল অপেক্ষা করে থাকে, শাঁখের আওয়াজে সন্ধ্যে নামে আর কোলাহল মুখরতায় বুদ্ধিজীবী হাঁসেরা নিকোনো উঠোনে ভেজা পায়ের ছাপ ফেলে ঘরে ফেরে। বাংলার সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বিশেষ করে সংগীতে, নাটকে ও চলচ্চিত্রে তারই পথনির্দেশ। তাই বাঙালি কখনোই দিকভ্রান্ত হয় না, অথবা বাঙালির দিকভ্রষ্ট রোমান্টিকতাই তার স্বজাতীয় পরিচয়।

আবার অন্যদিকে দৃশ্যমানতা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত দৃশ্য ও দৃষ্টি প্রাথমিক হলেও এর সঙ্গে মিশে যায় শব্দ ও গন্ধ— এক অদ্ভূত অপার রসায়নে। আশ্বিনের আকাশের রঙ বদলে, সাদা মেঘের চাঁদোয়ায়,আন্দোলিত কাশফুলে যে দৃশ্যপটের সূচনা, রীরেন্দ্রকৃষ্ণের[৪] উদাত্ত কণ্ঠে, ঢাকের শব্দে, শিউলির ও আতশবাজির মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়া আমোদ বারুদ গন্ধে তার পরিপূর্ণতা। বাঙালির মন ও মনন এই অপার রসায়নে সমৃদ্ধ। পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে থাকুক না কেন, বাংলাকে সেই ভিন্ন প্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করতে তার অসুবিধে হয় না। কারণ তার দৃশ্যান্তরের চেতনায় বাংলার রূপ সযত্নে প্রোথিত। বাস্তবে সে তারই প্রতিফলন সৃষ্টি করে, তার আদলেই গড়ে তোলে প্রতিবিম্ব। দেশভাগের ফলে জন্মভূমি থেকে বিতারিত উদ্বাস্তু বাঙালি তার প্রবাসে এবং প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকে, চিরপরিচিত মাতৃভূমির দৃশ্যকে মঞ্চস্থ করার যে প্রতিনিয়ত প্রয়াস করে থাকে তা তার বিষন্নজীবন নাট্যের অবিচ্ছেদ্দ্য অঙ্গ। তাই আন্দামানের রাধানগর দ্বীপের লবনাক্ত তটভূমি রূপান্তরিত হয় চিরপরিচিত বাংলার নিসর্গে— ধানের গোলা থেকে শুরু করে আটপৌড়ে শাড়িপড়া বউটি সবই তার প্রতীক। সন্ধ্যা আরতির কাঁসরঘন্টার শব্দে আর ধূপের গন্ধে এই দৃশ্যমানতার সম্পূর্ণতা লাভ। উদ্বাস্তু বাঙালি জীবনের এ এক অনন্ত বিয়োগান্তক নাটকীয়তা।

দৃশ্যমানতাকে শুধুমাত্র বস্তুনির্ভর ভাবার কোন কারন নেই, দৃশ্যমানতা বহুমাত্রিক— কখনো বস্তুজগতে বহির্ভূত এবং ইন্দ্রিয়াতীত। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন :

> আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ ......
>
> ('আমি', শ্যামলী)

তখন এই দৃশ্যকল্প তৈরির ক্ষেত্রে তিনি চেতনাকেই (consciousness) দিচ্ছেন প্রাধান্য। বস্তুজগতের রং রূপ সবই চেতনা থেকে উদ্ভূত, দৃশ্য এবং দৃশ্যমানতা দৃশ্যান্তরে পৌঁছে নিজেদের অর্থ খুঁজে পায় চেতনা নির্ভর হয়েই। তাই আমি এখানে মূলত দ্বৈত দৃশ্যমানতার কথাই বলেছি— প্রথম যা চোখ বা দৃষ্টি নির্ভর, আর দ্বিতীয় যা চেতনা নির্ভর । জন বার্জারের ওয়েজ অব সিইং-এ প্রবর্তিত দ্বৈত দৃশ্যমানতার তত্ত্বকে নাটকের (এবং অবশ্যই উদবাস্তু চেতনার) কথা মাথায় রেখে আরেকটু সম্প্রসারিত করে এই নিবন্ধে প্রস্তাবিত দৃশ্যমানতার মডেল নির্মাণ করা হয়েছে। বার্জার যেখানে চোখের দেখা ও দৃষ্টিকোণের (perspective) কথা বলছেন, আমি সেখানে দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যা চেতনার (consciousness) মাধ্যমে করার

প্রস্তাবনা করেছি যার অব্যর্থ উদাহরণ কালিসাধক কমলাকান্তের এই পংক্তিঃ

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিনি শ্যামা মাকে,
মন তুই দ্যাখ আর আমি দেখি
আর যেন কেউ না দ্যাখে.......।

(জাহ্নবী কুমার, পৃঃ ১৪)

কবি এখানে মনের দেখা আর তাঁর নিজের দেখার (চেতনার সাহায্যে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেবিকে দেখা) আলাদা করে উল্লেখ করেছেন - এই হচ্ছে যথার্থ দ্বৈত দৃশ্যমানতা। এই দৃশ্যমানতা, দৃশ্যপ্রীতি এবং তার ফলে দৃশ্যান্তরে পৌঁছে যাওয়ার প্রবণতা বাংলার ভক্তি সাহিত্যে ও আধ্যাত্ম চেতনায় স্পষ্ট। অতএব বলা যেতেই পারে এই দৃশ্যমানতা একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দৃশ্যমান জগত চেতনাময় কিনা তা উপলব্ধি করা সম্ভব শুধুমাত্র চেতনা নির্ভর দৃশ্যমানতার মাধ্যমে। আর দৃষ্টি থেকে চেতনায় যাত্রাই দৃশ্যান্তর। কারণ চোখের দেখাতে বস্তুজগত বর্ণিত, চেতনার দৃশ্যমানতা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মেলবন্ধনেও রচিত হতে পারে ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি, যথা ঃ

বাজলো তোমার আলোর বেণু.....

(মহিষাসুরমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ)

এখানে শব্দ/ধ্বনি আর আলোর দৃশ্যমানতা মিলে মিশে তৈরি হয় সেই অদ্ভুত অপার রসায়ন (synesthesia)[৫], এবং বাংলার সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে পরিচিত শ্রোতার এই আবহের দৃশ্যান্তরে পৌঁছে যেতে কোন অসুবিধাই হয় না। আলোর বাঁশি বেজে ওঠা কেবলমাত্র শোনা ও দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ এই দৃশ্যমানতা সময়, ঋতু ও প্রেক্ষিত নির্ভর- এবং অবশ্যই চেতনাতেই এই প্রকাশ। তান্ত্রিক মণ্ডলের ছবিতে দেহের মধ্যে অবস্থিত সুষুম্মা, সুষুপ্তা, ঈরা, পিঙ্গলা এবং সহস্রাধারের যে বিন্যাস তা সম্পূর্ণ চেতনা নির্ভর। মানব দেহের জাগতিক গঠনে (Anatomy) এই দৃশ্যের কোন অস্তিত্ব নেই। জাগতিক বা বস্তুনির্ভর দৃশ্যমানতা এখানে অসম্পূর্ণ। তান্ত্রিক চিত্র তাই চেতনা নির্ভর এবং তা উপলব্ধি করার জন্য দৃষ্টি নির্ভর দৃশ্যমানতার দৃশ্যান্তরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। লোটা কম্বল প্রথমভাগে লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় যখন সহস্রদলপদ্ম বিকশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাধকের মহাসমাধি লাভের কথা লিখছেন, তখন পাঠককে চেতনা নির্ভর হয়েই এই অর্থে পৌঁছুতে হবে।

নাটকের ক্ষেত্রে (একমাত্র রেডিও নাটকের সম্পূর্ণ দৃশ্যহীনতা এবং শ্রুতিনাটকের সীমিত দৃশ্যমানতা বাদ দিলে) দৃশ্যমানতা(visuality) অপরিহার্য। এই আলোচনায় নাতিদীর্ঘ এই মুখবন্ধের যৌক্তিকতা এখানেই। নাটক ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা ও অনুধাবন করা অনেকার্থেই সমার্থক। আবার এখানেই নাটক এবং সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য। সাহিত্যে পাঠক বা শ্রোতাকে তার চেতনা ও উপলব্ধির সাহায্যে দৃশ্যনির্মাণের সাথে সাথে দর্শকের চেতনাতেও এর প্রতিরূপ তৈরি হয়। তাই নাটকে দৃশ্যমানতা নাটকিয়তার অন্যতম উপাদান। এম। ব্লীকার। ভিস্যুয়ালিটি ইন থিয়েটার বইটিতে লিখেছেন ঃ

নাটক দর্শককে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ প্রদান করে। সেই দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দর্শক মঞ্চে উপস্থাপিত দৃশ্যের পূর্ণ অনুধাবন করেন। এই দৃষ্টিকোণ রেনেসাঁস শিল্পীদের আঁকা ফিনেস্ত্রা অ্যাপেরতার (finestra aperta)[৬] সঙ্গে তুলনীয়-এমন একটি জানালা যার মধ্যে দিয়ে মঞ্চে উপস্থাপিত দৃশ্য এবং এক অপর জগত ও সত্যের অনুভব সম্ভব। (ব্লীকার-৪০)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে জার্মান নাট্য-গবেষক হ্যান্স থিএস লেহমান তার পোষ্ট ড্রামাটিক থিয়েটার এ নাটকের অন্তর্নিহিত অদৃশ্য যুক্তির (dramatic logic) কথা বলেছেন, যার সাহায্যে মঞ্চে উপস্থাপিত দৃশ্য ও জগত নির্মিত হয় এবং দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় (লেহমান ১৯৯৯, পৃঃ ২৮৮)। এখান থেকে আরেকটু এগিয়ে বলবো যে এই যুক্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা যা নাটকের দৃশ্যমানতার ভিত্তি সৃষ্টি করে, তা চেতনা নির্ভর। এর মাধ্যমেই তৈরি হয় এক 'অর্থবহ সম্পূর্ণতা'[৭] (পিটার জোণ্ডি, ১৯৬৩)। তাই নাটকের মঞ্চে উপস্থাপিত দৃশ্য ও দৃশ্যমানতাকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হয় ।

এই নিবন্ধের প্রয়োজনে ত্রিপুরার একটি লোক সাংস্কৃতিক পরম্পরার কথা এখানে উপস্থাপন করবো যার নাট্য উপাদান (dramatic elements) এবং নাটকীয়তা একে লোকনাট্যের পর্যায়ে স্থান করে নিতে সাহায্য করে। স্থান- দেশভাগোত্তর ৬০/৭০ এর দশকের আগরতলা, দৃশ্য- চৈত্রের খড় দাবদাহের বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে চিঁড়ে ক্লান্ত ঢাকের শব্দের সাথে এগিয়ে চলা হতদরিদ্র হরগৌরি, যাদের দেবতা থেকেও মনুষ্যেতর জীব বলেই বেশি মনে হয়। মিহির সেনগুপ্তের বিষাদবৃক্ষ-এ উল্লিখিত দৃশ্যে নারদরূপী সূত্রধর নিবেদন করে ঃ

ঘরের দরজায় বুড়া শিব গুষ্টিগোত্তর লইয়া
দেইখ্যা শুইন্যা দিবেন দান হরষিত হইয়া,
ত্রিভুবনের স্বামী আইসেন ভিক্ষুকের রাজা
গেরস্তের কইল্যানে বাজুক ডম্বুড়ুর বাজা।
(সেনগুপ্ত মিহির। পৃঃ ৩৪)

কিন্তু আমার ফিরে দেখা ছোটবেলার হরগৌরির নাচে কোন নারদ চরিত্র নেই, নেই কোন গান বা মন্ত্রোচ্চারণ। আছে শুধুমাত্র অবসন্ন ঢাকের বোলের তালে তালে বিষন্ন শিব আর পার্বতীর নাচের নামে চক্রাকারে ঘোরা আর ভিক্ষা পাত্র এগিয়ে দেয়া। এই নাটকের কুশিলবেরা বেশিরভাগই অনাহুত ও অবাঞ্ছিত। এক কৌটো চাল অথবা একটি টাকার জন্যে এই অন্তজ দেবতাদের কাতর মিনতি আমি এখনো শুনতে পাই। অন্ত্যজ এই কারণে কেননা যে চড়কপূজার অঙ্গ হিসেবে এই লোকনাট্যের পরিবেশনা / উপস্থাপনা, তা ত্রিপুরায় দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসা ভদ্র বাঙালির কাছে ছিল ছোটলোক, ইতরজন, ব্রাত্য ও দলিতদেরই উৎসব। এই ব্রাত্যজনেরা তাদের নিজেদের আঙ্গিকে, একান্ত নিজস্ব ভাবে হরপার্বতীকে আপন করে নিয়েছিল। হর তাদের কাছে দেবাদিদেব মহাদেব নন, তিনি গাঁজায় আসক্ত বুড়া শিব, তার স্ত্রী গৌরির (পর্বতদুহিতা উমা হিসেবে যাকে কল্পনা করা এই প্রেক্ষিতে

দুষ্কর) অভাবের সংসার, খাদকের সংখ্যা অনেক, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ঠিক যেন সেইসব হাভাতে অন্ত্যজ পরিবারের দৈনন্দিন জীবননাট্যের প্রতিলিপি, যা লোকনাট্যের আদলে ৬০-৭০-র দশকের আগরতলার রৌদ্রস্নাত চৈত্রের মধ্যবিত্ত উঠোনে হতো মঞ্চস্থ।

লেহমানের পোস্ট ড্রামাটিক থিয়েটার - এর সংজ্ঞানুসারে আমার আলোচ্য বিষয় এই লোকনাট্যের উপস্থাপনায় প্রথম প্রজন্মের উদ্বাস্তু আমার ঠাকুমা স্বর্গীয় হাসিবালা গুপ্তার প্রতিক্রিয়া। আমার ঠাকুমার কাছে এই ব্রাত্য, অন্ত্যজ নটেরা এবং তাদের হরগৌরির নাচ ছিল সেই বহুকাঙ্খিত ফিনেস্ত্রা অ্যাপারতা (finestra aperta), যার মধ্য দিয়ে ব্লীকারের ব্যাখ্যায় তিনি খুঁজে পেতেন তাঁর ফেলে আসা জন্মভূমিকে, যেখান থেকে এক অমোঘ রাজনৈতিক সমীকরণে তিনি হয়েছেন ছিন্নমূল, তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি উদ্বাস্তু। ত্রিপুরা নামক লালমাটির দেশটিকে তিনি কোনদিন আপন করে নিতে পারেননি। তাই এই তথাকথিত সাবঅল্টারন[৮] উপস্থাপনা তাকে সেই নদীমাতৃক সবুজ দেশে কিছুক্ষণের জন্য প্রতিস্থাপন করতো, তিনি একাত্ম হয়ে যেতেন তাঁর চেতনায় সযত্নে রক্ষিত সেই ফিরে না পাওয়া দেশের দৃশ্যের সঙ্গে যেখানে বর্ষার জল থৈ থৈ দিঘীতে প্রাচীন মাছেরা ঘাই মারে, আটচালায় মৃন্ময়ী আসন্ন আশ্বিনে চিন্ময়ী হয়ে ওঠার অপেক্ষারত, বাতাসে দোল খায় লক্ষ্মীবিলাশ আর শাঁখের শব্দে নিবিড় সন্ধ্যা ঘনায়। আর দেশ বিভাজনের অমোঘ অর্থনৈতিক উপহাসে স্থাপিত হয় অনাকাঙ্খিত সাম্য, আকবর বাদশার সাথে হরিপদ কেরানির অথবা ভদ্র বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারের গৃহকর্ত্রী আমার ঠাকুমার সাথে অন্ত্যজ নটদের বিশেষ ভেদ থাকে না। তিনি আক্ষেপ করেন দেশবাড়ির মত সিধে না দিতে পারার। জানতে চান তাদের গ্রামের নাম, তাদের দেশ কোথায় ছিল। হরগৌরির নাচের এই উপস্থাপনা জাগতিক, বস্তুনির্ভর দৃশ্যমানতাকে অসীমান্তিক অবহেলায় অতিক্রম করে পৌঁছে যায় চেতনার দৃশ্যমানতায় যেখানে আজও অম্লান সেই চিরহরিতের দেশ। ত্রিপুরার হরগৌরির নাচ নামক এই লোকনাট্যের এখানেই দৃশ্যান্তর।

টিকা ঃ

১। Visuality-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে দৃশ্যতা প্রচলিত, কিন্তু আমি দৃশ্যমানতাকেই এর যথার্থ প্রতিশব্দ মনে করি।

২। ইন্টারনেটের বাংলা প্রতিশব্দ।

৩। একটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব যা সর্ব্বজনিন সত্যের অপসৃয়মানতাকে নির্দেশ করে এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও যৌক্তিকতার বদলে জনমত গঠনে আবেগ ও নিজস্ব মতকেই গুরুত্ব দেয়।

৪। ১৯০৫-১৯৯১ আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ভাষ্যকার, নাট্যকার, নির্দেশক, সম্প্রচারক ও অভিনেতা। তাঁর অমর সৃষ্টি 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'(১৯৩১)।

৫। একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্য একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির এক হয়ে যাওয়া, যেমন শব্দ শোনা, গন্ধ পাওয়া।

৬। আক্ষরিক অর্থে খোলা জানালা, এই প্রেক্ষিতে দৃষ্টিকোণ।
৭। পিটার জোণ্ডির মতে নাটক মঞ্চে এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত নির্মাণ করে যা বাস্তব এবং দর্শকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি একেই নাটকের পরম সত্য (absoluteness) বলেছেন।
৮। এই শব্দের প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দের (নিম্নবর্গীয় চেতনা) সঙ্গে আমি তত্ত্বের খাতিরে একমত নই। তাই ইংরেজি শব্দটাকেই রাখা হলো।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

(বাংলা)
চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা, কোলকাতাঃ ডি.এম লাইব্রেরি, ১৯৯৩।
চট্টোপাধ্যায় সঞ্জীব । লোটাকম্বল-১ কোলকাতা ঃ আনন্দ পাঃ, ২০০৯।
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী-সুলভসংস্করণ, কোলকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০৪।
ভদ্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ । 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী', পশ্চিমবঙ্গ ঃ অল ইন্ডিয়া রেডিও, ১৯৬৬।
সেনগুপ্ত মিহির। বিষাদবৃক্ষ, কোলকাতাঃ সুবর্ণরেখা, ২০০৪।

(English)
Berger, John .Ways of Seeing, UK: Penguin, 2008
Bleeker, M. Visuality in the Theatre : The Locus of Looking, Spain : Pulgrave Macmilan, 2008.
Dasgupta, Shasibhusan : An Introduction to Tantric Buddhism, Calcutta : University of Calcutta, 1950.
Lehman, Hans Thies, The Postdramatic Theatre, London:Routledge, 1999.
Mukherjee, Ajit. Tantra Art: Its Philosophy and Physics, Paris: Rupa & Company in collaboration with Ravi Kumar, 1994.
McDermott, Rachel Feel. Mother of My Heart, Daughter of My Dreams: Kali and Uma in the Devotional Poetry of Bengal. London: Oxford University Press, 2001.
Szondi, Peter. Theory of the Modern Drama, UK: Polity Press.1956.

লেখক : অশেষ গুপ্ত, অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা।
e-mail : ashesgupta@tripurauniv.in/ashesgupta69@gmail.com

মিথুন >মু >মুথুস> মিথ

প্রবীর গুহ

৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম। ৫৭ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণ। ৪ লক্ষ বছর আগে প্রথম মানুষ।

মিথ শব্দের উৎপত্তি গ্রীক মু বা মুথ থেকে। মু >মুথস> মিথ। মৌখিক গল্প। প্রাচীনকালে মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়াত যে গল্প..... সেগুলোই মিথ। আমরা একে লোকপুরাণ বলি। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন ছিল, আছে থাকবে। উত্তর খুঁজতে গিয়েই গল্পের শুরু। মিথ আসলে প্রাক বৈজ্ঞানিক যুগের বৈজ্ঞানিক ভাবনা। মিথের গল্প হোল বহিরঙ্গ। গবেষকদের কাজ এর ভেতরের সত্যকে খুঁজে বের করা। কোন না কোন ধর্মমত নিয়ে গড়ে উঠেছে দেবতা নির্ভর অলৌকিক এবং রূপকাশ্রয়ী কাহিনী। চোখের সামনে যা দেখে, তাই নিয়ে প্রশ্ন। সকাল, রাত কি ভাবে হয়? সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র কেন? বৃষ্টি হয় কেন? জোয়ার ভাঁটা কেন হয়? গ্রহণ হয় কেন? বাজ পড়ে কেন? ভূমিকম্প কেন হয়? স্বপ্ন দেখি কেন? এসব প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজেছে মানুষ। সেগুলোকে নিজেদের মত করে সাজাতে, নিজের চেয়েও বড় একটা সত্তার কল্পনা করেছে। এমনি সব প্রশ্নগুলোর ও সব আঞ্চলিক মিথ বা গল্প আছে।

এক এক জায়গার মিথে একেক রকম গল্প। পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়েই প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব গল্প আছে। মানুষ অচৈতন্য অবস্থায় নানা ধরনের স্বপ্ন দেখে, এবং সেই অচৈতন্য থেকে ফিরে চৈতন্য দিয়ে তাঁর একটা রূপ তৈরি করে । ধীরে ধীরে এই গল্প কলেবরে নানা শাখা বাড়িয়ে একটা গোষ্ঠীর গল্প হয়ে দাঁড়ায়। সেই গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অনুযায়ী গল্পের মধ্যে একটা প্রতীকী রূপায়ন ঘটে। এই সামগ্রিক অচৈতন্যতা থেকেই জন্ম মিথের। সব দেশের মিথ সমকালীন না হলেও সবই অনেক পুরানো। আমাদের দেশ যেহেতু হিন্দু প্রধান, তাই তার মাইথলজিগুলোও বেশীরভাগ হিন্দুত্বের ধারণা অনুযায়ী। সভ্যতার সাথে সাথে উত্তর খোঁজার পর্বও চলতে থাকে।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সংস্কৃতির বিকাশও ঘটতে থাকে। তার থেকেই লেজেন্ড (কিংবদন্তী) তৈরি হয়। প্রথমে মানুষ প্রকৃতির কাছে অসহায় ভাবত। এই বিপন্ন অবস্থা কাটাবার জন্যে নিজেদের থেকেও ক্ষমতাবান অতিপ্রাকৃত কিছুর কল্পনা করত যে তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দেবে। সেখান থেকেই দেব দেবীর কল্পনা শুরু হয়। আদিম ধর্ম চেতনায় দৈবশক্তি, যাদু শক্তিতে বিশ্বাস আর বস্তু বা প্রাণীর মধ্যেকার ক্ষমতায় বিশ্বাস করতো। সভ্যতার এক একটা পর্যায়ে এসে বিশ্বাসের স্তরগুলো খসে পড়তে শুরু করল এবং রূপ পাল্টাতে থাকল। যখন এসব লোকপুরাণ থেকে কাহিনী নির্মাণ শুরু হল , সমাজ

পুরোহিতদের নির্দেশে দেবতার প্রাধান্যই বড় হয়ে দেখা দিল। সেটাই হয়ে গেল লেজেন্ড। আর যেখানে বস্তু, পশু, মানুষ, যাদুশক্তির কল্পনা, তা দিয়ে নির্মাণ হল রূপকথা। ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছাড়াও কিছু সম্প্রদায় নিজের মত করে এনিমেট করে কিছু লেজেন্ড তৈরি করেছে। মানুষ জীবনকে ভালবাসে। কিন্তু জীবন রক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তত বিশ্বাস নেই। প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন না কোন কল্পিত অথবা লৌকিক দেবদেবীকে ধরে বসে আছেন। ঘরের মানুষের মতই তাঁদের পূজা বিধি। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগেও মিথের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ বিজ্ঞান ও মিথ উভয়েই সামাজিক ও মানবিক কল্যাণকামী। তাই বিজ্ঞানের সাথে সাথে মিথও লোকায়ত সমাজ নীতির ধারক। তাই বর্তমান যুগেও তার প্রভাব বজায় আছে।

আমাদের দেশে আধুনিকতা দেখা যায় তার বহিরঙ্গে। হেয়ার স্টাইল, জামা-কাপড়, সাজসজ্জা, শপিংমল, নার্সিং হোম, আরাম ইত্যাদিতে। কিন্তু স্বয়ং ডাক্তারবাবুও মায়ের নাম স্মরণ না করে ছুরি ধরেন না। যুবক যুবতীরা ফাটা জিন্সের শর্টস, টি-শার্ট পরছে , কিন্তু বাজুতে, কব্জিতে, আঙুলে, কোমরে নানা তুকতাক, ভাগ্য ফেরানোর পাথর, লাল সুতো, তাবিজ, কবচ, এমন কি শেকড় বাকড় ও থাকে। আধুনিকতম নার্সিংহোম এর রিসেপশনে ঝোলান উলম্বভাবে লেবু-লঙ্কার মালা। একইসাথে আমরা বড় ডাক্তার দেখাই আবার ঝাড়ফুঁক, বড়বাবা, বড়মায়ের পূজার ফুল -প্রসাদেও আস্থা রাখি। মিথ অবৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান। তাই মিথ শুধুমাত্র কাল্পনিক গালগল্প নয়। বর্তমান যুগেও তার প্রভাব বজায় আছে। বিজ্ঞান তা আসলে মানবিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য। মিথ ও আবার লোকায়ত সমাজনীতির ধারক। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিকীকরণ, সামাজিক স্তরবিন্যাস- এ সবই মিথের গৌরবময় ভূমিকার নিদর্শন। মানুষের মনে গল্প শোনার আগ্রহ প্রবল। আসলে, গল্পের মধ্যে মানুষ ভালো মন্দের বিচার করার বোধ জাগে। মনের জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজে। উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্ব খোঁজে, উপভোগ করে।

এই লোকপুরাণ থেকেই ত পুরাণের সৃষ্টি। রামায়ণ লেখার অনেক আগের থেকেই রামায়ণের কাহিনী নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিতে। নানারকমের রামায়ণ কাহিনী। অনেক পরে লিখিত রূপ পেয়েছে অনেক পরিশোধিতভাবে। এই লিখিত রামায়ণও আছে একাধিক। গল্প গড়ে উঠেছে সেখানকার সমাজ সংস্কৃতি অনুযায়ী। আদিমকালে মানুষ প্রয়োজনের কারণে মনে নানা ধরণের উদ্দেশ্য তৈরি করে সেটা পূরণ করার জন্য সুদৃঢ় কর্মপদ্ধতির কথা ভাবতে শুরু করল। আর ভাবতে গিয়েই মনের সন্ধান। মানুষ বুঝল মন-ই আসলে চিন্তা করায়। এভাবেই সৃষ্টিশীল চেতনার উদ্ভব হল। কেন, কেন, কেন? এর উত্তর থেকেই মৌখিক সাহিত্যের জন্ম। এই সাহিত্যই মানুষকে লোক দেবতা ও লোকপুরাণ নির্মাণে সাহায্য করল। তবে, দেবতারা পর্বত শিখরে বা স্বর্গে থাকলেও পৃথিবীর মানুষের সাথে তাদের অহরহ যোগাযোগ, আনাগোনা। মানুষ ছাড়া তাঁদের চলে না বা চলা সম্ভবও না। আসলে এইসব মনুষ্য সৃষ্ট দেবতারা মানুষেরই প্রতিরূপ। তাই

এদের মধ্যে মানুষের মতই ঈর্ষা, নিচতা, কামপরায়ণতা, ব্যাভিচার, দাম্ভিকতা, ক্রোধ, স্বার্থপরতা সবকিছু বিদ্যমান। অল্পেই রেগে যান, শাপ-শাপান্ত করেন। স্বার্থের কারণে যে কোন হীন কাজেও পেছপা নন। মানুষ ছাড়া তাঁদের এক পাও চলে না কিন্তু, মানুষের ওপরেই যত তাঁদের আস্ফালন। তাই পরবর্তীতে এঁরা হয়ে গেলেন ঈশ্বর।

এরপর যখন শ্রেণী বিভাজন শুরু হল, তখন আবার প্রয়োজনেই পুরোহিত এবং সামন্ত প্রভুরা দেবতা ও মানুষের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণদের বশে রাখার জন্য দরকার হল ভীতি সঞ্চারের। সামাজিক, অর্থনৈতিক অবিচারকে মান্যতা দিতে দেবতার নামে তৈরি করা হল অনুশাসন। একই সাথে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইও তাদের চেতনা বাড়াতে সাহায্য করেছিল। কার্য্য এবং কারণের যোগাযোগ বুঝতে শুরু করেছিল। কিন্তু দৈবী ব্যাপারগুলো বিশ্বাসে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, এগুলো তারা খুব স্বাভাবিক বলেই মনে করত।

লোকপুরাণের মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার অনেক। যেখানে সৃষ্টির কথা, সেখানে আরও বেশী প্রতীক। তারমধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মনের বিশ্বাস, সংস্কার, সামাজিক রাজনীতির গল্প। প্রতীকের ব্যাখ্যা বুঝলেই সে সময়ের মননের পরিচয় পাওয়া যাবে। মানুষ যেখানেই ঘটে যাওয়া কার্যকারণের ব্যাখ্যা করতে পারেনি, সেখানেই গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। কালে কালে এই গল্প নানা মানুষের ছোঁয়ায় কলেবর বৃদ্ধি করে লোকপুরাণে পরিবর্তিত হয়েছে। আদিমযুগে মানুষ, পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গদের নিরীক্ষণ করত গভীর মনোযোগে। কেমন করে বীজ থেকে চারার জন্ম হয়, পাখিরা ওড়ে কি করে, ডিম থেকে বাচ্চার জন্ম হল কিভাবে, বনে আগুন লাগে কিভাবে, অন্য ধরনের পাথরের থেকে গোল পাথর সহজেই গড়িয়ে নেওয়া যায় .... এসব তারা নিরীক্ষণ করেই শিখল। তাই তাদেরকেই তারা দেবতা রূপে কল্পনা করতে শুরু করলেন। যেমন মিশরের ইতিহাসে প্রথম অধিপতির নাম হোল 'মেনেস'। গুহা চিত্রের লিপিতে বর্ণনায় আছে যে বাজপাখি অন্য জানোয়ারদের গিলিয়া খাইল। মেনেস দের টোটেম (যার থেকে জন্ম) বাজপাখি। অন্য গোষ্ঠীগুলোকে পরাস্ত করে তিনি অধিপতি হইলেন। গুহাচিত্রে দেখা যায় যাদের শিরচ্ছেদ হয়েছে তাদের দেহটা মানুষের কিন্তু মাথাটা নানা জন্তু-জানোয়ারের। মানে কোন গোষ্ঠীর লোক বোঝাতে মাথাগুলো সেই টোটেম হয়েছে। পরবর্তীতে মোরেস হয়ে গেলে দেবতা হোরেস। দেবতার ধ্বজায় আঁকা থাকত বাজপাখির ছবি।

আনুমানিক তিনশ কুড়ি খৃষ্ট অব্দে তক্ষশীলাকে কেন্দ্র করে গুপ্ত যুগের শুরু। পরে প্রায় ভারতবর্ষ তাদের দখলে আসে। এই সময় থেকেই আধুনিক গণেশকে আমরা পাই। এর আগে নানাধরনের গণেশ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকরা বলেন গণ+ইশ। অর্থাৎ গনের দেবতা বা পতি। তখন বিভিন্ন গন, বিভিন্ন টোটেম, বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বাস করছে। আধুনিক গণেশের হাতে যে আয়ুধ দেখা যায় (আগে দুই হাত ছিল) তাঁর দুটি অস্ত্র সব জায়গাতেই আছে। একটি হল দড়ির ফাঁস। যাকে 'পাশ' বলা হয়,

আরেক হাতে অংকুশ, যার দ্বারা হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আল-বেরুনি জানাচ্ছেন একদল অরণ্যবাসীদের দ্বারা গুপ্তযুগের শুরু। সভ্যতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই সময়। ধাতুর ব্যবহার থেকে শুরু করে চিকিৎসা বিদ্যা, ভাস্কর্য সব ব্যাপারেই এগিয়ে গিয়েছিল অনেক। এই গুপ্ত যুগেই সমস্ত পুরাণগুলোকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল (গোপাল ভাণ্ডারকর এর মতে)। এবার হয়ত আমরা গণেশের আধুনিক রুপকে বুঝতে পারছি। গল্পগুলো ক্রমে লিখিত আকারে আসতেই তার বিশ্বাসের সারবত্তা বেড়ে গেল।

সে সময়ে এই গল্পগুলো নির্ভর করছে সেখানকার ভৌগলিক পরিবেশের ওপর। পৃথিবীর সৃষ্টির গল্পে বেশীর ভাগের ধারণা প্রথমে চারিদিকে ছিল জল। আবার আদি বাইবেলের প্রথমভাগে দুই জন লোকের নাম পাই। ইয়াওয়ে এবং এলহিম। পরে এলহিমের সাথে ইয়াওয়ের নাম যুক্ত হয়ে যায়। ইয়াওয়ে মিশরের চারপাশের বর্ণনা দিয়েছেন যে পৃথিবীতে জল ছিল না, চারদিক ছিল বালুময়। ঈশ্বর তখন সেই বালুরাশিতে সাইক্লোন তৈরি করে জল আনলেন। তাঁর পরে ধরিত্রী সবুজ হল এবং পড়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এলহিম রচনা করেন ব্যবিলনে বসে। সেখানে চারপাশে জলময় পরিবেশে ক্রীতদাসের জীবন কাটিয়েছেন ইহুদিরা কয়েক শতক। তাই তাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয় অন্ধকার জলধির মধ্য থেকে।

আদিম মানুষের কাছে ডিম ছিল এক আশ্চর্যের ব্যাপার। পাখির পেট থেকে আসে। আপাত শক্ত খোলা থাকলেও ভঙ্গুর জিনিস। মানুষ তো খেতেও শিখেছে। অথচ পাখি যখন পেটের নীচে থাকে, উষ্ণতায় রাখে, কিছুদিন পর ডিম বাচ্চায় পরিণত হয়। ছিল জড় বস্তু ডিম হয়ে গেল জীবন্ত পাখি। কি আশ্চর্য! শুধুমাত্র ভারতীয় পুরাণে নয়, বিভিন্ন দেশের যথা; রোডেশিয়া, চীন, নিউজিল্যাণ্ড, পুরনো বাইবেল, বৃহৎ আরণ্যক উপন্যাস ইত্যাদি গল্পে সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় জল এবং ডিমের কারণে পৃথিবীর উৎপত্তি। আর একটি সাধারণ ধারণা হল, এক বা একের অধিক জল এবং ডিমের কারণে পৃথিবীর উৎপত্তি। আর একটি সাধারণ ধারণা হল, এক বা একের অধিক ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করেন। যদিও তারা কোন লিঙ্গের, সে কথা বলা নেই কোথাও। তবে ভারতীয় উপজাতির গল্পে আমরা মারাং বুরুর (মারাং মানে বড় আর বুরু মানে পাহাড়) কথাও পাই।

পরবর্তীতে এটাও মেনে নেওয়া হল যে কৃষিকাজে মেয়েদেরই অগ্রাধিকার। প্রাথমিকভাবে তারাই বাড়ির মধ্যে বা আশে পাশে সব্জি ফলাতে শুরু করল। মানুষ তখন পশুপালনের দক্ষতা অর্জন করেছে। গরু, মহিষ, ঘোড়া দিয়ে লাঙ্গল (লিঙ্গ >লাঙ্গল) তৈরি করে ফেলেছে।

ঘোড়ার প্রয়োজন হোল দ্রুত যাতায়াতের জন্যে। আর ভারী মালবহনের জন্যে প্রয়োজন ছিল হাতির। মানুষ দক্ষতা অর্জন করল বুনো হাতি আর ঘোড়া ধরার। এবার দরকার জনশক্তি। সেটা ত মেয়েরাই একমাত্র দিতে পারে। কৃষি যুগে যে ধানের ফলন ছিল বেশী তাঁর নাম ব্রিহিধান্য। ডাক নাম ‘ষষ্টিক’। ষাট দিনে ফসল তৈরি হয়ে যেত। মানুষ

আদর করে 'ষেটে' ধান বলত। সেখান থেকেই ষষ্ঠির আবির্ভাব। সন্তানের জন্মের দেবী হলেন তিনি। তাই শস্য আর সন্তান ঘিরেই যাবতীয় কৃত্যের অবতারণা হোল। শস্যের দেবী অন্নপূর্ণা (দুর্গা বা দুর্গতিনাশিনী অনেক পরের নাম)। আদিতে দুর্গা ছিলেন শস্য দেবী। রামচন্দ্রের অকালবোধনে দেবীর পূজা অনেক পরের সংযোজন। বাল্মীকির মূল রামায়ণে সূর্যের কাছে রাম বর প্রার্থনা করেছিলেন। পরে শিবও আসলেন ফসলের দেবতা হয়ে আর সন্তানের দেবী ষষ্ঠি।

কৃত্য বা ব্রত জীবন সংগ্রামের অঙ্গ। শস্যের কামনায় বীজ বোনা আর ফসল তোলার মধ্যে অনেক সময়ের ব্যবধান। এই সময় জুড়ে রয়েছে উৎকণ্ঠা, ভয় অনিশ্চয়তা। মনের শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতেই ব্রতের আবির্ভাব। ব্রতের মধ্যে নৃত্য, নাট্য, আলেখ্যর প্রয়োজন। আর ব্রত করলেই যে শস্য আসবে এমন ত কোন অঙ্গীকার করেনি কেউই। তাই শস্যের উৎপাদনের সাথে জড়িয়ে থাকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মানুষ গুলোর উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতেই ব্রত জীবিত রাখা জরুরী। সময় আসলে সবাই যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ব্রত এখানে নকলের সাহায্যে কামনার ধনকে কল্পনায় রূপ দেওয়া। এটাই ছিল জাদু বিশ্বাস। যেমন শত্রুর কুশপুতুল পুড়িয়ে শত্রু নিপাত কিম্বা আকাশে জল ছুঁড়ে বা উঠোনে কাদা-জল মেখে গড়াগড়ি দিলে বৃষ্টি আসবে— এ সবই জাদু বিশ্বাস।

এইসব চলতি মিথকে ব্যবহার করেছিলেন এক নাট্য পথ প্রদর্শক- জেরজি গ্রটভস্কি। মিথ জনিত বিশ্বাস গুলোকে প্রাণ সঞ্চার করত আচার অনুষ্ঠান। যাকে আমরা ইংরেজিতে রিচ্যুয়াল বলে থাকি। তিনি বলেছিলেন জীবনের সত্যকে বুঝতে হলে ফিরতে হবে আবার উৎসে। যা এক ধরনের আদিরূপ সমৃদ্ধ কলাপের পুনরাবৃত্তি। প্রচলিত ট্যাবু (অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার) গুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সকলের একত্র আদিম সংঘবদ্ধতায় শুরু হবে এক পবিত্র কর্মকাণ্ডের থিয়েটার। ফেরত যেতে হবে সেই সময়কার রিচ্যুয়ালের আঁতুড়ঘরে। এমন একটা থিয়েটার হলে ভাল হয়, যেখানে সবাই অংশগ্রহণ করবে স্বাভাবিক মনের তাগিদে। কোন আলাদা দর্শক বা অভিনেতা নেই। সবাই সবকিছু। সেখানে যা কিছু হবে, সবার স্বার্থে হবে। প্রত্যেকের অংশগ্রহণে তা হয়ে উঠবে প্রাণময়। নাটক হবে আধুনিক কিন্তু প্রাণবায়ু থাকবে আমাদের শেকড়ের গভীরে।

লেখক:- প্রবীর গুহ, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

মৃচ্ছকটিক ঃ একটি সমীক্ষা

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভিত্তি যখন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে খ্রিস্টপূর্বের পঞ্চম শতক থেকে, নবীন ও যুক্তি নির্ভর বুদ্ধধর্মের প্রভাব যখন ভারতবর্ষের জনপরিসরের সীমানা ছাড়িয়ে দূরগামী হচ্ছে, সে-সময় ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শূদ্রক রচনা করেছেন 'মৃচ্ছকটিক'। নাট্যকারের ব্যক্তিগত পরিচয় সুস্পষ্ট নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচিতি দিতে অনাগ্রহী ছিলেন প্রাচীন সাহিত্যের লেখকরা। চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়ে স্রষ্টার সৃষ্টি ও কীর্তির অক্ষয়ত্বের দিকেই নজর দিতেন বেশি, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকরা । তুচ্ছ করতেন উপাধিও। কালিদাস বা ভাস উপাধিতে মজুমদার বা চক্রবর্তী ব্যবহার করতেন কি না তা এহ বাহ্য। নাটকের শুরুতে, 'নান্দী' শ্লোকে বা প্রস্তাবনায় নাট্যকারের আত্মপরিচিতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের প্রস্তাবনা থেকে বুঝা যায়, শূদ্রক ছিলেন রাজা, প্রজ্ঞাবান, গণিত, কামশাস্ত্র, হস্তিবিদ্যায় পারদর্শী। দীর্ঘজীবন লাভের জন্য তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তার পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে যান। তবে 'শূদ্রক' নামে প্রকৃতই কোন রাজা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। 'শূদ্রক'কে আভীর সম্প্রদায়ের রাজা বলে অনেকে মনে করেন। আভীরদের নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন কে.পি. জয়সোয়াল, দীনেশ চন্দ্র সরকার প্রমুখ। রিচমন্ড (Farley P. Richmond) মনে করেন 'শূদ্রক' নামে কোন রাজার বাস্তবতা নেই। এটি একটি মিথ মাত্র। তবে নাটকের মধ্যে উচ্চবর্ণের দুরাচারী রাজা পালকের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের পশুচারক আর্যকের বিদ্রোহ ও উত্থান দেখে অনুমানে প্রবৃত্তি হয়, আর্যক বা তাঁর পুত্রই ছিলেন 'শূদ্রক'। 'মৃচ্ছকটিক' ছাড়া 'বীণাবাসবদত্তা' নাটক ও 'পদ্মপ্রাভৃতক' নামে একটি 'ভাণ'-র রচয়িতা হিসাবে শূদ্রকের নাম জড়িয়ে আছে। শূদ্রকের আবির্ভাব কাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ শতকের মধ্যে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের কথাবস্তু সংক্ষেপে এইরকম—

"নাটকের নায়ক চারুদত্ত উজ্জয়িনীর একজন বিত্তশালী বণিক। কিন্তু তার মহানুভবতা ও দানশীলতার জন্য সমস্ত সম্পত্তি দান করে বর্তমানে সে দারিদ্রের সঙ্গে দিনযাপন করছে। চারুদত্তের স্বভাব ও সদ্‌গুণের কারণে নগরবাসীর কাছে সে বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিল। নগরের সুন্দরী গণিকা বসন্তসেনাও তার কাহিনী শুনে তাকে শ্রদ্ধা করতেন ও তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে দেশের দুষ্টু ও অত্যাচারী রক্ষা পালকের শ্যালক সংস্থানক নটী বসন্তসেনাকে পেতে চায় তার যৌনকামনা পূরণের জন্য। কিন্তু গণিকা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানদের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করতে নারাজ। সংস্থানক সর্বদা বসন্তসেনাকে নিজের দখলে আনার জন্য নানা কৌশল করতে থাকে। একদিন সংস্থানকের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে বসন্তসেনা

চারুদত্তের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। বাড়ি ফেরার সময় নিজের বহুমূল্য অলংকারগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রেখে যায়। শর্বিলক নামক একজন চোর বসন্তসেনার প্রধানা দাসী মদনিকাকে দাসত্ব থেকে উদ্ধার করার জন্য চারুদত্তের বাড়ি থেকে গচ্ছিত অলংকারগুলি চুরি করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেগুলি আবার বসন্তসেনার হাতে এসে পৌঁছায়। চারুদত্তের শিশুপুত্র রোহসেন এক প্রতিবেশী পুত্রের সোনার খেলনাগাড়ি দেখে সেও সোনার গাড়ির জন্য বায়না ধরে। কিন্তু সোনার গাড়ি কেনার ক্ষমতা না থাকায় তাকে মাটির খেলনা গাড়ি দেয়া হয়। তাতে রোহসেনের মন ওঠে না, সে কাঁদতে থাকে। বসন্তসেনা একথা জানতে পারে ভীষণ কষ্ট পায় এবং সোনার গাড়ি তৈরীর জন্য সমস্ত অলংকার খুলে মাটির খেলনা গাড়িটি সাজিয়ে দেয়। বসন্তসেনার এই উদার মানসিকতা চারুদত্তকে স্পর্শ করে এবং তারা পরস্পরের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। সংস্থানক জানতে পেরে বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রতি অনুরক্ত। সুতরাং পথের কাঁটা চারুদত্তকে সরাতে না পারলে বসন্তসেনাকে সে পাবে না। বহুবার চেষ্টা করেও যখন তাঁকে বাগে পেল না তখন সে কণ্ঠরোধ করে বসন্তসেনাকে মেরে ফেলতে চাইল। সে মারা গেছে মনে করে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ চারুদত্তের উপর আরোপ করা হয় এবং মিথ্যা মামলা সাজানো হয়। বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় চারুদত্তের। সেই দণ্ড কার্যকর করবার জন্য যখন তার শিরোচ্ছেদ করতে উদ্যত হয় তখন হঠাৎ করেই বসন্তসেনা সেখানে উপস্থিত হয়। সে প্রকৃত অপরাধীর কথা জানালে চারুদত্ত প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি পায়। ইতিমধ্যে দুষ্টু রাজা পালককে পরাজিত ও নিহত করে আর্যক নতুন রাজা হন। তার আদেশে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার বিবাহ স্থির হয়। এভাবে বসন্তসেনা গণিকা থেকে বধূর মর্যাদা লাভ করে। চারুদত্ত তার স্বভাবগুণে অপরাধী সংস্থানককে তার শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়।" এ কাহিনির উৎস কোথায়। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কীথের মতে নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরতমুনির পূর্ববর্তী কালের নাট্যকার ভাস-র 'চারুদত্ত' নাটকটি শূদ্রককে প্রভাবিত করেছে। আবার দেবধর মনে করেন, 'চারুদত্ত' হলো 'মৃচ্ছকটিক'-র সংক্ষিপ্ত রূপ। দুটি নাটকের কথাবস্তুর উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন লোককথা আশ্রিত 'কথাসরিৎসাগর' বা 'বৃহৎকথা'-র উল্লেখ করেন সমালোচক সুক্থঙ্কর। উৎস যাই হোক না কেন, 'মৃচ্ছকটিক' শূদ্রকের মৌলিক প্রতিভারই স্বর্ণিল ফসল।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী, 'মৃচ্ছকটিক' 'প্রকরণ' শ্রেণির মধ্যে পড়ে। নাটকের পারিভাষিক নাম হলো 'রূপক'। 'রূপক' দশ প্রকার, তা'হল- নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ঈহামৃগ, ডিম, সমবকার, ভাণ, প্রহসন, বীথি, প্রয়োগ। ভারতে বহু ধারার নাটক হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে, নানা ভাষায়, অভিনয় হয়েছে। এর মধ্যে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে, ভরতমুনি ছাড়াও দশম শতাব্দীর নাট্যতত্ত্ববিদ ধনঞ্জয় তার 'দশরূপক' - এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'মৃচ্ছকটিক' দশটি অঙ্কের প্রকরণ। নাট্যকার প্রতিটি অঙ্কের পৃথক নামকরণ করেছেন। যেমন, 'অলঙ্কারন্যাস', 'দ্যূতকরসংবাহক', 'সন্ধিচ্ছেদ', 'মদনিকা-শর্বিলক', 'দুর্দিন', 'প্রবহণবিপর্যয়', 'আর্যকাপহরণ', 'বসন্তসেনামোচন', 'ব্যবহার' এবং 'সংহার।'

'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি যথার্থ অর্থে 'লোকানুকৃতি'। সহজ কথায়, জীবনের প্রতিফলনই নাটক। ফলে নাটকের চরিত্রগুলি উঠে এসেছে নগর-জীবনের চেনাজানা পরিবেশ থেকে। নাটকের নায়ক-নায়িকা মহাকাব্য থেকে উঠে আসা বা স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন চরিত্র নয়। তথাকথিত 'ধীরোদাত্ত' না হলেও মহৎ গুণের কোন ন্যূনতা নেই। নায়ক চারুদত্ত উজ্জয়িনীবাসী, পেশায় বণিক, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ভাগ্যপীড়িত যুবক। স্ত্রী-সন্তান থাকলেও নটী বসন্তসেনাকে বধূ হিসাবে মেনে নেন। উদার, দয়ালু, সঙ্গীতপ্রিয়, কপটতাহীন, দৃঢ়চেতা চারুদত্ত সম্পর্কে শূদ্রক বলেছেন "দীনানাং কল্পবৃক্ষঃ সগুণফল-নতঃ সজ্জনানাং কুটুম্বী"।

বসন্তসেনা হলেন উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ গণিকা, কিন্তু অর্থলোভী নন। তার হৃদয় পবিত্র। ভালোবাসেন ব্রাহ্মণ সন্তান চারুদত্তকে। অনর্গল কথা বলেন সংস্কৃত ভাষায়। নিম্নবর্গের হলেও নাট্যকার পরম মমতায় বসন্তসেনাকে গড়ে তুলেছেন এক মহীয়সী নারী হিসাবে। পরম্পরা ও প্রথাকে ভেঙ্গে দিয়েছেন সাহসী শূদ্রক। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণের আরেকটি ব্যতিক্রমী চরিত্র হলো শর্বিলক, শিক্ষিত কিন্তু দরিদ্র। ব্রাহ্মণ অথচ পরিস্থিতির চাপে চৌর্যবৃত্তিতে নিপুণ। ভালোবাসেন আরেক গণিকা-দাসী মদনিকাকে। চারুদত্তের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে সিঁদ কাটার সময় গায়ের উপবীত (পৈতা) খুলে মাপজোখ করেন। কট্টর কোন ব্রাহ্মণ্যবাদী নাট্যকারের পক্ষে এ ধরনের চরিত্র নির্মাণ প্রায় অসম্ভব। শকারও একটি অনবদ্য চরিত্র। আসল নাম 'সংস্থানক'। শ্যামবাজারের শশীবাবুর মতো কথা বলতে গিয়ে কেবল 'শ' 'শ' করেন বলে তিনি শকার। ধূর্ত, ভীরু, যৌনলোভী, পেটুক ও হিংসাপরায়ণ শকারকে প্রথাগত ভিলেন হিসেব তুলে ধরেছেন নাট্যকার। মূর্খতা, ঔদ্ধত্য, নিষ্ঠুরতা, শঠতার আকর শকারকে বর্তমানকালের রাজনৈতিক দলের পরিপুষ্ট মাফিয়া সর্দার মনে হয়।

এক অনাবিল হাস্যরস ও আনন্দের উৎসারণ খুঁজে পাওয়া যায় নাটকের 'মৈত্রেয়ী' চরিত্রে। নিছক 'বিদূষক' বা ভাড় নয় মৈত্রেয়ী। চারুদত্তের আদর্শিক মিত্র ও সহযোদ্ধা, দারিদ্র ও বৈভবে। সব সময় ইতিবাচক ভূমিকায় নাটকে গতি এনে দিয়েছেন মৈত্রেয়ী। আরেকটি শুভাকাঙ্ক্ষী পার্শ্বচরিত্র হল 'বিট'। মধুরভাষী, পক্ষপাতহীন, গণিকা-বান্ধব বিটও ব্রাহ্মণ, বাগ্মী ও চতুর। দুটি 'বিট' চরিত্র আছে নাটকে। একটি বসন্তসেনার, অপরটি শকারের। দ্বিতীয়টি অভিনব। শকারের সহযোগী হলেও তার হীনমন্যতার তীব্র বিরোধী এবং চারুদত্তের গুণগ্রাহী। তাছাড়াও নাটককে বেগবান ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র। যেমন গণিকা, মদনিকা, পরিচারিকা, রদনিকা, চারুদত্তের আদর্শ হিন্দু পত্নী ধূতা, চারুদত্ত ও ধূতার পুত্র রোহসেন, চেট, জুয়ারী ও পরে বিদ্রোহী দর্দুরক, পাটলিপুত্রের অধিবাসী গাত্রসংমর্দক (Massager) পরে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংবাহক। বালক রোহসেন চরিত্রটিও চমৎকার, কখনো মৃৎশকটের পরিবর্তে সোনার গাড়ির জন্য বায়না করছে, তার পিতাকে শূলে চড়াতে উপক্রম হলে রোহসেন বলে উঠছে, বাবাকে নয়, আমাকে শূলে চড়াও, মা ধূতা আত্মাহুতি দিতে গেলে রোহসেন আর্তনাদ করে বলে — 'মাতরার্যে প্রতিপালয় মাম্, ত্বয়া বিনা ন শক্নোমি জীবিতং ধারয়িতুম্।" আবেগ ও স্নেহের প্রাবল্যে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে সংবেদী দর্শকের হৃদয়।

২.

সংস্কৃত নাটক দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত এবং দৃশ্যকাব্যের সার্থকতা তার প্রয়োগে, দৃশ্যায়নে। এ কথাই সুস্পষ্টভাবে বলেছেন কালিদাস 'শকুন্তলা' নাটকের প্রস্তাবনায়, দর্শকদের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন দৃশ্যকাব্যকেই সাধু বলে প্রশংসা করা যায় না।

"আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধুমন্যে
প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

কালিদাস নাটককে অভিহিত করলেন প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে, অর্থাৎ এটি হল application of science । একটি নাটকের সার্থক প্রয়োগের আবশ্যিক উপাদান হয়ে দাঁড়ালো অভিনয়, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, বাস্তুবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা এবং নন্দনতত্ত্ব বা রসশাস্ত্র। কুমার রায়ের ভাষায় নাটক হয়ে উঠলো 'তিলোত্তমা শিল্প', আন্তর্বিদ্যা রীতিনীতির এক অনন্য উদাহরণ হলো নাট্যশিল্প। এ বিষয়ে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। গুরুর কাছে শিষ্য শিখতে গেলেন অভিনয়। তিনি শিষ্যকে পাঠালেন সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে, সঙ্গীত শিক্ষক পাঠালেন নৃত্যের গুরুর কাছে, এভাবে সব শিক্ষা আয়ত্তে আসার পর শিষ্যকে অভিনয় বিদ্যা শেখালেন মার্কণ্ডেয় ঋষি। প্রাচীন ভারতের নাট্যোদ্যমী পণ্ডিতগণ কতোখানি সিরিয়াস ছিলেন নাটকের ব্যাপারে, তা একটিমাত্র বই পড়লেই কিছুটা অনুমান করা যায়। সেটি হলো ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই এর আদি রূপটি রচিত হয়ে গিয়েছিল। ভরত তাঁর পূর্বজদের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেছেন। নাট, নট, শৈলূষী- এসব শব্দ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরেই প্রচলিত ছিল, তা অনুমান করা যায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, বৌদ্ধ সাহিত্যে, বৈদিক সংহিতায় নাটকের প্রসঙ্গ রয়েছে। ভরত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, নাট্যরচনার কৌশল, মঞ্চ নির্মাণ থেকে অভিনয়, সবকিছু। কেবলমাত্র অভিনয়ের নানা দিক নিয়ে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও পরবর্তী কালের অন্যান্য গ্রন্থে যে-সব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা একটি রেখাচিত্রে উল্লেখ করা যায়।

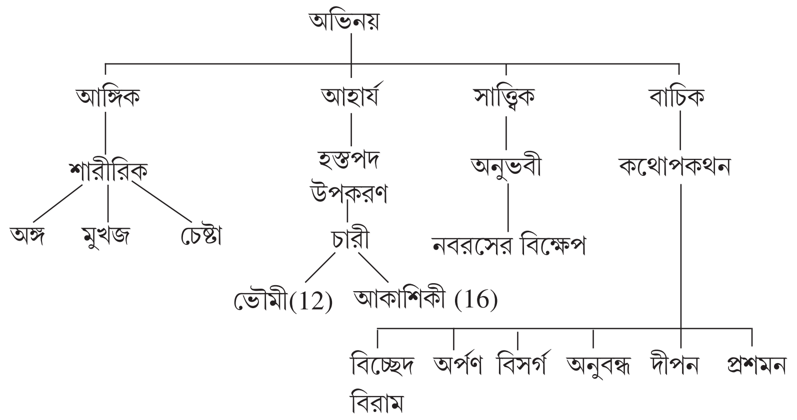

অভিনয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাস্তুবিদ্যা- নাট্যশিল্পে যা ছিল বীজাকারে সংহত, তা পরবর্তীকালে, পল্লবিত হয়ে মহীরুহ প্রতিম স্বতন্ত্র জ্ঞানচর্চার প্রস্থানে পরিণতি লাভ করেছে। এবং লেখা হয়েছে অসংখ্য বই। শুধুমাত্র নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ (৩৮টি) অধ্যায়ে ছয় হাজার শ্লোক রয়েছে। এর নানা অধ্যায়ে নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গশালা, প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কলা-কৌশল বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল নাট্য সম্ভারের মধ্যে মঞ্চ সফল নাটক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছে কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তরচরিত', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস',ভাসের 'ঊরুভঙ্গম্', 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং অবশ্যই শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্'। অনতিঅতীতে কুমার রায়ের পরিচালনায় 'বহুরূপী'র 'মুদ্রারাক্ষস্ নাটকটি দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সাম্প্রদায়িক কালে গৌতম হালদারের পরিচালনায় 'নটে নাটুয়া' গোষ্ঠীর - 'মাটির গাড়ি' অভিনীত হলো পুরোপুরি লোকনাটকের আঙ্গিকে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির পরিচিতি প্রথম ছড়িয়ে পড়ে হোরেস হ্যয়মেন উইলসনের অনুবাদের মাধ্যমে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সার্জন জেনারেল উইলসন ছিলেন প্রাচ্যবিদ। ১৮২৬ সালে তিনি 'মৃচ্ছকটিক' অনুবাদের দুরূহ কাজটি শেষ করেন। এরপর ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও নানা ভাষায় অনুবাদ হয় নাটকটির। এর ফরাসী অনুবাদ ১৮৫০ সালে 'Le Chariot denfant' নামে প্যারিসে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি মারাঠী ভাষায় প্রথম অভিনীত হয় পুণেতে। ১৮৮৭ সালে 'ললিত কলোৎসব মণ্ডলী'র গোবিন্দ বল্লাল দেবলের উদ্যোগে নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে মরগান ও লিউইশনের উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরে অভিনীত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের কুশীলবরা ছিলেন সবাই আমেরিকার। মঞ্চের পেছনে সেতার ও এস্রাজ-বাজিয়ে ছিলেন দুই ভারতীয় শিল্পী। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে, ১৯৩১ সালে, প্রথম কর্ণাটকী ছবিতে বসন্তসেনার অভিনয় করেছিলেন কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের একদা সহযোগী সুচেত সিং। তবে খুব সাড়া ফেলেছিল হাবিব তনবিরের 'মিট্টি কা গাড়ি'। ১৯৫৮ সালে 'হিন্দুস্থানী থিয়েটার গ্রুপ' প্রযোজিত এই নাটকটির অনুবাদ করেছিলেন বেগম কুদেসিয়া জায়দি ও নুর নবি আব্বাসি। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের বিধিনিয়ম মেনে, ছত্রিশগড়ের লোকসংস্কৃতির আঙ্গিকে তনবির এক তীব্র রাজনৈতিক নাটক হিসাবে 'মৃচ্ছকটিক'কে পরিবেশন করেছিলেন। পোষাক, মঞ্চ পরিকল্পনা ও সঙ্গীতের প্রয়োগে অভিনবত্ব ছিল নজর কাড়ার মত। দিল্লির 'ভারতীয় নাট্যসংঘ' ইউনেস্কোর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেছিল এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউট, ১৯৫৮ সালের ২০ জানুয়ারী। সে বছরই জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠানটি অধিগ্রহণ করে নেয় সঙ্গীত নাটক একাডেমি এবং এই প্রতিষ্ঠানটাই রূপান্তরিত হয়ে যায় 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা' হিসাবে। এন.এস.ডির কুশীলবরা ১৯৬০ সালে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির একাঙ্ক-রূপ 'নটী ও পুরোহিত' মঞ্চস্থ করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাট্যরীতির নিরীক্ষামূলক প্রয়োগ ছিল সেই পরিবেশনায়। বিখ্যাত সংস্কৃত নাট্য বিশেষজ্ঞ ভি.রাঘবনের পরিচালনায় 'নটী ও পুরোহিত' মাদ্রাজে মঞ্চস্থ হয় ১৯৬০ সালে। মঞ্চটি ছিল নিরাভরণ। আর পেছনে ছিল অঙ্কিত চিত্রাবলী। ১৯৬৬ সালে বলবন্ত গার্গী আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা-য়

মঞ্চস্থ করেন 'মৃচ্ছকটিক' নাটক। পোষাকের বাহুল্য নয়, মেক্ আপ অর্থাৎ অঙ্গ সজ্জার মাধ্যমে চরিত্রগুলো বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়-রীতিই ছিল প্রধান। সে বছর ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়েও মঞ্চস্থ হয় 'মৃচ্ছকটিক'।

১৯৭১ সালে পোলান্ডে অভিনীত হয় 'মৃচ্ছকটিক'। পরিচালনায় ছিলেন ক্রিস্টিনা সাজান্কা (krystyna Skuszanka)। খোলামেলা মঞ্চে, বাহুল্যহীন পোষাক ও অঙ্গসজ্জায় অভিনয়-নির্ভর ছিল নাটকের উপস্থাপনা। মঞ্চে উপকরণ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভরতের উপদেশ অনুযায়ী বাঁশ-বেত- কাঠের ব্যবহার করা হয়েছিল নাটকটিতে। ১৯৭৬ সালে মিচিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কার্লে রিচমন্ড নাটকটি মঞ্চস্থ করান। এছাড়াও 'মৃচ্ছকটিক' এর অভিনয় হয়েছে নানা জায়গায় নানা সময়ে। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বা নাট্যবিভাগের উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ বা একাঙ্ক অভিনয় হয়েছে। দিল্লির রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের উদ্যোগে প্রতিবছর সংস্কৃত নাটক সমারোহের আয়োজন করা হয়। সে-সব নাটকগুলোতে পরিচালকগণ ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিয়ম অনুসরণ করলেও আধুনিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির বিষয়বস্তু ও চরিত্র নির্মাণের অভিনবত্ব বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে। তৎকালীন সময়ের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিচিতির এক নির্ভরযোগ্য দলিল-চিত্র হিসাবে 'মৃচ্ছকটিক' নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সমুজ্জ্বল সম্ভার।

অত্যন্ত সমাজ সচেতন নাট্যকার ছিলেন শূদ্রক। তৎকালীন জনপরিসরের শ্রেণিদ্বন্দ্ব নিখুঁতভবে তুলে ধরেছেন নাটকে। একদিকে উচ্চবিত্ত মানুষের ভোগ-লালসা, ঈর্ষা-পরায়ণতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। চিরাচরিত বৃত্তি ব্যবস্থা নেই, ব্রাহ্মণের সন্তান শর্বিলককে ভরণপোষণের জন্য চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। নায়ক চারুদত্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কিন্তু হত দরিদ্র, নিজের ছেলে রোহসেনকে একটি দামি খেলনা গাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই। অর্থ রোজগারের দায়ে ও উচ্চবিত্তদের যৌন চাহিদা মেটাতে রমণীরা গণিকাবৃত্তি বা দাসীর কাজে জড়িয়ে পড়তেন। নাটকের 'মাটির গাড়ি' নামটিই সে সময়কার সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। চারিদিকে বেকারত্ব। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য। সংবাহক ও দর্দূরকের মতের লোকেরা পাশা খেলে রোজগার করতো। দারিদ্রের জ্বালায় লোকজন নেশায় আসক্ত থাকতো। মুষ্টিমেয় শ্রেণির কাছে ছিল সব ক্ষমতা। শর্বিলকের মতো গুণী উচ্চবর্ণের লোকও চৌর্য বৃত্তির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মৃচ্ছকটিকের পুনঃপাঠ বর্তমান ভারতের আর্থিক দুরবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মৃচ্ছকটিক একটি রোমান্টিক রাজনৈতিক নাটক। 'রসিক' নায়ক চারুদত্ত 'অভিসারিকা' নায়িকা বসন্তসেনা ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়েন। 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে উজ্জয়িনী নগরীর রাজা পালক ছিলেন স্বৈরাচারী প্রশাসক। প্রজাদের সুশাসন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। স্বজনপোষণের চূড়ান্ত, রাজা তার শ্যালক শকারকে রাজপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। শকার বসন্তসেনাকে গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করলেও এর দায় চাপিয়ে দেন চারুদত্তের উপর, বিচারকদের প্রভাবিত করেন শকার। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

হন চারুদত্ত। বিচার ব্যবস্থাও যে মূলত শাসক শ্রেণির অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়, একালের ভারতবর্ষের মতো, তা অকপট দেখাবার সততা ও দায়বদ্ধতা নাট্যকার শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী রাজার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, যে রাজা সুষ্ঠুভাবে প্রজার পালন করতে অক্ষম, এর দ্রুত অপসারণ করার কথা বলেন নায়ক চারুদত্ত।

> "যদ্যুদ্যতে পালকে মহতী রক্ষা ন বর্ততে
> তচ্ছীঘ্রমপক্রামতু ভবান্ । তৎ শীঘ্রম্ অপক্রামতু।"

আসন্ন হয়ে উঠে রাষ্ট্রবিপ্লব। শর্বিলকের তৎপরতায় কারাগারে বন্দী গোয়ালা পুত্র 'আর্যক' কারামুক্ত হয়ে দুষ্ট রাজা পালককে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। বসন্তসেনাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ থেকে চারুদত্তকে মুক্ত করে চারু-বসন্তের বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন নতুন রাজা আর্যক। বিচার ব্যবস্থাও স্বাধীন ও অবাধ হয়। একটি আদর্শিক গণরাজ্যের সূচনার মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটকের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে বিবদমান দুই ধর্মীয় গোষ্ঠী, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সংশ্লেষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। একদিকে কামদেবের মন্দিরের বৈভব অন্যদিকে শ্রমণদের প্রশান্ত উপাসনালয়ের ছবি এঁকেছেন শূদ্রক। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত বৌদ্ধমন্দির নির্মাণে উদারহস্তে দান করেন। বিপ্লবোত্তর কালে 'সংবাহক' হয়ে উঠেন বৌদ্ধমন্দিরগুলির প্রধান। যে নাগরিক জীবনের কাহিনির বিন্যাস করেছেন নাট্যকার শূদ্রক, সে নগরায়নের বিকাশ ঘটেছিল, সিন্ধু নগরসভ্যতার অবসানের দীর্ঘদিন পর, ষোড়শ মহাজনপদের আমলে। বৌদ্ধ সাহিত্য 'অঙ্গুত্তরনিকায়' 'দীঘনিকায়' এবং 'চুল্ল-নির্দেশ'-তে মহাজনপদের উল্লেখ আছে। সেগুলি হলো, অঙ্গ, অস্মক, অবন্তী, চেদী , গান্ধার, কাশী, কম্বোজ, কোশল , কুরু, মগধ, মল্ল, মৎস, পাঞ্চাল, সুরসেন, বৃজি, বৎস। অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী হলো বর্তমান নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। অত্যাচারী রাজা পালকের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় পশুপালক আর্যকের উত্থান দুরাচারী রোমান শাসকের প্রতিরোধে মেষপালক যিশু-র সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ইঙ্গিতের মাধ্যমে নাট্যকার শূদ্রকের আবির্ভাব খ্রিস্টের সমসাময়িক কালের বলে মনে হয়।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বিদ্রোহী রাজা হলেন 'আর্যক'। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যে ভালো কাজ করেন তিনিই আর্যক। আর্য শব্দটি গুণবাচক অর্থেই প্রথমে ব্যবহৃত হতো। 'শকুন্তলা' সহ প্রাচীন নাটকে 'আর্য' বা 'আর্যপুত্র' শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। স্বামী বা পতিকে 'আর্য' বা 'আর্যপুত্র' হিসাবে পরিচয় দেয়া হতো। 'অমরকোষ'-এ 'আর্য' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সৎকুলোদ্ভব'। 'শব্দরত্নাবলী' গ্রন্থে 'আর্য'-র প্রতিশব্দ হলো 'পূজ্য', 'শ্রেষ্ঠ' 'বুদ্ধ'। অভিধানকার হেমচন্দ্র 'আর্য' শব্দে 'স্বামী' ও 'বুদ্ধ'কে ধরেছেন। 'আর্য' শব্দটিকে জাতিবাচক বা দেশবাচক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে অর্বাচীনকালে। মূলত ব্রিটিশ লেখকদের হাত ধরেই 'আর্য'-র জাতিবাচকত্ব দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। ১৮৪০ সালে মোক্ষমূলর 'আর্য' শব্দের প্রতিরূপ 'aryan' সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেন। সমসাময়িককালের ফরাসী চিন্তাবিদ

আভিজাতিক যোশেফ আর্থার দ্য গোবিনিও (1816-1862) আর্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। এর প্রভাবে জার্মানিতে গড়ে ওঠে গোবিনীয় আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে ফ্যাসীবাদে পরিণতি লাভ করে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বিপ্লবী রাজাকে 'আর্যক' নামে অভিহিত করে শূদ্রক সুগত বুদ্ধের অনুষঙ্গ টেনে এনেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। নাটকে গ্রীক প্রভাব নাকচ করে দিয়ে Walter Rubin তাঁর 'The Mricchakatika, its folkloristic and political interpretation প্রবন্ধে বুদ্ধজাতক ৩১৮ ও ৪১৯ নং আখ্যানের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বুদ্ধজাতকে সুলসা নামে বারবণিতার এক চোরের সঙ্গে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ার আখ্যান রয়েছে। 'Orien' পত্রিকার প্রথম বছর প্রথম সংখ্যায় (১জুন, ১৯৪৮) প্রকাশিত এই প্রবন্ধে মৃচ্ছকটিকের রাজনৈতিক উপাদানের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, গোপালকর আর্যকের বিদ্রোহ অভিনব। ইউরোপে এমন বিদ্রোহ বিরল, বরং প্রাচীন চিনে এরকম রাজনৈতিক পরিবর্তন অনেকবার ঘটেছে। মিং-র বংশের উত্থানই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বুদ্ধধর্ম প্রচারের অন্যতম ভাষা ছিল প্রাকৃত। বুদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগের কারণে বা 'মৃচ্ছকটিক'-কে একটি জনপ্রিয় গণনাটক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই হোক না কেন, নাট্যকার শূদ্রক একাধিক প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করেছেন 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে। অবশ্য সংস্কৃত নাটকে 'প্রাকৃত' ভাষা ব্যবহার করার বিধান দিয়ে গেছেন ভরতই তার নাট্যশাস্ত্রে।

একটি সার্থক 'পলিটিক্যাল রোমান্স' হিসাবে 'মৃচ্ছকটিক' -র পাঠ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও মঞ্চায়ন একান্তই প্রয়োজন, শুধুমাত্র ঐতিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার হিসাবে নয়, অষ্টম শতকের নন্দনবিদ মম্মট তার 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নিয়ে, 'শিবেতরক্ষতয়ে' অর্থাৎ 'অমঙ্গল-বিনাশ'-র যে উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে তার জন্য প্রয়োজন আরো বেশি।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকের কাহিনিকে উপজীব্য করে উৎপল ভট্টাচার্য একই নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন লতিকা সাহা, ১৯৫৯ সালের মে মাসে। কলকাতার ১০/২ , টেমার লেন থেকে। উপন্যাসটির ভূমিকায় আমার মাষ্টারমশায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব বন্দ্যোপাধ্যায় যা মন্তব্য করেছিলেন, এর শেষাংশ দিয়ে বর্তমান লেখাটি শেষ করছি—

"ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম বোধহয় 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারিত সাধারণ প্রজাদের (Commoner) বিদ্রোহ স্থান পেয়েছে। আর্যক সর্বহারার প্রতিভূ হয়ে শোষক রাজার বিরুদ্ধে শোষিত প্রজাদের জন্যে বিপ্লব সংঘটিত করে নতুন যুগের সূচনা করেছে। সে যুগের পটভূমিকায় নাটকের সৃষ্টি হলেও নাটকের 'মৃচ্ছকটিক' (মাটির খেলনা) নামকরণের মাধ্যমে সর্বকালীন মানুষের লোভ, ঘৃণা, ভালোবাসা ও বঞ্চনার কাহিনি বলেছেন।"

লেখক : রামেশ্বর ভট্টাচার্য, এম.বি.বি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

খালেদ চৌধুরীর শিল্প ভাবনায় ও প্রয়োগে রবীন্দ্রনাটক

ড. শান্তনু দাস

বহুরূপী প্রযোজিত রক্তকরবী নাটকের ভুমিকাতে শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরী সম্পর্কে লিখেছেন— " লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যে কোন বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় রক্তকরবীর চিন্তা পেয়ে বসল।" এইরকম একজন বহুগুণসম্পন্ন মানুষ যার জীবনটাই ছিল নানা রংয়ের সমাহার। ১৯১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর আসামের করিমগঞ্জের দাসগ্রামের মামাবাড়িতে তাঁর জন্ম। করিমগঞ্জ থেকে মাইল খানেক দূরে চেপরা গ্রামে তাঁর পৈত্রিক ভিটা। বাবা চন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী ও মা হেমনলিনীর তিনি প্রথম সন্তান। গ্রামের পাঠশালাতেই ছোটোবেলায় লেখাপড়া শুরু হয়। মাস্টারমশাই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ছবি আঁকতে দিতেন। লাউ, কুমড়ো, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি তিনি ভালোই আঁকতে পারতেন, নম্বরও পেতেন দশে দশ। নিজের আঁকার সাথে সাথে অন্য বন্ধুদের খাতাতেও তিনি এঁকে দিতেন। এর জন্য পাঠশালার মাস্টারমশাইয়ের কাছে শাস্তিও পেয়েছেন অল্পবিস্তর। ছোটোবেলার এই পাঠশালার পড়বার সময় একদিন শুনতে পেলেন শোলমারায় এক বর্ধিষ্ণু চাষি নৌকোপূজো করেছেন। জীবনে এই প্রথম শুনলেন নৌকোপূজোর কথা। কৌতূহলবশত তিনি কখনও কখনও স্কুল পালিয়ে, আবার কখনও স্কুল ছুটি হলে সোজা চলে যেতেন ওই নৌকোপূজোর জায়গাতে। প্রচুর মানুষের ভিড়ের মধ্যে থেকেই দেখেছিলেন অনেক বিশাল চারতলা উঁচু বাড়ির মতো। বালক খালেদ অনেক দেব দেবীর নামও জানতেন না, পাশে রাখা লিস্ট দেখে তাদের চিনতে হত। নানারকমের দেবদেবীর মধ্যে তাঁকে আকর্ষণ করত নৃসিংহ— অর্ধেক মানুষ অর্ধেক সিংহ, অথবা বরুণ— অর্ধেক কচ্ছপ অর্ধেক মানুষ। এই সমস্ত দেবদেবীদের সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ফর্মটা তাঁকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই আকর্ষণই তাঁকে মূর্তি বানাতে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। কোথাও কোনো ট্রেনিং নেই, শুধুই মূর্তি দেখে মূর্তি বানানো; অর্থাৎ যে কোনো শিল্পচর্চার প্রাথমিক শর্ত যে OBSERVATION, সেটাই এখানে ব্যবহৃত হল। এই মূর্তি গড়ার কাজ দেখে তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন—এগুলো করবি না। মূর্তি বানালে পূজো করতে হয়।" শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, বাবা ঠিকই বলেছেন। এর মধ্যে কোথাও একটা দায়-দায়িত্ব আছে। তাই তিনি মূর্তি বানানো ছেড়ে দিলেন।

এই সময় তাঁদের গ্রামের আশেপাশে অনেক যাত্রাপালার অভিনয় হত, যেমন মনসা মঙ্গল ও পদ্মপুরাণ। খালেদবাবু বলেছেন—" এই পদ্মপুরাণ আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করতো। আমাদের বাড়িতে রাত্রে গিয়ে পদ্মপুরাণ শোনার অনুমতি ছিল না। সবাই ঘুমিয়ে

পড়লে আমি লুকিয়ে চলে যেতাম সেই গ্রামে যেখানে পদ্মপুরাণ হচ্ছে; সেখানেও লুকিয়ে থাকতাম। দূর থেকে শুনতাম, সেখানে যদি কেউ আমাকে দেখে ফেলে, বাড়িতে এসে পেটা খেতে হবে। কাজেই লুকিয়ে পদ্মপুরাণ শুনতাম। এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা পিক্টোরিয়াল দিক ছিল। পোশাক পরে দুই হাতে দুটো চামর নিয়ে নেচে নেচে গাওয়া হত এই গান। দীর্ঘ গাথার মতো এই পদ্মপুরাণ-এর কাহিনি। সেই কাহিনি বিবৃত করা হত, আর দোহাররা থাকত মূল গায়কের পাশে। সেই যে গান গাইত সেটা আমাকে অবাক করে দিত অন্য একটা কারণেও যে লোকটি গান গাইত সে ভীষণ তোতলা ছিল, অথচ সে দুর্দান্ত গান গাইত। সুরীন্দ্র বলে তার নাম, আসলে সুরেন্দ্র আর কী, গ্রামের লোক তাকে সুরীন্দ্র বলে ডাকত। সেই মূল গাইয়ে ছিল। বাল্যকালের শোনা গান তাঁর শেষজীবন পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে গেছিল।

খালেদ চৌধুরীর জীবনে তাঁর মামার বাড়ির প্রভাব অনেকটাই লক্ষণীয়। তাঁর দিদিমা কাত্যায়নী পুরকায়স্থ ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী গুরুসদয় দত্তের বড়োদিদি। তাঁর দিদিমা অত্যন্ত ভালো গাইতেন। গানের সাথে সাথে তিনি ধামাইল নাচে অংশগ্রহণ করতেন গ্রামের মেয়েদের সাথে। তাঁর দিদিমা, মামারা, মামিরা ও তাঁর মা অত্যন্ত ভালো গাইতেন। তাঁর বাবা সংকীর্তন করতেন। এক কথায় এইরকম এক সংগীতময় পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছিলেন। কোনো জিনিসকে অবজার্ভ করে ছবি আঁকা বা মূর্তি বানানোর মতোই প্রথমদিকে সংগীতে তাঁর কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, শুধুই অন্যদের চর্চা দেখে শিক্ষা নেবার চেষ্টা, তাঁর পরবর্তী জীবনে ভীষণ সহায়ক হয়েছিল।

১৯২৮ সালে মাতৃবিয়োগের পর তাঁর পারিবারিক যোগটা অনেক কমে গিয়েছিল। কিশোর খালেদ এই সময় প্রায়শই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতেন। সতেরো বছর বয়সে, ১৯৩৬ সালে তিনি শেষবারের মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যান সিলেটে। এই সময়টা তার জীবন কেটেছে খুবই দুর্বিষহ, টাকা নেই, কাজ নেই, থাকার জায়গা নেই। এর মধ্যে ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট শহরে এক বড়োসড়ো মিলিটারি ঘাঁটি। এই সময় তিনি মিলিটারি সাইন বোর্ড, হোর্ডিং ও নানা জায়গায় রং করার কাজের কন্ট্রাক্ট নেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের তখনও নামকরণ হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি কালচারাল স্কোয়ার্ড নামেই তা চলছিল। সেই সময়ে এক পার্টি কর্মী বিনোদবন্ধু দাসের অনুরোধে তিনি এঁকে দেন স্তালিনের এক বড়ো ছবি। এই ছবিতেই তিনি প্রথম স্বাক্ষর করলেন ‘খালেদ চৌধুরী’ নামে, যদিও তাঁর আসল নাম ছিল চিত্তরঞ্জন দত্ত চৌধুরী। বাকি জীবনটা তিনি এই পরিবর্তিত নামেই সকলের কাছে পরিচিত হন। এইখানেতেই তাঁর সাথে আলাপ হয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও শান্তা সেনের সাথে। গান গাওয়া ও ছবি আঁকার জন্য খালেদ চৌধুরী জড়িয়ে পড়লেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। গানের দলে গান করা, পোস্টার তৈরি করা ও ছবি আঁকা সাথে সাথে তিনি জয়নুল আবেদিন ও চিত্ত প্রসাদের ছবি এবং সুনীল জানার ফটোগ্রাফ দেখে বুঝতে পারছেন, শিল্প শুধু বিনোদন নয়। শিল্প

একটা উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট থিম অনুসারে তাঁর আঁকা সিরিজ অব পিকচার্সের প্রদর্শনী ভীষণভাবে প্রশংসিত হতে থাকে। এই সময় কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁকে বলেন— " মিউজিক ইজ নট ইয়োর লাইন। তুমি আর্টিস্ট, তুমি ছবি আঁকবে।" এই কথাটি তাঁর জীবনকে একেবারে নাড়িয়ে দেয়। তিনি এক দ্বিধার মধ্যে পড়ে যান।

এই দ্বিধাকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪৪ সালে মাত্র চৌষট্টি টাকা সাথে করে তিনি সিলেট থেকে শিলং হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়ার। কলকাতার এক পেইন্টার অজিত সিংহ তাঁকে জয়নুল আবেদিনের কাছে নিয়ে যায়। তাঁর আঁকা দেখে আবেদিন সাহেব জানান যে, তাঁকে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার দরকার নেই। যেমন তিনি ছবি আঁকছেন তেমনই এঁকে যান। এই কথার সাথে সাথে তিনি সুযোগ পেয়ে যান আবেদিন সাহেবের সাথে কাজ দেখা ও শেখার। আর ঠিক এই সময় দেশে দাঙ্গা লাগল। দেশ ভাগ হল। জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে চলে যান। ফলত, ছবি আঁকা শেখার ব্যাপারটা ধামাচাপাই পড়ে গেল।

আবেদিন সাহেবের সান্নিধ্যে খালেদ চৌধুরী বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পূজো সংখ্যায় অনেক ইলাস্ট্রেশনের কাজ করেছিলেন। পোস্টার আঁকা ও এই ইলাস্ট্রেশনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অর্থাভাবকে দূর করার জন্য বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকার কাজ শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন— আমি শুরু করলাম ১৯৪৫-এ। আমি প্রথম যে কভারটা করলাম, সেটি একটি পত্রিকার, পত্রিকাটি যখন বেরোল তখন দশ টাকা পেয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছিল দারুণ, যেন বিশ্বজয় করে ফেললাম। এরপর চিন্মোহন সেহানবিশের অনুবাদ ডাইসন কার্টারের সোভিয়েত বিজ্ঞান বইটা এখনও আছে। অনিল সিংহের ছাপা, আমার প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ। এঁকে দিলাম একটা স্টার, মানে শ্যুটিং স্টারের মতো একটা, ওপর দিকে উঠছে, প্রচণ্ড বেগে উঠছে। যেমন রকেট ওঠে, ওইভাবে একটা স্টারকে আমি তুলি। অর্থাৎ সোভিয়েতকে স্টার হিসেবে সিম্বলাইজ করি। সোভিয়েত বিজ্ঞানও যেন ওইভাবেই 'রাইজ' করছে। এই হল আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স বইয়ের কভারের। তারপর থেকে এটায় উন্নতি কীভাবে করা যায় এবং নিজেকে কত ভাবে তৈরী করা যায়, সেইটা নিয়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আমি ভীষণভাবে লেপটে ছিলাম।" খালেদ চৌধুরী বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিও অসমিয়া এই চার ভাষায় প্রায় পনেরো হাজার বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন।

গণদর্পণ পত্রিকার আগষ্ট ১৯৯০ সংখ্যায় খালেদ চৌধুরী 'ছেঁচল্লিশের ডায়রি থেকে' নামক এক প্রবন্ধে ১৯৪৬ সালের কলকাতার ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন— "দাঙ্গায় লাঠি, বল্লম, সোর্ড, ছোরাছুরি বা অন্য যে কোন অস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, দাঙ্গার আসল হাতিয়ার মানুষের বিদ্বেষ আর ঘৃণা । আর তার প্রস্তুতি অস্ত্র সঞ্চয়ের নয়। মানুষের মনের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত পারস্পরিক ঘৃণা আর সন্দেহই প্রস্তুত করে সেসব গণহত্যার বাতাবরণ।" ফলত, এই সময় তিনি সবকিছু ত্যাগ করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর এই কাজে পরনের ধুতিকে লুঙ্গির মতো করে কখন এক পাড়ায় খালেদ নামে কাজ করছেন তো অন্য পাড়ায় আবার ধুতিকে

কাছা দিয়ে পরে কালী নামে আর্তের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

কবি গোলাম কুদ্দুস দ্বারা নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গদ্যের কিছু অংশ নিয়ে খালেদ চৌধুরী শ্যাডো প্লে করার উদ্যোগ নেন। তাঁর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন— "একটা ধুতি টাঙিয়ে, কুপি জ্বেলে, কাগজ কাটা আকৃতি বানিয়ে তার ছায়া ফেলতাম। গান গাইতাম আর ছায়ারা পর্দায় নাড়াচাড়া করত। দর্শক ছিল মামাতো ভাইবোনের দল।" এই ছোটোবেলার অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে কাজে নামলেন। এই প্রথম তিনি কোরিওগ্রাফির কাজ করলেন। নির্বাচিত অংশগুলি পাঠ করা হত আর তার সাথে নৃত্যশিল্পীরা নাচ করতেন এবং তাদের ছায়া পর্দায় গিয়ে পড়ত। মুসলিম ইনস্টিটিউট ও ব্রাবোর্ণ কলেজে এই শ্যাডো প্লে-র দুটি মঞ্চায়ন হয়েছিল। এরই মাঝে তিনি রঙ মহলের বিজন ভট্টাচার্যের জীয়ন কন্যা নাটকে কাজ করেন। এর সাথে সাথে কমল বোসের বাড়িতে শহীদের ডাক ছায়া নাটিকার মঞ্চসজ্জার কাজ করলেন। স্বাভাবিক কারণেই ছায়ানাটিকার সেটটি টু-ডাইমেনশনাল হয়েছিল। এই সময়ে তিনি পেনসিল স্কেচ, জলরং, তেলরংয়ের প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নজরুল ইসলাম অনুদিত ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে ইলাস্ট্রেশন, ১৯৫৮ -৫৯ সালে এটি বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮ সালে খালেদ চৌধুরীর সাথে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মতপার্থক্য শুরু হয়। এই সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘে ড্রামা ইউনিট, গানের ইউনিট ও ব্যালে ইউনিটে বিভাজিত হয়ে গেছে। ইউনিটগুলোর নিজেদের মধ্যে তালমিলের একটু অভাব বোধ হচ্ছে। মূলত নাটকে ইউনিটের সাথে বাকি ইউনিটের মতপার্থক্য চরমে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালে খালেদ চৌধুরী ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন। কিন্তু এখানেই তাঁর সাথে শম্ভু মিত্রের আলাপ হয়েছিল। শম্ভু মিত্র ছিলেন ড্রামা ইউনিটের একজিকিউটিভ সদস্য আর খালেদ চৌধুরী ছিলেন ব্যালে ও গানের ইউনিটের । ফলে দুইজনের দেখা হলেও যোগাযোগ বিশেষ ছিল না।

খালেদ চৌধুরীর নাটকে অভিনয়ে কখনোই কোনো উৎসাহ ছিল না। বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী নাটকে একবার একটি ছোটো আভিনয় ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন মেদিনীপুরে নবান্ন নাটকের অভিনয়ে নির্ধারিত অভিনেতা অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এরপর বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রদের সাথে রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে আংশিকভাবে যুক্ত ছিলেন। এই প্রযোজনায় প্রখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদারের সাথে সারারাত জেগে মঞ্চসজ্জার কাজ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকের সাথে তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে এটাই বোধহয় প্রথম যোগাযোগ এবং একই সাথে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে এটাই সম্ভবত শেষ কাজ। তবে শম্ভু মিত্রের সাথে তাঁর যোগাযোগটা নানা কাজের মধ্যে দিয়ে ছিল। শম্ভু মিত্রও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ছেড়েছেন খালেদ চৌধুরীর সমসাময়িক সময়ে, তবে ভিন্ন কারণে। এরই মধ্যে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫০ সালে শম্ভু মিত্রের আহ্বানে ছেঁড়া তার নাটকের প্রচারপত্র আঁকার মাধ্যমে বহুরূপী নাট্যদলের সাথে

খালেদ চৌধুরীর সংযোগ স্থাপিত হয়। এরপর বহুরূপীর বিভিন্ন নাট্য উৎসবের পোস্টার করে দিয়েছেন। এছাড়াও ধর্মঘট নাটকে একটু নেপথ্যসংগীত দেখিয়ে দিয়েছিলেন সাথে সাথে মঞ্চসজ্জার কাজেও সহযোগিতা করেছিলেন। খালেদ চৌধুরীর কথায়— " সবটাই ছিল অপটু,অনভিজ্ঞ হাতের কাজ।" এইভাবে দিন যখন যাচ্ছিল, একদিন শম্ভু মিত্র জিজ্ঞেস করলেন—" তোমার পয়সার দরকার নেই?" উত্তর দিলেন— " আছে।" শম্ভু মিত্র বললেন— " তাহলে নাটক করা যাক।" জবাব দিলেন— " নাটকে পয়সা হয় না।" শ্রী মিত্র প্রশ্ন করেন— "রক্তকরবী পড়েছ?" খালেদ চৌধুরীর মনে এল ১৯৪৯ সালের ভারতীয় গণনাট্য সংঘের রক্তকরবী প্রয়োজনার কথা। জবাব দিলেন — " পড়েছি।"

২০০৫ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে এক সাক্ষাৎকারে খালেদ চৌধুরী শোনালেন সেই সময়ের কথা- " রক্তকরবীর সাথে এভাবে যুক্ত হয়ে পড়বো ভাবতেই পারিনি। ১৯৪৯ সালে জর্জজা (দেবব্রত বিশ্বাস) রক্তকরবী করেছিলেন। শ্রীরঙ্গমে কমিউনিস্ট পার্টির অর্থের প্রয়োজনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষে ছবি বোস আর উমা সেহানবীশ এটি অভিনয়ের আয়োজন করে। রাজা-শম্ভু মিত্র, নন্দিনী- কনিকা মজুমদার, চন্দ্রা - তৃপ্তি মিত্র, সর্দার - কালী ব্যানার্জী, গোঁসাই - সজল রায়চৌধুরী। জর্জদা একদিন বললেন, 'একটা সেট কইর‍্যা দাও। সেট-র কিছুই আমি জানি না। কোনদিন নাটক করিনি। বললেন, তোমার লগে একজন আছে সূর্য রায়— তার লগে তুমি গিয়া কামটা কইর‍্যা দাও। রক্তকরবী পড়লাম। দেখলাম, বার বার জালের কথা বলা আছে। সূর্য রায়ও একজন বড়ো আর্টিস্ট। নাটকের ক্ষেত্রে আমার মতোই। দুজনে ভবানীপুরে যারা নেট ভাড়া দেয় তাদের কাছ থেকে একটা জাল সংগ্রহ করে টাঙিয়ে দিলাম আমরা। অপরিণত বুদ্ধি যা মাথায় এসেছে সেই সময়ের কাজটা তাই করেছি। " আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই প্রযোজনাটির কোনো ছবি বা স্কেচ নেই। তাহলেও আমরা অনুমান করতে পারি যে, রক্তকরবী-র বর্ণিত রাজার জাল আর সেটা দিয়েই সারা মঞ্চ ঘিরে দেওয়া হল। আসলে রক্তকরবী-তে শুধু রাজাই তো জালে আবদ্ধ নয়, সেই জালে প্রতিটি চরিত্রই আবদ্ধ রয়েছে। এই রকমের একটা ভাবনার আভাস আমরা পেতে পারি। আমরা বলতে পারব না যে, পরিচালক ও অভিনেতারাও এই ভাবনাটাকেই আমল দিয়ে তাদের কাজটা করেছিলেন। হয়তো করেননি, তাই খালেদ চৌধুরী নিজের ভাবনাকে বলেছেন 'অপরিণত বুদ্ধি।'

যাই হোক, বহুরূপীর রক্তকরবী নিয়ে তিনি বললেন —" আমি কখনো ভাবতে পারি নি যে আমাকে জড়াবেন। আমাকে রক্তকরবী পড়তে বললেন , পড়লাম। মনে হল অনেক কিছু আছে কিন্তু ধরেও ধরতে পারলাম না। একসঙ্গে বসে পড়া হল। রিহার্সাল হচ্ছে ধাপে ধাপে। আমার মনে নানা প্রশ্ন এল— রাজা কে? নন্দিনী কে? বিশু কে? সর্দাররা আছে, গোঁসাই আছে রঞ্জন আছে— আরেকটা রঞ্জনের জন্য নন্দিনী অপেক্ষা করে থাকে। ধরাছোঁয়ার বাইরের চরিত্র অন্যরাও অপেক্ষা করে থাকে।" শম্ভু মিত্রের কাজের পদ্ধতি দিয়ে আমরা একটা total production-এর আভাস পাচ্ছি। যেখানে অভিনেতা, মঞ্চের,

নেপথ্য শিল্পীরা একসাথে নাটক পড়ছেন এবং তারপর তারা আলোচনা করে চলেছেন। খালেদ চৌধুরী আরও যোগ করেন—" শম্ভু মিত্র একদিন কাগজের মডেল বানিয়ে বললেন 'এটা রাজার ঘর, এটা অমুক'— ইত্যাদি । আমি ভাবছি এত বড় একটা স্টেজ রয়েছে, এতটা স্পেস রয়েছে, তাতে থ্রি-ডায়মেনশনাল একটা জায়গা পাচ্ছি। কী দিয়ে তাকে ভরাট করব? রাজার ঘরই বা কেমন হবে? কার্ডবোর্ডের মডেলে শম্ভু মিত্র তখন এক নম্বর, দু নম্বর করে প্রবেশ - প্রস্থানের রাস্তা চিহ্নিত করে অভিনেতাদের বোঝাচ্ছেন। যতই রিহার্সাল দেখতে লাগলাম, ততই নাটকটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কিন্তু মঞ্চের ওপরে কীভাবে সেটগুলোকে দাঁড় করাতে হয় তার কোনো জ্ঞান আমার ছিল না। শীতাংশু মুখার্জী দেখিয়ে দিলেন কীভাবে স্ট্রাকচারগুলো দাঁড় করাতে হয়। আমি ডিজাইনের কাজ শুরু করলাম। এই ডিজাইনগুলো আস্তে আস্তে অনেকটাই পালটে গেছে। প্রতিটি অংশই নির্মিত হয়েছে নির্দিষ্ট যুক্তিকে মেনে। শম্ভু মিত্র আমাকে নানা জিনিস বুঝতে সাহায্য করেছেন। যেমন, প্রথমে 'মকরমুখ'-জিনিসটা কী বুঝতাম না। পড়ে যখন 'রাজার এঁটো'-র তাৎপর্য ধরতে পারলাম, তখন 'মকরমুখ' এর একটা আর্কিটেকচারাল চেহারা নিয়ে এলাম। নাটকে যা বর্ণনা করা হচ্ছে সেটটা কিন্তু শুধু সেইটুকুই নয়। ওর একটা আর্কিটেকচারাল রূপ থাকা দরকার, একটা পিকটোরিয়াল রূপ থাকা দরকার এবং অভিনেতাদের গতির সঙ্গে একটা গতিশীলতা বজায় রাখা চাই। পিকটোরিয়ালিটি আনার জন্য আমাকে লিনিয়াল আসপেক্টগুলো দেখে নিতে হবে। অর্থাৎ কোনখানে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিকাল লাইনের ব্যবহার হবে অথবা কোথায় ত্রিভুজ আসছে কোথায় চতুর্ভুজ আসছে, কোথায় বক্ররেখা আসছে—রেখাগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে। ঠিক করে নিতে হবে কীভাবে প্রয়োজনবোধে মুড অনুযায়ী এই রেখাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। কারণ রেখার দ্বারাই তো আমাদের 'মুড'-এর বদল হয়। আমাদের মুখের অভিব্যক্তি পাল্টে যায় রেখার বদল ঘটলে। হাসি-কান্না-রাগ-মন খারাপ ইত্যাদি মানসিক অবস্থার বিভিন্নতায় রেখারাও পাল্টে যেতে থাকে। এই রেখাগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করব তাই নিয়ে ভাবতে থাকলাম।" খালেদ চৌধুরীর এই কথার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি যে, উনি মঞ্চ স্থাপত্যের অন্যান্য প্রাথমিক শর্তগুলির মধ্যে "line as expression" -কে অধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। ওই সময় নাটকের মঞ্চস্থাপত্যে পিছনের পটচিত্র ছেড়ে ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে নাটকের উপযুক্ত মঞ্চ স্থাপত্যের ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

খালেদ চৌধুরী আরও উল্লেখ করেন— " রাজার ঘরের সামনে যে জাল ছিল— প্রথমে সেটা গগন ঠাকুরের আঁকা 'রক্তকরবী' বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে অনুকরণ করে তৈরী করা হয়। পরে সেটা সম্পূর্ণ বদলে দিলাম। পরে দরজাটা ওপরে-নীচে হাঁ -হয়ে খুলে যেত আর মকর-মুখের চেহারাটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসত। 'রক্তকরবী'তে যে সমস্ত এলিমেন্ট আছে— রাজা বা নন্দিনী যে সমস্ত কথাবার্তা বলে, এই সমস্ত কিছু ওই দরজার কম্পোজিশনে ধরা আছে। সুপার-ইমপোজ করা হয়েছে। চট করে দেখলে মনে হবে গগন ঠাকুরের ছবি,

আসলে কিন্তু তা নয়। নাটকটা যত ভালো করে বুঝেছি ততই পরিবর্তনের কাজ চলছে। বেসিক কোরিওগ্রাফিকে অপরিবর্তিত রেখে বিভিন্ন সিম্বলের চেহারা পাল্টে গেছে। রূপ বদলে গেছে। দরজাটা আগে খাড়া মতন ছিল পরে ওপরটা এমনভাবে ঢালু করে দিলাম যা দেখে বাংলাদেশের কোনো কুঁড়েঘরের চেহারাটা মনে আসে। এক নজরে হয়তো এটা কিছুই কনভে করে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এটা বাংলারই নাটক। রাজার ঘরটি এমনই একটা জায়গা যেখানে নন্দিনীও বার বার আকৃষ্ট হচ্ছে আর রাজাও সেখানে নির্জনতার আড়াল ভাঙতে চাইছে। নির্জনে ঘরটি হয়ে ওঠে তার একাকিত্বের নীড়। আর তারই দ্যোতক ওই কুঁড়ে ঘর। এটা খুবই সুক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত। এছাড়াও ওতে বিভিন্ন ডিটেল আছে। তাতে বকযন্ত্র, মরাব্যাঙ এমনকি পরবর্তীকালে অ্যাটমিক এনার্জিও চলে এসেছে। যে শুধুই টিকে থাকে তাকে রাজা সহ্য করতে পারে না। মরা ব্যাঙটি দিয়ে টিকে থাকা মানুষকেই তো বোঝানো হয়। রাজা সেই 'মানুষ' -এর উর্দ্ধে যেতে চায় কিন্তু পারে না। তথাকথিত কাজের জগতে সে আটকে থাকে। কিন্তু জীবনের প্রতি সে আকৃষ্ট। নির্জন নীড় সে ভাঙতে চায়, তবু পারছে না। এই ইমেজগুলো কিন্তু নাটকের মধ্যে থেকেই আমার কাছে উঠে এল। পরে ইমেজগুলোকে আমি আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করি। এইটেই আমার নাটক দেখার বা নাটকের সেট করার সূত্র হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল।"

এই আলোচনাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি খালেদ চৌধুরী line -কে গুরুত্ব দিচ্ছেন। যেখানে, রাজার জাল প্রথমে গগন ঠাকুরের রক্তকরবী বইয়ের প্রচ্ছদ অনুকরণ করে তৈরি করলেন। তারপর ওখান থেকে সরলেন, কিন্তু রাজার জালটা সেই বইয়ের প্রচ্ছদের মতো দেখতে লাগল। জালে অনেক সিম্বল আঁকলেন, যথা বকযন্ত্র, মরা ব্যাং ইত্যাদি কিংবা রাজার জালকে গ্রামের কুঁড়েঘরের আভাস দিলেন, কিন্তু কোনো মেটিরিয়াল ব্যবহার করলেন না। সবগুলো line দিয়ে প্রকাশ করলেন। আজ ২০২০ সালে খালেদ চৌধুরী ওই রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্য করলে হয়তো শুধু রেখাতে সীমিত থাকতেন না। অনুমান করা যায় এই জালটারই হয়তো একটা ইনস্টলেশন করতেন। তার আভাস আমরা আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়ের রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্যে পাই।

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ নানা শ্রেণির মানুষ আর তার গল্প বলেছেন। এই প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরী বলেছেন— " কবি পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে যাওয়া সেটাও উনি চাইছেন না। কিন্তু আমার দরকার। আমি না জানলে এটার সমাধান পাবো না। মডেল করতে পারবো না। এই নাটকে একটা চত্বর আছে। সেই চত্বরে যারা আছে সামাজিক স্তর বিন্যাসে অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। চত্বরের ওপরের অংশ শ্বেত পাথরের, নীচের অংশ কালো পাথরের। ওপরে একমাত্র নন্দিনী যেতে পারে। রাজার ঘরের দরজার একটা অংশ ওপরে অন্য অংশটি নীচে নেমে যাচ্ছে। সেইখানে একটা কালো পাথরের চেহারা এবং তার সঙ্গে সমতা আনার জন্য অন্যদিকে এ্যাটলাস যে সমস্ত সভ্যতা কাঁধে নিয়ে রয়েছে। তার মাথায় একটা প্ল্যাটফর্ম। উচ্চতা তিনফুট। সামনে একটা ধ্বজা। তাতে একটা ছোঁ-মারা বাজপাখি

রাজার প্রতীক। চত্বরের পাথুরে চেহারার জন্য বিস্কুটের কাগজের সীট কিনে এনে জলে ভিজিয়ে কালো রঙ ঢেলে দিতেই মার্বেলের চেহারা নিল।" এই আলোচনার মধ্যেও আমরা যে মেটিরিয়ালের ব্যবহার পাচ্ছি তা দিয়ে একটা রিয়ালিস্টিক আভাস তৈরির। এখানে মেটিরিয়াল অর্থাৎ বিস্কুটের কাগজের শিট আলাদা করে কোনো অর্থ তৈরি করছে না। খালেদ চৌধুরীর এই রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্য মূলত 'রেখা' উপাদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

এবার আমরা একটু দেখে নেব শম্ভু মিত্রের রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্য সম্পর্কে ওই সময়ের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত কী বলেছেন: " বহুরূপীর দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ— রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চসজ্জা। সেই ন্যক্কারজনক ফাঁকা মঞ্চের ঢং না দেখিয়ে। তার স্থলে তাপস সেনের অত্যাশ্চর্য আলোকসম্পাতে বিকশিত খালেদ চৌধুরীর দৃশ্যসজ্জা দেখে বোঝা যায় শম্ভুবাবু রবীন্দ্রনাটক বলে আলাদা অপার্থিব ধরনের কিছু নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাট্যই হোক আর শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটকই হোক— মঞ্চে ওঠার বেলায় তাকে মঞ্চের ঠাটে মঞ্চের বিশেষ ঘরোয়াপনায় দীক্ষিত হতে হবে— কারণ, মঞ্চটা কলেজি আবৃত্তির কমনরুম নয়। কিন্তু আবার পূর্বে উল্লিখিত কারণেই খালেদ চৌধুরীর গীতধর্মী দৃশ্য পরিকল্পনার সঙ্গে স্থূল বাস্তব চরিত্রগুলির প্রতি মূহুর্তে ঘটে সংঘর্ষ, সুর যায় কেটে। ফাগুনলাল, চন্দ্রা আর নম্বর মারা শ্রমিকদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত বস্তিতে, যা প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে ল্যাম্পপোষ্টের নীচে। দৃশ্যসজ্জায় বৃহত্তর রূপকের আমেজটা নিশ্চয়ই রাখা উচিত, কিন্তু হয়তো বর্তমান জীবনের নানা পরিচিত বস্তুর অতিরঞ্জিত চিত্রণের মধ্যে দিয়ে হওয়া উচিত ছিল, অথবা চরিত্রগুলিকেই পাগড়ি আর রঙিন জোব্বা পরানো উচিত ছিল। আধুনিক রূপকে নিশ্চয়ই ঈষৎ বাঁকানো ল্যাম্পপোষ্ট, দাম্ভিক অট্টালিকার অসংখ্য ইস্পাত শলাকার বেড়াজাল, বৈচিত্র্যহীন নির্জীব খোলার ঘরের সারি এসব থেকেই নির্মিত হতে পারে এমন কাব্যময়, বিচিত্রবর্ণ দৃশ্যপট যা প্রতিদিন দেখা স্থূল বাস্তবের পরিবেশটাকে রাঙিয়ে তুলেবে, কল্পনার উদ্দামতাকে করতে সংযত, তার নানা খেয়ালের হেঁয়ালিকে দেবে এক সহজবোধ্য রূপ, জীবনের খণ্ডচিত্রের মধ্যেই আনতে মহাজীবনের সম্পূর্ণতা, আবার মহাজীবনের জটিল দর্শনকে বাঁধবে খণ্ডচিত্রের স্বল্প পরিসরে।" উৎপল দত্তের ভাবনায় ল্যাম্পপোস্ট, ইস্পাত শলাকার বেড়াজাল, বস্তি, অট্টালিকার ইমেজের মধ্যে দিয়ে একেবারে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রক্তকরবী-কে দেখতে চেয়েছিলেন; অর্থাৎ তাঁর মঞ্চস্থাপত্যের ভাবনায় লাইনের বদলে মেটিরিয়াল অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

আর এক জায়গাতে উৎপল দত্ত বলছেন- 'অন্যপক্ষে য়ুরোপীয় মঞ্চের প্রোসিনিয়ামের অভ্যন্তর ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শম্ভু মিত্র। ক্রেগের মতে রং, রেখা ও ছন্দের ঐকতান সৃষ্টি হবে প্রকৃত অভিনয়ে। দৃশ্যপটের যেমন রং আছে। তেমন রেখাও আছে। এ সবটা এক সুরে, এক রং-এ এক রেখায় , এক ছন্দে গাঁথবেন পরিচালক। এটাই আধুনিক য়ুরোপীয় থিয়েটারের প্রধান তত্ত্ব। শম্ভুবাবু দৃঢ় পদে এদিকে পা বাড়িয়েছেন 'রক্তকরবী'তে। যথা যক্ষপুরীর স্বর্ণজঠর

থেকে নির্গত শ্রমিকের মিছিলের দৃশ্যটি। এই রং-রেখা-ছন্দ সমন্বয়ের এক অপূর্ব নিদর্শন এই দৃশ্যটি। প্রতি অভিনেতার চলনভঙ্গি নন্দিনীর আর্তনাদ, লাল আলোর চমক , নেপথ্যে কর্কশ ধাতব ধ্বনি— সব মিলে একটা নতুন ভাব নতুন রকমের সৃষ্টি।” উৎপল দত্তের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা পাচ্ছি, নাটকের মঞ্চস্থাপত্যে রেখার আধিক্য এবং সেটি গীতধর্মী; অর্থাৎ কিনা রেখাগুলির ব্যবহার একটি সুন্দর ছন্দ বা সংগীতের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। যা স্বাধীনতা সময়কালে বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে পথিকৃৎ হয়ে আছে।

বহুরূপীর রক্তকরবী-র পর খালেদ চৌধুরী ১৯৮৪ সালে তৃপ্তি মিত্রের পরিচালনায় আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়ের প্রযোজনায় রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণ করেন। এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে বলতে গিয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছিলেন- “ তখন নার্সিং হোম থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছি। তৃপ্তি মিত্র আমাকে গিয়ে বললেন, ছাত্ররা বলছে ‘রক্তকরবী’ নাটক এবার অভিনয় করবে। তাই মঞ্চের ব্যাপারে তাঁর ভাবনা সম্পর্কে তিনি বললেন, “ যদি একটা খুব সিম্পল দরজা করা যায়।’ যেই দরজা বললেন , আমি বললাম — আপনি নাট্যবিদ্যালয় বলছেন তো, ছেলেদের দিয়ে করাবেন, তা আপনি দরজা করতে চাইছেন কেন! আপনার রাখার জায়গা আছে? বললেন , ‘না টাকা পয়সা নেই।’ আমি বললাম টাকা পয়সা নেই। রাখার জায়গা নেই তাহলে আপনি বড়ো সেট করে কি করবেন? তার চেয়ে বরং উপযোগী আপনি জিনিসটা করুন, যাতে বগলে করে নিয়ে যাওয়া যায়, অতি অল্প খরচায় করা যায়। অর্থাৎ আপনার নাটকের নাটকীয়তাও হবে বরং তাতে নাটকের ওপর জোরটা বেশী পড়বে।”

আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ের রক্তকরবী-র মঞ্চস্থাপত্য ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। এক্ষেত্রে বোধ করি দুটি বিষয় কাজ করেছিল। এক, আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতি একেবারেই ছিল না। দুই, আগের রক্তকরবী-র যে বাহুল্য ছিল তা তিনি বাদ দিতে চেয়েছিলেন। মঞ্চের দুইদিকে দুইটি অল্প উচ্চতার ছোট আকারের প্লেটফর্ম এবং মঞ্চের মাঝখানেও ছোটো আকারের প্ল্যাটফর্ম । তার ওপর একটি কালো পরদা, যাতে রক্তকরবী নাটকের সমস্ত কিছুই আঁকা আছে যখন নন্দিনী কড়া নাড়ত তখন বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ করা হত, আসলে দরজাটা পরদার তৈরি ছিল বলেই। রাজা শেষে যখন বেরিয়ে আসতেন তখন পরদা একেবারে সরিয়ে দেওয়া হত।

এই প্রসঙ্গে খালেদ চৌধুরীর ভাবনার সঙ্গে তৃপ্তি মিত্রের প্রয়োগ- পরিকল্পনার তফাত দেখা গিয়েছিল, যার উল্লেখ আমরা দেবাশিস রায়চৌধুরীর লেখাতে পাচ্ছি। উনি লিখেছেন—“ খালেদ চৌধুরী চেয়েছিলেন পর্দার দরজাটা থাকবে, মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে রাজা বেরিয়ে আসবে। শ্রীমতী মিত্র অবশ্য একটা প্রয়োগীয় কারণ দেখিয়েছেন। তা হল সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে, ফলে পর্দাটা নড়ে যেতে পারে, দৌড়াদৌড়ি হচ্ছিল অন্ধকারে। উত্তরে শ্রী চৌধুরী বলেছিলেন, অন্ধকার না করে মঞ্চে যে অল্প আলো আছে, সেই আলোতে দরজাটা সরলে রাজাকে অনেক বড়ো মনে হবে। আসলে অন্ধকারে দরজা সরে যাওয়া ম্যাজিক মনে হচ্ছিল, এর দরকার ছিল না। মঞ্চ ভাবনায় এইখানেই শ্রীমতী মিত্রের সঙ্গে

তাঁর পার্থক্য হয়েছিল। তবুও আরব্ধর প্রযোজনা রক্তকরবী'র মঞ্চ নির্মিত আর নির্দেশনা গরিমা অর্জন করেছিল।" এইখানেই আমরা অন্য-এক খালেদ চৌধুরীকে দেখতে পারছি, যিনি আর শুধু রং-রেখা -ছন্দ দিয়ে শুধু একটা রিয়ালিস্টিক অ্যাপ্রোচের মঞ্চ স্থাপত্য করতে চাইছেন না। প্রসেনিয়াম মঞ্চের যে মঞ্চমায়া, তাকে ভেঙে এক অন্য সত্যের দিকে যেতে চাইছেন। তাই রাজার দরজা খুলে বেরোবার দৃশ্যটি উনি আলোয় করতে চাইছেন। অন্ধকারে দরজা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মঞ্চমায়া বা ম্যাজিক দেখাতে চাইছেন না কিংবা অনুধাবন করেছেন, এতে রবীন্দ্রনাথকে সময়ের দাবিতে প্রকাশ করা যাবে না।

এরপর খালেদ চৌধুরী ১৯৫৫ সালে বহুরূপী -প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের স্বর্গীয় প্রহসন নাটকে মঞ্চ, পোশাক, সংগীত ও রূপসজ্জার কাজ করেছিলেন। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছিলেন অমর গাঙ্গুলী। এই নাটকে মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে খালেদ চৌধুরী বলেছিলেন— "প্রথমে মনে হয়েছিল এটা তো স্বর্গ, কাজেই জিনিসটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত মঞ্চটাকে কালো করে দেওয়া হল। চারপাশ কালো। মেঝেটাও কালো। ফলে যারাই আসছে মনে হচ্ছে ভাসছে। কোনো জিনিস দাঁড়াচ্ছে না। মাঝখানে একটা লাল সিংহাসন। কয়েক ধাপ উঠে। পোশাকটার ডিজাইন আমি করেছিলাম; আমাদের কালীঘাটের যে পুতুলগুলো আছে, বেনেবউ পুতুল; এই বেনেবউ পুতুলের যে ডিজাইনটি , স্বর্গীয় প্রহসন-এর প্রতিটি চরিত্রের ডিজাইন কিন্তু তাই। ওইটাকে আমি মডেল করে নিয়েছিলাম। চট দিয়ে ডিজাইন করলাম।"

শোনা যায়, রবারের পাইপের ভিতরে মোটা তার ঢুকিয়ে রবারটাকে রং করে তাকে মেঘের আকৃতি দিয়েছিলেন। যেন আকশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কালো সুতো দিয়ে ঝোলানোর জন্য পুরো জিনিসটা একটা অদ্ভূত, মজাদার ও রহস্যময় চেহারা নিয়েছিল। এর সাথে ধোঁয়া ও স্বর্গীয় শব্দ সহযোগে এই মজাদার রহস্যময়তা প্রকাশ পেয়েছিল। এই নাটকে সংগীতেও খালেদ চৌধুরী নানা রকমের উদ্ভাবনী প্রয়োগ করেছিলেন। নাটকের একটি দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— " সুরসভার মধ্যে মনসার ও শীতলার গ্রাম্য ভাষায় তুমুল কলহ।" এই কলহ চাঁদকে নিয়ে শুরু হয়। সেটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যেটা আর ভাষায় বলা যাচ্ছে না। এই বিষয়টি বাচ্চাদের একরকম খেলার বাঁশি যেটা কুঁই কুঁই শব্দ করে হুঁকোর কলকে দিয়ে বিকট আওয়াজ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি ওই ঝগড়ার দৃশ্যটির পরিবেশ রচনা করেছিলেন।

স্বাধীনতা- উত্তর সময়কালে আমাদের মনে যে ডাকঘর প্রযোজনাটি রেখাপাত করে সেটি তৃপ্তি মিত্র- পরিচালিত ও বহুরূপী - প্রযোজিত। ১৯৫৭ সালে এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয়। এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে দেবাশিস রায়চৌধুরী তার খালেদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারভিত্তিক বইয়ে লিখেছেন —" তাঁর প্রথমেই মনে হল নাটকের সংলাপের মধ্যে এত সংগীত, বাইরের সংগীত সেখানে বাহুল্য মনে হবে। অমল অনেক কথা বলছে যা সে নিজে দেখতে পাচ্ছে না, তার এই না দেখার দৃশ্য যদি দর্শককে দেখানো যায়। সেটে

ত্রিকোণাকার একটি কুঁড়েঘরের মতো রাখা হল, চালের আদলটা দেওয়া হল এবং দেওয়ালটা উঁচু নীচু করে করা হল। অর্থাৎ দেওয়ালের সামনের সঙ্গে ভিতরের উচ্চতার পার্থক্য রাখা হল। ঘরটিকে ওপেক রাখা হল। তার পাশেই ফুল এবং তার পাশে বাঁশের সাঁকো, সুধা নাচতে নাচতে আসে সেই সাঁকো দিয়ে। সাঁকোর পাশে চট দিয়ে বানানো দুটো বড়ো গাছ এবং দূরে কিছু তাল গাছ। পিছনে একটা পাহাড়ের আদল দেওয়া হল। ... যখন অমল মারা যায়, তখন বলে এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। তখন, সেই যে ওপেক দেওয়াল ছিল অস্বচ্ছ দেওয়াল, হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়। এবং অমল যখন বলত, এই তো আমি আকাশ দেখতে পাচ্ছি, তখন শুধুমাত্র তার উপরে একটা স্পট পড়ছে, বাকি সবাই ছায়ার মধ্যে আছে। আর সমস্ত কিছু যেন ভাসছে, শূন্যে ভাসছে। এইরকম একটা অনুভূতি হত।" খালেদ চৌধুরীর মনে হয়েছিল, নাটকে প্রত্যেক চরিত্র বাস্তব হওয়া সত্বেও সবাই কাব্যিক। অমল যে তারা আর আকাশ দেখতে পাচ্ছে তা যেন দর্শকও দেখতে পায়। প্রাথমিক এই গোটা মঞ্চকে তিনটি স্পেসে ভাগ করেছেন। এক, অমলের ঘর। দুই, অমল যে স্পেসের কথা বলে কিন্তু দেখতে পায়না, দর্শক অমলের সেই কল্পনার স্পেসটি দেখতে পায় । তিন,অমলের মৃত্যুশয্যাতে সে যখন বলছে দেখতে পাচ্ছি তখন অমলের ঘরের অস্বচ্ছ দেওয়াল হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যাওয়াতে অমলের ঘর, ঘরের ভিতর ও অমলের কল্পনার স্পেস মিলেমিশে একাকার হয়ে আর-একটি অন্য স্পেসের সৃষ্টি হয়। সেটা দর্শকের মনের মধ্যে তৈরিও হয় এবং অমলরূপী ছোট্টো শাঁওলী মিত্রের অভিনয় ও নাটকের মঞ্চস্থাপত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফলে রবীন্দ্রপণ্ডিতদের অভিমত—ডাকঘর যেন পড়বার জন্যই লেখা, অভিনয়ের জন্য নয়— এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ভাষণে পরিণত হয়।

এরপর আমরা পাই বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় বিসর্জন নাটকের প্রযোজনা। ১৯৮৪ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটকের প্রযোজনা করেন। নাটকটি দর্শক ও সমালোচকদের কাছে একেবারেই গ্রহণীয় হয়নি। তবুও এই প্রযোজনায় বিসর্জন-কে এক নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী লিখছেন— " আমি মনে করি একজন শিল্পী বা শিল্পী গোষ্ঠীর কাজই হচ্ছে নিজেকে একই ধারা বা বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেই সীমাটাকে বাড়িয়ে তোলা ।... আমরা বিশেষ করে পরীক্ষামূলক নাট্যগোষ্ঠীগুলো— আমরা তো ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থিয়েটার করি না। আমরা থিয়েটারের মাধ্যমে কিছু বলতে চাই এবং যে মাধ্যমটা অবলম্বন করে সেটা বলতে চাই, সেই মাধ্যমটাকেও সমৃদ্ধ করে তোলাটা আমাদের একটা কাজ বলে মনে করি। " ফলত, পরিচালকের কথার মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, তিনি নাটক প্রযোজনা করার সময় বিষয়বস্তু ও শৈলীতে জোর দিতে চান এবং প্রতিবারই নতুন বিষয়বস্তু ও শৈলীতে কাজ করতে উৎসাহিত বোধ করেন। এর ফলে একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। কিন্তু তিনি এই গ্রুপে থিয়েটারি আদর্শের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নতুন শৈলীর সন্ধান করতে চান। বাজারকে তিনি অস্বীকার করছেন।

বিভাস চক্রবর্তী তার নাটক বিসর্জন -এর নাট্যপাঠ প্রস্তুত করেছেন তিনটি রবীন্দ্রনাটককে নিয়ে, যথা— Sacrifice, বিসর্জন এবং রাজর্ষি। তিনটি নাটকের ধরন তিনরকম। এই তিনটিকে মিলিয়ে নাম হল বিসর্জন। কেন এই নামকরণ সেই বিষয়ে বিভাস চক্রবর্তী বলেন— " আমরা 'রাজর্ষি' এবং 'স্যাক্রিফাইস' থেকে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচার, যেটা মাথায় ছিল এবং যেটা অনুসরণ করেছি, সেটা 'বিসর্জন'।" এই প্রযোজনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তিনি লিখেছেন — "ধর্ম কেন, কেন তার বিভিন্ন, rituals জীব বলি যার একটি প্রধান অঙ্গ— তার সঙ্গত ব্যাখ্যা রঘুপতির কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু যুক্তি সে দেয়; কিন্তু তা আধুনিক মানুষের যুক্তিবোধকে ছুঁয়ে যায় না। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, যাকে বলা যায় religious bureaucracy অর্থাৎ সে মনে করে, যে ধর্ম থেকে সে তার শক্তি পেয়েছে এবং এই ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত আছে। ধর্মের মূল কথা কী, কেন এই আচার-বিচার , কেন ধর্মের সৃষ্টি কী সে রক্ষা করছে—এগুলোর থেকে তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায় সেই ধর্ম , যা তাকে ক্ষমতা দিয়েছে, সেটা রক্ষা করা। তাই আমরা 'বিসর্জন' - এ দেখি রঘুপতি নিজেকে দেবতার প্রতিভূ ভেবেই ধরে নিয়েছে যে, সে যা বলবে, সেটা দেবতারই মুখনিঃসৃত বাণী, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে বিধিসম্মত। ধর্মীয় তত্ত্ব— যা প্রচার করার জন্যে সে জন্মেছে বলে মনে করে— তার চেয়েও সে এইখানে নিজে বড় হয়ে দাঁড়ায়। " পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর কথায়, এই নাটকটিকে পূর্ববর্তী কোনো পরিচালকই দর্শকদের মনোগ্রাহী করে তুলতে পারেনি। তার মূল কারণ এই নাটকের কাব্য। তিনি লিখছেন— " নাটকের মধ্যে এমনকিছু রয়েছে যা থিয়েটারের ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এক এক সময়ে মনে হয়েছে, নাটকটার কাব্যই কি এর জন্য দায়ী? মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না গিয়ে তার কাব্যিক সংলাপটা গদ্যনাট্যে পরিবেশন করেন। ওঁর বিশ্বাস ছিল, গদ্যে হয়তো এই সংলাপের তীক্ষ্মতাটা বাড়বে, নাটকীয় সংঘর্ষগুলো বেশ জমে উঠবে এবং লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন— "পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কালী মন্দিরটা মঞ্চের কোথায় রাখবেন? যদি কালী মূর্তি তথা মন্দিরটি মঞ্চের পেছনে অর্থাৎ আপ স্টেজে রাখেন তাহলে অধিকাংশ সময়ই সব অভিনেতা ব্যাক টু দ্যা অডিয়েন্স হয়ে যাবে। কারণ এই পাঠকের বহু দৃশ্য আছে মন্দিরে কালী মায়ের সাথে চরিত্রেরা কথা বলছে। তাহলে উপায় মঞ্চের ডান বা বাঁ দিকে রাখা।" বিভাসবাবুর কথায়, "অদ্যাবধি যত 'বিসর্জন' হয়েছে তাতে কালী মন্দিরকে মঞ্চের ডান বা বাঁ দিকে রাখা হয়েছে। এখানেও অভিনেতা প্রোফাইল । আমরা তাদের ফ্রন্ট পাচ্ছি না। " এই ভাবনা থেকে উনি কালীমন্দিরকে কল্পনা করলেন দর্শকদের দিকে বা দর্শকের মধ্যে। মঞ্চের সেন্টার ডাউনে একটি ছোটো প্লাটফর্ম ব্যবহার করলেন, যাকে মনে করা হল মন্দিরের বেদি। ফলত, অভিনেতারা মা কালীর দিকে তাকিয়ে কথা বললেই সেটা দর্শকদের দিকে তাকানো হয়। এইভাবে অভিনেতারা কখনোই 'ব্যাক টু দ্যা অডিয়েন্স' বা 'প্রোফাইল'

হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হল। বিভাস চক্রবর্তী গোটা মঞ্চটাই ফাঁকা রেখেছিলেন। শুধু ওই ছোট্টো প্লাটফর্মটি ছাড়া আর সেভাবে কিছুই ছিল না। শুধু প্রয়োজন অনুসারে কিছু মঞ্চ-উপকরণ আসত, আবার চলে যেত। এই পরিকল্পনাতে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর শিল্পীমন পুরোপুরি সায় দিচ্ছিল না। উনি কিছু একটা খুঁজছিলেন। তাই তিনি এই সময় খালেদ চৌধুরীর শরণাপন্ন হন।

এই প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন— "খালেদদাকে প্রথম কাছ থেকে দেখি ঊনিশশো চুরাশিতে। আমরা তখন 'বিসর্জন' করছি। বা বলা ভালো, বিসর্জন নিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষায় মত্ত হয়েছি। প্রযোজনা প্রস্তুতি যখন শেষ পর্বে, একদিন সকালে একাডেমিতে স্টেজ রিহার্সালে খালেদদা এলেন নির্দেশক বিভাসের আমন্ত্রণে। তখন উনি খুব অসুস্থ। রিহার্সাল দেখে শুধু বলে গেলেন পশ্চাদ মঞ্চে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বা তিনটি পর্দা ঝুলিয়ে দিতে— তিন রঙের তিনটি পর্দা — তিনটি বিশাল থামের মতো — যাতে বিসর্জন নাটকের তিনটি মূল সত্যের প্রতীক আঁকা থাকবে। তাই করা হয়েছিল। আমাদের প্রযোজনাটি , তার নানা ইন্টারেস্টিং নিরীক্ষা সত্ত্বেও তেমন উতরোয়নি। কিন্তু ওই প্রযোজনার যে দু-একটি ব্যাপার দারুণ হয়েছিল তার মধ্যে একটি ওই তিনটি পর্দা। যাকে বলে মাস্টারলি স্ট্রোক। গোটা মঞ্চসজ্জা ওই শেষ মুহূর্তের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়েছিল, ভাষা পেয়েছিল। হাতে কলমে বুঝেছিলাম, কতো বড়ো শিল্পী তিনি, কী বিরাট ও বিচিত্র তাঁর কল্পনা।"

অশোক মুখোপাধ্যায়ের এই লেখা থেকে আমরা এই প্রযোজনার একটা পরিস্কার মঞ্চস্থাপত্যের চিত্র পাই। বিভাস চক্রবর্তী শুধু হরাইজন্টাল স্পেসটাকেই দেখছিলেন। ওঁর ভাবনাতে ভার্টিক্যাল স্পেসের কোনো প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। খালেদ চৌধুরী এই অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করে দিলেন, যা কিনা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। খালেদ চৌধুরী শুধু রেখাই নয়, রং ও যোগ করেছিলেন। আর এখানেই বিসর্জন -এর মঞ্চ স্থাপত্য অসামান্য হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রযোজনার শেষ দিক অর্থাৎ শারদোৎসব থেকে মঞ্চস্থাপত্যে যে নতুন ধারা উনি আনলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাই স্বতঃসিদ্ধ বলে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা ধরে নিয়েছিলেন। ফলত নিরাভরণ মঞ্চে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ও গাঢ় নীল পরদার সামনে রবীন্দ্রনাটক অভিনয় করাটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এসে বহুরূপীর রক্তকরবী এই নীল পরদা বা নিরাভরণ মঞ্চস্থাপত্য থেকে নাটকের প্রয়োজন ও পরিচালকের নাট্যপাঠ অনুসারে মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণ করে নাটক করা হল। যে নাটকটি আবার দর্শকসাধারণের ও সমালোচকদের দ্বারা সমাদৃতও হয়েছিল। অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাটক শুধুই পাঠযোগ্য অভিনয়যোগ্য নয়" — এই মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করল বহুরূপীর রক্তকরবী। এই প্রথম রবীন্দ্রনাটককে সাধারণ দর্শক গ্রহণ করল। এই প্রযোজনায় যে মঞ্চস্থাপত্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল তাঁর আলোচনা আমরা আগেই করেছি। আজাদ পত্রিকা ২১ মার্চ, ১৯৫৭ তারিখে লিখেছে—"অভিনয়ের তুলনায় মঞ্চকৌশলে অধিক দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে, মঞ্চ পরিচালনা

ও আলোকসজ্জাতে যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্চে রূপায়িত যক্ষপুরীর পরিবেশ এদেশের মঞ্চের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন।" এই আলোচনাতে অভিনয়ের থেকেও মঞ্চস্থাপত্য ও আলোর প্রশংসা করা হয়েছে বেশি এবং এই মঞ্চ স্থাপত্যকে সম্পূর্ণ নতুন বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে এই নাটকে রং, রেখা ও ছন্দের এক অপূর্ব ঐকতান সৃষ্টি হয়েছিল। তার সাথে মিলে গিয়েছিল অভিনয়। ফলে এক টোটাল থিয়েটার আমাদের সামনে ভেসে উঠেছিল। বহুরূপীর রক্তকরবী-র এই অসামান্য উপস্থাপনার প্রেক্ষাপট আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল। এই বিষয়ে গণনাট্য সংঘের অবদান অনস্বীকার্য। গণনাট্য সংঘের নবান্ন ভারতীয় থিয়েটারের মঞ্চস্থাপত্যের এক নতুন তথা আধুনিক অধ্যায় রচনা করে। এই নাটকেই ক্লান্তিকর পটচিত্রের বদলে নাটকের প্রয়োজন অনুসারে বাস্তবসম্মত মঞ্চস্থাপত্য গড়ে উঠল, এককথায়, প্রসেনিয়াম মঞ্চ থ্রি-ডাইমেনশনাল হয়ে উঠল। এরপর গণনাট্য কর্তৃক একটি রক্তকরবী প্রযোজনা হয় যাতে খালেদ চৌধুরী মঞ্চপরিকল্পক ছিলেন। সেখানে তিনি জাল কিনে এনে টাঙিয়ে দিয়েছিলেন, রাজার জাল দেখাবার জন্য। সেটা যে খুব অসাধারণ কিছু হয়েছিল, এমনটা আমরা জানি না। তবে নতুন কিছু করবার একটা ঝোঁক ছিল।

স্বর্গীয় প্রহসন-এর নিরাভরণ মঞ্চকে তিনি সম্পূর্ণ কালো রংয়ে মুড়ে রংবেরংয়ের চরিত্রদের শূন্যে ভাসিয়ে সামান্য রবারের পাইপের মধ্যে দিয়ে আকাশের মেঘকে প্রকাশ করেছিলেন। এর সাথে নানা বিচিত্র শব্দের সমাহারের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্খিত প্রহসন অসাধারণরূপে প্রকাশ পেয়েছিল বলে আমরা অনুমান করতে পারি। ভাবতে অবাক লাগে, আজকের দিনের scenography-র concept -এ কাজ। ১৯৯৫ সালে খালেদ চৌধুরী করেছেন, যেখানে মঞ্চ, পোশাক, রূপসজ্জা ও সংগীতের সমন্বয়ে এক নাটকীয় সামগ্রিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

এরপর বহুরূপীর ডাকঘর প্রযোজনায় খালেদ চৌধুরী অমলের ঘরটিকে একটি ত্রিকোণাকার কুঁড়েঘরের রূপ দিয়েছিলেন স্টেজের একপাশে। শেষ দৃশ্যে অমলের ঘরটি আর ওপেক থাকে না, যার ফলে কতগুলো রেখায় ঘরটি প্রকাশ পায় এবং অমলের দেখা না দেখা দৃশ্যগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানেও রেখা আর রং প্রাধান্য পেয়েছিল। সর্বোপরি, অভিনয় ও মঞ্চস্থাপত্য মিলেমিশে এক টোটাল থিয়েটার হয়ে ওঠে।

এর পরবর্তী নাটক আবার রক্তকরবী। খালেদ চৌধুরী এবারে নিরাভরণ মঞ্চের পিছনে একটি কালো পরদায় রক্তকরবী-র সারবস্তু এঁকে দিলেন। এখানে মঞ্চ স্থাপত্যে একটি সিম্বলিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা আছে। বলা বাহুল্য, এখানেও রেখা ও রং আমরা পাচ্ছি। পরিচালক তৃপ্তি মিত্র এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে ১৯৮৬ সালে লেখা এক চিঠিতে স্মরণ করেছেন— " আমার সামর্থ্য চাহিদা সব মন দিয়ে শুনে কি সামান্য কয়েকটা জিনিস দিয়ে কি সাধারণ আওয়াজ কি অসামান্য মঞ্চসজ্জাই না করেছিলেন।"

যাই হোক, এরপর আমরা দেখি থিয়েটার ওয়ার্কশপের বিসর্জন, যেখানে পরিচালক

নাটকের একটি অসাধারণ ভাবনায় ব্যবহার করেছিলেন। কালীঠাকুর এবং মন্দিরের ভেতরের ও বাইরের দৃশ্য নাটকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই কালীমন্দির কোথায় হবে এটা নিয়ে পরিচালক চিন্তিত থাকেন। পাশে বা পিছনে রাখলে অভিনেতা দর্শকের থেকে আড়াল হয়ে যায়। বিভাস চক্রবর্তী মা কালীকে না দেখিয়ে দর্শকদের দিকে কল্পনা করলেন। ফলে এক ঝটকায় সব সমস্যার সমাধান হল, এবং এইভাবে দর্শকের দিকের স্পেসকে নাটকের মধ্যে নিয়ে নেওয়া ব্যাপারটাও বোধহয় এই প্রথম হল। আর অসাধারণ ছিল পেছনের দিকের তিনটি পরদা। যাদের দূর থেকে থামের মতো লাগত। এই নাটকের কিছু বিষয়কে সাংকেতিকভাবে এঁকে দেওয়া হল। ফলে গোটা মঞ্চস্থাপত্যে একটা সিম্বলিক রূপ এসে গেল। এর সাথে ওই তিনটে পরদার মধ্যে দিয়ে ভার্টিকাল স্পেসের ব্যবহার ও বিসর্জন নাটকের বিষয়ের বিশালতা নিরাভরণ মঞ্চে অসাধারণভাবে প্রকাশ পেল। এখানেও রেখা আর রং আধিপত্য বিস্তার করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই সময়ে অন্যান্য নাটকেও এই রেখা আর রংয়ের প্রাধান্যই আমরা পাচ্ছি। এখনও মেটিরিয়াল আলাদা করে আমাদের কাছে কোনো অর্থ নিয়ে আসছে না।

বহুরূপীর স্বর্গীয় প্রহসন, আরব্ধর রক্তকরবী এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপের বিসর্জন নিরাভরণ মঞ্চের শূন্যতা একটা ফর্ম সৃষ্টি করেছে। সেটা বহুরূপীর রক্তকরবী-র pictorial illustration -এ অনুপস্থিত। এই যে সময়ের সাথে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চভাবনায় খালেদ চৌধুরীর ক্রমপরিবর্তন, এটাতে তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনার ('রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) প্রভাব আছে কি না তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

খালেদ চৌধুরী যে কত বড়ো মাপের শিক্ষক ছিলেন তা প্রকাশ পায় নাট্য পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর কথায়: " প্রথম বছর আমি প্রায় প্রতিটি শিবিরে উপস্থিত ছিলাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে আমরা শুনতাম মানবসভ্যতায় দৃশ্যকলার আবির্ভাব। নাটকের আত্মাকে আবিষ্কার করে মূল ভাবনার সঙ্গে আর্থিক সংগতির ব্যবহার, সেটা কীভাবে কোথায় রাখা হবে, কোথায় নাটক মঞ্চস্থ হবে এতগুলো দিক ভেবে একটা পরিপূর্ণ মঞ্চ আমরা অনেকেই ভাবতে শিখিনি। সেটের সঙ্গে তার রঙ, পোশাকের রঙ, আলো সব ভাবেন একই সঙ্গে। একাধারে শিল্পের বৈজ্ঞানিক , নান্দনিক দিক আবার অন্যদিকে আর্থিক, সাংগঠনিক চিন্তা খালেদদার মতো মানুষের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতা।" ১৯৫৪ সালের বহুরূপীর রক্তকরবী থেকে শুরু করে ২০০৫ অবধি খালেদ চৌধুরী ৯২টি নাটকের মঞ্চ, সংগীত, পোশাক ও রূপসজ্জার কাজ করেছেন। শিল্প ও জীবন সম্পর্কে ২৩টি প্রবন্ধ ও দুটি বই রচনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধ ও বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। তিনি সংগীত নাটক একাডেমী (দিল্লি) পুরস্কার, কালিদাস একাদেমি (মধ্যপ্রদেশ) প্রদত্ত- কালিদাস সম্মান, রবীন্দ্রভারতী ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধি লাভ করেছেন। এছাড়াও ভারতের নানা নাট্যগোষ্ঠী তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। এতসব কিন্তু খালেদ চৌধুরীকে তাঁর কাজ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। সারাজীবন মানুষের প্রতি প্রেম আর শিল্পের

প্রতি ভালোবাসা নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করেছেন নির্লোভ, নীরব ও নির্লিপ্ত থেকে। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় প্রতিটি কাজেই প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চভাবনায় এক নতুন দিগ্‌দর্শনের সন্ধান দিয়ে গেছেন খালেদ চৌধুরী।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বসু, সুদেষ্ণা, খালেদদা, একুশে সংসদ, ২০০০
রায়চৌধুরী, দেবাশিস, খালেদ চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাদেমি, ২০০৪
চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫
দে, সন্ধ্যা, অন্য ধারার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, ১৪১৪
মিত্র, শম্ভু, অভিনয় নাটক মঞ্চ, সপ্তর্ষি, ২০০৯
বসু, সৌমিত্র, রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অন্য ভাবনায়, রত্নাবলী, ২০১৩
বসু, সৌমিত্র, থিয়েটারের কাছে, সম্পাদনাঃ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলাভৃৎ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
চক্রবর্তী, বিভাস, থিয়েটার যা দেখা তা নিয়ে লেখা, প্রতিভাস, ২০১৫
দত্ত, উৎপল, গদ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১১৯৮

সহায়ক পত্র পত্রিকা

এপিক থিয়েটার, সম্পাদক: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাউণ্ডেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার স্টাডিজ ১৯৯৮
পশ্চিমবঙ্গ: রক্তকরবী সংখ্যা, প্রধান সম্পাদক: সুখেন দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫
নাট্যপত্র স্যাস, সম্পাদক: সত্য ভাদুড়ি, ১৯৯৭
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা- ৫, সম্পাদক, নৃপেন্দ্র সাহা, ১৯৯৯
সায়ক বক্তৃতামালা/১, সম্পাদক: মেঘনাদ ভট্টাচার্য, ১৯৯৫

লেখক : শান্তনু দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক।

বাদল সরকার এবং থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব

শুভংকর ঘোষ রায়চৌধুরী

১

- নমস্কার। আমি শুভংকর, গতদিন যোগাযোগ করেছিলাম আপনাকে। বাদল সরকারের থিয়েটার বিষয়ে কিছু আলোচনার ব্যাপারে .....

- বলো। তুমি বাদলদা'র নাটক নিয়ে কাজ করছ, না?

- হ্যাঁ। ঠিক নাটক নিয়ে নয়। উনার থিয়েটারের যে ধারণা,সে নিয়ে। আমার কাজের নিরিখে বাদল বাবুর থার্ড থিয়েটার বিষয়ে যে ধারণা, সেটাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করতে পারা খুব প্রয়োজন। আমার তো সেভাবে সামনে থেকে উনার কাজ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তাই, আপনারা যারা ওঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, ঘনিষ্ঠ থেকেছেন, যদি কিছুটা সাহায্য করেন.....

- খুবই ভালো। বাদলদা'কে সেই সম্মান আর দেওয়া হল কোথায়! তোমরা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ওঁকে নিয়ে ভাবছ, এটাই খুব ভালো। বলো তোমার প্রশ্ন কী, শুনি।

- আমার প্রাথমিক জিজ্ঞাসা এটুকুই যে, বাদল বাবুকে আমরা তাঁর 'থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই লিখতে দেখি প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটার সম্বন্ধে, এবং কিভাবে তৃতীয় থিয়েটার তাঁর চোখে এক ধরনের 'থিয়েটার অফ সিন্থেসিস' হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারের মধ্যবর্তী একটা মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

- ঠিক।

- কিন্তু পরবর্তীতে এই ধারণা থেকে অনেকটাই সরে আসেন উনি, এবং নানা জায়গায় নানাভাবে এই থিয়েটারকে ব্যাখ্যা করেন। শেষ অব্দি কোনও একটা সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা কিন্তু সেভাবে উঠে আসেনা আমার কাছে। তাই জানতে চাইছি, ব্যক্তিগত ভাবে উনার সঙ্গে কাজ করার সূত্রে আপনি 'থার্ড থিয়েটার'কে কিভাবে দেখেছেন?

-বাদলদা'র থার্ড থিয়েটার কিন্তু খুব আলাদা একটা ধরণ। মানে ফার্স্ট থিয়েটার বলতে যে যাত্রাপালা, কি অন্যান্য লোকনাট্য, তা কিন্তু নয়। বুঝতে হবে।

- ঠিক।

- আবার সেকেন্ড থিয়েটারে আমরা যে এই কলকাতার মঞ্চ নাটকের লারেলাপ্পা, বেলেল্লাপনা, কমার্শিয়াল কাজ বুঝি.... তা'ও নয় বাদল দা'র থিয়েটার।

- হ্যাঁ, কিন্তু শম্ভু মিত্র বা উৎপল বাবুর নাটককে লারেলাপ্পা বলা হয়তো ......

- আরে বাদলদা'র সমকক্ষ কি হতে পেরেছেন? পারেন নি তো। এইভাবে একটা ভাষা তৈরি করা.....
- বেশ।

- কাজেই থার্ড থিয়েটার এর কোনওটাই নয়।

- থার্ড থিয়েটার.... আলাদা।
- ... আলাদা?
আচ্ছা, তাহলে থার্ড থিয়েটারকে কিভাবে ডিফাইন করব আমরা?

- একদম আলাদা।

- হ্যাঁ,আমিও একমত। মানে, আমি 'আলাদা'রই একটা স্পষ্ট ধারণা চাইছি।

- বাদলদা ... বলতে পারো, ভিশনারি।

- হুম।

- চোখের নিমেষে কখন যে থিয়েটার এনে ফেলবেন! এটাই তো মজা থার্ড থিয়েটারের।

- আচ্ছা,তাহলে বলা যায় যে এই বিশেষ আঙ্গিক, এই যে কোনোরকম ফর্মাল ধ্যানধারণা না মেনেই থিয়েটারের গড়ন, এটাই থার্ড থিয়েটার?
- না, না, সেটা কী করে বলছ? থার্ড থিয়েটার একদমই আঙ্গিক - সর্বস্ব নয়। আমাদের দর্শনকে ছাড়া কিচ্ছু হবে না।

- তাহলে থার্ড থিয়েটারের দর্শনকে কিভাবে দেখব?

- এই থিয়েটারের দর্শন একেবারে ... আলাদা।

- 'আলাদা' বলতে?

- এই যে যেমন মানুষকে প্রপ হিসেবে ব্যবহার করতেন কেমন! দর্শকদের মাঝের পথ হয়ে উঠত কলকাতার অলি-গলি- রাজপথ! এই যে দুর্দান্ত কোরাসের ব্যবহার!
- এগুলো দর্শন?

- এগুলো... আলাদা।

-তাহলে, থার্ড থিয়েটারের সংজ্ঞা বলতে এই আলাদা হওয়াই বুঝবো?
- আলাদা।

২

উপরের কথোপকথনটি একেবারেই কাল্পনিক নয়। চরিত্রদের একটি তো আমি নিজেই, অন্যটির সঙ্গেও বাস্তবের মিল পেলে তা ঘোরতর সত্য, এবং কাম্য। এমন ঘটনা এক বা দু'বার নয়, বারবার ঘটেছে। বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমাকে শেষ আট বছরে প্রায়শই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বেচ্ছায় যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে আমার প্রশ্ন ক্রমশ বেড়েই চলেছে, কমেনি। ব্যতিক্রম যে নেই, তা বলছি না, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাদলবাবুর সঙ্গে কাজ করা তাঁর ঘনিষ্ঠ/ একদা ঘনিষ্ঠ নাট্যকর্মীদের কাছ থেকে ওই উপরোক্ত কথোপকথনের

মতো সাড়া পেয়েছি। সম্পূর্ণভাবে তাঁদের দায়ী করি না এমন উত্তরের জন্য। বাদল সরকার যে হারে নিজের জীবনের শেষ চল্লিশ বছর থার্ড থিয়েটারের সংজ্ঞা, প্রকাশ পাল্টেছেন, যে কারুর পক্ষেই তা থেকে কোনও সুগঠিত উপসংহার খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু উপসংহারের প্রতি, ঘাড় ধরে কিছু মিলিয়ে দেওয়ার প্রতি আমাদের এমন দুর্বলতা, বা কিছু না মিললে সেটাকে দোষ বলে মনে করা আমাদের এমন মজ্জাগত, যে বাদল বাবুর কথা বলতে গিয়ে প্রবীণ/নবীন নাট্যকর্মী এবং নাট্য সমালোচকদের মধ্যে এমন কিছু ফিরে-ফিরে-আসা প্রয়াস লক্ষ্য করেছি-

১। তাঁর থিয়েটারকে 'আলাদা'-নামক একটি অস্বচ্ছ বিশেষণে জর্জরিত করতে করতে শেষ অব্দি বাদল সরকারকেও 'enigma' প্রতিপন্ন করা।

২। আলোচনা দর্শনের দিকে যেতে চাইলেই তাতে কোনভাবে ফিজিকাল অ্যাকটিং-এর গাজরটি ঢুকিয়ে সমস্ত কিছুকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা।

৩। এদিকে তাঁর থিয়েটারকে ফিজিকাল থিয়েটারও বলা যাবে না, কারণ বিষয়বস্তুই তৃতীয় থিয়েটারের মূল কথা।

এ'সব যে খুব ইচ্ছাকৃত, তা হয়তো নয়। কিন্তু এই সবই তৃতীয় থিয়েটারের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে না পারার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা। 'কাল্ট'হওয়ার জন্য মূল যে দুটি শর্ত— এক, মূলস্রোতের বাইরে অল্প সংখ্যক গোষ্ঠী বা সংগঠনের কাছে পূজিত হওয়া এবং দুই, আশপাশের কাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করা, বাদল সরকার এই দুই শর্তেই বলে বলে সফল। তাই আজও তাঁকে মোজেস মেনে বহু দল অন্ধকারে তাঁর দেখানো পথে চলতে চায়। কিন্তু সম্ভবত দর্শনের অস্পষ্টতার কারণেই তাঁদের কাছে পথের ভূমিকা অনেক সময় নিয়ে নেয় সামান্য কিছু নুড়িপাথর। নুড়ি পথের অংশ বটে, কিন্তু সমগ্র পথের সংজ্ঞা তো তারা নয়। তাই বাদল সরকারের থিয়েটারে সবচেয়ে সহজলভ্য নুড়িপাথর 'ফিজিক্যাল অ্যাকটিং' দিয়ে তাঁর দর্শন নির্ণয় করার চেষ্টা চলে। তাই তাঁর থিয়েটারের আদলে হয়ে চলা নাটকগুলিতে আজ বিষয়বস্তুর এত দৈন্য। সবই শরীরসর্বস্ব। আবারও, ব্যতিক্রম যে নেই, এমন নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে একটি সময়ের মূল ধারা বিচার করা যায় না।

হয়তো এই প্রজন্মের আমরা যারাই বাদল বাবুর থিয়েটার, তাঁর দর্শন, আদর্শ জানার ব্যাপরে ব্যাপারে উৎসাহ দেখাই, তাদের পথে এমন কিছু বাধা অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু অন্ততঃ আমাদের নিজেদের জন্যই, বাদল বাবুর থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব, তার অবস্থান নিয়ে আমাদের বার বার প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। অনুসরণ করার মতো কোনও অস্তিত্বকে আমরা স্বীকৃতি দিতে তখনই সক্ষম হবো, যখন তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারবো আমরা এই দীর্ঘ ইতিহাসের পাত্রে। সেই পাঠ আংশিক হতে পারে, সেই বোঝা অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল বোঝা এবং বোঝানোর চেয়ে সে ভালো। আপাতদৃষ্টিতে দেখা চড়াদাগের আঙ্গিক পেরিয়ে ইতিহাসের খোঁজ, অবস্থানের খোঁজ হওয়া জরুরী। এই

প্রবন্ধে বাদল সরকারের থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব নিয়ে আমার নিজস্ব পাঠের কথাই বলবো এর পর।

৩

শূন্য দশকে আমরা যারা বড় হয়ে উঠেছি, ক্রমশই উৎসাহ পেয়েছি সাহিত্যে, নাটকে, বাদল সরকারের উপস্থিতি আমাদের চোখে অনেকাংশেই রহস্যাবৃত। তাঁর খোঁজে যতই এগোই, বুঝতে পারি তৎকালীন তাত্ত্বিক বা সমালোচকরা তাঁকে যে ভঙ্গীতে দেখেছেন, তা থেকে তাঁকে ভিন্নভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তা।

সে সময়ের বেশির ভাগ আলোচনাধর্মী কাজই তাঁর তৃতীয় থিয়েটারের প্রাথমিক উন্মাদনা, বা অন্ততপক্ষে তাঁর নিয়মিত খবরে আসার দিনগুলিকে কেন্দ্র করে। শূন্য দশকের মাঝামাঝি বাদল বাবুর এই 'নতুন' থিয়েটারের ধারাও বেশ পুরোনো হয়ে এসেছে। কিন্তু তাত্ত্বিকরা তখনও ব্যস্ত বাদল বাবুর বিকল্প ভাষ্যের স্বপ্নের উড়ান বর্ণনা করতে, কিভাবে মঞ্চ নাটকের লোভ পরিত্যাগ করে তিনি 'গরীব' থিয়েটারে ঠাঁই নিলেন সে কথা বলতে। দেশে বিদেশে তাঁর বিভিন্ন থিয়েটার দেখা, এবং কাজকর্মের একটা খতিয়ান পাওয়া যায় বটে এতে, কিন্তু শেষ অব্দি তৃতীয় থিয়েটারের অবস্থান এবং তত্ত্বের কোনও নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক বিচার হয় কিনা, বলা মুশকিল। বাদল সরকারকে ভারতের 'বিকল্প' থিয়েটারের গুরুর আসনে বসিয়ে তাঁর আলোচকরা দেখাতে চান, সমসাময়িক থিয়েটারের ধারার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েই, একেবারে কোনও মৌল পদার্থ হিসেবে যেন শুরু হয়েছিল তৃতীয় থিয়েটারের পথ-চলা, তাঁরা পারলে ১৯৭০ -এর আলোচনাতেই একপ্রকার বেঁধে ফেলতে চান তৃতীয় থিয়েটারের দীর্ঘমেয়াদী, অনির্বাণ ভবিষ্যৎ।

এইরকম প্রশ্নাতীত আনুগত্যই আমরা শূন্য দশকে পেয়েছি বাদল সরকারের থিয়েটার বিষয়ে। পর্যালোচনার বদলে প্রাধান্য পেয়েছে অনুকরণ; ফলত আমাদের চোখে আরও ঝাপসা হয়ে এসেছে এই থিয়েটারের বাস্তবতা। ততদিনে বাদল বাবুও নিজের আস্তিনের সব ম্যাজিক গুটিয়ে নিচ্ছেন একে একে, কমিয়ে এনে প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছেন ওয়ার্কশপ করানো, শহরে নাটক করা তো ছেড়েছেন বহুদিনই। কাজেই, সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁর বিকল্প ভাষ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা 'মিথ'কে স্বীকার করা ছাড়া খুব একটা অন্য পথ ছিলও না আমাদের। কিন্তু তা থেকে একটু গভীরে গেলেই মনে হতে বাধ্য, এত সাদা-কালো বোধহয় হয় না কোনও অবস্থান।

বলাই বাহুল্য,আধুনিক ভারতে থিয়েটারের জমিতে তৃতীয় থিয়েটার নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী, বলবান এখটি ধারা। কিন্তু তাকে যুগাবতারের মতো না দেখাই শ্রেয়। তাতে প্রশ্ন বাধা পায়, এবং অনিবার্যভাবে সত্যও ঢাকা পড়ে যায়। বাদল বাবুর এই বৈপ্লবিক থিয়েটারের ধারাকে প্রশ্ন না করে মেনে নিতে কোনই আপত্তি ছিল না আমার, যদি তাতে সত্য পরিস্ফুট হত। কিন্তু দেখলাম, তা হচ্ছে না। অতএব, আমার প্রশ্ন ও খোঁজ বদলে গেল - তৃতীয় থিয়েটারের সত্যটি কী?

৪

একটু পিছনে ফিরে দেখা যাক। আধুনিক ভারতে শহরে গড়ে ওঠা থিয়েটারের ধারা এবং তার কর্মকাণ্ড বিচার করতে গেলে আমরা সহজেই দেখতে পাই, ইউরোপীয় মঞ্চ নাটকের কেঠো রিয়ালিজম ভেঙে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে সেই চল্লিশের দশকেই , আই পি টি এ-র হাত ধরে। অবশ্য স্বাধীনতার পর আই পি টি এ - সৃষ্ট যে প্রাথমিক উন্মাদনা জননাট্যের, তাতে ভাটা পড়ছে কিছুটা। সদস্যরা সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করছেন নিজেদের দল,জন্ম হচ্ছে গ্রুপ থিয়েটারের। এমন সাংঘাতিক মন্থনের যুগে বাদল সরকার নিজের দল নিয়ে মঞ্চে তেমন সফল না হলেও, নাট্যকার হিসেবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছেন; একের পর এক লিখিত হচ্ছে 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'বাকি ইতিহাস', 'সারা রাত্তির'। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রীতিমতো। তাহলে এমন কী হল যে হঠাৎ বাদল বাবু মঞ্চের আড়ম্বর ছেড়ে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এলেন নগ্নতায়? প্রাথমিক পাঠে ধারণা করা যায়, এই অবস্থান নেওয়ার পিছনে কারণ ছিল দুটি। একটি আদর্শগত- বাদলবাবু ফিরে যেতে চেয়েছিলেন থিয়েটারের গোড়ার কথায়, যা হল দর্শকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ; এবং দ্বিতীয়টি আর্থিক-মঞ্চ নাটকের বিপুল খরচকে কমিয়ে এনে দলের আয়বৃদ্ধি, কারণ অর্থাভাবই শেষ করে দেয় বহু থিয়েটার দলের স্বপ্ন।

কিন্তু তারপর বহু জল গড়িয়ে গেছে। তৃতীয় থিয়েটার যেমন আকাশচুম্বী সাফল্যের স্বাদ পেয়েছে, তেমনই অনিশ্চয়তার চরম খাদেও গিয়ে পড়েছে। আজ, বাদল সরকারের প্রয়াণের নয় বছর পর তাঁর এই বিশেষ বিকল্প থিয়েটার তাঁর মতোই মিথে পরিণত হয়েছে; সে যতটা স্মার্ট ততটা আলোচিত বা চর্চিত নয়- অন্তত তার সূচনা যে শহরে হয়েছিল, সেই শহর কলকাতায় দাঁড়িয়ে আমরা এ কথা বলতেই পারি। প্রান্তিক কলকাতায় বা মফঃস্বলে বেশ কিছু দল এই থিয়েটার নিয়মিত করে চলেছেন বটে, কিন্তু জনমানসে আজও সেই পঞ্চাশ বছর আগে বলা দুটি শর্তই- আদর্শগত এবং আর্থিক- বার বার প্রকাশ পায়, এই থিয়েটারের অসংলগ্ন ধারণায়। যদি তৃতীয় থিয়েটার সীমাবদ্ধ থাকতো শুধুমাত্র বাংলার আঞ্চলিকতায়, বা বাদল বাবুর একান্ত ব্যক্তিগত একটি প্রয়াস হিসেবে, তবু মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু জাতীয় স্তরে এই থিয়েটারের বিস্তার এবং প্রভাব মাথায় রেখে উপরোক্ত শর্ত দুটিকে তার সর্বভারতীয় অবস্থানের সারসত্য হিসেবে দেখা বেশ কষ্টসাধ্য। স্বরচিত 'দ্য থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে বাদলবাবু একদিকে দেখান ইসলামীয় শাসকের প্রভাবে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যের ভেঙে পড়া এবং বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনাট্যের একপ্রকার সনাতন হয়ে থেকে যাওয়া (তাঁর মতে 'ফার্স্ট থিয়েটার'), অন্যদিকে ইউরোপীয় ধ্যানধারণায় গড়ে ওঠা শহরে সেই পাশ্চাত্য মডেলে তৈরি মঞ্চনাটকের প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠা (তাঁর মতে 'সেকেন্ড থিয়েটার')। তাঁর তৃতীয় থিয়েটার এই দুই থিয়েটারের সংশ্লেষে তৈরি হয়েছে বলেই দাবী করেছিলেন বাদল সরকার- লোকনাট্যের আঙ্গিক ও শহরের নাট্যের বৌদ্ধিক চর্চার মেলবন্ধনে। সেই সময়ের নিরিখে নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বাধীন ও পোক্ত বিকল্প স্বর। কিন্তু উল্লেখ্য, ভারতে তিনিই প্রথম বিকল্প স্বর ছিলেন না; এবং সমস্যা এখানেই। আমাদের তৃতীয় থিয়েটারের

পাঠ অনেকাংশেই exclusive - পূর্ব ভারতের শহর কলকাতার প্রথম বিকল্প নাট্যের স্বর হিসেবে বাদল সরকারের থিয়েটারকে দেখেই আমরা অনেকাংশে ক্ষান্ত এবং গর্বিত। কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে এই অবস্থান - অন্যান্য বিকল্পভাষের নিরিখে-কতটা সঠিক, এবং পূর্ণ?

৫

জাতীয় স্তরে বিকল্পভাষের কথা বলতে গেলেই মনে পড়তে বাধ্য ১৯৪০-এর দশকে আই পি টি এ-র কাজকর্ম। আগের অংশে একপ্রকার ঝাঁকিদর্শন আমরা করেছিলাম ঠিকই, তবে তার সুর টেনে বিশদে এটুকু বলাই যায় যে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে আই পি টি এ-র শাখার গভীর বিস্তার থাকায় ভারতের থিয়েটারে বিকল্পের প্রথম স্বাদ তাঁরাই এনেছিলেন সংগঠিতভাবে। প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া আইপিটিএ- র মূলধন ছিল শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। ইউরোপীয় নাট্য-মডেলকে অনুকরণ করার কোনও দায় না রেখে আইপিটিএ দেশে বিকল্প থিয়েটার-ভাষ্য তৈরি করার জন্য বেছে নেয় প্রধানত দুটি পথ— একদিকে সনাতন লোকনাট্যের আড়ালে থেকে যাওয়া ধারাকে আবার জনপ্রিয় করে তোলা, অন্য দিকে শহরের মঞ্চে যুগোপযোগী বিষয় ও সমস্যার সরাসরি অবতারণা।

ফলতঃ আধুনিক ভারতে বিকল্প থিয়েটারের আকর আই পি টি এ। তবে চল্লিশের দশকে পরাধীন দেশের সংস্কৃতিতে ঐক্যস্থাপন যতটা দরকারি এবং প্রতীক্ষিত ছিল, স্বাধীনতা লাভ করা নতুন দেশে এমন আন্দোলনের খানিক দিশাহীন হয়ে পড়া খুব নতুন নয়। আই পি টি এ-র ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। তার স্ফুরণের ইতিহাসে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নাটক 'নবান্ন'র কাণ্ডারী বিজন ভট্টাচার্য্যই প্রথম সংগঠন ছেড়ে বেরিয়ে তৈরি করেন নিজের দল, ক্যালকাটা থিয়েটার। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠা শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' বা উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', এবং আরও অন্যান্য অনুসরণকারী দল গড়ে তোলে নতুন বিকল্প ধারা 'গ্রুপ থিয়েটার মুভমেন্ট', শহরের বাণিজ্যিক কোম্পানী থিয়েটারের বিরুদ্ধে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের প্রশ্ন, সমস্যা নিয়ে তার মুখপাত্র হয়ে ওঠে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার।

অন্যদিকে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে আইপিটিএ- চর্চিত ভারতীয়ত্বও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে যায়; স্পষ্ট, স্বতন্ত্র কণ্ঠ শোনা যায় আঞ্চলিকতার। যে একক বিকল্প স্বর নতুন অবয়ব দিয়েছিল ভারতে থিয়েটারকে, সেই স্বরই বহুবচনে ভেঙে যায়। বিকল্প নাট্যের জমিতেই বিতর্ক চলতে থাকে একদিকে সুরেশ অবস্থির মতো 'থিয়েটার অফ রুটস' দিয়ে একপ্রকার কেন্দ্রীকরণ করতে চাওয়া তাত্ত্বিকের, এবং অন্যদিকে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জি.পি. দেশপান্ডের মতো নাট্য সমালোচকের।

প্রশ্ন উঠতে থাকে, আদৌ ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে কেন্দ্রীভূত বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকা কী সম্ভব এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের যুগে? নাকি এই প্রয়াসগুলিকে 'ভারতীয় থিয়েটার' (Indian Theatre) না বলে 'ভারতের থিয়েটার' (Theatres of India) বলা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত? এই বিষয়ে জি.পি. দেশপাণ্ডের " Is There or Should There

be a National Theatre in India?" প্রবন্ধের একটি ছোটো অংশ আপনাদের পড়ানোর লোভ সামলাতে পারছি না। বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বজায় রাখতে আমি বাংলায় অনুবাদ না করে মূল ইংরাজি লেখাটিই তুলে দিলাম-

My business is to define theatre, not to define national theatre.What do I know of 'nation'? I hardly speak the fourteen or fifteen languages recognized by the eighth schedule of the Indian constitution. I barely speak two and genuinely know only one. How dare I say that I understand this country? I think I know what theatre is,but I will never be asked to define it; and on top of it, those who do not know what nation is will force a definition of it on me.

এরই বিপক্ষে উঠে আসছে সুরেশ অবস্থির স্বর। ১৯৭১ -এ তাঁর পরিচালিত লোকনাট্যের বর্তমান প্রায়োগিকতার উপর গোল-টেবিল বৈঠকের সূত্র ধরে অবস্থি বিভিন্ন আঞ্চলিক বিকল্প থিয়েটারের ধারার একটি সার্বজনীন শিকড় খুঁজে পান তাদের বিষয়ে, আদর্শে এবং গঠনে। ইংরাজিতে যাকে আমরা ' revivalist approach' বলি, সেই সনাতন লোকসংস্কৃতির পুনরুন্মেষবাদকে সহায় করেই এই আঞ্চলিক ভিন্নতার মধ্যেও এক ধরনের 'জাতীয়তা' লক্ষ্য করছেন অবস্থি। কোনও একটি বিশেষ নাট্যরীতি বা আদর্শ নয়, পাশ্চাত্য - প্রভাব ভেঙে দেশজ শিকড়ের সন্ধান করে চলা যে কোনো প্রয়াসকেই তাঁর 'Theatre of Roots' -এর ছত্রছায়ায় আনতে আগ্রহী তিনি। তাই অবস্থির আলোচনায় যেমন উঠে আসে বি.ভি.করন্থ বা কে.এন. পানিক্করের নাম, তেমনই মণিপুরের রতম থিয়াম, বা ছত্তিশগড়ের হাবিব তনভির, বা বাংলাব বাদল সরকার, এমন কি শম্ভু মিত্র উপস্থাপিত রবীন্দ্র নাটকের প্রসঙ্গও চলে আসে।

এই দুই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের পাশাপাশি একটি তৃতীয় ধারাও লক্ষ্য করা যায়। তার প্রতিনিধি গিরীশ কারনাড বা মোহন রাকেশের মত্যে ব্যক্তিত্বরা। অভিনয়ের ক্ষেত্র নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা না করলেও, নতুন সজ্জায়, নতুন উদ্দেশ্যে ভারতের সনাতন কাব্য, কাহিনীকে ফিরিয়ে আনার কাজে নেমেছিলেন তাঁরা। এরকম খোঁজ চলতে থাকলে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আরও অনেক ধারাই পরিলক্ষিত হবে। দেখা যাবে, এক ধারার সঙ্গে অন্য ধারা কোথাও মিলেমিশে যাচ্ছে এক নতুন আদর্শে। যেমন আপাত ভাবে বিরুদ্ধগামী মঞ্চ ও পথনাটকের দুই ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় চলাচল করতে দেখা যায় উৎপল দত্ত বা সফদর হাশমির মতো নাট্যকর্মীদের। অভিনয়ের ক্ষেত্র বা থিয়েটারের গঠনের চেয়েও তাঁদের চোখে প্রাধান্য পেয়েছিল থিয়েটারের আদর্শ- সাধারণের স্বর, হাতিয়ার, বিপ্লব হয়ে ওঠার দায়িত্ব।

৬

এত বৈচিত্র্য, বিভেদ, বিতর্ক, পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়েই আধুনিক ভারতের থিয়েটারে বিকল্পভাষের জমি। মূলস্রোতের থিয়েটারের বিপরীতে এই বিকল্প থিয়েটার একমুখী নয়; সে বহুগামী। এই বহুগামীতার এক পথে খুঁজে পাই আমরা বাদল সরকারের তৃতীয়

থিয়েটারকে। তাঁর কাজ বিকল্প তো বটেই; কিন্তু মূলস্রোত যদি 'প্রথমত্ব' -এর প্রতীক হয়, বিকল্প থিয়েটারের বিপুল সম্ভার যদি মূলস্রোতের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয়ত্ব' নিয়ে আসে, তবে বাদল বাবুর থিয়েটারের 'তৃতীয়ত্ব' কোথায়? আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, আসুন তার নিরিখেই দেখা যাক বাদল সরকারের 'নতুন' থিয়েটারকে।

* একদিকে লোকনাট্যরীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য আইপিটিএ-কে স্মরণ করায়।
* অন্যদিকে নিজের স্বাধীন দল 'শতাব্দী' গড়ে তোলা আবার আই পি টি এ-থেকে বেরিয়ে আসারই ইঙ্গিত।
* আবার গ্রুপ থিয়েটার হয়েও তিনি শহরের অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারের মতো কাজ করলেন না। বরং একটা সময়ে শহরে অভিনয় বন্ধ করে চলে গেলেন গ্রাম পরিক্রমায়।

আসল কথা এটুকুই-আমরা যখন কোনও অবস্থানের কথা ভাবি বা নির্ণয় করি, বিশ্বাস করি অবস্থান মাত্রেই মেরুকেন্দ্রিক। পরস্পর-বিরোধী লক্ষাধিক মেরু থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে অবস্থান বলতে এর কোনও একটি মেরু। অথচ মেরুগুলির মধ্যবর্তী পথেও যে কোনোদিন কেউ অবস্থান ঘোষণা করতে পারে, এ আমাদের দৈনন্দিন চিন্তার বাইরে, কারণ এমন অবস্থান আমাদের বৈপরীত্যের সহজ সমীকরণগুলিকে ভেঙে দেয়। এই মধ্যবর্তী no man's land'-ই বাদল সরকারের অবস্থান; এই দুই চরম অবস্থানের মাঝের 'in betweenness' ই বাদল বাবুর থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব। আমার শুকনো কথায় বিশ্বাস করতে হবে না, আসুন তথ্য দিয়েই দেখে নিই। ১৯৭২ -এ তৃতীয় থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে ২০১১-এ তাঁর মৃত্যু অব্দি নিজের থিয়েটারের নাম নিয়ে, পরিচয় নিয়ে বাদল বাবুর অস্থিরতা, অস্বস্তি লক্ষ্য করার মতো। 'থার্ড থিয়েটার'-এর ছায়ায় বহু নামে নিজের থিয়েটারকে তিনি ডেকেছেন, পরে নিজেই সে-সব অস্বীকার করে বেরিয়ে এসেছেন।

* ১৯৭২-এ 'দ্য থার্ড থিয়েটার' প্রবন্ধে উল্লিখিত ' থিয়েটার অফ সিন্থেসিস' তাঁর দেওয়া প্রথম নাম।

* কয়েক বছরের মধ্যেই সেই নামের সঙ্গে আত্মীয়তা ত্যাগ করেন বাদল বাবু। বলেন, তাঁর থিয়েটার প্রথম (শহুরে থিয়েটার) ও দ্বিতীয় (লোকনাট্য) থিয়েটারের সংশ্লেষ নয়, বরং তাদের উভয়েরই বিরোধী।

* অঙ্গনমঞ্চের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ, সীমিত পরিসর থেকে বেরিয়ে আসেন বাদল সরকার। রাস্তায়, পার্কে, মাঠে নাটক নিয়ে নেমে পড়েন। নাম দেন 'ফ্রী থিয়েটার'। কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে নয়। বদ্ধ অভিনয়ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত পরিসর পাওয়া, পরিসর-ভেদে নাটকে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, সব মিলিয়েই তাঁর ফ্রী থিয়েটার।

* আবার কখনও কখনও, বিনামূল্যে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন থিয়েটারকে, এই কারণে শতাব্দীর কাজকে উল্লেখ করতেন 'পুওর থিয়েটার' বলে।

কিন্তু ভেবে দেখলে, তথাকথিত 'পুওর' থিয়েটারের প্রবক্তা জের্সি গ্রোটোভস্কির দর্শনের থেকে বিস্তর আলাদা বাদলবাবুর 'পুওর'।

* রাস্তায় বা পার্কে নাটক করতেন বলে কেউ তাঁর থিয়েটারকে 'স্ট্রীট থিয়েটার' বললেও আপত্তি করতেন বাদল সরকার। প্রচলিত স্ট্রীট থিয়েটার propagandist, আড়ালবিহীনভাবে রাজনৈতিক এবং তাৎক্ষণিক; তাঁর নিজের থিয়েটার এমন নয় বলেই মনে করতেন বাদল বাবু। ১৯৮৩ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর পত্রিকায় নিজেদের কাজকে স্ট্রীট থিয়েটার হিসেবে উল্লেখ করেও শিরোনামে "Our Street Theatre" লিখে "Our" -এ বিশেষ জোর দিয়ে আলাদা করে দেন বাকি স্ট্রীট থিয়েটারদের থেকে।

* এ দেশের বাইরে ইউরোপে ইউজেনিও বার্বা, এবং আমেরিকায় রবার্ট ব্রুস্টাইন 'থার্ড থিয়েটার' কথাটি নিজেদের কাজের সূত্রে ব্যবহার করেন। বলাই বাহুল্য, বাদল বাবু তাঁদের সঙ্গে তিনি নিজে কোনোভাবেই যুক্ত বলে দাবী রাখেন নি।

তাঁর সুবিস্তৃত কর্মকান্ডের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, বাদল সরকার নিজের থিয়েটারকে নিয়ে শুধু ছুটে গেছেন এক পরিচয় থেকে আরেক পরিচয়; যেভাবে একই মানুষ তার একই সম্পত্তি নিয়ে বার বার ঠিকানা পাল্টায়। যেই কোনও ঠিকানায় তাঁকে মানুষ নিয়মিত খুঁজে পেতে শুরু করেছে, বা ভেবেছে এ-ই বুঝি তাঁর গন্তব্য তবে, সেই ঠিকানাকে নিমেষে বাতিল করে বাদলবাবু আবার খুঁজে নিয়েছেন আর কোনও নাম, পরিচয়।

৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিশ্বভারতী' নামাঙ্কিত প্রবন্ধগুলি পড়লে প্রায়শই দেখা যায় কবি লিখছেন, প্রথমে তিনি যে সামান্য লক্ষ্য নিয়ে, যে আশু গন্তব্যের কথা ভেবে আশ্রম তৈরির কথা ভেবেছিলেন, আজ এতদিন পথ চলতেচলতে তাঁর অলক্ষ্যেই সেই আশ্রমের একটি বৃহত্তর আদর্শ, অবস্থান গড়ে উঠেছে। সে এখন কেবল রবীন্দ্রনাথের একার নয়; ভারতের, বিশ্বের।

বাদল সরকারের থিয়েটারের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে একটি বৃহত্তর সত্যে উপনীত হওয়ার সুযোগ থাকে। প্রাথমিক কালের সেই প্রথম ও দ্বিতীয় থিয়েটারের সংশ্লেষে গঠিত তৃতীয় থিয়েটার একান্তই বাদল বাবুর ব্যক্তিগত সংজ্ঞা ছিল, তখনও সে পুড়ে সোনা হয় নি। সময়ের নিয়মে ভারতের বিকল্প নাট্যের ধারায় অবগাহন করেছে তাঁর সৃষ্টি। আর আজ এত স্রোত পেরিয়ে এসে, এত দহন শেষে তবে আমাদের সেই শুরুর প্রশ্ন রাখা যাক। বাদল সরকারের থিয়েটারের যে 'তৃতীয় ' অবস্থান, তার সারসত্য তবে কী?

বাদল বাবু নিজের থিয়েটারকে বরাবরই সংজ্ঞায়িত করেছেন নঞর্থক ভাবে। তাঁর থিয়েটার কী, তার চেয়ে বেশি তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থেকেছেন যে তা কী কী নয়। তাই এই সমস্ত মেরুর, বিধিবদ্ধ অবস্থানের (Canon) মধ্যবর্তী বিষণ্ণতাই তাঁর থিয়েটারের পরিচয়। সে এক নয় বলে যে সে অন্য, এই যুক্তিতে বাদল সরকার বিশ্বাসী নন। তাঁর

থিয়েটার এক এবং অন্যের মাঝে অবস্থিত, তৃতীয় কোনও পরিচয়ের অপেক্ষায়, যাকে আর কেউ দাবী করবে না। চিরন্তনভাবে সে হয়ে উঠছে (becoming), অথচ পূর্ণ কোনও অস্তিত্ব (being) গ্রহণ করছে না।

এ-ই সম্ভবত: তাঁর থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব; হয়তো একেই 'আলাদা' বলে আবছা বুঝেছি আমরা অনেকে। সেই 'আলাদা'র খোঁজ শুরু করেছিলাম এক সময়ে। আজ, এখনও অব্দি সেই খোঁজে যতটুকু এগোতে পেরেছি, তা কোন অর্থেই সম্পূর্ণ নয়; আরও অনেক পথ বাকি। তবু পেরিয়ে আসা পথের অভিজ্ঞতাটুকু আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম। বাদল সরকারের থিয়েটারের তৃতীয়ত্ব আমাদের সন্ধান দিয়েছে একটি পরিচয়কে সত্য না ভেবে স্বাধীন থাকার পথের। প্রথাগত কোন খুঁটির সঙ্গে যুক্ত না থাকার শিক্ষাও ভারি বড় শিক্ষা। সে একদিকে সংহার করে সব বিধিকে, এদিকে আমরা খুঁজি কেবল উপসংহার।

ঋণ-

১। বাদল সরকার , "The Third Theatre"
২। জি.পি. দেশপান্ডে, " Is There or Should There be a National Theatre in India ?"
৩। সুরেশ অবস্থি , "In Defence of the Theatre of Roots".
৪। বসুধা ডালমিয়া, Poetics, Play and Performances : The Politics of Modern Indian Theatre.

লেখক : শুভংকর ঘোষ রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের রায়দিঘি কলেজে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, কলকাতার "অন্তর-রঙ্গ" নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কবি ও নাট্যকার।

বিশ্বনাট্যের এক ঝলক

প্রবাসে নাট্যের বশে ঃ ফুজাইরাহ

আশিস গোস্বামী

'We want to show the world who we are and what we have to offer, at the same time open the door to experience and share other ideas all around the world. Culture is the platform on which we learn to understand each other despite all the contrasts culture brings us together and together'- কথাটা ফুজাইরাহ বলেছেন, ফুজাইরাহ সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিচালক মোহামেদ আফকাম। সত্যিই ফুজাইরাহ নিজেকে নতুনভাবে চিহ্নিত করতে চাইছেন বিশ্বমানচিত্রে। তার পর্যটন , সাংস্কৃতিক চর্চা আর আতিথেয়তায়। এই ফুজাইরাহতে দ্বিতীয়বার যাবার আমন্ত্রণ আচমকাই চলে এলো বন্ধুবর, আই টি আই বর্তমান সভাপতি মহম্মদ সঈফ আল আফখামের আমন্ত্রণে। প্রতি বছরই ফুজাইরাহ আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মূল আকর্ষণ মনোড্রামা উৎসব ছিল ২০-২৮ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু শুরুতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার। কারণ ২২ ফেব্রুয়ারি আমার নিজস্ব সংগঠন আনন্দসভার উদ্যোগে পার্বতী বাউলকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তাই ১৯শে পৌঁছনোর কথা থাকলেও সবিনয়ে তা বাতিল করে ২৩ যেতে হলো। ফলে দুদিনে তিনটি প্রযোজনা দেখতে পারিনি। তবে যারা এ উৎসব সম্পর্কে কিছুই জানেন না তাদের জন্য এসব প্রযোজনার কথা যতটুকু জেনেছি সেকথাও বলবো এখানে।

যতদূর জানি সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য মনোড্রামা উৎসব হলেও আড়ম্বরে জৌলুযে ফুজাইরাহ অন্যতম। আর এ বছর আই টি আই-য়ের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং থাকায় বিদেশী অতিথির লম্বা তালিকা ছিল। ফলে ২০১৮-র উৎসবের তুলনায় এবার থিয়েটারের বিশ্ব থিয়েটারের মানুষের ভিড় ছিল দেখবার মত। করোনা ভাইরাসে আতঙ্কের মধ্যেও এত মানুষ আসবার কারণ এই উৎসবের মান্যতা সবার কাছেই যথেষ্ট আগ্রহের। আর আমার মত নগন্যের কাছে এই উৎসব হাজারদুয়ারী হয়ে উঠেছিল। কত নতুন পরিচয়, নতুন কথা, নতুন থিয়েটার- এসব মেলার সুযোগ তো আমার মত রাজ্য থেকে মেলা মুশকিল। তাই ফুজাইরাহ এবছরের জন্য আমার কাছে সবিশেষ অবশ্যই।

গতবছর আমার কাছে সবটাই অচেনা ছিল। একমাত্র রামেন্দু মজুমদার, যার সুপারিশে গত বছরের যাবার সুযোগ জুটেছিল, তিনি ছাড়া কাউকেই চিনতাম না। এ বছর সুবিধা ছিল অনেক পরিচিত মানুষ ছিলেন। বিশেষত ভারতীয় আই টি আই সম্পাদক বিদ্যানিধি বানারসী প্রসাদ এবং পুনের আইপার সদস্য অদিতি ভেঙ্কটেশ্বরণ থাকায় ভারতীয় তিনজনের একসাথে চলাটা সহজ হয়েছে আমার। প্রসাদের সংগে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেকদিনের না হলেও যথেষ্ট গভীর। আমাদের চাওয়া পাওয়ার স্বপ্নের অনেক মিল

রয়েছে। এর আগে ভারতীয় আই টি আই -য়ের সংগে যুক্ত মানুষদের চিনতাম কিন্তু সখ্যতা কোনমতেই গড়ে ওঠেনি। তাঁরা সখ্যতা চাইতেন বলেও মনে হয়নি। তুলনায় প্রসাদ অনেক বেশি উদার মানসিকতার। সারা ভারতের থিয়েটারকে আই টি আইয়ের সংগে সম্পৃক্ততার স্বপ্ন দেখে। পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে আশাবাদী হওয়া যায় প্রসাদকে নিয়ে। তাই এবার একাকীত্বের ভয় ছিল না আমার মত নবীশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলার। আর ছিল শ্রীলংকার মহম্মদ শফীর এবং তার দল, যাদের সংগে পূর্ব ঘনিষ্ঠতা ছিল আমার। সবটা মিলিয়ে মাঝপথে পৌঁছেও অসুবিধায় পড়িনি। অসুবিধায় পড়িনি এই কারণেই যে গতবারের সংগঠকদের অনেকেই মনে রেখেছেন আমাকে। তাদের বিপুল শরীরে আমাকে আলিঙ্গন করে নিতে কসুর করেন নি কেউ। বিমানবন্দরে নেমেই সেই চেনা জানার ছোঁয়াচ পেয়েছি। বহুদিন যাবত এই উৎসবের প্রতি আমার আকর্ষণের মূল কারণ, অনেক অজানা দেশের থিয়েটার দেখার সুযোগ পাওয়া। যে দেশের থিয়েটার দেখার সুযোগ চট করে হয় না। আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি থিয়েটার নিয়ে কি ভাবছেন, কি করছেন এটা জানতে চাই বলে এই উৎসব আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। না হলে দেখাই হতো না জেরুজালেমের কোন দুরন্ত অভিনেতাকে বা লিথুয়ানিয়ার কোন অভিনেত্রীকে। জানতেই পারতাম না তিন তিনবার জেল হাজতে থেকেও একচল্লিশ বছর ধরে অভিনয় করে চলেছেন কামেল আল বাঁশার মত কোন একজন অভিনেতা।

এবারের উৎসবে এগারোটা প্রযোজনা ছিল। প্রথমদিনের দুটি প্রযোজনা আমার দেখা হয়নি, তবে শুনেছি তিউনিসিয়ার Muneer Al- Ammari অভিনীত এবং Waleed Ai- Dagsany লিখিত ও পরিচালিত HUDOD জমেনি। তুলনায় লিথুয়ানিয়ার নাটককার-পরিচালক - অভিনেত্রী Birute Mar -এর ভালো অভিনয় আগত অতিথিদের ভালো লেগেছে। তবে নাটকের বিষয়গুলি অনুধাবন করলে দেখবো, পৃথিবী জুড়ে আমাদের সংকট বোধহয় এক। বিশ্বায়ন বিশ্বকে হাতের মুঠোর নিয়ে এসে আমাদের মত সংকটময় দেশগুলির প্রাথমিক সংকটে কোন হেরফের নেই। নাটক দুটি দেখতে না পাবার আফশোষ থেকে যাবে আমার। তবে বিষয় হিসেবে কি ছিল সেটা জেনে নিতে পেরেছি। HUDOD : This performance deals with Alienation topic and its physical and psychological matters and impacts on societies and individuals, besides, it displays its consequences of tyranny and misery on nations. The creature shows a painful and shocking story about displacement within homeland and the useless search for an outlet to avoid crime. পরের প্রযোজনা BUDDHA IN THE ATTIC : Travelling on the Boat. A group of native and young Japanese women sail on a ship to Sanfrancisco to meet their future grooms, who have only been seen photographs- They certainly believe to face a happy life in America and fulfillment of their Dreams. Each morning they admire the sea, at the same time watching their fellow passengers- German tourists , Chinese workers heading to cotton plantations in Peru, Rich Russian's feeling from

the revolution ...... In the evenings, Japanese brides gather into the cabins and share rumours of the unfamiliar and awesome world waiting for them in the wide American land .

তবে দুটিই খুব ভালো প্রযোজনার তালিকায় Buddha in the Attic প্রযোজনায় অভিনেত্রী Birute Mar- এর অভিনয় সারা উৎসবে আলোচনার বিষয় ছিল। নাটকটির সংলাপ রচনায় কাব্য এবং বিবৃতিধর্মীতা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। তবে ভালো প্রযোজনার তালিকায় অবশ্যই থাকবে Al Molaqqin। আলজেরিয়ান অভিনেতা পরিচালক Bin Bakriti Mohammed- এর অভিনয় এবং থিয়েটার মনস্কতায় উজ্জ্বল প্রযোজনাটি। Ahmed Al Mulla লিখিত এই নাটকে হতভাগ্য অভিনেতার স্বপ্ন আর স্বপ্নহীনতার সাথে আমার দেশে দেখা অনেকের জীবনের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় যেন। আগেই লিখেছি,এসব দেশের থিয়েটার মানচিত্র আমার দেশের থেকে আলাদা নয় কোনভাবেই। লড়াইটা এক, বাঁচার চেষ্টাও এক। তাই তো জানতে ইচ্ছে করে এইসব অচেনা শিল্পীদের। তাঁদের পুস্তিকায় যে ভাবনাটি পাই, তাহলো, Al Molaqqin is a dreamer who wants to proof his existence in the Cultural field in which he has been removed from. He entered the Theatre to become an actor due to the tools and skills he has. However He found himself with semi actors and he is working to correct their words! And once he starts dreaming to become one of them, they take him out to live with ignorance and carelessness. He becomes the trustee among all marginalised actors like himself. এই মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার কথা আর একভাবে বলেছেন রাশিয়ান অভিনেত্রী Lidia Kopina। তাঁর অভিনীত প্রযোজনা SETTIMANA শুধু যে নারী জাগরণের কথা বলেছে তা হয়তো নয়। সব মানুষের বেঁচে থাকাই সদর্থক এক চেহারায় দেখতে চেয়েছেন তিনি। To accept what was happening, I had to turn off the resistance. To avoid the desire to defend. Because all this has already happened to you and left a mark. You learned to walk, fell, fought, tried to like, materialised tenderness ... but you have not yet taken the last step and therefore are vulnerable. When this happened to you in reality, you were absorbed by emotions, you could not even imagine what you look like at that moment. When you see yourself from the outside, it becomes creepy. Creepy from some kind of primeval cantor. Words are not capable of such frankness, only plastic. It was necessary to skip everything happening through myself. To wash away the dust, blood, tears and see under it today's self. To accept myself, all that survived- honestly and unconditionally. নাটকটি পরিচালনা করেছেন Tanya Khabarova আর যৌথভাবে লেখা Lidia Kopina, Veronika Berashevich. এই একই ভংগী ছিল শ্রীলংকার প্রযোজনা Untouched. তবে সে প্রসংগে যাবার আগে, আমার মতে উৎসবের সেরা প্রযোজনা Qahwa Zataar - এর কথা বলে নিতে চাই।

আমরা সকলেই জানি প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থার কথা। রোজ সংঘর্ষ রোজ মৃত্যুর রোজনামচা যে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত সেখানে থিয়েটার বেঁচে আছে কি করে? শুধু বেঁচে নয়, একদল নিয়মিত কাজ করে চলেছেন। আরো শোনা যায়, নতুন ছেলেমেয়েরা পেশাদার হিসেবে নানা দলে কাজ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় থিয়েটার আছে। এই উৎসবে দেখা প্রযোজনায় কোন জৌলুষ নেই, আছে শুধু দাপটে অভিনয়ের শিরোপা আর কঠিন বাস্তব এক সমাজ ব্যবস্থার ব্যঙ্গচিত্র। আমি ভাষা বুঝিনি, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে হাসির ফোয়ারা, নাটক শেষে দর্শককুল উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন সদর্থক এক বার্তা দেয় বৈকি। নাটকটি লিখেছেন এবং অভিনয় করেছেন Hussam Abu Aisha, পরিচালনায় ছিলেন Kamal Al Basha। নাটকটির বিষয় যতটুকু জেনেছি, Quhwa Zataar has been a special Palestinian State according to its social, economical and political role in the 1960s and 1970s. Its pioneers were politicians and academics who were recognised as iconic merchants and tribes' elder. Through ' Saleh' the cafe worker, we will live breath- taking stories which will make us wonder about the true ways in this life. ভালো নাটক আর ভালো অভিনয় হলে যে আর কিছু দরকার হয় না তার এক বড় উদাহরণ এই নাট্য। একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। অভিনেতার হাতে মাঝারি গোছের একটা ব্যাগ, আলো একেবারেই সাদামাটা- ব্যস। অভিনয় উতরে দিল সব। মনে থাকবে আপনাকে Hussam Abu Aisha।

একইভাবে সমীহ আদায়কারী আরো দুটি কাজ, গ্রীসের The Bomber আর লন্ডনের AT HOME WITH WILL SHAKESPEARE, খুব ভালো অভিনয়, ভালো বিষয়, সমীহ আদায়কারী প্রযোজনা। এদের কাউকে খাটো না করেই বলছি, মনে রেখে দেবার জন্য অন্য এক তরিকার অনুসন্ধান লাগে যেখানে কেউ এগিয়ে থাকেন কেউ বা একটু দূরে, তবে অগোচরে নয়। The Boomer নাটকে নাটককার- পরিচালক- অভিনেতা Johnny o- Panayota Kantiani এই প্রযোজনায় তিনটি চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন। নির্বাক অভিনয়ে গাড়ি চালক, কর্পোরেট চাকুরে এবং প্রেমিক হিসেবে তিনটি চরিত্র এবং তার স্বস্তি এবং অস্বস্তির ছবি দেখিয়েছেন। তাঁর খুব জোরলো অভিনয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। সামান্য মঞ্চসজ্জা এবং আলোর ব্যবহার, জোন হিসাবে করেছেন। তিনটি চরিত্রকে তিনি জোনে রেখেছেন।

Three archetypes. Three basic aspect of human character. Three roles we all play in life. All of them fighting for their ground. All of them existing in each and every one of us. All of them waiting for the big explosion that will free them or destroy them. All of them waiting for the Bomber. প্রত্যেক মানুষের জীবনের অমোঘ সত্য, অমোঘ এক জীবন কাব্য উচ্চারিত হয় এই নাট্যে, নির্বাক নির্মাণে। এই কাব্য হয়তো নির্মাণ হতে পারতো শ্রীলংকার প্রযোজনা Untouched অভিনয়ে। কিন্তু সেটা হয়না প্রযোজনা প্রক্রিয়ার বিড়ম্বনায়। এখানেও এক নারীসত্বার বিদ্রোহ

আছে, যেমন ছিল SETTIMANA প্রযোজনায়। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বিব্রতকর লেগেছে মঞ্চসজ্জা হিসেবে নেটের ব্যবহার। ভীষণ অভিনব যেমন, একই সংগে অভিনয়কে জমাট হতে দেয় না। অভিনেত্রীকে বহু সময় ব্যয় করতে হয় নেট সামলাতে। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছতে যে সময় ব্যয় করতে হয় তাতে চরিত্র হারিয়ে যায় মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে। অথচ অভিনেত্রী Subuddhi Lakmali খুব ভালো অভিনেত্রী এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, বুঝতে অসুবিধা হয় না পরিচালক Sujeewa Pathinisekara কি চাইছেন। সমস্যা তৈরি করছে প্রযোজনা নির্মাণে। নাটকটির বিষয় হলো 'Untouched' is a story of man, 'woman and her lover in a contemporary atmosphere. How they meet each other and how the stranger replaces the void in her life is being dramatised here. Her husband is a doctor by profession who has been taken away from his family due to stressful life. She is alone in her own world. Suddenly her husband explains about one of his patients and she wants him to have dinner with them. After short meeting at his archaeological site she finds him in his old apartment. She goes deeper in her relationship and they suddenly depart for a short period where she finds that is unbearable.

এবারের উৎসবে এই জাতীয় প্রযোজনার সংখ্যাই বেশি। মাথা উঁচু করে বাঁচার আর্তি, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই আকৃতি প্রায় বিশ্ব জুড়ে। এমন কি তথাকথিত সামাজিক বন্ধন যেখানে দৃঢ় হয় সেখানেও এই জাতীয় প্রযোজনাগুলি বেশ নজর কেড়ে নেয়। তাই Untouched যতটা কঠিন হতে পারে না সেখানে বাহারিনের A woman in dark ততটাই ক্রুদ্ধ তার প্রযোজনায়, সেটা চমকে দেবার মত। এই উৎসবে যদি অভিনয়ের মাপকাঠি দেবার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে এই প্রযোজনার অভিনেত্রী Sudaba Khalifa নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেতেন। মঞ্চে এমন কতগুলি বলিষ্ঠ মুহূর্ত তিনি তৈরি করেছেন দাপটের সাথে যা করে ফেলা সহজ নয়। স্বামীর প্রতি তার প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত তাকে খুন করতে পিছিয়ে আসেনি। ভীষণ ভালো লেগেছে একটা ঝুলন্ত জ্যাকেট - এর ব্যবহার। স্বামী চরিত্রটির নানা আচরণ জ্যাকেটটা ব্যবহার করে প্রকাশ করার কল্পনা সত্যিই সুন্দর। বা শিশু হিসেবে একটি বেলুন, শিশুটির অপমৃত্যুতে বেলুনটি উড়ে যায় অনির্দিষ্টকালের দিকে। পরিচালক Hussain Abd Ali চমৎকৃত করেছেন আমাদের। ছোট ছোট সাজেশন এবং তা দিয়ে মুহূর্ত গড়ার কাজটি অবশ্যই তারিফ যোগ্য। Ebrahim Bahar লিখিত নাটকের বিষয় হিসেবে ছিল, Neema, is a woman who struggles with loneliness and isolation after her husband abandoned her. Her wishes became so intense that she only wants anyone to visit her and a hand to take her off from this isolation. আর এইভাবে এই অসহায়তা দেখি ইরাকের প্রযোজনা ANIAAB-এ। নাটককার Abdurazaq Mohammed তুলে ধরেছেন চিরন্তন এক সমস্যা- ANIAAB is about many issues related to women in Iraq and Kurdistan,

Especially, violence against women as murder, torture and other issues, পরিচালক Najat Najam এবং অভিনেত্রী Laila Fares অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এসব তুলে ধরেছেন তাদের প্রযোজনায় । মোনোড্রোমা হিসেবে এই উৎসবের সেরা কাজের একটি হলো, At Home with will Shakespeare। UK-র Pep Utton এর লিখিত-পরিচালিত - অভিনীত নাটকটি দর্শক সমাদ্রিত এবারের উৎসবে । সারা পৃথিবী জুড়েই শেক্সপিয়রকে নিয়ে নানা দিক থেকে দেখাটা নতুন কিছু নয়, শুধু তাঁর নাটক নয়, মানুষ শেক্সপিয়র নিয়েও নানাভাবে দেখা ও বোঝার চেষ্টার অন্ত নেই বিশ্ব নাট্য জগতে। এই নাট্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। In at home with will Shakespeare ' Pip brings the famous man to life. No longer merely the problem writer of wonderful plays and poetry but a real man who loves, laughs, drinks, sings, dances and cries , and in between has to write some words to make a living. His poems and speeches come alive. It's fun, it's moving, and it involves the audience now and again in the way Pip excels, It's Shakespeare's greatest hits, performed by Shakespeare himself. খুব ভালো অভিনয়ের গুণে , দর্শকদের সাথে সরাসরি কথপোকথনে জমে উঠে প্রযোজনাটি। এভাবে শেক্সপিয়র নিয়ে কাজের ধরনটা বহুল চর্চিত হলে মন্দ হয় না। ইউ কে-র এই প্রযোজনা মনে থেকে যাবে অনেকদিন।

তবে এই প্রযোজনাও বড় নিরাভরণ, একটিমাত্র টেবিল চেয়ার আর সামান্য উপকরণে সাজানো। পোশাক বদলটাই মনে থাকে। বাকি সব এতই নিরাভরণ, মাঝে মাঝে মনে হয়, মনোড্রোমা কি শুধুই একক অভিনয়ের একটা সহজ পথ? টোটাল থিয়েটার বলতে যা বুঝি তা এত ব্রাত্য কেন এখানে। লাইট-মিউজিক-সেট-কস্টিউম সব নিয়ে প্রসেনিয়ামের যে যাদু তৈরি করে থিয়েটার তাকে কি বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের একক অভিনেতারা বাদ দিয়ে কাজ করতে চাইছেন? সহজ পথ করে নিতে চাইছেন? এর কারণ কি, সহজে নানা প্রান্তে পৌঁছে যাবার সহজলভ্য হাতছানির কাছে সমর্পণ নাকি একক নাট্যের সংজ্ঞায় এমনই হওয়া উচিত বলে মনে করছি আমরা। ফুজাইরাহর মত সংগঠন যে সহযোগিতা করেন, সেখানে একটা উড়ে গিয়ে নাটক করে আসবো, এটা তো না ভাবলেই চলে। টোটাল থিয়েটার করবার সব রকম সহযোগিতা তারা করেন। তাহলে? শ্রীলংকা বা গ্রিস বা আরো সামান্য দু একটি দেশ বাদে তেমন জোরালো প্রসেনিয়াম থিয়েটার পেলাম কোথায়? অন্যভাবে নেবেন না। একথাগুলি না ভাবলে মোনোড্রোমা ক্রমশ একঘেয়েমীর শিকার হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত । যদিও একঘেয়েমী ছিল না At home with William Shakespeare বা Qahwa Zataar এর মতো প্রযোজনায়। অভিনয় সব খামতি পুশিয়ে দিয়েছে। সেটা কিন্তু সব সময় হয় না, হবেও না।

এ আলোচনা শেষ করতে চাই নতুন এক আশাবাদের কথা শুনিয়ে । UAE -র প্রযোজনা Al-Mamlok প্রযোজনাটি দেখে ভীষণ উদ্দীপ্ত হলাম এই ভেবে আয়োজক দেশের এত আয়োজন যে তাদের থিয়েটারকেও প্রভাবিত করছে, নতুন প্রজন্ম নিজেদের মত

থিয়েটারের খোঁজ করছেন, এটা বড় আনন্দের। নাটককার- পরিচালক Ahmad Abdullah এবং অভিনেতা Rashed Abdullah Al Khadeem দুজনকেই ধন্যবাদ জানাই তাদের এই প্রচেষ্টার জন্য। According to 'Saad- Allah Wanous' text, this show highlights a serious chapter to a slave who aims to get out from slavery that strangles his dreams. He thinks carefully and take the advantage of his Country's bad situations and tries to solve an issue of the Minister and take a very serious and private letter out of the country, and lives the adventures and the fear. এই রাষ্ট্রে এমন এক বিষয় নির্বাচনটাই বড় চমক আমার কাছে। যেখানে থিয়েটার খুব বেশি চর্চিত নয়, সেখানে এন্টারটেইনমেন্ট থিয়েটারের কথা না ভেবে সিরিয়াস এক বিষয় নির্বাচন করেছেন তারা। নাট্য কাঠামো নিয়ে দ্বিমত হতে পারে, ভালো লেগেছে বা লাগেনি নিয়ে কথা হতে পারে, তবে আলো এবং শব্দ ব্যবহার নিয়ে তারিফ করার মত কাজ করেছেন তারা। আবারও বলি, এই নবীনেরা ঐ দেশের মানচিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলবেন একদিন।

এবারে আই টি আই এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং থাকায় সমাগম জোরদার ছিল, একথা আগেই লিখেছি। সেই সংগে ছিল ইন্টারন্যাশনাল মোনোড্রামা ফোরামের মিটিং। সেখানে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান এই কারণে অন্তত বারো চৌদ্দটি দেশের মোনোড্রামার অবস্থান ও গতি প্রকৃতি নিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন সবাই। এটা বাড়তি পাওনা। এমনকি আমাদের দেশের কথা বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাট্যচর্চায় মোনোড্রামা যে এখনো ব্রাত্য সেটা জানানোর পাশাপাশি বেশকিছু ভালো কাজ হচ্ছে এটা জানানো গেল। সম্ভবত প্রথম তারা জানলেন এ রাজ্যের কথা। আমাদের রাজ্যের প্রতি তাঁদের আগ্রহী করে তোলা গেছে এটা টের পেয়েছিলাম পরের কয়েকদিন উৎসবের মাঝে অনেকেই এখানে আসবার জন্য উৎসাহ দেখান। বিশেষত, সেই মিটিং এ বন্ধু Mahammed Saif Al Afkham যখন সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যান, কলকাতা পুণে ঘুরে আসুন, তখন অশেষ কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। শুধু তাই নয়, আমাকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন সেই ফোরামে। আমি, প্রসাদ, অদিতি মিলে কৃতজ্ঞ রইলাম এই উৎসবের কাছে। আর প্রতিদিন কাছে না পাবার মনোবেদনায় অধীর হবো কত, কত বন্ধুদের, মনে মনে লিখবো, I miss you Ali Mahdi, Dieter Topp Pavlos Kavouras, Marina Vienescu, Mentor Zymberaj, Shaig Safarov, Olga Pozeil, Bolor Naya, Ricardo Abad, Kakumoto Atshusi, Gladys F Agulhas, Reinhard Auer, Steve Karier, Georges Dupont... miss you all.

লেখক : আশিস গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

অতিমারী ও থিয়েটারের যুদ্ধ

শ্যামল ভট্টাচার্য

২০২০ সাল অতিমারীর তাণ্ডবে অবরুদ্ধ করেছে আবিশ্ব থিয়েটারকে। ইতিহাসে থিয়েটার বার বার রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু করোনা সংক্রমণের মত এমন ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের কাছে থিয়েটারকে এমন নি:শর্ত আত্মসমর্পণ অতীতে করতে হয়নি। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহগুলি শূন্য অন্ধকার। থিয়েটারমুখী মানুষ সুদীর্ঘ অপেক্ষায় আবার কবে আলোকিত হবে মঞ্চ।

এটা যদি হতাশার কথা হয় তাহলে ফিরে তাকাতে হবে সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের থিয়েটারের দিকে। এলিজাবেথান এবং জেকবিয়ান যুগে থিয়েটার ঘন ঘন বন্ধ হয়েছে ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি এবং গণ অভ্যুত্থানের কারণে। বারবার থিয়েটারের ওপর নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞা। তা সত্বেও ওরসেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটারের অধ্যাপিকা Claire Cochrane বলেছেন যে থিয়েটারের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি একেবারে অদৃষ্টপূর্ব। এই পরিস্থিতির তুলনা করা যায় কেবলমাত্র ষোড়শ শতকের এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বে ভয়ঙ্কর প্লেগ সংক্রমণের সঙ্গে। অবশ্যই তারপরেও আরও বৃহত্তর মহামারী দেখা গেছে ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৬ পর্যন্ত। উভয় ক্ষেত্রেই নাটকের মঞ্চ জনস্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থেই সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। যদি আপনারা শেক্সপীয়ারের সময়ের কথা ভাবেন, দেখবেন তখন বিপুল দর্শক সমাগম ছিল, এখন কিন্তু সে তুলনায় অনেক কম দর্শক আসেন। তৎকালীন বিপুল দর্শক সমাগমের কারণে প্লেগ দ্রুত ছড়িয়ে পরত ভয়ঙ্কর মাত্রায়। সেই কারণেই ঘন ঘন মহামারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রিভি কাউন্সিলকে ঘোষণা করতে হয়েছিল যে যখন প্রতি সপ্তাহে ৩০ জনের বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন, তখন প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ রাখতে হবে।

১৬০৩ থেকে ১৬১৩ এই এক দশকের মধ্যে প্লেগের মত মহামারীর কারণে থিয়েটার বন্ধ ছিল মোট ৭৮ মাস- এই তথ্য জানিয়েছেন উইলিয়াম বেকার। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর Neil McGregor বলছেন, “শেক্সপিয়ারের জীবন একেবারে শুরু থেকেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল প্লেগের তাণ্ডব লীলায়। তাঁর পেশাগত জীবন নির্ধারিত হয়ে গেছিল এই প্লেগেরই আবির্ভাবে।”১৫৬৪ সালে, ঠিক শেক্সপিয়ারের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁর জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড -আপন-এভনের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মারা গিয়েছিল মহামারীতে। ১৫৯২ সালে যখন লণ্ডনের অধিবাসীদের প্রতি ১২ জনে ১ জন করে মারা যাচ্ছেন সংক্রমণে, তখন দ্রুততার সাথে সমস্ত থিয়েটার হলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই শেক্সপিয়ার নাটক লেখা বন্ধ করে দৃষ্টি ঘোরালেন কাব্যের দিকে, লিখলেন, Venus and Adonis এবং The Rape of Lucrece। নাট্য গবেষকরা বলছেন, বাড়িতে বসে অবিশ্রাম লিখে যাওয়া ছাড়া যখন আর কোনও কাজ নেই তখন শেক্সপিয়ার ধারাবাহিকভাবে ঘরে বসে কবিতা লিখে চলেছেন। যখন লণ্ডনে প্রতি পাঁচজনে

একজন প্লেগ আক্রমণে মারা যাচ্ছেন তখন থিয়েটার বন্ধ রেখে বহু মানুষের মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সেই সময়ে অভিনেতা, নাট্যকার, মঞ্চশিল্পী কারোর হাতেই কোনও কাজ নেই। স্বয়ং শেক্সপিয়ার মঞ্চ শিল্পীদের নিয়ে সুদূর গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনে বেরিয়ে পরতেন। কিন্তু হায়, বর্তমান বিশ্বে আজ আর আমাদের যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। প্লেগের ভাইরাস ছিল ভয়ংকর দীর্ঘস্থায়ী। বহু দেশে থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এই ঘটনা ছিল থিয়েটারজীবীদের পক্ষে এক কঠিন লড়াই। থিয়েটার যাদের জীবিকা তাদের জন্যে কোনও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না। এর পেছনে অন্যতম কারণ হল গোঁড়া পিউড়িটানিজম মাথা চাড়া দিয়েছিল ব্রিটেন জুড়ে। আর একটি কারণ হল সেই সময়ে প্রশাসন থিয়েটারকে ভালো নজরে দেখতেন না। তারা মনে করতেন থিয়েটারে মানুষের জমায়েত চুরি করা, বেশ্যাবৃত্তি করা এবং রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম ক্ষেত্র। তাই তারা থিয়েটার বন্ধ করে রাখার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিতেন।

১৬০৪ সালে প্লেগ সংক্রমণ কাটিয়ে উঠে যখন থিয়েটারের দ্বার উন্মুক্ত হল তখন দর্শক এবং অভিনেতারা স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে থিয়েটারের পরিবেশ আর আগের মত নেই। মানুষের মৃত্যু মিছিল আর সংক্রমণের আতঙ্ক জনজীবনের সামাজিক চরিত্রটাই বদলে দিয়েছে। তাই নতুন করে আবার ভাবতে হবে, নতুন পরিস্থিতির উপযোগী থিয়েটার গড়ে তুলতে হবে। এই একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ১৬৬৫ সালে ইংল্যান্ডে সর্বশেষ বৃহত্তর প্লেগ সংক্রমণের সময়ে যখন আবারও সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। অর্থাৎ ইতিহাস বলছে যে ষোড়শ শতক থেকেই এক একটা মহামারী থিয়েটারের অভিমুখ বার বার বদলে দিয়ে গেছে।

আমরা ভারতবর্ষে দখছি প্রায় সমস্ত প্রদেশে আজ থিয়েটার অবরুদ্ধ। বেশিরভাগ শিল্পীরা যারা নানাভাবে মঞ্চের সাথে যুক্ত তারা লকডাউন পর্বে বাড়িতে বসেই ঘরেই মঞ্চ সজ্জা নির্মাণ করছেন। ঘরে বসেই নানান শিল্প মাধ্যমে তারা কাজ করে চলেছেন। বাঙ্গালুরুতে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীরা এখনও জানেন না কবে আবার তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে রঙ্গ শংকরা, জাগৃতি, সুচিত্রা সিনেমা, কালচারাল একাডেমি এবং বাঙ্গালোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, তার আগেই সকলেই যুক্ত হয়েছেন করোনা সংক্রমনের আতঙ্ককে জয় করতে এক যৌথ কর্ম উদ্যোগে।

সকলে মিলে একই ছাতার তলায় এসে কাজ করবার সংকল্প নিয়ে সমবেত হয়েছেন, যে ছাতার নাম B-SAFE অর্থাৎ Bengaluru- Spaces for Arts, Films and Events.তারা বলছেন, "We understand the current circumstances, and why permission has not yet been given to culture spaces to reopen. However, this puts strain on the livelihood of creative artists and the financial sustainability of the physical spaces. The collective will have uniform norms for all punlic spaces, making it easy for people to recognize and follow them". কিছু জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।এই স্পেসে থিয়েটার যারা দেখতে আসবেন

তাদের প্রত্যেকের নাম এবং মোবাইল নাম্বার নথিভুক্ত করা হবে হলে ঢোকা এবং বেরোবার সময় । অভিনয় স্থল নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শিল্পীকে ধারাবাহিকভাবে রেপিড টেস্ট করতে হবে। পাশাপাশি দর্শক আসন ৩০ শতাংশের বেশি অথবা ৫০ জনের বেশি পূরণ করা যাবে না। ওরা বলেছেন যে সাধারণভাবে নিয়মিত নাটক দেখতে আসা দর্শকেরা অধিকাংশই প্রবীণ নাগরিক। তারা নিশ্চয়ই নাটক দেখতে আসার আগে বার বার ভাববেন। নাটক উপভোগ করার পাশাপাশি নিরাপত্তার ও সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় রাখতে হবে।

আমাদের স্মরণে আছে ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু কীভাবে আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল থিয়েটার হয়েছিল অবরুদ্ধ। যদিও আমেরিকাতে থিয়েটার এই প্রথম বন্ধ হল তা নয় আরও অনেক বিপর্যয়ে প্রেক্ষাগৃহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। বিশেষ করে ৯/১১ ঘটনার পর বহুকাল বন্ধ রাখা হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহগুলি।

আসলে এই সংক্রমণের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদের আজ থেকে ১০০ বছর আগে পিছিয়ে যেতে হবে। তখন মনে করা হত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে ফেরা সৈনিকরা যেখানে যেখানে গেছেন সেখানেই ফ্লু ছড়িয়েছেন। সুতরাং বিষয়টা যুদ্ধ অর্থাৎ প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিষয়। কিন্তু মার্কিনী সেনারা যখন দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরেছিল, তখন কিন্তু রোগটা অতিমারীর আকার ধারণ করল। যদিও এই অতিমারীকে স্প্যানিশ ফ্লু নামে অভিহিত করা হয়, তথাপি ঐতিহাসিকরা এবং মহামারী বিশেষজ্ঞরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন যে এই রোগের উৎসস্থল ছিল ক্যানসাস। তবুও যে নাম হল স্প্যানিশ ফ্লু, তার কারণ ছিল অন্য।

সেই সময় স্পেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। স্পেনে প্রচার মাধ্যমের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। তাই স্পেনের রাজা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন সমস্ত প্রচার মাধ্যমেই খবরটা ছাপা হল। বিশ্বের বহু দেশ কিন্তু এই প্রথম জানল যে স্পেনে রাজা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তার মানে স্পেন থেকেই রোগটা ছড়িয়েছে। প্রথম দিকে আমেরিকার প্রশাসন বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পরে যখন ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সংক্রমণ লাগাম ছাড়া হয়ে পড়ল তখনও প্রশাসনের কোনও উদ্যোগই মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হল না। সেপ্টেম্বরে যখন এর ভয়াবহতা প্রকাশ পেতে শুরু করলো তখন ফিলাডেলফিয়ার মেয়র লিবার্টি লোন প্যারেডের মত সুবিশাল পদযাত্রার অনুমতি বাতিল করলেন। পত্র পত্রিকায় জনসমাবেশের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়াতে পারে এমন ধারাবাহিক সতর্কবার্তা প্রচার হতে থাকলো। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার সেই মহা মিছিলের ছয় সপ্তাহ বাদেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেল ১২ হাজার মানুষ । অক্টোবর মাসে মানুষ প্রত্যক্ষ করল মৃত্যু মিছিল। আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য কোন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসাকেন্দ্রে আর স্থান সংকুলান হল না। মৃতদেহ সৎকার করার মত মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না। মাত্র ১০ মাসের মধ্যে ৬ লক্ষ

৭০ হাজার মানুষ মারা গেল। পরের বছর ১৯১৯ সালে এই ফ্লুয়ের প্রকোপ কমতে থাকে এবং গ্রীষ্মকাল আসার পর ফ্লু আর দেখা যায়নি।

তবে ১৯১৮ সালের এই অতিমারী অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে থিয়েটারকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। থিয়েটারের গুরুত্ব বোঝা গেছিল থিয়েটার বন্ধ হওয়ার আদেশ জারির পর। সমস্ত প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমের প্রচার ছিল, " সব গির্জা, সব স্কুল ও সব থিয়েটার বন্ধ রাখার আদেশ জারি অর্থাৎ জাতীয় জীবনে শিক্ষা, ধর্ম ও থিয়েটার সব থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল । ১৩ অক্টোবর, দ্য মিনিয়াপোলিস মনিট্রি বিউন লিখেছিল .... "গতকাল রাতে থিয়েটার গুলির দর্শক আসন ছিল পূর্ণ। নিষেধাজ্ঞা চালু হবার আগের রাতে নাটকের শেষ প্রদর্শনীটি দেখতে মানুষ ভিড় করে এসেছিল। সন্ধ্যা নামার অনেক আগেই লম্বা লাইন লেগে যায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে ভদভিল (vaudeville) থিয়েটারের সামনে।" ঝুঁকি নিয়েছেন বিপুল দর্শকমণ্ডলী । বন্ধ হয়ে যাওয়া থিয়েটার সাংঘাতিক আঘাত নামিয়ে এনেছিল থিয়েটারজীবী অভিনেতা ও কলাকুশলীদের জীবন ও জীবিকার ওপর। মূলত থিয়েটারের প্রযোজক অথবা প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের আর্থিক লোকসান দৈনিক সংবাদে স্থান পাচ্ছিল।

সেইসব বিপুল ক্ষতি পূরণ হওয়ার কোনও উপায় ছিল না। দ্য ইভিনিং বুলেটিন মোটামুটি একটা খসড়া হিসাবে জানিয়েছিল, থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২০০০০০ ডলার। ২০২০ সালের হিসাবে এটা ছিল ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের সমতুল্য।

এ বছরে এখনও পর্যন্ত এই ক্ষতির পরিমাণ ৮ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। থিয়েটার মহলে প্রবল ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে যে মদের দোকানে, পানশালাতে, হাটে বাজারে, শপিং মলে বহু মানুষের জমায়েত ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে, অথচ থিয়েটার বন্ধ রাখা হচ্ছে। থিয়েটার ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ফ্র্যাঙ্ক এ ম্যাকডোনাল্ড এবং তার ২৫ জন সহকর্মী একটি সিটি কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সকলেই তারা মাস্ক পরেই গেছিলেন। সেই আলোচনাতে তারা থিয়েটার বন্ধ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু দাবি তোলেন। তারা বলেন যে সরকারি দপ্তরগুলি খোলা, পার্ক খোলা, বাজার খোলা, এসব জায়গায় বহু মানুষ জড়ো হচ্ছেন। অথচ স্কুল, চার্চ ও থিয়েটার বন্ধ রাখা হয়েছে। তারা দাবি করেন ওইসব ক্ষেত্রগুলি অবিলম্বে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে হবে। পরবর্তী কালে তারাএই বিষয়ে একটি মামলাও দায়ের করেন। তবে থিয়েটার হলগুলি কিছুকাল বাদে খুলে যাওয়ার পর মামলাটি পরিত্যক্ত হয়।

লেখক : শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। কলকাতা থেকে প্রকাশিত নাট্যপত্র "গণনাট্য"-এর সম্পাদক।

সেদিন থেকে আজ- নাট্যপত্রিকা নিয়ে কিছু কথা

দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়

সৃষ্টির সেই শুরুর সময় থেকে মনুষ্য সমাজে সৃজনশীলতার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। একথাকে অত্যুক্তি বিচার করা সম্ভবত: সঠিক হবে না। কারণ মানুষের মুখে যখন ভাষা আসেনি তখন তারা বিচিত্র শব্দাবলি ও আঙ্গিক ইশারায় নিজেদের ভাব বিনিময় বা মত বিনিময় করত। বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল সেই কর্মকাণ্ড। সেটাও ছিল একধরনের সৃজন কর্ম। সময়ান্তরে এলো ভাষা। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাও হলো উন্নত থেকে উন্নততর। সেই ভাষা অবলম্বন করেই পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডে মানুষের বহু ধরণের সৃজন ক্রম পল্লবিত হতে থাকল। মানুষের জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলির সমাধানের উত্তর পর্বে এলো বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা। বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাই সৃষ্টি এবং সৃজনের পথকে করল প্রসারিত। বহুধা বিস্তৃত। এ কোনও স্বল্প সময়ের রূপকথার কাহিনী নয়, হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে তবেই সেসব ইতিহাসের আঙ্গিনায় গৌরবময় কালাতিপাত। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের মানুষের জীবন বৈচিত্র্য , সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সভ্যতার কষ্টিপাথরে নব নব রূপে প্রতীয়মান হয়েছে। ভাবনার বহুমুখীনতা ও বহুত্ববাদের দর্শন আশ্রয় করে মানুষের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড অত্যুচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে নিরন্তর সচেষ্ট থেকেছে। মানুষের জীবনের বহু ধরনের প্রবৃত্তি, সংকট,অনুভূতি,দর্শন ধীরে ধীরে স্থান করে নিয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে। সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে জীবনমুখী, বর্ণময়। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, জায়গা করে নিয়েছে সমাজ সংকট, ব্যক্তিসংকট এবং এরই পাশাপাশি প্রতিবাদের দিশাও চিহ্নিত হয়েছে।

ফুলের সাজিতে যেমন বহুবর্ণের, বহুধরনের ফুল থাকে, তেমনই সংস্কৃতি হলো বহুধরনের এবং বহুমাত্রিক সৃজন কর্মের সমাহার। কাব্য,গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, কথাসাহিত্য এবং নাট্য ছাড়াও আরও অনেক ধারা সেখানে বর্তমান। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চার প্রাথমিক অবস্থা থেকে যত উত্তরণ ঘটেছে, অনুভূত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা। পৃথিবীর বহু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো আমাদের দেশেও এই ভাবনার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের দেশে সেই শুরুর কালে মূলত: ব্যক্তি উদ্যোগে এবং বিভিন্ন ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতির অঙ্গনে বিভিন্ন ধারার কিছু মুখপত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কালের নিয়মেই হয়তো তাদের স্থায়িত্বে ইতি ঘটেছে। কিন্তু শূন্যস্থানকে পূর্ণ করতে যুগ যুগ ধরে নতুন নতুন মুখপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা তো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, আজও নেই। বহু সংকট, বহুমন্বন্তর, বহুমারি, বহুযুদ্ধ পেরিয়ে পেরিয়ে মানব ইতিহাস রচিত হয়েছে এবং আজও সেইধারা প্রবহমান। সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় সেই নেতির প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে নাট্যে।

বাংলার বুকে থিয়েটার চর্চা পঞ্চাশের দশকের আগের বিচারে যে চেহারায় ছিল উত্তর পঞ্চাশে তার চেহারায় অনেকটাই পরিবর্তন ঘটে গেছিল। সমাজ, অর্থনীতি, বিভিন্ন সংকট এবং অবশ্যই সময়ের দাবিতেই থিয়েটার নিছক বিনোদনের পথ থেকে ক্রমশ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করল। সে এক অনন্য ইতিহাস। সেই ইতিহাসের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল মুখপত্র বা নাট্যবিষয়ক পত্র পত্রিকার ইতিহাস। কিছু নাটক প্রকাশ, প্রযোজিত নাটক সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি অনুভূত হলো নাট্যশিক্ষার্থীদের নাট্যের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং নাট্যআন্দোলনকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করার উদ্যোগ। ফলে নাট্য বিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলি হয়ে উঠল নাট্যআন্দোলনের দর্পণ। উনিশ শতকে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্র (সর্বাংশ নাট্যপত্র নয়) ইংরাজি বা বাংলাভাষায় প্রকাশিত হতো। যেগুলিতে তখনকার দিনে প্রযোজিত নাটক,তার অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা হতো। নাটকও ছাপা হতো। সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' (ইংরাজি), 'বেঙ্গল হরকরা' , 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ ভাস্কর', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইত্যাদি। ১৮৭৫ এ প্রকাশিত 'সাধারণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কলকাতার বাইরে বহরমপুরে 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার' -এর 'অভিনয়ের সংবাদ' । প্রায় সমসময়ে মনোমোহন বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ছাপা হল 'নীলদর্পণ', 'লীলাবতী', 'নবীন তপস্বিনী', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি মঞ্চস্থ নাটকগুলির বিশ্লেষণী আলোচনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঙালির নিজস্ব এক নাট্যশালার দাবির স্বপক্ষে ১৮২৬ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকার'- সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ হয়। ১৮০১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু থিয়েটার'- বাঙালির প্রথম নাট্যশালা। এই সংবাদটি প্রথম প্রকাশ্যে আনে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ১৮৩১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় 'সোমপ্রকাশ'। যদিও সোমপ্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, এর মূল কারিগর ছিলেন বিদ্যাসাগর। অন্তত: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবরাম শাস্ত্রী তেমনই মত প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক আলোচনা প্রচার করা। এই 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিও নাট্যচর্চার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালীন নাটকের দর্শকরাও ওই পত্রিকায়, মঞ্চস্থ নাটক দেখে নাটক সম্পর্কে মতামত জানিয়ে চিঠি লিখতেন এবং সেগুলি ছাপা হতো। সেই পত্রিকায় "স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসুরা যে ধরনের সুক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণধর্মী নাট্য আলোচনার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তুলনা আজও দুর্লভ।"

১৮৯০ এ প্রকাশিত 'মজলিশ' পত্রিকাও নাট্যবিষয়ক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিল। বাংলা ১৩০২ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সৌরভ' পত্রিকা। এতে প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা ছাড়াও নাট্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছাপা হতো। তবে দুই বা তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর এই পত্রিকা স্থায়ী হয়নি।

বাংলাভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক নাট্যপত্রিকা 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। "অমরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটি নাট্যজগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ গড়ে তোলে।" এই সময় পত্রিকাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু স্থায়িত্ব ছিল মাত্র চার বছর। কিন্তু অল্প কয়েকটি সংখ্যাতেই লেখালেখির মান ছিল বেশ উন্নত এবং যথেষ্ট শিক্ষণীয়। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' নাটকের তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও 'বিদেশী রঙ্গালয়' অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা, মঞ্চে ব্যবহৃত সংগীত, দৃশ্যসজ্জা, নাচের ব্যবহার, শব্দ প্রক্ষেপণ ইত্যাদি থিয়েটার সংক্রান্ত দিকগুলি আলোচিত হতো।"

১৯১০ সালে অমরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট আর্থিক সংকটের মধ্যে থেকেও প্রকাশ করলেন 'বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা'— 'নাট্যমন্দির'। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'নাট্যমন্দির' লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই পত্রিকার সম্পাদক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত 'নাট্যানন্দ শর্মা' ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তারই কয়েকটি হলো,'দ্বিজেন্দ্রলাল', 'নাট্য রহস্য', 'নাট্যকারের নিয়তি', 'রুশ অভিনেত্রী অ্যানা পাভলোভা', 'সঞ্জীবনী ও সখের অভিনয়', ইত্যাদি। 'নাট্যসংগীত' শিরোনামে বিশিষ্ট সংগীতাচার্য দেবকণ্ঠ বাগচি এই পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন। দশ পর্বে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লিখেছিলেন কিরণচন্দ্র দত্ত। এছাড়াও গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ - এর মতো মানুষদের লেখায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও মূল্যবান হয়ে উঠেছিল 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা। বলা যায় সর্ব অর্থেই একটি সার্থক নাট্যপত্রিকা ছিল 'নাট্যমন্দির।' মাত্র ছয়বছর স্থায়ী হয়েছিল এই পত্রিকা।

প্রায় একই সময়ে আর একটি পত্রিকার নাম পাওয়া যায় - রঙ্গমঞ্চ। ১৯১০ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আবার বসুমতি পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। অর্থাৎ নাট্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগের পিছনে মূল ভাবনাটাই ছিল নাটকের প্রচার ও প্রসার। সেক্ষেত্রে সমসাময়িক বহু বিদগ্ধ মানুষ তাদের কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন সেই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে। সময়ের বিচারে সেই উদ্যোগ এবং বিদগ্ধ মানুষদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

১৯১৩ সালে প্রকাশিত আর একটি পত্রিকার সন্ধানপাওয়া যায়- 'নাট্য পত্রিকা'। এটি মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু একটিই সংখ্যা প্রকাশিত হয়- সেটিই প্রথম, এবং সেটিই শেষ। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অদ্ভূত -মাত্র চারটি নাটক, 'ড্যনক্যান চরিত', 'হাসনবাবু', 'ইছামতি নাটক' এবং 'আশা বিভ্রাট'। কোনও নাটকেই নাট্যকারের নাম নেই এবং প্রত্যেকটি নাটকই 'ক্রমশঃ' দিয়ে শেষ হয়েছে। একেবারে শুরুতে আছে 'আশা' নামে একটি কবিতা। সম্পাদক জনৈক নারায়ণ চন্দ্র সেন পত্রিকার শুরুতে 'আমার নিবেদন' এ বলেছেন- " ... নানাবিধ উপন্যাস ও ঐতিহাসিক ঘটনা এবং পণ্ডিত মহোদয়গণের পুস্তক সকল হইতে ভাবার্থ সংগ্রহণ করিয়া নাট্যাকারে লিখিত হইয়া এই পত্রিকায় প্রকাশিত

হইবেক।”- অর্থাৎ চারটি নাটকই সম্ভবত তাঁরই লেখা। ‘আমার নিবেদন’— শেষ হয়েছে এই ভাবে — ‘সাহায্য প্রার্থীকারী/আপনাদের অনুগত ভৃত্য /শ্রী মূর্খনারায়ণ সেন/২৪নং রতন সরকার গার্ডেন লেন/কলকাতা’। পত্রিকার শেষ পাতায় নিয়মাবলীতে যা লেখা তার থেকে বোঝা যায় পরিকল্পনা ছিল মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করার এবং লভ্যাংশের টাকা কাঙালী ভোজনে ব্যয় করার।

নাট্যচর্চার পাশাপাশি পত্রিকা, বিশেষ করে নাট্যবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বহুসংখ্যক পত্রিকার সন্ধান মেলে না। আবার সেই সকল পত্রিকায় স্থায়িত্বের তেমন ধারাবাহিকতাও পরিলক্ষিত হয় না। নাট্যমোদি বা নাট্যশিক্ষার্থীরা কতটা আগ্রহী ছিলেন পত্রপত্রিকা বিষয়ে সেটা অবশ্যই গবেষণার বিষয়। পত্রিকাগুলিতে নাটকের পাশাপাশি যাত্রাপালা, লোটোগান , কবিগান ইত্যকার বিষয়ে লেখা হলেও মূলত: শহরকেন্দ্রিক উদ্যোগ গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অংশে সেভাবে প্রসারিত হবার সুযোগ পায়নি।শহরের সাধারণ মানুষরাও সম্ভবত: পত্রিকা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

এই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে - ‘১৮৩৫ থেকে ১৯৩০ সাল, এই সময়কাল বাংলা থিয়েটার এক তীব্র ঘাতপ্রতিঘাতময় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করলেও তার তরফে কেবল নাট্যবিষয়ক পত্রিকার কথা কারও মাথায় উদয় হয়নি.... ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই যেসব পত্রিকা ও দৈনিকপত্র প্রকাশিত হতো , তাতেই নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক মাধ্যমটির যতখানি গুরুত্ব সেই যুগের পক্ষে বিবেচিত হত, সেই গুরুত্ব বিবেচনায় বিজ্ঞাপন, সংবাদ , নাট্য সমালোচনা, নিবন্ধ এবং প্রাসঙ্গিক বাদানুবাদ মাঝে মধ্যেই প্রকাশ পেত। ’

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নৃপেন্দ্র সাহা প্রসঙ্গক্রমে সঠিক ভাবেই মত প্রকাশ করেছেন যে, “ বাংলার থিয়েটার গড়ার আন্দোলনে উনিশ শতকীয় নাট্য সাংবাদিকতা সাধারণ পত্রপত্রিকাকে আশ্রয় করে যেভাবে গড়ে উঠেছিল, তা সঠিকভাবেই যুগোচিত ও যুগোত্তীর্ণ চেতনার মাপ কাঠিতে গড়ে উঠেছিল। .... বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণের পূর্বে পৃথক কোনও নাট্য পত্রিকার প্রয়োজন বা পরিকল্পনা কারোর চিন্তায় উদয় হয়নি ..... সেকালের নাট্য জগতের যাঁরা শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রয়োগকর্ম ও নাট্য রচনার সঙ্গে এত বেশি ব্যস্ত থাকতেন যে নিজেদের থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতেই বেশি সময় দিতেন। নাট্যপত্রিকা চালানোর মতো সময় তাঁরা বের করতে পারতেন না।”

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ স্থাপনের পর বাংলার সংস্কৃতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই এল নব নব সৃজনের জোয়ার। আক্ষরিক অর্থেই নাটক হয়ে উঠল আন্দোলন। নাট্যচর্চা যতটা প্রাণ পেলো বা ক্রমপ্রসারিত হলো, সেই তুলনায় নাট্য বিষয়ক পত্রিকার নব নব উদ্যোগ খুব বেশি করে নজরে এলো না। সেকালের সংগঠকদের হয়তো মনে হয়েছিল আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে প্রদর্শশিল্পকে মানুষের সামনে হাজির করা বেশি জরুরি। ‘পঞ্চাশের দশকের সামাজিক অভিঘাত গণনাট্য সংঘের ছত্রছায়ায় সঙ্গীতে

নাটকে নৃত্যে চিত্রাঙ্কনে অন্য এক বদল ঘটিয়ে ফেলেছিল।' সময়ের দাবিতে সেটাই ছিল সঠিক কাজ।

গণনাট্য সংঘই প্রথম পথ দেখালো। গণনাট্য সংঘের মুখপাত্র হিসাবে ১৯৪৯ সালে বীরেন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশ পেল 'লোকনাট্য'। ঠিক দু'বছর পর দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন 'নাট্যলোক'।

আবার ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হলো 'গণনাট্য', সম্পাদনায় ছিলেন সলিল চৌধুরী এবং ১৯৫৪ তে বেরুলো 'নাট্য' বুলেটিন আকারে।

পত্রিকাগুলিতে সমকালীন নাট্য আন্দোলন সম্পর্কিত বিষয়ই সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। 'লোকনাট্য' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখা হয়েছিল.... " গণনাট্য সংঘ ঘোষণা করেছে , গণনাট্য সংঘ গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিবিরের দলভূক্ত সংগ্রামী মজদুর, কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের যে গণতন্ত্রের লড়াই- সাম্যবাদের লড়াই তারই একধর্মী, গণনাট্যসংঘ আন্দোলনকে এই আদর্শে গড়তে শপথ নিয়েছে। " এটাই ছিল পত্রিকার ভাবাদর্শ। এই ধরনের আদর্শ ভিত্তিক যে পত্রিকা তাকে তৎকালীন দক্ষিণপন্থী শাসক সহ্য করবে কেন- যথারীতি তাকে বন্ধ করা হয়েছিল।

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাট্যলোক' প্রকাশ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন- " ... মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপুষ্ট ও উন্নততর করতে হলে শিল্পকলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন নতুন নতুন সৃষ্টি প্রয়োজন, তেমনি সেই সকল সৃষ্টিকে সুসঙ্গত , সুপরিচালিত এবং সেগুলোর যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য একাধিক সাংস্কৃতিক মুখপত্রের দরকার। যুগের দাবিতে এই শ্রেণীর পত্রিকা জন্মলাভ করে এবং নতুন যুগের দাবি পূরণের সংকল্প নিয়েই আত্মপ্রকাশ করল....."

১৯৫৪ তে প্রকাশিত 'নাট্য' পত্র থেকে জানা যায় সেই সময়ে তিরিশটির মত নাট্যদল যে মিলিত সংগঠন তৈরি করেছিলেন সেই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ি, নির্মল ঘোষ, সুধী প্রধান প্রমুখ। 'নাট্য' পত্রিকার 'নাট্য কি ও কেন' শীর্ষক একটি লেখায় গিরিশঙ্কর মন্তব্য করেছিলেন"... বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলন বর্তমানে যে ব্যাপ্তি লাভ করেছে তার পক্ষে একটি শক্তিশালী নাট্যপত্রিকা অবশ্য প্রয়োজন। মুখপত্রের অভাব নাট্য আন্দোলনের একটি বড় দুর্বলতা....।"

১৯৫২ তে প্রকাশিত গণনাট্যে উৎপল দত্ত একটি প্রবন্ধে (গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা) লেখেন " গণনাট্য আন্দোলনের দুটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে, যার একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ধরা যায়না.... প্রথম হলো গণনাট্যের দর্শক আর দ্বিতীয় তার নাটক বা বিষয়বস্তু.... ইদানিং গণনাট্য মঞ্চে ভূত প্রেতের যে অপূর্ব সমাবেশ করা হয়েছে তা সত্যিই হাস্যকর। প্রগতি নাট্য আন্দোলনের এই অবনতি ভীষণ পীড়াদায়ক।" এই ধরনের আত্ম সমালোচনায় মুখর লেখা তৎকালে বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। একটা অন্য সুর যেন কোথাও অনুভূত হচ্ছিল। ১৯৬৪ সালে চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায় যে 'গণনাট্য' প্রকাশিত

হয় ১৯৬৫তে মন্মথ রায় সেই পত্রিকায় লিখলেন "আজকের এই নবনাট্য আন্দোলন বুড়ো হয়ে পড়েছে। আর এক নবনাট্য আন্দোলনের পদক্ষেপ অনিবার্যভাবেই সমাসন্ন।.... দেশের ও সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজকের নাট্য আন্দোলনের ধারাটি যে নতুন খাতে প্রবাহিত করা আবশ্যক, সেটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রের খাত। একটি সমাজতন্ত্রী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারলে আমার এই অস্তায়মান জীবন তৃপ্ত হত।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গণনাট্যকে এড়িয়ে এই সময় অন্য এক ধারার নাট্য আন্দোলন ক্রমশ: সক্রিয় হচ্ছিল ।

সম সময়ের এক উজ্জ্বল নাট্যপত্র 'গন্ধর্ব' ১৯৫৯ এ নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত এই পত্রিকা থিয়েটারকে কিছুটা ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছিল। এই পত্রিকায় বহু কবি ও কাহিনীকার নাটক লিখেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও অনুদিত নাটকের মাধ্যমে বিশ্ব থিয়েটারের সঙ্গে এখানকার থিয়েটারের পরিচয় ঘটিয়েছিল, 'গন্ধর্ব' সর্ব অর্থেই থিয়েটার সংক্রান্ত পত্রিকায় এক অন্য মাত্রা যুক্ত করেছিল। 'গন্ধর্ব' এর আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'থিয়েটার' পত্রিকা। দাবি করা হয়েছিল- 'নাটক দেখানো ও নাটক দেখা সম্বন্ধে সবরকম তথ্য, সংবাদ, আলোচনা ও সমালোচনার জন্য একটি সচেতন পাক্ষিক পত্রিকা।' সামান্য এক বছরের স্থায়িত্ব কাল হলেও পত্রিকাটির আকাঙ্খা ছিল- মুক্তবুদ্ধি সংস্কারমুক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্র রূপেই এই নাট্যশালাকে গড়ে তুলতে হবে। যে ব্যবস্থায় যে পন্থায় তা সম্ভব হয়, তাই কাম্য।

'গন্ধর্ব' এর পূর্বেই প্রকাশিত হয় 'বহুরূপী'(১৯৫৫), 'পাদপ্রদীপ', 'প্রসেনিয়াম'(১৯৫৬), 'মঞ্চকথা'(১৯৫৭), 'নতুন থিয়েটার' (১৯৬০), 'রূপকার' (১৯৬১), 'শৌভনিক' (১৯৬৩), 'এপিক থিয়েটার. (১৯৬৪) । তাদের সম্পাদকরা ছিলেন যথাক্রমে গঙ্গাপ্রসাদ বসু, উৎপল দত্ত, সমরেন্দ্র সরকার, 'মঞ্চকথা'র সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। চিররঞ্জন দাস, 'রূপকার' ও 'শৌভনিক'-এর সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। উৎপল দত্ত সম্পাদনায় ছিলেন 'এপিক থিয়েটার'- এর।

১৯৬৮ তে ঋত্বিক ঘটকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'অভিনয় দর্পণ'। সমসাময়িক সুপরিচিত পত্রিকাগুলি থেকে এর দর্শন ছিল ভিন্ন। সম্পাদকীয়ই তার প্রমাণ। ঋত্বিক লিখলেন-'আমরা অবশ্য আমাদের মতামতকে অন্য কাহারও ওপর চাপাইয়া দিতে চাহি না।' ..'কোনও শিল্পই নিরালম্ব বায়ুভূত নহে, তাহার একটি বাতাবরণ আছে। ইহা মানবজীবনের সম্পর্কে আত্মীয়। সব শিল্পই সৌন্দর্য নির্ভর কিন্তু সত্য নির্ভর না হইলে তাহা শিল্প হয় না'....। আসলে নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ঋত্বিক একমত ছিলেন না। তিনি গভীর বিশ্বাস করতেন শিল্প কখনও শ্রেণী বহির্ভূত হতে পারে না। 'অভিনয় দর্পণ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল বাংলার নাট্যচর্চাকে উজ্জীবিত করা। সেই সময়ে নাট্য মহলের বেশি নজর ছিল শহর কলকাতার থিয়েটারের উপর। গ্রামবাংলার নাট্যদলগুলির প্রতি শহুরে নাট্যজনের ঔদাসিন্যের তীব্র নিন্দা করেছিল 'অভিনয় দর্পণ'।

কিছুকাল পরে এই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অভিনয়' পত্রিকা। মতাদর্শ সেই একই থেকে যায়। সময়ান্তরে পত্রিকাটির মধ্যে অতিবাম ঝোঁক নজরে পড়ে। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে বিশ্বদেব দত্ত'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার অর্ণব' পত্রিকা। খুবই অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। কখনও ছোটো পুস্তিকা আকারে, কখনও ট্যাবলয়েড আকারে। বিশ্বদেব দত্ত'র মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি।

সত্তর দশকের অতিবাম ও দক্ষিণপন্থী বিভীষিকাময় সন্ত্রাসের অবসান ঘটল ১৯৭৭ এ। বাংলার মানুষ নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। ১৯৭৮ এ রমন মহেশ্বরী ও নৃপেন্দ্র সাহা 'গন্ধর্ব'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন পত্রিকার জন্ম দিলেন - 'গ্রুপ থিয়েটার।' সংকল্প ছিল 'সমবেত শিল্প নিয়ে সমবেত প্রতিরোধ'। সম্পাদকীয়তে বলা হলো বহু ধরনের রাষ্ট্রীয় তান্ডবের শিকার হয়েছে মধ্যবিত্ত থিয়েটার কর্মীরা, পাশাপাশি প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তের থিয়েটার চল্লিশের দশকের শেষে ৫০-৬০ এর দশকে এসে গণনাট্যের মূল ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ৭০ এর দশকে আবার গণনাট্যনিষ্ঠ হয়েছে।

বামপন্থী থিয়েটার চেতনা যেমন সম্প্রসারিত ও প্রখর হয়েছে প্রতিপক্ষের অত্যাচার উৎপীড়নও সহ্য করতে হয়েছে থিয়েটার কর্মীদের। গণনাট্য ও অন্যান্য নাট্যকর্মীদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে শাসক দল। অত্যাচারিত বহু থিয়েটার কর্মীর নিয়ত নিষ্ঠারই - নাম গণনাট্য আন্দোলন। সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরের থিয়েটার কর্মীদের অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটারের সমবেত প্রয়াসে।

শ্রেণিহীন সমাজবাদের পক্ষে গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা দীর্ঘ লড়াইতে সামিল হয়েছে। কোথাও কোনো শৈথিল্য ছিল না বা আজও নেই। যদিও তার স্মরণে ছিল এবং আজও যা ক্রিয়াশীল - "..... সমকালের সংগ্রামের রূপ ও গতি এক রেখায় এগোয় না। নানান বাঁক আছে, প্রশ্ন আছে, তর্ক আছে, তথাপি আন্দোলনের গতিমুখ যে এক.....।"

শিল্প সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রবণতার বিরূদ্ধে লড়াই করে এবং নাটকের বিষয় প্রসঙ্গে সংশোধনবাদী ঝোঁক ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করেই এগিয়ে চলেছে 'গ্রুপ থিয়েটার'। আশির দশক থেকেই 'অভিনয়' পত্রিকা খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার অমল রায় কিছুটা উদ্যোগ নিয়ে নিয়মিত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

১৯৮১ তে এলো 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকা, রথীন চক্রবর্তীর সম্পাদনায়। 'গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হলো।' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে লেখা হলো- " কোনও নাট্য আন্দোলন যেমন শুধুমাত্র কাগুজে বা প্রচারভিত্তিক হয়ে টিকে থাকতে পারে না। তেমনি মুখপত্রহীন আন্দোলন ব্যর্থ না হোক, সঙ্কটাপন্ন হতে বাধ্য। কার্যত গত ১৬ বছরে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন এমন কোনও বলিষ্ঠ

মুখপত্রের জন্ম দিতে পারে নি যা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারে। ....এখনও যে কটি কাগজ আছে যে কোনও নাট্যকর্মী স্বীকার করবেন, গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা রাখে না ....।" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় উপদেষ্টা মণ্ডলীর তালিকায় উৎপল দত্তের নাম ছিল, কিন্তু 'উৎপল দত্ত এই ধরনের প্রয়াসের মধ্যে 'ভাঁওতাবাজীর' স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বলে একটি পত্র লিখে তাঁর নাম না রাখার অনুরোধ জানান।' দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে তার নাম রাখা হয়নি। 'নাট্যচিন্তা' পত্রিকা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর ১৯৮২তে 'শূদ্রক' (সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না), ১৯৮৩তে 'সোপান নাট্যপত্র ', ১৯৮৪ তে 'স্যাস' ও 'প্রয়াগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'শূদ্রক' মোটামুটি বহুরূপী'র ভাবধারাতেই কাজ করলেও রাজনৈতিক ভাবধারায় ছিল সমকালীন। 'সোপান নাট্যপত্র' সরোজ পাল ও আশিস গোস্বামীর সম্পাদনায় কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'তাপস সেন', 'পথ নাটক' ও 'বাংলাদেশ' সংখ্যা। সত্য ভাদুড়ির সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্যাস' পত্রিকার প্রথমদিককার একটি সংখ্যায় লেখা হয়েছিল-'কোনওরকম গোষ্ঠীবাদের কাছে নাড়া না বেঁধে থিয়েটার নিয়ে যাঁরাই উল্লেখযোগ্য চিন্তা ভাবনা করছেন, স্যাস তার সীমায়িত যাতায়াতের মধ্যে তাঁদেরই লেখা পত্রস্থ করবে- সূচনা লগ্নে নেওয়া হয়েছিল এমনই সিদ্ধান্ত , - আজও সেই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা 'স্যাস' চালিত -এমনটাই অনুমান"। 'নাট্যচিন্তা' ও 'স্যাস' এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে- ভালো প্রবন্ধ ভালো নাটক তার সম্পদ-শহুরে নাট্যমোদীদের মধ্যে তাদের চাহিদাও আছে। 'নাটক ও প্রবন্ধের পাশাপাশি সারা ভারতের অগ্রজ নাট্যকর্মীদের অনুসন্ধানের পথটাকে চিনে নেওয়া ও চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টায়ও 'শূদ্রক' আন্তরিক'। 'শূদ্রক'-এর প্রাণবন্ত দর্শন আগ্রহী পাঠকদের সম্ভ্রম আদায় করেছে। 'এপিক থিয়েটার' প্রগতি ভাবধারায় চললেও পরবর্তীতে শুধুমাত্র উৎপল দত্তের সৃষ্টি ও সৃজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে 'উৎপল দত্তের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ' সম্বলিত সংখ্যাটি যথেষ্ট মূল্যবান বলেই বিবেচিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হলেও এবং উৎপল দত্ত ও তাঁর থিয়েটারের ভাবধারায় বহু মানুষকে প্রাণিত করলেও সেই অর্থে নতুন কোনও আদর্শ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে এমন দাবি না করাই সঙ্গত। বরং বলা চলে একধরণের 'একক পথচলা' হয়ে গিয়েছে।

৮০'র দশকে প্রকাশিত 'প্রয়াগ' পত্রিকা এখনও সেই স্বপন দাসের সম্পাদনাতেই 'থিয়েটার প্রয়াগ' হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু কিছু বিশেষ সংখ্যা কৃতিত্বের দাবি রাখে।

৮০'র দশকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলি হলো 'নাট্যমুখপত্র' (১৯৮৫, ট্যাবলয়েড) সম্পাদনায় শিব মুখোপাধ্যায়, 'আননায়ূধ' (১৯৮৫, ট্যাবলয়েড), সম্পাদনায় স্বপন রায়। দু'টি পত্রিকাই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে শহর ও মফস্বলের বহু নাট্যদলের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে দু'টি পত্রিকাই যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে নাট্যমোদীদের কাছে।

১৯৮৯ তে প্রবীর ঘোষালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'রূপন নাট্যপত্রিকা'। ১৯৯১ তে আশিস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'শিল্পায়ন' নাট্যপত্র। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৯৪ থেকে রঙ্গন দত্তগুপ্ত যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে চলেছেন 'অসময়ের নাট্যভাবনা' পত্রিকা। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে নৃপেন্দ্র সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর 'নাট্য আকাদেমি পত্রিকা'। এখন তার প্রকাশ কিছুটা অনিয়মিত। ৯০ এর দশকে সোনারপুর কৃষ্টি সংসদের পক্ষে সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার বার্তা।' একুশ শতকের গোড়ায় নৃপেন্দ্র সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বহিরঙ্গন পত্রিকা'। যদিও তার স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকালের। এছাড়া 'কথাকৃতি পত্রিকা', 'রঙ্গপট' এবং 'নান্দীপট পত্রিকা'। বাৎসরিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয় শ্যামল দত্ত সম্পাদিত 'পালা দৃশ্যকাব্য' পত্রিকা।

অপর একটি নাট্যপত্র 'ঋক' কিছুটা অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হয়। পলাশ ভদ্র প্রকাশ করেছিলেন 'শাব্দিক নাট্যপত্রিকা'। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে চন্দন দেবনাথ সম্পাদিত 'থিয়েটার ক্যাফে', অন্তিকা চ্যাটার্জী সম্পাদিত 'নাট্যসৃজনী' অয়ন জোয়ারদার সম্পাদিত 'নাট্যমেব'। কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে মূল্যবান একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে 'ভাবনা থিয়েটার'। সম্পাদনায় অভীক ভট্টাচার্য। বাদল কাঞ্জিলালের উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে 'থিয়েটার এখন' এবং অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার ওয়াল'। এছাড়া মাঝে মাঝে হাতে আসে 'থিয়েটার মগজ', 'থেসপিয়ান থিয়েটার', 'মূকাভিনয়', 'দৃশ্যভারতী', 'নাট্যপঞ্জিকা', 'থিয়েটার বাংলা'।

'ইলোরা' নাটকের 'বর্ষকথা' ২০০৮ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বোলপুর থেকে প্রকাশিত এই বার্ষিক পত্রিকাটি আসলে থিয়েটারের ডাইরেক্টরি। নাট্যবিষয়ক জরুরি তথ্য সম্বলিত পত্রিকাটি থিয়েটার মহলে যথেষ্ট আদরণীয়।

এছাড়াও শহর কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকে বহু নাট্যদল বাৎসরিক বা ষান্মাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অন্যান্য বিভিন্ন নাট্যসংবাদ ছাড়াও নিজ নিজ দলের কর্মকান্ডের বিশদ হদিশ মেলে পত্রিকাগুলিতে। প্রত্যেকেই সচেষ্ট থাকেন বিষয়বস্তু ও মুদ্রণ পরিপাট্যে পত্রিকাকে একটি মানে পৌঁছে দিতে।

প্রতিবেশি রাজ্য ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চলছে নাট্যচর্চা। বিভিন্ন নাট্যদল ছড়িয়ে আছে রাজ্যের নানা প্রান্তে। আগরতলা শহরে সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরও একসময় প্রবল উৎসাহ নিয়ে নাট্যচর্চা করতেন। বর্তমান চিত্রটা অবশ্য জানা নেই। থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি নাট্যপত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। বিভু ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় একটি মূল্যবান পত্রিকা 'ত্রিপুরা থিয়েটার'। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক 'ত্রিপুরা থিয়েটার' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ২০০৬ সাল থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গেও বহু নাট্যকর্মীর প্রিয় পত্রিকা। ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে 'ত্রিপুরা থিয়েটার' ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন) কেয়ার লিষ্টে যুক্ত হয়েছে।

এছাড়াও ত্রিপুরার আগরতলা থেকে অপর একটি নাট্যপত্রিকা 'অভিনয় ত্রিপুরা' প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা মুনমুন ঘটক। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে প্রকাশিত হয় মণিদীপ দাস'এর সম্পাদনায় 'নাট্যমঞ্চ' পত্রিকা। উক্ত দুটি পত্রিকাই যথাযথ মান বজায় রাখতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট।

১৯৪৯ থেকে অর্থাৎ ৮০'র দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পর পর কয়েক দশক ধরে নাট্যবিষয়ক বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। গণনাট্যের আদর্শে নাট্যচর্চা সম্পূর্ণ অন্য অভিমুখে যাত্রা করেছিল এবং আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। সত্তরের দশকের শেষ পর্বে এসে দক্ষিণপন্থী শাসনের অবসান ঘটল। বামপন্থীরা শাসকের আসেন বসেছে।বর্তমানে বামপন্থীরা আবারো বিরোধী শিবিরে।

নাট্যচর্চার পাশাপাশি নাট্যকর্মীদের শিক্ষিত করতে, সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে বিভিন্ন নাট্যপত্রিকায় প্রকাশিত নাটক, প্রবন্ধ একসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং আজও তা সক্রিয়।

যে সময় থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে, আগেই বলা হয়েছে নাট্যচর্চা এবং নাট্যপত্রের মাঝে বিশাল ফাঁকছিল । নাট্যচর্চাই প্রাধান্য পেয়েছিল— প্রবন্ধ বা নাটক পাঠের আগ্রহ সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। নাট্যপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় (নাট্যসম্বন্ধীয়) জানার আগ্রহ বেড়েছে। ফলে নাট্যপত্র প্রকাশের আগ্রহও বেড়েছে। নিজের দলের কাজকর্ম জানাতেও অনেকে ছোটোখাটো পত্রিকা বা স্মরণিকা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রও একটা বিভাজন নজরে পড়ে- এক শ্রেণীর পত্রিকা Mass বা গণ'র জন্য । আরেক ধরনের পত্রিকা অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য। হতে পারে এই বিভাজন, কিন্তু বিশ্বজুড়ে থিয়েটার চর্চার ক্ষেত্রে যে আমূল সংস্কার চলছে, যে নতুনত্ব বা সৃষ্টিমূলক বিষয় জায়গা করে নিচ্ছে, সেগুলি সম্পর্কে শহর কিংবা মফস্বল সব জায়গায়ই নাট্যকর্মীদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। একথা সত্য বহু নাট্যকর্মশালা আয়োজিত হচ্ছে সরকারি বা বেসরকারি স্তরে, অনেক আলোচনা সভা হচ্ছে, কিন্তু হাতে একটা টেক্সট থাকা অত্যন্ত জরুরী। নাট্যপত্রপত্রিকাই পারে সেই প্রয়োজন মেটাতে। এছাড়াও, যে সময়টা চলে যাচ্ছে সেই সময়ের কাজের গতিপ্রকৃতির একটা ডকুমেন্ট বা দলিল থাকাটাও অত্যন্ত জরুরি। একটা প্রজন্মের ইতিহাস আশ্রয় করেই তো পরবর্তী প্রজন্ম সামনের দিকে পা ফেলবে। পাঠাভ্যাস বাড়াতে হবে নাট্যকর্মীদের তবেই সার্থক হবে নাট্যপত্রপত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ।

ঋণ স্বীকার ঃ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী পত্রিকা, নাট্যচিন্তা পত্রিকা, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ড. আশিস গোস্বামী, ড. অপূর্ব দে।

লেখক ঃ দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, নাট্যপত্রিকা গ্রুপ থিয়েটারের সম্পাদক।

ক্রান্তিকালের সঙ্কট
উপস্থাপনার ভাবীকাল নিয়ে দুয়েকটি ভাবনা

মনুজেন্দ্র কুনডু

বাংলা তথা ভারতীয় উপস্থাপন ক্ষেত্র (performance space । এখানে এরপর থেকে performance অর্থে উপস্থাপন বা উপস্থাপনা শব্দ ব্যবহৃত হবে।)[1] এখন একজোড়া সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে। একদিকে রাজনৈতিক সংকট, অন্যদিকে করোনার ক্রান্তিকাল। এই সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে নাটক তথা যে কোনো উপস্থাপনারই স্বচ্ছন্দ পথ রুদ্ধ। এই দুই প্রতিকূলতা এড়িয়ে নাট্যচর্চা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক রোষানলের প্রকোপ অনেকদিন ধরেই চলছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে করোনা। সেটাই আপাতত দুশ্চিন্তার প্রধানতম কারণ।

রাজনৈতিক আগ্রাসনে তবু একটা দৃশ্যগোচর প্রতিপক্ষ থাকে। কিন্তু এখন করোনা নামক এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই যেন অনেকটা হলিউড ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমাদের নিজেরই শরীর আমাদের শত্রু। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশীও তাই। হাওয়া-বাতাস, এমন কী জড় পদার্থও এই তালিকা থেকে বাদ নেই। অসুখ- মৃত্যু-মহামারী ওঁত্ পেতে আছে সবসময়। এই মারণব্যাধির উৎস নিয়ে এখনো তর্ক শেষ হয়নি। এ মানুষেরই হঠকারিতা, সীমাহীন লোভ, চরম আগ্রাসনের ফল, নাকি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'- সহসা চাপানউতোরের নিরসন হওয়া হয়তো সম্ভবও নয়।

যাই হোক, যে সাঁড়াশিচাপের কথা দিয়ে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম, সেটাই পরবর্তী দুটি অংশে একটু বিশদ করার চেষ্টা করব।

১

করোনা- পরিস্থিতির আগের মুহুর্ত পর্যন্ত ভারতের যে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল, এই মারণ-সংকটের সময়েও চরিত্রের বিশেষ হেরফের হয়েছে বলে মনে হয়না। এখন শুধু কিছু কিছু উপলক্ষ বদলেছে। বরং একটা সঙ্কট নিবারণ করতে, মানুষকে শায়েস্তা করার জন্য, ঔপনিবেশিক আমলের আইনকে সামান্য অদল-বদল করে জারি করা, জ্বালানির দাম লাগামছাড়া জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সংসদকে এড়িয়ে (যেহেতু সংসদ এখন বন্ধই আছে) বিভিন্ন নীতি ও আইন প্রণয়ন করা, মানুষের মৃত্যুর কারণ, সংখ্যা ও চিকিৎসা নিয়ে নোংরামির মতো ঘটনাবলি অব্যাহত। এই ধরনের কার্যকলাপে খুব যে নতুনত্ব আছে, তা নয়। রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর চোখরাঙানির চরিত্র আগের মতোই একরকম এবং সদর্পে অব্যাহত।

সুতরাং করোনার আগে-পরে বা এখন যদি কোনো উপস্থাপনার কথা ভাবতে হয় (যদি বা আদৌ ভাবা যায়), তা হলে কোন ধরনের নাটক বা উপস্থাপনা এই সময়ের পক্ষে উপযুক্ত? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বৈব প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাই তার একমাত্র পথ। যে সব উপস্থাপন -তাত্ত্বিক এর আগে বিভিন্ন পথ-উপায় দেখিয়েছেন, সেসব মাথায় রেখেই বলছি, কোনো রকম রূপক, অলঙ্কার, ইতিহাসের আশ্রয় না নিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে সরাসরি প্রশ্ন করাটাই এখন একমাত্র কাজ। তার বিভিন্ন কাজ, নীতি, সমসাময়িক খবর, ইত্যাদিকে ভিত্তি করে ছোট ছোট উপস্থাপন করা হলে হয়তো একটা পর্যায় পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। সেটা মঞ্চেও করা যেতে পারে আবার মঞ্চের বাইরেও হতে পারে। যেহেতু মঞ্চ পাওয়ার সঙ্গে আবেদন, অনুমতি, টাকাপয়সা খরচার একটা বিরাট প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে, তাতে দেখা যেতে পারে, এই ধরনের দুয়েকটা মঞ্চায়নের পরে আর মঞ্চ পাওয়াই যাচ্ছে না। তখন মঞ্চের বাইরেটাই ভরসা। তাছাড়া, শারীরিক দূরত্ববিধি বজায় রেখে মঞ্চকে কী ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তো রয়েইছে।

কিন্তু মঞ্চের বাইরেও এই ধরনের অস্বস্তিকর উপস্থাপনা রাষ্ট্রশক্তির রোষের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে দাঁড়ায়ও। একটা কথা বুঝতে হবে, এই ধরনের উপস্থাপনার জন্য একটা গণতন্ত্রের যে পরিমাণ পরিণতমনস্ক হওয়া প্রয়োজন, সমালোচনা সম্পর্কে যতটা সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন- সেটা আমাদের দেশে নেই। যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, ততক্ষণ কোনোরকম উপস্থাপনারও গুরুত্ব নেই এবং কোনো কাজও স্বাধীনভাবে করা সম্ভব নয়। মার্গারেট থ্যাচারের সময়ে ব্রিটেনে প্রোসেনিয়াম বা নন-প্রোসেনিয়াম নাটকের কী অবস্থা হয়েছিল, সে কথা আমরা এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারি। তারপর সেই ভয়, অস্বস্তি , অনুদানবিহীন অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে ব্রিটেনের বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে কখনোই সে সবের উপায় ছিল না। চোখ রাঙানি কখনো কম/একটু কম, বেশি/একটু বেশী- এই ধরনের তারতম্যযুক্ত একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। আমরাও যখন কম বা একটু কম শাসন-তাড়নের পরিবেশ পেয়েছি, সেটাকেই পরম পাওয়া বলে উল্লাস করেছি। কারণ, আমাদের তাছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। শুধু ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ারই এই সমস্যা। তার সঙ্গে তো ধর্মীয় মৌলবাদ রয়েইছে। আসলে রাষ্ট্র আর সরকার, সরকার আর শাসকদল এগুলোকে নিজের সুবিধে মতো এক করে ফেলে, তাকে নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করার যে বিপদ, সেটাই এই উপ-মহাদেশের বারবারের সমস্যা। সাধারণ মানুষও এখানে এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। অন্যরকম কিছু হলেই, সেটা আশচর্যের ঠেকে। তখন তার পায়ে পড়ব, না বেদীতে বসাব- ঠাহর করে উঠতে পারি না। ফলে এই অবস্থায় মন খুলে উপস্থাপনা বিপজ্জনক বৈ কি! সমালোচকের অবস্থান থেকে এই ধরনের পরামর্শ দেওয় যতোটা সহজ, কাজটা ঠিক ততোটাই কঠিন। এটা জানা সত্ত্বেও বলছি : তবু চেষ্টা করতে হবে। যতটা পারা যায়। কারণ, নাটক/উপস্থাপন তো আসলে বিনোদনই নয়, প্রতিবাদেরও হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

যখন বলছি প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে উঠবার কথা, তখন কিন্তু উপস্থাপন-কুশলীদেরও তৈরি হতে হবে। প্রোসেনিয়ামের যে ধারা থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিকল্প উপস্থাপন (alternative performance) ধারার সৃষ্টি, তার পেছনে রয়েছে দু'-দু'টো মহাযুদ্ধের অভিঘাত; অর্থনৈতিক সঙ্কট, মৃত্যুমিছিল, সেখান থেকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি, দুনিয়াজোড়া নয়া উপনিবেশবাদ, ঠান্ডাযুদ্ধ, ভিয়েতনাম লড়াইয়ের মতো নানা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাপ্রবাহ। একই সঙ্গে উঠে এসেছে ragtime, জ্যাজ, ব্লুজ,রক অ্যান্ড রোল, rap; ছড়িয়ে পড়েছে রেডিও, চলচ্চিত্রের আগ্রাসী প্রভাব; পৃথিবী দেখেছে কালো মানুষের লড়াই, তাদের শিল্পসৃষ্টি; দানা বেঁধেছে নারীবাদ নিয়ে বৌদ্ধিক চর্চা; শিহরণ সৃষ্টি করছে চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সমাজবিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও তথ্য। এইসব কিছুই কিন্তু বিকল্প উপস্থাপনার অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে, যা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়বে আমেরিকা-সহ উন্নত পশ্চিমি দুনিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় Performance Studies নামে। আমরা যদি, পশ্চিমি থিয়েটারের ঘরানা বা বিভিন্ন সময়ে তাদের নানা ধরনের উপস্থাপনার ধারাবাহিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব আমোদপ্রমোদ বা প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে মঞ্চের বাইরে (বিকল্প) উপস্থাপনার একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে সেখানে। সে সবই পরে নানা ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেয়েছে। বদলে গিয়েছে বিনোদন বা শিক্ষার গণভাবনা (Popular perception)। ভারতীয় কায়দায় আলাদাভাবে তার জন্য আবেগপ্রবণ (emotional melodramatic) আদর্শায়ন বা তত্ত্বায়ন(theorize) করার প্রয়োজন পড়েনি। তার বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগ করা হয়েছে যা ক্রমশ বৌদ্ধিকচর্চার অংশ হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে কিন্তু Theatre/ Deama Studies- এর চর্চাও আছে। কিন্তু ভারতীয় পরিমণ্ডল কখনোই এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যায়নি। স্বাধীনতার পরেও নানা আকারে এবং মাত্রায় ঔপনিবেশিক মানসিকতাই অব্যাহত। এ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা বিশদে আলোচনা করেছেন, আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। তাই, এখানে বিকল্পধারার পরিবেশ আদৌ কতটা ছিল, সেটা নিয়ে আলাদা তর্ক হতে পারে। দুয়েকজন যাঁরা সেই চেষ্টাটা করেছেন, সেগুলো ব্যক্তিগত, সীমান্তবর্তী প্রচেষ্টা হিসেবেই থেকে গিয়েছে। তাছাড়া, তাঁদের ভাবনাচিন্তাতেও অনেক সমস্যা ছিল।

যেহেতু আমাদের এখানে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ডায়নামিজম একেবারেই নেই তাই বিকল্প উপস্থাপনার স্বরটিকে চিনতে গেলে একজন উপস্থাপন-কর্মীকে সেই বিরাট বৌদ্ধিকচর্চার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বলেই আমার মনে হয়। এর কোনো চটজলদি রেসিপি নেই। আমাদের দেশে আরও একটা সমস্যা হল, যাঁরা উপস্থাপনামূলক কাজকর্ম করেন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই পড়াশোনার প্রতি অনীহা। তাঁরা 'কাজ করেন' এটাই তাঁদের কাছে পরম শ্লাঘার বিষয়। অবশ্যই কাজ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই কাজ করার জন্য যে বৌদ্ধিক পরিশ্রমটা প্রয়োজন, সেটা তাঁরা শুধু 'কাজ করার' মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। অল্পবিস্তর নাটক-নাচগানের বই, দুয়েকটা তত্ত্বের বইয়ের মধ্যেই

প্রধানত তাঁদের পড়াশোনা সীমিত। দুয়েকজন যে ব্যতিক্রম নেই, তা বলছি না। কিন্তু সেই দুয়েকজন, অধিকাংশের পাশে যেন একেবারেই বেমানান। অধিকাংশ আবার সমালোচনাও পছন্দ করেন না একেবারেই। আজকাল সামাজিক মাধ্যমের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে পরস্পরের পিঠ চাপড়ানোর একটা মারাত্মক প্রভাবও দেখা যাচ্ছে। এ সবই অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং, একজন নাট্যকর্মী/উপস্থাপকের বৌদ্ধিকচর্চার বিভিন্ন দিক(সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান) সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলেই আমার মনে হয়। না হলে, অল্প সময় পরেই তাঁদের কাজের ধার এবং ভার নষ্ট হয়ে যায় এবং তা হয়েছেও।

২

এবারে আসি দ্বিতীয় এবং আশুসংকটের বিষয়টিতে। একটি মারণ ব্যাধির উদ্যত ফণাকে কীভাবে নাট্যকর্মীরা সামলাবেন, কতটা তাতে সাফল্য আসবে- এর উত্তর সহসা দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমে, এমনকী আমাদের দেশেও অনেকেই ভার্চুয়াল উপস্থাপনার কথা বলছেন বা অল্প বিস্তর করারও চেষ্টা করছেন। এর কয়েকটা সমস্যা আছে। আমাদের দেশে যেখানে এখনও বহু মানুষ খেতে পড়তে পায় না, বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাই নেই, সেখানে ইন্টারনেট নির্ভর অনেকেই ভার্চুয়াল কমিউনিকেশন ব্যবহার করতে পারেন না, ইত্যাদি। কিন্তু করোনা আমাদের অনেক কিছুই শিখিয়ে নিচ্ছে। আরও নেবে। সুতরাং কষ্টেসৃষ্টে এটাও আমাদের শিখতে হবে (এটা আমি বলছি তাঁদের উদ্দেশে, ইন্টারনেট ব্যবহার করার সঙ্গতি রয়েছে যাঁদের। কারণ, শেষপর্যন্ত নাটক, নাচ , গানের শিল্পিত-চর্চা আমাদের দেশে তো শুধু সঙ্গতিপন্ন মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে দেশের ক্ষুধার্ত মানুষকে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয় বাড়ির আশ্রয়ের জন্য, যে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ দুবেলা কোনো মতে খেতে পান বা পান না, তাঁদের কাছে/সামনে এসব শহুরে মানুষের শিল্প-বিলাস, বৌদ্ধিক আরাম আর সুবিধাবাদীদের প্রতিবাদ-প্রতিবাদ খেলা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হয়)। শুধু আজকের কথা ভেবেই নয়, ভবিষ্যতে যখন করোনার ক্রান্তিকাল কেটে যাবে, তার দিকে চেয়েও আমাদের তৈরি হতে হবে।

আমি অনলাইনে এই ধরনের যতটুকু উপস্থাপনা দেখেছি, সেগুলো মোটের উপরে ভালোই। সেটাকে আয়ত্ত করে, তার সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যেই একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেবার কথা ভাবা যেতে পারে। যদিও তাতে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার স্বাদ পাওয়া যাবে না বলেই মনে হয়। আরেকটা বিষয় হল, নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যবস্তুর (text-এর) পূর্ণ বা আংশিক একাঙ্ক উপস্থাপনা। সেগুলো কেউ কেউ একটু অ্যামেচারিশ ভাবে করছেন। কিন্তু আমি বলছি সেই দক্ষতাকে আরও পালিশ করে পেশাদার উপস্থাপনার কথা। যাঁরা পুতুল বা ছায়া নাটকে দক্ষ, তাঁদের কাছে তো এটা খুবই সহায়ক মাধ্যম।

আমি জানি, অনেকেই এসব খারিজ করে দেবেন। কিন্তু এই মহামারী আমাদের অনেক কিছুকেই নতুনভাবে শিখতে এবং ব্যাখ্যা করতে শেখাচ্ছে এবং শেখাবেও। ফলে

নাটক বা দর্শক-নির্ভর কোনো উপস্থাপনাও অচল বস্তু সেজে বসে থাকতে পারে না। তাকেও বদলাতেই হবে। কোন শুচিবায়ু রাখলে হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ছেড়ে উপস্থাপনার যদি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক পরিভাষা তৈরি করা হয়ে গিয়ে থাকে আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে, তাহলে এখন তাকে আরও বদলে নতুন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করতেই বা মানসিক জড়তা কেন থাকবে, সেটাও বোধগম্য নয়। পরিবর্তনশীলতাই যখন স্বাভাবিক ধর্ম। সমস্যা যদি নামকরণ নিয়ে হয়, তাহলে তাকেও বদলে নিতে হবে। তাছাড়া, উপস্থাপনা বা Performance বলতে তার মধ্যে সবকিছুই আসে।

এর পাশাপাশি, আগে খোলা জায়গায় উপস্থাপনা নিয়ে যে কথা লিখেছি, তা তো আছেই। আমাদের দেশে ড্রাইভ-ইন থিয়েটার বা সিনেমা বলে কিছু আছে কিনা, আমি জানি না। সেটা হলেও ব্যাপারটা বেশ বিলাসিতারই বিষয়। তাই অবস্থা কিছুটা আয়ত্তে এলে, দর্শকদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে , খোলা জায়গায় উপস্থাপনা করার কথাও ভাবা যেতে পারে। প্রয়োজনমাফিক তার সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই। আমি অকারণ এই মাধ্যমের আদর্শায়নের পক্ষে নই, সে কথা আগেই বলেছি। এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে এই ভাবনা।

আমাদের দেশে যে কোনো উপস্থাপনারই সংরক্ষণ একটা বড়ো সমস্যার বিষয়। এ নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা তো নেই-ই, বরং চূড়ান্ত উদাসীনতাই আছে। যদি আগে ভালো, দক্ষ লোকের সাহায্যে উপস্থাপনাগুলোর ভিডিওগ্রাফি করা থাকত, তাহলে সেগুলো এখন ইউটিউবে আপলোড করা থাকলে শিক্ষার্থীরা সহজেই দেখতে, জানতে, শিখতে পারতেন, আর সংশ্লিষ্ট সংস্থারও দু'পয়সা রোজগার হত। শুধু যাঁরা এই ধরনের শ্রম বিনিয়োগ করে দিন গুজরান করেন, তাঁদের কাছে বেঁচে থাকাটা এখন একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মাধ্যম ব্যবহার করতে পারলে, তাঁরা হয়তো কিছুটা উপকৃত হতেন। তবে তা যে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হত, তা বলাই বাহুল্য।

যাক যা হয়নি, তা হয়নি। গতস্য শোচনা নাস্তি। ভবিষ্যতে যদি তাঁরা এ দিকগুলো নিয়ে ভাবেন, তাতে দর্শক এবং উপস্থাপক - দুপক্ষেরই উপকার। আমরা এতদিন ভেবে এসেছি, দর্শক-নির্ভর যে কোনো উপস্থাপনা, বিশেষত নাটক, একই স্থান এবং কালে উপস্থাপক এবং দর্শকের সহাবস্থানের প্রক্রিয়া। না হলে দর্শকও উপস্থাপকের ভূমিকা নেবেন কী করে? কিন্তু করোনা -সঙ্কট আমাদের দেখিয়ে দিল,একজন দর্শক দূর থেকেও একটি নাট্য /উপস্থাপন প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে উঠতে পারেন। বিপর্যয় তেমনটাই করিয়ে নেয়। এবং সে ভাবেই একজন দর্শক গোটা প্রক্রিয়ায় সক্রিয় উপস্থাপকের ভূমিকা নেন। তাঁর অর্থনৈতিক যোগদানের মাধ্যমে। হয় তিনি বিদেশী নাটক/ উপস্থাপনা ক্রেডিট কার্ডে কিনে দেখেন, নয়তো দেখেন ইউটিউবে। দু'ক্ষেত্রেই অর্থ জমা হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার তহবিলে। বিপর্যয়ের দিনে একজন দর্শকের কাছে নাট্য/উপস্থাপন প্রক্রিয়া এবং নাট্য/উপস্থাপন কর্মীদের বাঁচিয়ে রাখার থেকে বড় সক্রিয় অংশগ্রহণ আর কিছু হতেই পারে

না। এভাবেই একজন নাট্য/ উপস্থাপনামোদী তাঁর দূরত্ব বজায় রেখেও উপস্থাপন-ভাবনার সবচেয়ে বড় সক্রিয় সংগঠক কর্মী হয়ে উঠতে পারেন।

কিন্তু তার জন্যও নির্দিষ্ট নিয়মকানুন থাকা দরকার। যদি দেখা যায়, লভ্যাংশের পুরোটাই গিয়ে ঢুকল শুধুই নির্দেশক- প্রযোজকের তহবিলে, তাহলে কোনো লাভ নেই। তার জন্য সংশ্লিষ্ট উপস্থাপনার প্রতিটি কর্মীকে সমানভাবে টাকাপয়সা ভাগ করে দিতে হবে। সেটাই প্রতিটি উপস্থাপন-কর্মীর কাছে প্রত্যাশিত। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মতোই শিল্পমাধ্যমেও ঘুণ চারিয়ে গিয়েছে বহুদূর।

এই সঙ্কটা আমাদের আরও একটু বেশি মানবিক হতে শেখাবে, ঘৃণার রাজনীতি, শোষণ এবং বঞ্চনার ছলাকলা থেকে বিরত রাখবে- সেটুকু কামনা করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই।

লেখক : মনুজেন্দ্র কুনডু, এক দশক সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার নিয়ে ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বই প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণার বিষয় - ১৯-২০ শতকের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি।

ককবরকে কবিগুরুর 'মুকুট'

নন্দকুমার দেববর্মা

আমার নাট্যপাঠ এবং অভিনয় শুরু হয়েছিলো কবিগুরুর 'মুকুট' নাটিকাটির অভিনয়ের মাধ্যমে। আমাদের বিদ্যালয়ে বছরে কম করেও চারবার নাটক করার রেওয়াজ ছিলো। সেই গত শতকের ষাটের আগে, যখন দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তাম তখন থেকেই এটা দেখে এসেছিলাম। স্কুলের স্যারেরা খুব যত্নবান ছিলেন এ-বিষয়ে। আর সবার আগে মূল উৎসাহদাতা ছিলেন স্বয়ং আমাদের প্রধান শিক্ষক মহোদয়।

সরস্বতী পূজোর একদিন বা দুদিন পরে নাটক হতো। ছাত্র-শিক্ষকেরা মিলে করা হতো। সিনিয়র বেসিক স্কুল। দিদিমণি ছিলেন না। ফলে ছাত্রীরাই অভিনয় করতো। 'সিরাজদৌল্লা', 'মহারাজ নন্দকুমার', কর্ণার্জুন- ইত্যাদি নাটকগুলো হতো। ঘন্টা দেড়েকের পালা। এগুলো সব হতো বাংলায়।

ককবরকের নাটক হলো, ঐ যে বললাম, কবিগুরুর 'মুকুট'। এটাকে অনুবাদ করেছিলেন আমাদের মাষ্টারমশাই শ্রীযুক্ত যাদব ভৌমিক মহোদয়। তিনি খুব ভালো ককবরক বলতে পারতেন। বলা ভাল, ক্লাসেও ছাত্রদের বুঝিয়ে বলতেন ককবরকের মাধ্যমে। আজ এতো বছর পরে যখন ককবরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ-র ক্লাশ হচ্ছে নিয়মিত , তখন যাদব ভৌমিক স্যারকেই প্রথম ককবরক শিক্ষক হিসেবে ঐতিহাসিক প্রণাম করার ইচ্ছে হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়েই 'মুকুট' নাটকে আমাকে 'ইন্দ্রকুমার' চরিত্রটি করতে হয় ঐ স্যারের পরিচালনায়। মূল নাটক শুরুর আগে এটা অভিনীত হতো। আমাকে বেশ কয়েকবার করতে হয়েছে। আরেকটু বড় হয়ে বাংলায় নাটক করার দলে সুযোগ পাই। যাদব ভৌমিক স্যারের একটা পরিচিতি দিতে হয় এ প্রসঙ্গে। তিনি এসেছিলেন নোয়াখালি থেকে। তখন নোয়াখালীও ত্রিপুরার অংশ ছিলো। ফলে আসতে যেতে কোন বাধা নিষেধ ছিলো না। তখন মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকাল। শোনা যায়, ১৯৪০ সালের দিকে তিনি বিশ্রামগঞ্জে মানিক দেববর্মার বাড়ীতে গুটিকয় ছেলেদের নিয়ে পড়ানো শুরু করেন। তখন এখানে কোন স্কুল ছিলোনা। নিজে ধীরে ধীরে ককবরক বলতে শেখেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। মহারাজা আসার কয়েকদিন আগে থেকেই সেনা, পাইক পেয়াদা, রাজকর্মচারীরা এখানে ক্যাম্প করতে শুরু করে। মহারাজা এলে সন্ধ্যায় একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তাতে যাদব স্যার ককবরকে একটা রাজবন্দনা গান লেখেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করেন। মহারাজাই জায়গাটার নাম

'বিশ্রামগঞ্জ হোক' বলে নামাকরণ করেন। এটাকে 'ক্যাম্পের বাজারও' বলা হতো। যাদব ভৌমিক এর বিদ্যাভ্যাস স্থলটি পরবর্তী সময়ে স্কুলে পরিণত হয় এবং তিনি স্কুলে চাকরীও পান।

আমি ব্যক্তি জীবনে স্কুলের প্রথম ক্লাশে পাই যাদব ভৌমিক স্যারকে। আমার পিতৃদেব কম্যুনিষ্ট ছিলেন বলে সব সময় বাড়ীতে থাকতেন না। পাশের বাড়ীর গোবিন্দ আচার্য্যকে বলে যান, আমাকে স্কুলে ভর্তি করাতে। আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড় গোবিন্দই আমাকে স্কুলে নিয়ে যায় একদিন শীতের সকালে। স্কুলে ভুল করে ক্লাশ ওয়ান-এর পরিবর্তে ক্লাশ-টুর ঘরে অন্যদের মাঝখানে বসিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে যাদব ভৌমিক ঢুকেন এবং আমাকে দেখে নাম জিজ্ঞেস করেন ককবরকে। অবশ্য বাংলা জানতামও না। নাম বললাম - নন্দলাল। বাড়ীতে মা এভাবে বলতেই শিখিয়ে দিয়েছিলো। উত্তর শুনে, যাদব ভৌমিক বললেন, এই নাম তো হবে না। সবাই হা করে তাকিয়ে রইলো। কারণ এখানে আরও একজন নন্দলাল আছে। এক ক্লাশে দুইজন নন্দলাল কি করে হবে। একটু ভেবে তিনিই নাম ঠিক করে দিলেন, তোমার নাম আজ থেকে নন্দকুমার। এই তোমরা সবাই ওকে নন্দকুমার বলে ডাকবে। পরে দেখলাম আরেকজন নন্দলাল আমাদের পাড়াতেই থাকে যাকে দাদা ডাকতাম। ১৯৬৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। খুব বড় করে বিদায়ী অনুষ্ঠান হয়েছিলো। সেই 'মুকুট' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়েছিলো।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা আন্দোলনের আগেই বিশ্রামগঞ্জ স্কুলটি স্থাপিত হয় এবং নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু হয়।

আজ ককবরক নাটকে ডালপালা ছড়িয়েছে। নাট্যকর্মীদের সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু ওই দিনগুলোর কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

লেখক : নন্দকুমার দেববর্মা। রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক নাট্য বিষয়ে নিয়মিত পাঠ দান করেন।

নাট্য ও সংস্কৃতির জগতে ভাইরাস সংক্রমণ যেন না হয়

প্রশান্ত সেনগুপ্ত

কোভিড-১৯ অর্থাৎ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বিশ্বে আমরা এখনো বেঁচে আছি যারা তাদের অনেকেই সুস্থ স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় জারিত হয়ে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ পুন:স্থাপিত করতে চাই। করোনা বিপর্যয় অতিমারী কিংবা মহামারী আতঙ্কে পৃথিবী যখন আতঙ্কগ্রস্ত, বিরাট অংশের মানুষ রুটি রুজি হারিয়ে বিপন্ন তখনও অনেক মানুষেরই ভ্রুক্ষেপ নেই। ফেসবুকে দেখি নানা ধরনের চপল রসিকতা খাবার দাবারের ছবি ইত্যাদি। তখন ভাবনা হয় মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতা কী? করোনা ভাইরাস ঠেকাতে গত ২৫ মার্চ থেকে হঠাৎ করে দেশজুড়ে লক ডাউন ঘোষণা করা হল। বলা হল " সামাজিক দূরত্ব" বজায় রাখতে। আমরা কেউ তখন একথাটার অর্থ বুঝিনি। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য আরেকজন মানুষের মধ্যে দৈহিক উপস্থিতির দূরত্ব বজায় রাখা দরকার সংক্রমণ ঠেকাতে। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব কেন? এর পেছনে এক গূঢ় অভিসন্ধি রয়েছে তা সন্দেহ করা অমূলক নয়।

এ নিবন্ধে আমি করোনা ভাইরাস বিপর্যয়ের পরবর্তী নাট্যচর্চার বিভিন্ন দিক, নাট্যরচনা, উপস্থাপনা, প্রযোজনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। মানব সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্বজুড়ে গত জানুয়ারি থেকে এক ভয়াবহ মহাশক্তিশালী অদৃশ্য জীবাণু যার নাম করোনা, তার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। লড়াইটা অসম। কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য গবেষণায় মানুষ গগনচুম্বী সাফল্য পেলেও করোনা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইটা যেন ঢাল তরোয়াল ছাড়াই চলছে। এ যেন এক নীরব বিশ্বযুদ্ধ। কারণ করোনা ভাইরাসের কোনো গ্রহণযোগ্য প্রতিষেধক ৬ মাস পরও আবিস্কার করা যায়নি। অবশ্য বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর নাগাদ গবেষণার ফল পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে অর্থাৎ জুন, ২০২০ সালের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রায় পৌনে পাঁচ লক্ষ মানুষ চিকিৎসাধীন থেকে করোনা ভাইরাসের শিকার হয়েছেন। ভারতে ওই সময়ের মধ্যে মারা গেছেন ১৪ হাজার মানুষ।

গত ২৪ মার্চ ছিল দেশজোড়া জনতা কারফিউ। পরদিন থেকে শুরু হয় লক ডাউন, ১৪৪ ধারা, শারীরিক দূরত্ব। মাত্র চারঘন্টার নোটিশে লকডাউন ঘোষিত হওয়ায় আমাদের দেশে মানব সম্পদের অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে। ইতোমধ্যে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ তাদের সামান্য ও একমাত্র কাজটুকু হারিয়ে চূড়ান্ত ভাবে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন না করে হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করে স্থল, জল, আকাশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়ায় সবচাইতে বিপন্ন হয়ে পড়েন যারা পেটের দায়ে পরিবার পরিজনদের ভরণপোষণের জন্য নিজের গ্রাম, শহর ছেড়ে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে গিয়েছিলেন । লক ডাউন বন্ধ করে দেয় কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, পরিষেবা ক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক , কর্মী বেকার হয়ে পড়েন। তাদের বাড়ি ফেরাতে প্রথমদিকে কোনোরকম সরকারি পরিকল্পনাই ছিল না। তদুপরি তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সরকারের মাথায় ছিল না। যেন হুজুগে দেশের মানুষ আমরা।

শুধু শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেই গাড্ডায় ফেলা হয়নি। অপরিকল্পিত দিশাহীন লক ডাউন লক্ষ লক্ষ কৃষক, ক্ষেত মজুরকে মারাত্মক বিপন্ন করেছে। এক অমানবিক প্রহসন হয়েছে গরিব সাধারণ মানুষকে নিয়ে। তাদের মুখ থেকেই শোনা গেছে করোনায় মরা ভালো অনাহার মৃত্যুর চেয়ে।

লকডাউন চারটি পর্বে ১৪ দিন করে চলে। পয়লা জুন শুরু হয় আনলক- ১ পর্ব। মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সারা দেশে অবর্ণনীয়, অভূতপূর্ব, একেবারেই অনভিপ্রেত অবাঞ্ছিত এবং অকল্পনীয় বেশ কয়েকটি মর্মান্তিক নিদারুণ ঘটনার সাক্ষী হলাম আমরা। যদি ওই দুমাসের দিনলিপি অনুসন্ধান করি তাহলে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া দুর্বিষহ সীমাহীন দুর্দশা দেখে মানবিকতা শিহরিত হয়ে উঠতে বাধ্য। করোনা ভাইরাস এক বিরাট অপরিমেয় অভিশাপ হয়ে উঠেছে। মানুষ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। এক যারা আক্রান্ত এবং দুই যারা অনাক্রান্ত। অনাক্রান্তদের জন্য লক ডাউনের নানা বিধিনিষেধ।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত না হয়েও বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের কর্মস্থল থেকে পূর্ব, উত্তর ভারতে নিজেদের গ্রামে ফিরতে অনন্যোপায় হয়ে কয়েকজন শ্রমিক পরিবার পরিজন নিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ট্রেন, বাস অন্যান্য যানবাহন বন্ধ। রাস্তা দিয়ে চললে পুলিশ পাকড়াও করে। অগত্যা ওরা ট্রেন লাইন ধরে হাঁটছিলেন। সেদিন এক জোর অমানিশায় ক্ষুধায় অবসন্ন, ক্লান্ত নির্জীব পরিশ্রান্ত শ্রমিকরা ট্রেন লাইনেই শুয়ে পড়েছিলেন। কাদার মতো ঘুমিয়েও পড়েছিলেন তারা। নির্জীব ঘুমন্ত শ্রমিকদের উপর দিয়েই চলে যায় কালান্তক মালগাড়ি। কাটা পড়েন কমপক্ষে ১৮ জন ঘরে ফেরার প্রত্যাশী শ্রমিক। তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন পরিবার পরিজন। ট্রেনে কাটা পড়ার পর ঘটনাস্থলে অর্থাৎ রেল লাইনে পড়েছিল কিছু পোড়া রুটি। যেগুলি খাবার সময় পাননি। ক্ষিধে পেটেই ওদের জীবন সাঙ্গ হয়েছিল।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা সম্পূর্ণ নাটক হতে পারে নি:সন্দেহে। মৃত শ্রমিকদের পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল কিনা জানা নেই। হলেও রিপোর্টে কী উল্লেখ করা হয় তাও অজানা। তবে সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি নাটকে পোস্টমর্টেম করা যেতেই পারে।

দেশ স্বাধীন হবার পর এমন ভয়াবহ অচিন্তনীয় মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক ঘটনা আর একটিও ঘটেনি। এই বাস্তব ঘটনা, বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক নির্মাণ হতেই পারে।

এছাড়া লক ডাউনকালে অজস্র ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে শ্রমিকদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবিশেষ উল্লেখ করার মতো। হাজার শ্রমিক ঘরে ফিরতে হাজার মাইল হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন । এক কিশোরী তার অসুস্থ বাবাকে বাইসাইকেলে চাপিয়ে হাজার মাইল পরিক্রমা করেছে। অনেক শ্রমিক স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে হেঁটে সাইকেলে বাড়ি ফিরেছেন। লকডাউন বিধিনিষেধের গ্যাঁড়াকলে বহু মানুষ বাড়ি ফিরতে পারেননি। খাবার, পানীয়, বাসস্থানের অভাবে আকাশের নীচে থেকেছেন। কারখানা থেকে ছাঁটাই, বাড়িওয়ালা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এমন ভুরি ভুরি ঘটনা ঘটেছে হাজারো শ্রমিকের জীবন। যেন জীবন যন্ত্রনার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কোলাজ। সবই যেন আরোপিত।

একটা অপ্রতিরোধ্য জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে কোটি কোটি মানুষকে এভাবে বিপদে ঠেলে দেবার ঘটনা অন্যান্য দেশে ঘটেছে কিনা জানা নেই। এক মৃত্যু উপত্যকা যেন, এক মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আগরতলা কেন গোটা রাজ্যেই লকডাউন বিধিনিষেধ কেড়ে নিয়েছে হাজার হাজার দিন মজুর, নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সা ও পরিবহন শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে দুমুঠো ভাতের স্বপ্ন। লক ডাউন সংক্রমণ যেমন বিশ্রীরকম ছড়াতে পারেনি তেমনি হাজার হাজার পরিবারে ডেকে এনেছে অর্ধাহার অনাহারের হাতছানি। পাহাড়ের মানুষ বিশেষ করে জুমিয়া পরিবারগুলির অবস্থা শোচনীয়। উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে ভালো নাটক রচনা করা অসম্ভব নয়। সবটাই বেঁচে থাকার লড়াই। একদিকে ভাইরাস, অপরদিকে ভাত রুটি।

এবার লকডাউনের চারটি পর্বে কৃষক, ক্ষেতমজুরদের ভয়ানক জটিল ও কঠিন পরিস্থিতি আলোচনা করব। সমাজের অন্নদাতা বলে অতি পরিচিত এই অংশের কঠোর পরিশ্রমী মানুষ জঘন্যভাবে প্রশাসনিক নির্দয়তা লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। তাদের এই জ্বলন্ত অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে অবশ্যই নাটক রচনা ও নির্মাণ করা যায়। এখানে শুধু দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। কমলপুর ও খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত চিহ্নিত করে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করা হয়েছে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে। প্রায় সব গ্রামেই সীমান্তের ওপারে রয়েছে ভারতীয় ভুখন্ড সেখানে অনেক ভারতীয় বসবাস করছেন। রয়েছে বহু আবাদি জমি। ভারতীয় কৃষকরা সেখানে ধান ছাড়াও প্রায় সব ধরনের শাক সব্জি ফলান। এটাই তাদের উপার্জনের প্রধান উৎস। আচমকা লকডাউন ঘোষিত হল। একবারের জন্যও প্রশাসন ভাবল না হাজার হাজার একর জমিতে সোনার ফসলের কথা। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হল । এক মর্মান্তিক বিষয়। কৃষকরা সহ্য করতে পারেননি। কমলপুরের বেশ কয়েকজন কৃষক এস ডি এমের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেন। কিন্তু তার মূল্যবান সময় অন্নদাতাদের জন্য খরচ করতে রাজি হলেন না। কয়েকদিন পর দ্বিতীয়বার গেলেন কৃষকরা। তিনি দেখা করলেন, স্মারকলিপি সম্পর্কে বললেন উপর

মহলে জানাবেন। জানিয়েছিলেন কি না কে জানে। কারণ ফসল সত্যিই নষ্ট হল। কৃষকরা তাকে অনুরোধ করেছিলেন সীমান্ত গেট খুলে দেওয়া হোক দৈনিক তিন ঘন্টার জন্য। শারীরিক দূরত্ব মেনে মাস্ক পড়ে তারাই ফসল সংগ্রহ করে আনবেন। শুধু তাই নয় এইসব ফসল বিনামূল্যে মহকুমা প্রশাসনই জনসাধারণের মধ্যে বিলি বন্টন করবে। কিন্তু স্থবির জড় প্রশাসন।

দ্বিতীয় অত্যন্ত নিন্দনীয় অমানবিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। শান্তিরবাজার মহকুমার একটি গ্রাম্য বাজারে স্থানীয় কয়েকজন ক্ষুদ্র কৃষক তাদের কঠোর পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। সময়টা লকডাউনের দ্বিতীয় পর্ব। পুলিশ, টি এস আর জওয়ানরা বিধিনিষেধ বজায় রাখার নামে বাজারে ক্ষুদ্র কৃষকদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চালায়। ঘায়েল হন বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে পঁয়ষট্টি বছরের একজন প্রবীণ ক্ষুদ্র কৃষক। ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বাড়ন্ত। তাই কিছু শাক সবজি বাজারে বিক্রি করে ডাল তেল লবণ ইত্যাদি সংগ্রহ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তারা বিধিনিষেধ মোটেই অমান্য করতে কিংবা নিছক রং তামাশা করতে যাননি। আইনের রক্ষকদের হাতে কেবল লাঠি বন্দুকই থাকবে। হৃদয় মানবিকতা বিবেচনা বলতে তাদের কিছুই থাকবেনা ? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সোচ্চার। গণতান্ত্রিক পটভূমিতে এ কোন প্রহসন? নাটক এসব ঘটনায় আধারিত করে রচনা করা যায়। কৃষকরা গত রবি মরশুমে এবং বর্তমানেও ফসলের ন্যায্য দাম পাননি। একরের পর একর জমিতে আনারস হলেও বাজার নেই। রপ্তানিতেও গরজ নেই প্রশাসনের। লক ডাউনের সময় হাজার হাজার লেবু গাছেই নষ্ট হয়েছে। এসব বিশাল ক্ষতির দায় কে নেবে? কে দেবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সময়ের মানসিক সমস্যা। একদিকে কোভিড -১৯ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা, দীর্ঘ লক ডাউন পর্ব একটা অংশের মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের মনে অবসাদ, ক্লান্তি, হতাশা ইত্যাদি মনোবৈকল্য বাসা বেঁধেছে। পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা স্বাভাবিক চলাফেরা, জীবন যাত্রার চেনা ছন্দ হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ায় কিছু মানুষের মনে জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক বিপর্যয়ও নাটকের উপজীব্য বিষয় হতে পারে। তবে বাস্তব সমস্যা, দ্বন্দ্ব এসব টানাপোড়েনের দিকগুলিকে মাথায় রাখা দরকার।

:

লেখক : প্রশান্ত সেনগুপ্ত, রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গল্পকার।

মাইম ঃ শব্দ নিঃশব্দের মণিমঞ্জুষা

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

Mime is the technique of silence অন্যদিকে Technique is the main organ of Drama বা Theatre . অপরদিকে বলা যায় নিঃস্তব্ধতার শিল্পরূপ মূকাভিনয়— আবার শোনা যায় নীরবতার শিল্পরূপ মূকাভিনয়। এক কথায় মাইম- শব্দ নি:শব্দের মিথষ্ক্রিয়া। তাই তো লেবানন - এর প্রখ্যাত মূকাভিনেতা Fack Homaissi বলেন " World of silence is the only world of truth. Only silence is great. Only silence can unify the human race. " শব্দ-নি:শব্দের পরিমণ্ডলে বিশ্ববন্দিত মহান নির্বাক কবি চার্লি চ্যাপলিন -এর সেই মহান উক্তি দিয়ে নিবন্ধ শুরু করি। " I had no idea of character. But the moment I was dressed, the cloth; make-up the sound made me feel the person he was I began to know him, and by the time I walked on to the stage he was fully born".

মাইম শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। একথা আমরা সবাই জানি যে, সভ্যতার আদিম স্তরে মানুষ যখন কথা বলতে শেখেনি তখন আদিম মানব সম্প্রদায় তাদের নিজেদের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশ করতো আকারে ইঙ্গিতে। দলবদ্ধ হয়ে ফলমূল সংগ্রহ করে তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণ করতো। ক্রমে সেই অঞ্চলের ফলমূল যখন শেষ হয়ে যেতো তখন সেই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র আবার নতুনভাবে বসবাস শুরু করতো— ক্রমে আবার অন্যত্র। সভ্যতার এই ক্রমবিকাশকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়— (১) আহরণ ও শিকার যুগ (২) পশুপালন যুগ, (৩) কৃষিযুগ, (৪) শিল্পযুগ। এই আহরণ যুগ ও শিকার যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র বানাতে শিখলেও শিকারের পটুতা না থাকায় দিনান্তে শিকার করে যখন সবাই একসাথে খেতে বসতো তখন তারা দেখতো দলের কেউ না কেউ অনুপস্থিত— অর্থাৎ শিকারের সময় তাদের অনুপস্থিত শিকারের সঙ্গীরা মারা গিয়েছে। এইভাবে তাদের সঙ্গীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ায় তারা স্থির করল শিকার করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। সেই কৌশল আয়ত্তের জন্য চললো আকারে ইঙ্গিতে মহড়া। কেউ বাঘের , কেউ সিংহের অনুকরণ করতো। মহড়ার সময় মুখ থেকে নানারকম শব্দ নির্গত হতো। সেই শব্দই কালক্রমে হয়ে উঠলো আবহ সঙ্গীত। পরবর্তী সময়ে শিকারের এই মহড়াকে আরও প্রাণবন্ত করতে শিকার করা পশুর হাড় দিয়ে কাঠের গুড়িতে ঠুকে তারা বিভিন্ন ধ্বনি -সুর তৈরি করলো। যে ধ্বনি-ও সুরের থেকে সৃষ্টি হলো তাল ও ছন্দ। এই ভাবে মহড়ার যত উন্নতি হলো ততই তারা শিকারে সফলতা পেতে শুরু করল। এক একজন হয়ে উঠলো পটু শিকারী।

খাদ্য-জীবিকা সংগ্রহের লড়াইকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের অনুকরণ থেকেই এই অনুকৃতি শিল্প জন্ম লাভ

করে। অতএব এ কথায় কোনো অত্যুক্তি নেই যে 'মূকাভিনয়' মানব ইতিহাসের আদি ও অকৃত্রিম শিল্প। এই অনুকরণ বা অনুকৃতি শিল্পই নীরবতার শিল্পরূপ তথা মাইম(Mime) এর উৎস। গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল তাঁর কাব্যতত্ত্ব (পোয়েটিক্স) -এ এবং খ্রীষ্টের জন্মের ২০০ বছর আগে ভরতমুণি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকর্মের প্রধান অবলম্বন রূপে এই অনুকরণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভরতমুণি তাঁর ভরত নাট্যশাস্ত্রের অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন-
"আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যর সাত্তিকস্তথা/জ্ঞেয়স্তুভিনয়ো বিপ্রাশ্চতুর্যা পরিকল্পিত।।"

প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে আজ পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর নিমেষে আরেক প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। অথচ একটি মানুষের মনের কথা ঠিক তেমনটি করে বোঝানো যায় না আর একটি মানুষকে। মানুষ আজীবন এই অপারগতার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ায়। পৃথিবীর সব শিল্প কর্ম্মে এই বোঝামুক্ত হবার প্রয়াস। ভাষার ব্যবহার ব্যতিরেকে ভাব ও ভাবনার প্রকাশকে অধিকতর আবেদনময় করে তোলে MIME বা মূকাভিনয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মানুষের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করার ও সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার ক্ষমতা মূকাভিনয় -এর আছে বলে মূকাভিনয় -এর অপর নাম " আন্তর্জাতিক ভাষা(Mime is the universal language of the world)"। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন মানুষের মুখ বন্ধ করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে তখন প্রধান প্রতিবাদী অস্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে মাইম বা মূকাভিনয়। মাইম আসলে এক প্রতিবাদ। মাইমের অনুকৃতি যেমন ক্রিয়া বা Action-এর , তেমনি মনের —তেমনি ভাবের। শরীরের পেশীর সঞ্চালনে, ব্যবহারে এই ক্রিয়া ও ভাব এক ধ্রুপদী শিল্পের বিন্দুতে মিলিত হয়। আর এ অনুকৃতি একই সঙ্গে শব্দময় নিঃশব্দ।

মাইম এক গতির ঝঙ্কার আবার নিঃশব্দের তর্জ্জনী। আজকের অদ্ভুত আঁধারে। চৈতন্যের মড়কে মাইম বিশেষ প্রাসঙ্গিক। তাই মাইম-এর আসর মানেই চতুর্দিকের ভগ্নস্তূপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। শব্দকে নৈঃশব্দের মুখরতায় শুদ্ধ করা, ড্যামিন্যাস্ট আইডিয়ালজি বা প্রদান, শোষক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আবার বস্তুর শরীরে মুক্তিও। এই মুক্তির বার্তা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ফরাসী বিপ্লবের সময় গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো নিঃশব্দ মাইম। মাইম গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী ব্যঙ্গ। যাকে বলে লাফটার। এই লাফটার এর ইতিহাসে মাইম এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মিখাইল বাখতিম ১৯০৩ -এ প্রকাশিত Reich-এর 'দি মাইম' নামক বইটি সম্পর্কে লিখেছেন— " Grasps the essential many centuries old link of laughter with the images of the God's lower stratum." মূক + অভিনয়= মূকাভিনয়। বাক্য বা বাক্হীন অবস্থার কিংবা কোনোপ্রকার সংলাপ উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয় এই শিল্পের প্রকাশ মাধ্যম। ভরতমুনির ভরতনাট্যম অনুযায়ী অভিনয় চার প্রকার— আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং উপাঙ্গের গতিবিধি বা গতিভঙ্গির যে চলন অর্থৎ দেহজভাষা বা Body Language দ্বারা মঞ্চ উপযোগী উপস্থাপনাই আঙ্গিক অভিনয়। অভিনয় বিধিতে তিনি তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন যথা - নৃত্য - নৃত্ত-নাট্য। নৃত্য

অর্থাৎ নাচ। নৃত্ত অর্থাৎ অনুকরণ বা অনুকৃতি শিল্প অর্থাৎ নির্বাক (মূকাভিনয়) । আর নাট্য বলতে বোঝায় সংলাপ সহযোগে অভিনয় বা সবাক্ অভিনয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আদি ও অকৃত্রিম শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার অভিব্যক্তি এই মূকাভিনয় বা মাইম প্রথম শৈল্পিক রূপ নিয়ে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে গ্রীক্, রোম, ফ্রান্স, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষে। ইংরেজী মাইম(Mime) বা ফরাসী মিম(Mim) শব্দের প্রথম ব্যবহার গ্রীক্ শব্দ প্যান্টোমাইম'(Pantomime) এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৬৪ অব্দে। শিল্প হিসাবে তার আধুনিকীকরণ তখন থেকেই পরিলক্ষিত। মাইম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রকৃত ঘটনা প্রদর্শনকারী প্রহসন্', ঐরূপ প্রহসনের অভিনেতা , ' A kind of frace, in which real characters were represented; actor in such a farce.' প্যান্টোমাইম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'কেবল অঙ্গ ভঙ্গির দ্বারা অভিনয় করা।' মাইম ও প্যান্টোমাইম-এর আভিধানিক অর্থের ভিন্নতাকে আরও বিশদে পর্যালোচনা করা যেতে পারে ঃ -

মাইম	প্যান্টোমাইম
১। শিল্পী এককভাবে সব সিরিয়াস বিষয়বস্তু উপস্থাপনা করবে।	১। দলগতভাবে নির্বাক্ অভিনয়-এর মাধ্যমে হাস্য রসাত্মক নাটকাদি উপস্থাপনা করবে।
২। শিল্পীর দেহ ভঙ্গিমা হবে সুক্ষ্ম আঙ্গিকাভিনয়	২। প্যান্টোমাইম বৃহদাকার আঙ্গিকাভিনয়।
৩। কোনো কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকবে না একজন শিল্পী বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবে।	৩। কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকবে পাশে পাশে সাথে থাকবে পার্শ্ব চরিত্র অভিনেতা।
৪। মাইম সর্ব্বময় বিভ্রম মঞ্চ। অর্থাৎ illusion stage তৈরী করবে । কোনো স্টেজ props ব্যবহার হবে না।	৪। প্যান্টোমাইমে props ব্যবহারে জন্য illusion এর প্রয়োজন হয় না।
৫। বিমূর্ত বা বাস্তবতা বিবর্জিত।	৫। বাস্তবসম্মত অভিনয় রীতি প্রযোজ্য ।
৬। অভিনয় চলাকালীন বেশভূষার পরিবর্তন হবে না। শুধু মুখোশের পরিবর্তন হবে।	৬। অভিনয় চলাকালীন বেশভূশার পরিবর্তন হতে পারে। সাথে সাথে মুখোশেরও ব্যবহার হবে।
৭। Sign এর ব্যবহার হবে a sign is eternal which is related to the world of things (Jhone Brucket)	৭। Symbol-এর ব্যবহার হবে A symbol is internal which is related to the world of ideas (John Bruket)
৮। মাইম অনুকরণ শিল্প	৮। প্যান্টোমাইম অনুকৃতি শিল্প।
৯। অভিনয়ের সময় দর্শকমনে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে এবং অভিনয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করতে যে বিষয়গুলিকে ভীষণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলিহল —ক) আয়তন বা size খ) আকৃতি বা shape গ) ওজন বা height ঘ) সময় বা Time উপরিবর্ণিত বিষয়গুলি নিয়মিত অভ্যাস করা আবশ্যক।	৯। প্যান্টোমাইমে স্টেজ properly ব্যবহার অর্থাৎ অভিনেতা মঞ্চসামগ্রী ব্যবহার করতে পারে সেইহেতু অভিনয়ের সঠিকতার জন্য। আয়তন, আকৃতি, দূরত্ব, সময়, ওজন এর গুরুত্ব খুব বেশী নয়।
১০। মাইমে প্রাচীর পত্র (placard) ব্যবহৃত হয় না।	১০। প্যান্টোমাইমে প্রাচীরপত্র ব্যবহৃত হয়।

রোমান সভ্যতায় অবশ্য মাইম-এর থেকে প্যান্টোমাইম এর চলনই ছিলো বেশী। ‘ Pantos’ এবং ‘Mimeomai’ (Pantos and Mimeomai) যার অর্থ অনুকৃতি। শব্দ দুটি জুড়ে প্যান্টোমিমাস্ শব্দের উৎপত্তি।প্যান্টোমিমাস- এর অভিনেতারা কেবল সাধারণ দর্শকবৃন্দের কাছে নয় সমাজের উচ্চশ্রেণী ব্যক্তিদের কাছেও জনপ্রিয় ছিলো। সম্রাট আগাস্টাস্ প্যান্টোমিমাস্ -এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইতিহাসে কুখ্যাত সম্রাট নিরো ছিলেন একজন প্রখ্যাত প্যান্টোমিমাস শিল্পী। তদানীন্তন রোমে প্যান্টোমিমাস্দের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন -পাইলাডেস, ব্যাথিল্লুস ও প্যারিস্। এই তিনজন অভিনেতাই প্যান্টোমিমাস্ বা বা প্যান্টোমাইম শিল্পকে এক উন্নত শিল্পরূপ দান করেছিলেন। সম্রাট নিরোর আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্যান্টোমিমাস শিল্পী ছিলেন প্যারিস এবং তিনি সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে যে নিরো নিজে একজন প্যান্টোমিমাস্ হওয়াতেই ঈর্ষাবশত প্যারিসকে হত্যা করেন। রোমানরা প্যান্টোমাইম বলতে বোঝাতো মূকাভিনেতাকে এবং তারা তাদের প্রদর্শনীতে মুখোশের ব্যবহার করতেন, যার ফলে হাত ও হাতের অঙ্গুশ্রী বক্ষ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গগুলি ভাবের এবং অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে সহায়তা করতো। মুখের কোনো অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতো না এবং সেই কারণেই তারা বেছে নিতেন প্রধানত: পৌরাণিক বা দর্শকদের পরিচিত কাহিনীগুলি। যাতে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। পরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই পদ্ধতিগত মূকাভিনয় শিল্পটি করপোর্যাম মাইম রূপে মঞ্চে আবির্ভূত হয়।

গ্রীক্ সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন আঙ্গিকাভিনয় Pantosবা Mimeomai। কৃষিযুগ থেকেই গ্রিকে নৃত্য ও নৃত্ত-র আবির্ভাব। গ্রিক্ এর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিসম্পদ আঙ্গুর চাষ থেকেই এই শিল্পের উদ্ভব। প্রায় ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিকের Attica অঞ্চলে আঙ্গুর ফলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডিয়োনাইসাসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শীত ও বসন্ত ঋতুতে পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এইসব পূজা উৎসব ডিথাইরাস অথবা ডিয়োনাইসাক্ উৎসব নামে পরিচিত হতো। এই উৎসবের অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে মুখোশ পরে ‘নৃত্য’ ও ‘নৃত্ত’ পরিবেশিত হতো। এই উৎসবের মাধ্যমে দেবতাদের সাথে অভিনেতাদের আত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টি হতো। আঙ্গুর সংগ্রহ শুরু হতো ডিসেম্বর মাস থেকে। অর্থাৎ আঙ্গুরের চাষ শুরু হওয়ার সময়কার একটি উৎসব। যাতে প্রচুর আঙ্গুর উৎপাদন হয় সেই উদ্দেশ্যেই দেবী ডিয়োনাইসাসের কাছে ‘নৃত্য’ - এর মাধ্যমে প্রার্থনা চলতো সমবেতভাবে পরিবেশিত হতো অন্য আরেক ‘নৃত্ত’ অনুষ্ঠান। যাকে বলা হতো ‘লেনিয়া নৃত্ত’ উৎসব। ফেব্রুয়ারী মাসে আঙ্গুর পেষণ করা রস থেকে পানীয় বা মদ্ তৈরীর পর তার গুণাগুণ স্বাদ গ্রহণের জন্য হতো সমবেত ‘হুলোর নৃত্য’ যার নাম ছিলো এ্যানথেস্টেরিয়া— এইসব উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত ভাবে নৃত্য পরিবেশিত হবার সময় দেখা যেতো যে অভিনেতা ডিয়োনাইমাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন ধীরে ধীরে। সেই অভিনেতাকে সকলে আলাদা মর্যাদা দিত এবং সে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হতো। সমাজে অন্যান্যদের তুলনায় পদমর্যাদাধিকারী হওয়ার জন্য অভিনেতারা বিশেষ পারদর্শী পূর্ণ অভিনয় চর্চা করতেন। উন্নতমানের এই চর্চা

থেকে উদ্ভব হল pantos বা মাইমোমাই বা অনুকৃতি শিল্প।

শুধুমাত্র রোমান সভ্যতায় নয়, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবকে কেন্দ্র করে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষেও যে বিবিধ লোক উৎসবের উদ্ভব তার ভিতর লুক্কায়িত রয়েছে মূকাভিনয় শিল্প। চীনে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান -এর পাশাপাশি, কৃষিজমি তৈরি করার সময় এই 'অনুকৃতি' শিল্পের উদ্ভব হয়। সমবেতভাবে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মুখোশ সহযোগে এই নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দের সময় মেং নামে একজন চীনা মূকাভিনেতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনিই সে দেশে এই 'অনুকৃতি' শিল্পচর্চার বিকাশ ঘটিয়ে ভূস্বামী চ্যাং কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলেন, চীনদেশে ড্রাগন নৃত্য পরিবেশিত হয় অঙ্গভঙ্গিমা ও শারীরিক দক্ষতার দ্বারা। এই নৃত্যাভিনয়ে দক্ষ হওয়ার জন্য প্রত্যেক শিল্পীকে মূকাভিনয় শিল্পে পারদর্শী হতে হতো।

জাপানের দেবতা সূর্য। এই সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয় প্রাচীন লোকনৃত্য উজুমে— 'উজুমে নৃত্য।' পরবর্তীকালে 'উজুমেনৃত্য' থেকে বিকাশ লাভ করে সৃষ্টি হয় 'কাগুরা নৃত্য'। এই 'কাগুরা নৃত্য'তে মুখোশ পরে সমবেতভাবে একের পর এক ঘটনা উপস্থাপিত করে নৃত্য-নৃত্ত-নাট্যের প্রকাশ ঘটাতো। পরিশীলিত চর্চার ফলে এই নৃত্যের আরো বিকাশ ঘটে, এবং উদ্ভব হয় জাপানি ক্লাসিক্যাল থিয়েটার 'নো-ড্রামা' -র এবং 'কাবুকি নৃত্য'-র । মুখোশের জাপানী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'নো ম্যান'(Noh-men) যেটা নো থিয়েটারে ব্যবহৃত হয়, স্বভাবতই 'নো থিয়েটারে' ও 'কাবুকি নৃত্যে' দেহজ ভাষায় প্রচলিত কাহিনীই প্রকাশ পেতো বেশী। বর্তমানে জাপানে মূকাভিনয় চর্চা খুবই উন্নতমানের। মূকাভিনয় -এর মূল ধর্ম্ম যেটা তা হচ্ছে 'illusion' তৈরী করে অভিনেতব্য বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে, জাপানের মূকাভিনয় শিল্পীরা এটি খুবই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিষ্ঠাভাবে পালন করে।

ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ। এখানেও মূকাভিনয় শিল্প-ধর্ম থেকে দেব দেবতা থেকে আবির্ভূত। ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা মূক হয়ে তপস্যা করতেন। তপস্যার এক স্তরে বাক্ সম্পূর্ণ রোধ করাই নিয়ম। অথচ বাক্ যখন রুদ্ধ, শরীর তখন কথা বলে। চোখ যখন বন্ধ দৃষ্টি তখন উন্মুক্ত। দেহ যখন আসনে অটল তখনো সে স্বগ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে আসতে পারে। কি ভাবে? কারণ শরীর ও মনের স্পন্দন। মুখ দিয়ে সে কথা বলে না অথচ দৈববাণী উচ্চারিত, চোখ দিয়ে সে দেখে না অথচ ত্রিনয়ন সব সময় ক্রিয়াশীল। স্থির হয়ে বসেও সুক্ষ্ম দেহে সে ভ্রমণশীল। কত হাজার হাজার বছর আগে মুণি-ঋষিরা আবিষ্কার করেন চারটি শব্দ 'মনঃ', 'বুদ্ধ', 'চিন্তা', 'অহং' যা আজকে মূকাভিনয় শিল্প চর্চায় অপরিহার্য। ধ্যান যোগ মূকাভিনয়-এর আর শক্তি।

এই ধ্যানযোগ থেকেই উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন লোক উৎসব যা রামায়ণ, মহাভারত ভিত্তিক পুতুলনাচ ও মুখোশ নৃত্য— পরে ভারতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যের মধ্যে ভারতের মূকাভিনয় শিল্পের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। কথাকলি নৃত্যে নাট্যশাস্ত্রের চারটি ভাগই

লক্ষ্য করা যায়— আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য্য। অর্থাৎ মুখজ অভিনয়ের মাধ্যমে গীত অবলম্বন করা হস্তের (হস্তমুদ্রা) দ্বারা গীতে অর্থ নির্দেশ; নেত্রদ্বয়ের ভাব প্রদর্শন। পদদ্বয়ে তাল রক্ষণ। যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি , যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানেই ভাব সেখানেই রসোৎপত্তি। এই রসনিষ্পত্তিই কলা সাধনায় চরম উৎকর্ষ। আঙ্গিকাভিনয়ের এই চরম উৎকর্ষই কথাকলি নৃত্যের সম্পদ। ভারতনাট্য— ভাব -রাগ-তাল এই তিন কলার সমন্বয়ে সৃষ্টি। এই ভারতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যের মধ্যে মূকাভিনয় -এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং মূকাভিনয়- এর স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র লক্ষণ মূকাভিনয়ের কার্যকারিতা আগেই উদ্ঘাটিত, তারই ধারা অনুসরণ করে আজ মূকাভিনয় নিজস্বতার দাবী নিয়ে উপস্থিত। ভাব থেকেই মূকাভিনয়ের সৃষ্টি, ভাষা থেকে নয়।

প্রকৃতি কি কথা বলে? বলে, কিন্তু ভাষা দিয়ে নয়, ব্যাকরণসম্মত ভাষাশাস্ত্র সে ব্যবহার করে না। বাতাস-শোঁ-শোঁ শব্দের বেগে বয়ে যায়। মেঘ গর্জন করে। ঝড় হাহাকার করে, বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র ধমকায়, গাছ মাথা দোলায়, কিংবা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। সমুদ্র আছড়ে পড়ে। পুকুরে ঢিল মারলে 'ডুবং' অথবা 'কল' করে ওঠে, দীঘির জলে বা পুকুরে জলে ঘাই মারার শব্দ সে তো আর্তনাদের শব্দ, নদী কুল কুল করে বয়ে যায়, পাখি কিচির মিচির করে । ধান গাছ মাথা নাড়ে। সাপ 'হিশ্' শব্দ ছাড়া বেশী কথা বলে না ব্যাঙ্ 'গ্যাঙোর' ছাড়া আর শব্দ জানে না। তারারা মিট্ মিট্ করে জ্বলে। সূর্য, চন্দ্র বাক্য ব্যয় না করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। ভোরের সূর্য - মধ্যাহ্ন সূর্য আর অস্তাচলের সূর্য তিনরকম ভাব ব্যক্ত করে। অথচ ভাষা নেই।

প্রকৃতি ভাষা ছাড়াই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের কেন এতো ভাষার প্রয়োজন হবে? নিম্নস্তরে— নির্বাক অভিনয়। মধ্যস্তরে — সবাক। অন্তিমে - পুনঃনির্বাক। সত্যজিৎ রায়ের পরশ পাথরে পাথর কথা বলে, শাখা প্রশাখায় গাছপালা কথা বলে। 'অপুর সংসারে' পিতাপুত্রের মিলন হওয়ার পর আর কথা নেই অথচ পিতার কাঁধে পুত্র দৃশ্যটি পর্দায় চলমান ও জীবন্ত হয়ে কত কথাই বলতে থাকে।

নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন, থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের দেহ থেকে অনাবশ্যক মেদের মতো অতিরিক্ত সংলাপ ঝরিয়ে দিলে শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে তন্বী ও ঝরঝরে, হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময় ও বাঙ্ময়, হয়ে ওঠে মনোগ্রাহী ও হৃদয়স্পর্শী। উদাহরণস্বরূপ: 'পথের পাঁচালী' সেখানে সর্বজয়া মেয়ের মৃত্যু সংবাদ স্বামীকে জানাতে বাক্য খরচ করেনি, সেখানে প্রথম ট্রেন চলার দৃশ্য দেখে অপু-দুর্গা কথা বলতে ভুলে গেছে। সেখানে বৃষ্টির দৃশ্যে দুর্গা জলে ভেজে অপুও ভেজে। মুহূর্ত-মুহূর্ত পার হয়ে যায়— কথা নেই -অথচ ভাইবোন পরস্পরকে দেখছে। কথা না বলেও কত কথা বলে। 'ভুবনসোম' -এ ও বালিয়াড়ির দৃশ্যে

প্রকৃতি কথা বলে। 'নায়ক' শেষ দৃশ্যে কটা কথা বলে? অথচ কথা না বলেও কতো কথা বলা হয়ে যায়। 'ভুবনসোম'কে নিয়ে আজও কথার শেষ হয় না। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' এ যন্ত্রের সঙ্গে কথোপকথন ও প্রেম চলে। যন্ত্রই হয়ে ওঠে নায়ক। ভাষা নেই অথচ তার দাবী সে ঠিকই প্রতিষ্ঠা করে। 'চারুলতা'-তেও তো দুটি হাত হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। বিরহী স্বামী ও বিরহিনী স্ত্রী 'মূক' হয়ে কাছে আসে আবার দূরে সরে যায়। 'দেবী'তে তো নায়িকা জড়পুত্তলী হয়ে বসেই চোখের দৃষ্টি ও ভঙ্গিমা দিয়ে নিজের যুবকাষ্ঠে বলি হওয়ার যন্ত্রণা ব্যক্ত করে, করে বলেই 'দেবী'কে ভোলা যায় না। শুভা,কোসিস, কুহুক, মানিক , একদিন রাত্রে, জাগতে রহ, ব্ল্যাক, বেনহুর, গানস্ অব্ নাবারোন, নোয়াস আর্ক, সাউন্ড অব্ মিউজিক, টাইটানিক — এর মতো অসংখ্য চিত্রে সংলাপহীন দৃশ্যগুলির এক ভিন্ন আবেদন রয়ে যায়। যা চিরন্তন হয়ে থাকে দর্শক মনে। সাথে সাথে সংলাপহীন দৃশ্যগুলির নির্বাক শিল্পীদের বা-সি- উপ্যার ন্যু-মেরারীর ভূমিকা বড় উজ্জ্বল।

চলচ্চিত্রের মতো নাটকেও মূকাভিনয় পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক' এ চোরের ভূমিকায় অনবদ্য মূকাভিনয় প্রয়োগ। 'শ্যামলী' , 'একদিন রাত্রে', 'থানা থেকে আসছি' , 'জন্মদিন', 'জগন্নাথ', 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' বিভাস চক্রবর্তী-র 'মাধব মালঞ্চ কইন্যা', 'মহাকালীর বাচ্চা' শম্ভুমিত্রের অনবদ্য নাটক 'বিভাব', সদ্য প্রয়াত উষা গাঙ্গুলির প্রসিদ্ধ নাচক 'লোককথা', শতাব্দী প্রযোজিত ১৯৭৮ সালে বাদল সরকার মহাশয়ের মূকাভিনয় আশ্রিত নাটক 'গণ্ডী', এরপরেই মঞ্চস্থ হয় 'মিছিল' নাটক। অবশ্য এর আগে ১৯৭৬ সালে খড়দহ লিভিং থিয়েটার-এর নির্দেশক শ্রী প্রবীর গুহ তাঁর 'সমুদ্র অস্থির' নাটকটি মূকাভিনয় আঙ্গিকে ব্যবহার করে মঞ্চস্থ করেন এরপর 'এখন মাঝ রাত', 'গাঁয়ের পাঁচালী', 'রাতদিন', 'অহল্যা' এসব নাটকে শ্রী গুহ মূকাভিনয়ের বহুধা ব্যবহার করেছেন। আমরা ভুলতে পারি না নির্বাক অভিনয় একাডেমি'র অঞ্জন দেবের মূকাভিনয় আশ্রিত নাটক 'জয়গুরু' নাটকটির কথা। এবং পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী নির্দেশিত ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার প্রযোজিত মূকাভিনয় আশ্রিত অনবদ্য নাটক 'মা লক্ষ্মী পুতুল নাচ পার্টি আজও শাশ্বত মাইম থিয়েটার।

অধুনা 'রঙতাল থিয়েটার' প্রযোজিত শ্রী রতন চক্রবর্তী নির্দেশিত মূকাভিনয় আঙ্গিক ব্যবহৃত অনবদ্য মানব পুতুল নাটক 'ভাগ্য লক্ষ্মী পুতুল পার্টি', বাংলাদেশ-এর স্বপ্নদল প্রযোজিত জাহিদ রিপন নির্দেশিত অনবদ্য সবাক মাইমো ড্রামা 'জাদুর প্রদীপ' এখনও স্মৃতিময়। মূকাভিনয় আঙ্গিকে সবাক নাটকের মতো উল্লেখনীয় অনবদ্য নির্বাক মাইমো ড্রামা মিনি মাইম মাইন প্রযোজিত 'মুক্তপুরুষ বিবেকানন্দ', বাংলাদেশের প্যান্টোমাইম মুভমেন্টস্ প্রযোজিত জনাব রিজোয়ান রাজন নির্দেশিত 'A tale of a Hero' এবং 'প্রাচ্য' অনবদ্য। আবার পুরোটাই মূকাভিনয় আশ্রিত উল্লেখযোগ্য প্যান্টোমাইম পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী নির্দেশিত ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটার প্রযোজিত বিখ্যাত কর্পোরাল প্যান্টোমাইম 'মেসবাড়ী ও অঞ্জন দেব' -এর 'বোনাস' বাংলাদেশের গাজীপুরের 'মুক্ত মঞ্চ নির্বাকদল' প্রযোজিত জনাব শহিদূল শামিস হাসান নির্দেশিত 'Death of Humanity'এগুলি

নয়নাভিরাম প্যান্টোমাইম। ত্রিপুরার উদয়পুরের লিটিল ড্রামা অর্গানাইজেশন প্রযোজিত গৌতম সাহা নির্দেশিত 'ভয়' একটি মৌলিক সার্থক প্যান্টোমাইম।

উল্লেখ করা যেতে পারে 'মৌনমূক'- এর শান্তিময় রায় নির্দেশিত 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' মুকুল দেব নির্দেশিত মূক একাডেমী প্রযোজিত 'মৃত্যুহীন প্রাণ'- 'বিলে থেকে নরেন', সোমা দাস নির্দেশিত ও সোমা মাইম থিয়েটার প্রযোজিত 'পান্তা বুড়ি', অঙ্গকল্পনার অসিত আচার্যের 'নারী', পরম শ্রদ্ধেয় যোগেশ দত্ত নির্দেশিত পদাবলী প্রযোজিত 'বিপ্লবী ক্ষুদিরাম' অবিস্মরণীয় উপস্থাপনা। প্রখ্যাত প্রবীণ মূকাভিনেতা ধ্রুব মিত্র- এর জাদু মাইম 'বেহালা' অবিস্মরণীয়। মঞ্চে ৭০ জন কুশীলব নিয়ে অবশ্যই মূকাভিনেতা একসঙ্গে অনবদ্য প্যান্টোমাইম মছলন্দপুর 'ইমন মাইম সেন্টার' প্রযোজিত ও ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত 'নভেম্বর বিপ্লব' ও 'দহন' মঞ্চস্থ করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেয়।

একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালে বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী রচিত ও ১৯৭৫ সালে 'রূপান্তর নাট্য সম্প্রদায়' প্রযোজিত 'X-পেরিমেন্ট' নাটকটি সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম মূকাভিনয় নির্ভর নাটক মঞ্চস্থ হয়, ১৯৭৭ সালে 'ন' -এর চেতনা, ট-এর টেক্কা, ক-এর কথা, সুর থেকে অসুরে, স্বপ্ন বিভ্রাট, আজকে অমল, চিরন্তন সত্য, আজকের সকালে, যদিও মানুষ, সময়ের অপেক্ষা- ইত্যাদি নাটকে সার্থকভাবে মূকাভিনয় আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়। পথ নাটকেও মূকাভিনয় ব্যবহৃত হয়েছে। সফদার হাসমির হল্লাবোল, মানুষ, মেশিন ইত্যাদি পথনাটকে মূকাভিনয় ব্যবহার লক্ষ্যণীয় কেননা পথনাটকে সেট্, প্রপস্ ইত্যাদি ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। 'মিনি মাইম মাইন' -এর সব পথ নাটকই মূকাভিনয় আশ্রিত যার ভেতর 'শ্রমিক তুমি এগিয়ে চলো', 'ভারত উদয়', 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। অসাধারণ মাইম আঙ্গিক ব্যবহৃত পথ নাটক তীর্থঙ্কর চন্দ্র নির্দেশিত ও অভিনীত 'ভবঘুরে' ভোলার নয়। রূপায়ন চৌধুরীর 'রানার' স্মৃতিময় কিন্তু মূকাভিনয় একটা স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম, থিয়েটার-যাত্রা-নাটক - পথনাটক-চলচিত্র এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে নির্বাক অভিনয় বা আঙ্গিকাভিনয়ই হবে মূকাভিনয় শিল্পকর্ম হবে না। কেননা মূকাভিনয় যতক্ষণ সঠিক বিশ্বাসযোগ্য বিভ্রম সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত হচ্ছে না।

মূকাভিনয় শিল্পকে স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত করতে পরম শ্রদ্ধেয় যোগেশ দত্ত প্রতিষ্ঠিত 'পদাবলী'-র 'যোগেশ মাইম একাডেমী' মূকাভিনয় শিক্ষা কেন্দ্রের পর সাম্প্রতিক সময়ে মূকাভিনয় চর্চাকে আরো সুসংহত রূপ দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁরা হলেন পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী-নিরলস প্রয়াসের মাধ্যমে আজ স্বমহিমায় জন্ম নিয়েছে 'ইণ্ডিয়ান মাইম থিয়েটার' এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মূকাভিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান National Mime Institute , প্রথিতযশা মূকশিল্পী অশোক চ্যাটার্জি-র 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল' প্রবীণ মূকাভিনেতা স্বপন সেনগুপ্ত -এর 'মূক একাডেমি' মূকাভিনয় স্কুল, প্রখ্যাত মূকাভিনয় শিল্পী মুকুল দেব- এর 'মূক একাডেমী' মূকাভিনয় স্কুল, শ্রী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী-র 'মিনি-মাইম-

মাইন' মূকাভিনয় শিক্ষাকেন্দ্র। প্রবীণ মহিলা মূকাভিনেত্রী কৃষ্ণা দত্তের 'কলকাতা অনুভব' মূকাভিনয় শিক্ষাকেন্দ্র এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বহু শতাধিক মূকাভিনয় শিল্পী স্বমহিমায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে মূকাভিনয় চর্চা ও শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন। বড়ই আনন্দ সংবাদ যে, প্রখ্যাত মূকাভিনেতা শ্রী রতন চক্রবর্তীর উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'Indian Mime Association' এবং স্বমহিমায় আজও প্রকাশিত হচ্ছে প্রখ্যাত মূকাভিনেতা রণেন চক্রবর্তী সম্পাদিত ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলায় মূকাভিনয় বিষয়ক পত্রিকা 'মূকাভিনয়'।

মুখর নজরুল একসময় নীরব হয়ে গেলেন, সেটা দুঃখজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু নীরব হওয়ার জন্যই তাঁর সরবতা আমাদের স্পর্শ করে। সুরের বিস্তার দিয়ে সাঁইবাবাকে ধরতে হয়। শ্রী অরবিন্দের মোটা মোটা বই থাকলেও তাঁর নীরব সাধনা মূর্তিটি দিয়েই তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর বা ঋষি হয়ে ওঠেন। চৈতন্য তো প্রেমাস্ত্র নিয়ে সারা ভারত চষে বেড়ালেন। সবাই তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল।

মুখে কথা সবাই বলে , ভাব দিয়ে কথা বুঝতে পারে ক'জন? প্রাচীন ঋষি শুধু 'দ' উচ্চারণ করে মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু 'ওঁ' উচ্চারণ করতে ঠোঁট ফাঁক করতে লাগে না। অথচ সব কথা হয়ে যায় হাতের মুদ্রা, চোখের মণির ঘূর্ণন, পদাঘাত, কেশ বিন্যাস, চলন, নারারন্ধ্র, মুখ দিয়ে গর্জন বা পেট থেকে ধ্বনি নির্গমন এবং শরীর চালনা— এসব শিক্ষা ইন্দ্রলোক এবং বৈকুণ্ঠের সম্পদ, ভাষা সেখানে গৌণ।

বাক্য মানে প্রায়শই ক্ষয়। ভাব মানে অক্ষয়। সবাক অভিনয়-এর যেখানে শেষ মূকাভিনয় এর সেখানে শুরু। মূক হয়ে দর্শকের সঙ্গে মেলবন্ধন স্থাপনেই শিল্পের অদ্বিতীয় মহিমা পরিস্ফুট। থিয়েটারের মঞ্চ , পথনাটক-এর সড়ক থেকে আর চলচ্চিত্রের ক্যামেরার সামনেই হোক অভিনেতাকে নিজ শরীরের ওপর দখল রাখতে হয় পুরো মাত্রায়। মূকাভিনয় - এর প্রাথমিক শর্তই তাই। বিভিন্ন ভাবের স্বরূপ যেভাবে শারীরিক অভিনয়কে তুলে ধরা যায় সেখানে সংলাপ কেবল অনুঘটকের কাজ করে, শরীরকে টপকাতে পারে না। সেই কারণেই নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ থেকে শুরু করে চার্লি চ্যাপলিন এর নাম আজকের পৃথিবীতে যেমন ভবিষ্যতের পৃথিবীতেও তেমন উজ্জ্বল থাকবে।

তাই Sir Charles Spencer Chaplin- এর উক্তিটি দিয়ে শেষ করি " That Which is apparent ends, That which is subtle is never ending."

লেখক : বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে শুধু মূকাভিনয়, নির্দেশক, রূপান্তর নাট্য সম্প্রদায়, অধ্যক্ষ, নৈহাটি মিনি মাইম মাইন নাট্য ও মূকাভিনয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মাইম অ্যাসোসিয়েশন।

প্রাগজ্যোতিষ নাট্য উৎসব-২০২০ ও ত্রিপুরা

শেখর সি. দত্ত

N.S.D বা রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় ১৯৫৯ইং সঙ্গীত নাটক একাডেমির অংশ হিসাবে শুরু করে, পরে ১৯৭৫ ইং থেকে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে কাজ করে আসছে। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে দেশের চারটি রাজ্যে স্থাপন করে তাদের অফিস বা সেন্টার। দেশের বিভিন্ন ভাষার নাটককে বিকশিত করা, তাকে জনপ্রিয় করা সেই সঙ্গে নাট্যকর্মীদেরও উৎসাহিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় ২০০৮ সাল থেকে পূর্বোত্তর উৎসব নাম দিয়ে উত্তরপূর্বাঞ্চলের নাট্য দলগুলিকে নিয়ে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাট্য উৎসব আয়োজন করেছে। এবার পূর্বোত্তর নাম পরিবর্তন করে 'প্রাগজ্যোতিষ উৎসব-২০২০ নামে তিনটি রাজ্যের রাজধানী শহরে— গৌহাটি (আসাম), ইটানগর (অরুণাচল) ও আগরতলা (ত্রিপুরা) পাঁচটি করে নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেছে নির্ধারিত দিনে ও মঞ্চে। নতুন নামাকরণের কাজটি এ অঞ্চলের শিল্প সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তার প্রকাশ যা দারুণভাবে সংস্কৃতি কর্মীদের আকর্ষণ করেছে। ইতিহাসের গর্ভগৃহ থেকে খনন করে এনে 'প্রাগজ্যোতিষ' স্বর্ণমুকুট পূর্বোত্তর নাট্য উৎসবের মাথায় বসিয়ে N.S.D. একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। N.S.D. সত্যিই ধন্যবাদার্হ।

কেন ঐতিহাসিক বললাম একটু খুলেই বলি, 'প্রাগজ্যোতিষ উৎসব' সম্পর্কে। 'Pragjyotish'- 350 - 650 AD Kamrupa Kingdom under Varman dynasty থেকে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। Prag মানে former বা Eastern, Jyotish মানে light/ astrology/ shining অর্থাৎ Eastern Light (Pragjyotish pura - (pura মানে city) city of eastern light (বর্তমান গৌহাটি), প্রাগজ্যোতিষ নামের sound and style-এ একটা rythm আছে। এটি প্রাচীন নাম, Mythological নাম।
Ramayan, Mahabharat, Kiskinda Kanda, Puran ইত্যাদিতে তার উল্লেখ আছে। মোটামোটিভাবে বলা যায় Narak রাজার সময়ে Kumrupa Kingdom 'Pragjyotish' নিয়ে আসা হয়। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নীলাচল পর্বতের ঢালু অঞ্চলে ।আবার ethnological দিক থেকে বলা হয়ে থাকে 'Chao theius' যিনি China থেকে এসে তিনটি centre occupy করে, তাঁকে Zuthis বলা হতো। তিনটি অঞ্চলের মধ্যে একটি আসামে পরে, ঐ অঞ্চলটিকে 'Pragjyotisha' বলা হতো। এ নিয়ে অন্য মতও আছে, তবে সেটা দেখা ইতিহাসবিদ বা গবেষকদের কাজ। আমি শুধু নামাকরণের একটা প্রথমিক ধারণা দেবার চেষ্টা করলাম।

যাই হোক 'প্রাগজ্যোতিষ উৎসব-২০২০' তিনটি শহরে ভিন্ন ভিন্ন দিনে শুরু হয়। আমি তারিখের ক্রম অনুযায়ী তিনটি উৎসবের নাম উল্লেখ করছি।-

Guwahati : 28th February থেকে 3rd March, 2020 Srimanta Sankaradeva Kalakshetra মঞ্চে উৎসবের সূচনা করেন- প্রধান অতিথি শ্রী দুলাল রায়, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা, সম্মানীয় অতিথি মিঃ প্রাঞ্জল সইকিয়া, বিশেষ অতিথি শ্রী সুদর্শন ঠাকুর এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী হেমা সিং, এসোসিয়েট প্রফেসার N.S.D.

Agartala : 1st March থেকে 5th March, 20202, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং-২, উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা, সম্মানীয় অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী সঞ্জয় গাঙ্গুলী, ও NSD আগরতলার পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টর শ্রী বিজয় কুমার সিং এবং সভাপতিত্ব করেন NSD র ফ্যাকাল্টি মেম্বার শ্রী শান্তনু বসু।

Itanagar : 3rd March থেকে 7th March, 2020, সিদ্ধার্থ বিহার মঞ্চে উৎসব উদ্বোধন করেন Er. Taba Tedin, Hon'ble Minister Culture & Education etc. Deptt., Arunachal, সম্মানীয় অতিথি Sri Opek Gao, Addl. Secretary-cum-Director, Art & Culture, Govt. of Arunachal এবং ছিলেন Mr. Dipankar Paul, Asstt. Prof. & Faculty Member, NSD.

রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় এবারের উৎসবে ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ নাট্য দলগুলির অন্যতম তিনটি সংস্থা (১) নাট্যভূমি, (২) নাট্যভূমি গ্রুফ থিয়েটার, (৩) ত্রিপুরা থিয়েটার তাদের মঞ্চ সফল নাটক 'রাজ অতিথি', 'ওয়াক্সা' ও 'বাপুজী' মঞ্চস্থ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তার মধ্যে 'রাজ অতিথি' ও 'ওয়াক্সা' আগরতলা উৎসবে এবং 'বাপুজী' ইটানগরের উৎসবে মঞ্চায়ণের আমন্ত্রণ পায়। এখানে নাটকগুলি সম্পর্কে বলার আগে একটা কথা বলে রাখা সঠিক হবে বলে মনে করি। একজন সাধারণ নাট্যকর্মী (১৯৭৩ স্কুলে এবং পাড়ায় নাটকে অভিনয় শুরু করলেও ১৯৭৮ থেকে বড় মঞ্চে নিয়মিত নাটক করে আসছি এখনো) হিসাবে উৎসবের আগে নাটকগুলির মঞ্চায়ণ দেখার সুযোগ হয়েছিল তার অভিজ্ঞতা এবং উৎসবে নাটকগুলি দেখেছেন এমন দর্শক ও নাট্য বোদ্ধাদের আলাপচারিতায় যেটুকু মনে হয়েছে তা কিছুটা উল্লেখ করবো। নিজে উৎসব দেখিনি, নিজেদের নাটক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং অরুণাচল চলে যাওয়ায় নাটক করতে। প্রায় একই সময়ে তিন জায়গায় উৎসব হয়েছে তাই 'বাপুজী' নাটকের একজন সাধারণ অভিনেতা হিসাবে যুক্ত থাকার সুবাদে এই নিবন্ধটি লেখার আগ্রহ বোধ করি।

ত্রিপুরার নাটক সম্পর্কে বলতে হয় তিনটি সংস্থাই তাদের ধারাবাহিক মঞ্চ সফল প্রযোজনায় উৎকর্ষতার প্রমাণ রেখেছে বার বার। তিনটি নাটকের নাট্যকারই পরিচালক এবং তিনজনই যথেষ্ঠ ভাল অভিনেতাও। ইতিপূর্বে উনারা রাজ্য বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবে তার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখেছেন পূর্বোত্তরেতো বটেই। বিভু ভট্টাচার্য্য যথেষ্ঠ বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ, সঞ্জয় কর স্বীকৃত শক্তিশালী অভিনেতা এবং পরিচালক, আর পার্থ প্রতিম আচার্যি বয়সে নবীন হলেও তার কাজের মধ্যে রয়েছে প্রতিভার সাক্ষর । ভাল অভিনেতা যখন নাট্যকার ও পরিচালক হন, তখন নাটক নির্মাণ, সংলাপ যথেষ্ঠ শক্তিশালী হয়, মঞ্চটাকে

তারা সেদিক থেকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিনটি নাটক রচনা ও পরিচালনায় কিছুটা পার্থক্য আছে। 'রাজ অতিথি' ও 'বাপুজী' জীবনী নির্ভর তাই এখানে নিজস্ব কল্পনা বা illusion তৈরী করার সুযোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজির জীবনশৈলি এবং ঘটনাবহুল জীবনের ছবি থেকে সরে আসা যাবে না। মানুষ চরিত্র দুটি সম্পর্কে সচেতন বা ওয়াকিবহাল। কিন্তু 'ওয়াক্সা'র বেলায় তা নয়। কারণ এটি ঐতিহাসিক নয়, লোকগাঁথা বা ফোক টেল। বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে এজাতীয় গল্প বিদ্যমান। জুমচাষ এবং উপজাতিদের সম্পর্কে মানুষের কিছুটা ধারণা আছে। কিন্তু চরিত্র নয়। সেটি নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র, তাই নাটককার যেভাবে সাজাতে চেয়েছেন তা পেরেছেন। অন্য দুটোর ক্ষেত্রে নাটককারের সে স্বাধীনতা ছিল না। নানান আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও কিছুটা সুবিধা ছিল বলা চলে। তিনটি নাটকই বাংলা ভাষায় রচিত। তিনটি নাটকে নবীন প্রবীনের সুসম সমন্বয় আছে, যা দর্শককে মুগ্ধ করেছে। তিনটি নাটকই Proscenium নাটকের রীতি মেনেই হয়েছে। এবার তিনটি নাটকের বক্তব্যটা আলাদা আলাদা করে পাঠকের কাছে তুলে ধরছি।

(১) **'রাজ অতিথি'** - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ সালে প্রথম এবং ১৯২৬ সালে শেষবার ত্রিপুরায় আসেন রাজার আমন্ত্রণে। মোট সাতবার এসেছেন। রাজ পরিবারের চার পুরুষের সঙ্গে কবির হৃদ্যতার ছবি, সম্পর্কের পরতে পরতে কতো কথা, ঘটনা, সাহিত্যের নানান অঙ্গনে বহুল আলোচিত এবং ব্যবহৃত হলেও নাট্য মঞ্চে আগে কেউ এমনভাবে তুলে আনেননি। স্বনামধন্য নাট্যকার-পরিচালক ও অভিনেতা সঞ্জয় কর রাজা - কবিতে এমন মধুর ইতিহাসে বিরল সম্পর্ক নিয়ে দারুণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে নাটক নির্মাণ করেছেন। ইতিহাসের মহাফেজখানা থেকে সমুদ্রে মুক্তো কুড়ানোর মতো বিভিন্ন চিঠি-পত্র তুলে ধরেছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য, রাধাকিশোর মানিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য এবং বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য— চার রাজাকে তুলে এনেছেন, এনেছেন তিন বয়সের রবীন্দ্রনাথকে। রাজ শাসনের টানাপোড়েন, সংশয় আর কবির সাথে সখ্যতা বোঝাতে কুশলী সংলাপ বয়ন করেছেন, একটি গবেষণাধর্মী অভিনন্দনযোগ্য কাজ।নির্দেশনায় অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন প্রাচীন ও আধুনিক কৌশল মিশিয়ে। শিল্পীরা তাদের অভিনয়ে নাটকটির প্রতি সুবিচার করেছেন। আলো, মঞ্চ, রূপসজ্জা ও পোষাক যথাযথ বলা যায়। তবে তিন বয়সের রবীন্দ্রনাথই সময় ও বয়স অনুযায়ী মঞ্চে সাবলীল কিনা তা নিয়ে দ্বি-মত আছে। তবে দর্শক নাটকটি দেখে খুশি হয়েছেন।

(২) **ওয়াক্সা**— গরীব জুমিয়া ঘরের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষের শূকরের (Pig) মতো জীবনযাপন। এটাই তাদের জীবনের অভিশাপ। জুম চাষের ফসল রাজার লোকেরা কেড়ে নিয়ে যায় আর তাদের দুঃখে কষ্টে দিন কাটে। এসব দেখতে দেখতে সে বড় হয় আর ভেতরে ভেতরে রাগ জন্মাতে থাকে। একজন চন্তাই (ভালো মানুষ), সে আগে রাজার লোক ছিল। এই চন্তাই-এর সহযোগিতায় ওয়াক্সা ধীরে ধীরে রাজার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং জয়ী হয়, পাশাপাশি জুম চাষের নতুন পদ্ধতিও আবিস্কার করে ও প্রবর্তন করে রাজা ও জুমিয়াদের সমতা বিধানে সক্ষম

হয়। সে সর্দারও হয়। এক সময় রাজকন্যাকে বিয়ে করে। এই করে করে অভিশপ্ত শূকরের জীবন থেকে মুক্ত হয় and finaly removed his mask of pig.

নাট্যকার-পরিচালক পার্থ প্রতিম আচার্য্য অভিনব কৌশলে আধুনিক মোড়কে নাটকটি নির্মাণ ও নির্দেশনা করে আবারও প্রমাণ করেছেন তাঁর জ্ঞান ও প্রায়োগিক ক্ষমতা। Technical দিকগুলি strong, সঙ্গে অভিনয় যুক্ত হয়ে সফল মঞ্চায়ণ হয়েছে, আর একটি কথা আগরতলা উৎসবে এ নাটকে দর্শকাসন পূর্ণ ছিল এবং দর্শক নাটকটি উপভোগ করেছে।

(৩) এবার আসি ত্রিপুরা থিয়েটার প্রয়োজিত নাটক 'বাপুজী' সম্পর্কে। প্রথমেই বলি আমন্ত্রণ পেয়েহে আমরা যারপরনাই আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম।২০১৪ সালে ত্রিপুরা থিয়েটার পূর্বোত্তর নাট্যোৎসবে ডিব্রুগড়ে প্রথমবার আমন্ত্রিত হয়েছিল। তাই এবার আরো ভালো করার একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। ৪/৩/২০২০ইং আমরা ইটানগরের সিদ্ধার্থ বিহার মঞ্চে 'বাপুজী' নাটক মঞ্চস্থ করি। অতি সাধারণ ছোট মঞ্চ, নাটকের উপযুক্ত লাইট-এর ব্যবস্থা ছিল না। তা করতে হয়েছে। আসলে ওখানে নিয়মিত নাটক হয় না। যাহোক, নাটকের কথায় আসি। ভারতবর্ষের মানুষকে নৈরাশ্য, দাসত্বের গ্লানি ও পরাধীনতা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে মনীষী— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী— তাঁর জন্ম সার্ধ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি 'বাপুজী' নাটক। রাজ্যের নাট্য জগতের বরিষ্ঠ নাট্যকার-পরিচালক ও

দক্ষ অভিনেতা বিভু ভট্টাচার্য্য দারুণ মুন্সিয়ানার সাথে ইতিহাসের বহুধাবিস্তৃত গান্ধীজির বর্ণময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে নাটক নির্মাণ করেছেন। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের যন্ত্রণা, জীবনের অধিকারবোধ, অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন, সংখ্যালঘুদের অধিকার, পঞ্চায়েতীরাজ, বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনের কথা, সত্যরূপী ঈশ্বরে বিশ্বাস ও চরিত্রের দৃঢ়তা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সত্য, সত্যাগ্রহ ও ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতার কথাও গুরুত্বপূর্ণভাবে নাটকে বয়ন করেছেন। আর তার সুযোগ্য নির্দেশনায় মঞ্চে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছু videography এবং সংলাপ উচ্চারণে বুঝিয়েছেন গান্ধীজিই প্রথম ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়েছেন। অভিনেতাদের সাবলীল অভিনয়ে, আলো, মঞ্চ পোষাক ও মঞ্চ সজ্জার অর্থবহ প্রয়োগে নাটকটির সফল মঞ্চায়ণ হয়েছে বলা যায়, অন্তত দর্শক ও NSD থেকে আগত আধিকারিকদের আলাপচারিতায় যেটুকু বুঝেছি।

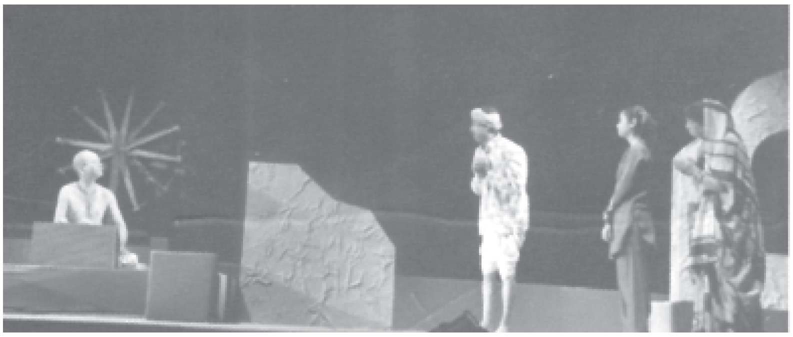

সর্বশেষে বলতেই হয় রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাট্য দলগুলির পরস্পরের মধ্যে নাট্যচিন্তার, বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রায়োগিক কৌশল ও তার আধুনিক রূপ সম্পর্কে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে নাট্যমোদী ও নাট্য স্বজনদের আরো ভাল নাটক দেখার ও আরো আরো দর্শক তৈরি করায় প্রাণিত করছে, উৎসাহিত করছে এ জাতীয় উৎসব আয়োজন করে। তদুপরি প্রতিভার অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণও দিচ্ছে। সর্বোপরি NSD 'পূর্বোত্তর' বা 'প্রাগয্যোতিষ' উৎসব করে এ অঞ্চলের সফল নাটক নির্বাচনই নয় তার থেকে cream of the cream কে জাতীয় নাট্য উৎসবে আমন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক আসরে পরিচিতি দানে প্রয়াস জারী রেখেছে, যাতে করে সুযোগ- প্রাপক দলগুলির নাটককে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করা এবং আধুনিক নাটকের পরিভাষা বুঝতে সাহায্য করছে। NSD নাট্য প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক নাট্যোৎসব আয়োজন করে নাট্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি হয় না। NSD কে ধন্যবাদ।

লেখক : শেখর সি দত্ত, রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, দক্ষ অভিনেতা ও ত্রিপুরা থিয়েটারের নাট্যকর্মী।

Dhrupad is an effective and joyful musical role in Theatre and life.

Dr. Kamla Dhyani

Music has been an integral part of Indian theatre. Music can reveal the inner emotional life of a character, foreshadow a vicious attack or budding love, or comment on the action onstage.

According to the first theatrical scholar, Aristotle, the six elements that make up any drama are: plot, character, thought, diction, music and spectacle. Other traditions of theatre from Asia, Africa, and elsewhere, share in the essential nature of music in theatre. Historically, almost every known form of theatre has included a musical element. The three primary forms of music in the theatre are source music, underscoring, and songs.The Natyashastra is a Sanskrit text on the performing arts. The text is attributed to sage Bharata Muni, and its first complete compilation is in between 200 BCE and 200 CE,

The text consists of 36 chapters with a cumulative total of 6000 poetic verses describing performing arts. The subjects covered by the treatise include dramatic composition, structure of a play and the construction of a stage to host it, genres of acting, body movements, make up and costumes, role and goals of an art director, the musical scales, musical instruments and the integration of music with art performance.

The earliest Indian artistic thought included three arts, syllabic recital *(vadya),* melody *(gaan)* and dance *(nritya)*. The Natyasastra discusses Vedic songs, and also dedicates over 130 verses to non-Vedic songs.Chapter 17 of the text is entirely dedicated to poetry and the structure of a song, which it states is also the template for composing plays. Its chapter 31 asserts that there are seven types of songs, and these are *Mandraka, Aparantaka, Rovindaka, Prakari, Ullopyaka, Ovedaka* and *Uttara.* It also elaborates on 33 melodic alankaras in songs. These are melodic tools of art for any song, and they are essential. Without these melodic intonations, states the text, a song becomes like a night without the moon, a river without water, a creeper with a flower and a woman without an ornament. A song also has four basic architectural varna to empower its meaning, and these tone patterns are

ascending line, steady line, descending line and the unsteady line.

The *Natya Sastra* is notable as an ancient encyclopedic treatise on the arts, one which has influenced dance, music and literary traditions in India. It is also notable for its aesthetic "Rasa" theory, which asserts that entertainment is a desired effect of performance arts but not the primary goal, and that the primary goal is to transport the individual in the audience into another parallel reality, full of wonder, where he experiences the essence of his own consciousness, and reflects on spiritual and moral questions.
Dhrupad is a vaidik and spiritual form of traditional music that is meant to bring the mind to a peaceful, meditative state. It's an ancient science of sound and music that aim to develop human consciousness and the corresponding nervous system. It is the original form of Indian classical music and has been retained in its pure form to date by successions of masters. Hence, it also forms a major part of the Indian cultural heritage. Like other great sciences of old India, as for instance Yog and Ayurved, it is a powerful support for life improvement.

The form and concept of Dhrupad, with its particular way of developing a composition, came about around 1100 - 1200 AD, though its origin can be traced back to the Vedas. Dhrupad is a form of Gandharva Veda, the Vedic science of music, which again is a branch of Saam Ved. Dhrupad claims the distinction of being the oldest form of Indian Classical music heard today, its origin can be traced back to the chanting of vedic hymns and mantras. It is said to be a form of the Gandharva Veda, the Vedic science of music, which is a branch of Sama Veda. The Sama Veda was chanted with the help of melody and rhythm called Samgaan.

It is traditionally also has a string instrument called Veena. For rhythmic accompaniment, it traditionally uses an instrument called Pakhaawaj. Hence, the instrumentalists in the Dhrupad tradition were usually also good singers. As a vocal practice, Dhrupad aims at removing all blockages for the expression of sound and to make the sound vibrate all over the body. This removes tension, opens the subtle channels of energy and creates complete relaxation. The gamak and meed of dhrupad normally **used in theatre** to elaborate the mood of war, love imagine and absurdness.

Another important feature of Dhrupad is the use of sliding, which means moving a note gradually from one to another, and thus to enhance the beauty and the mood of the music.

The real purpose of Dhrupad is not merely to entertain, but to expand human consciousness. Dhrupad is an effective and joyful means for life improvement both for listeners and performers.

The birth of Dhrupad as we know it today coincided with the Bhakti movement and consequently was more devotional in nature. It was rendered in temples facing the Divinity full of devotion and bhaav. Famous proponents of this style- Ashta chhaap.

Famous proponents was - Swami Hari Das and his two historical disciples Miyan Tansen and Baiju Bawra.

Given its roots the original language of the dhrupad music was in Sanskrit but later transitioned to being primarily in Brij Bhasha (a dialect Hindi). The pristine nature of Dhrupad has survived to this day and both majestic forms can be heard just as it was more than 500 years ago, the Haveli form in Temples and the Darbari form can in concerts. There are two main components to a Dhrupad performance; first alaap and then composition.

Alaap

One of Dhrupad's distinct characteristics is its long elaborate alaap which can last up to an hour. It is generally broken up into 3 sections; alap (unmetered), the jor and the jhala. The exclusive use of aakar (producing an "Aa" sound while singing) and sargam (singing notes by their names: Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Nee) is avoided. Aalap calls for a subtle and delicate treatment of notes in the raag, while also allowing them complete freedom of expression. Different shades of the raag manifest in the renditions of the jod and jhala following the aalap.

The alaap is a skilful unfolding of the raga, where the artist slowly reveals its form, carefully rendering each note in a progressive fashion whilst also working in its key phrases. Much emphasis is placed on note purity and clarity in Dhrupad and this takes a lifetime of dedication and practice to develop.

Bandish

The climax of a Dhrupad performance is the composition which traditionally consists of 4 main sections Sthai and Antara.

The *Talas* or cycles of beats commonly used are *Choutala* (12 beats), *Dhamara* (14 beats), *Shaadra* (10beats), *Sultala* (10beats) and *Tivra*

(7 beats).

There is also a more playful form called Dhamaar, as it is set to the 14-beats taal Dhamara. The compositions are associated with the play between Lord Krishna and the Gopi's of Vraj during Holi, the Spring Festival of colours celebrated in India.

DHRUPAD GHARANAS : The Guru- Shishya Parampara. The teaching of Dhrupad is very closely tied to the ancient system of *guru-shishya parampara* (the teacher-disciple tradition). It is an oral tradition that dates back thousands of years, where the students lived in the home of their Guru and devoted themselves to riyaz (practice) of music. The lives of students were focused on learning music and helping with the household chores of their teacher. The teacher could supervise the students all the time and provide guidance. The music was taught orally, with teacher singing a phrase and students repeating it until they perfected it. Thus, the learning of Dhrupad music does not involve transcribing the teaching. The leading Dhrupad Ustads strongly believe, as did their ancestors, that learning of music is not possible through text books. Due to its strict adherence to purity, learning Dhrupad is very difficult. It takes years of rigorous and painstaking practice, involving many hours (8 to 12) of singing everyday,The royal patronage led to the preservation of guru-shishya parampara for centuries.. In effect, the disappearance of the royal system also led to a decline in the support for Dhrupad music. Great artists were suddenly faced with financial hardship and were left with no support. The central and state governments in India are belatedly making limited efforts to revive this tradition. The Dhrupad Kendra in Bhopal, based on this ancient tradition, has produced several outstanding vocalists. As the guru-shisya parampara depends upon oral transmission of information, if there is no one to transfer the information, the musical tradition, that is thousands of years old, might simply disappear.

The Dhrupad Vaani : During the seventh century, five Geeti's (styles of singing) were mentioned by Matang. These Geetis, called Shuddha, Bhinna, Gauri, Vegswara, and Sadharani were supposed to have developed later into the four bani's (or vani) of Dhrupad: Gauri, Khandar, Nauhar, and Dagar-bani. Historians have not bee able to resolve the questions related to the genesis or even the existence of the banis, due to a lack of documentation. The style of singing by Darbhanga and Talwandi Gharanas is said to be derived from Khandar Vani. Asad Ali Khan, the rudra Vina maestro, states

that his family practices Khandar Vani. The family of Indra Kishore Mishra claims to be the practitioner of Nauhar and Khandar Vani. The Dagar family is adherent of Dagarvani.

PROMINENT GHARANAS (TRADITIONS) OF DHRUPAD IN EXISTENCE

The Dagar Family: The Dagar family claims lineage through Swami Haridas (fifteenth century), a renowned singer of that time. Besides Swami Haridas, Behram Khan (1753-1878) was the most renowned Dhrupad artist in the Dagar clan. He was associated with the royal court of Jaipur. Other famous artists were Ustad Zakiruddin Khan (1840-1926) and Allabande Khan (1845-1927), well known for their jugalbandi (duet) performances. The famous Dagar brothers are the grandsons of Allabande Khan, whereas Ustad Zia Fariduddin Dagar and Ustad Zia Mohiuddin Dagar are the grandsons of Zakiruddin Khan. The Dagarbani Dhrupad rendition is characterized by meditative and leisurely development of alap. The purity of a raga is never compromised for the sake of showmanship, often observed in many other Hindustani music concerts of present times. Even during the composition singing, while intricate rhythmic patterns are being sung, the music maintains its spiritual character.The rich heritage of the Dagar tradition lives on in the remaining Dagar brothers and their sons and well-groomed disciples from outside the family. Wasifuddin Dagar, Uday Bhawalkar, Bahauddin Dagar, Gundecha Brothers, Ritwik Sanyal, Pushpraj Koshti and Nancy Lesh.

Darbhanga Gharana : Darbhanga tradition is one of the two main living Dhrupad gharanas, besides Dagar tradition. The Mallik family represents Darbhanga gharana of Dhrupad. Radha Krishna and Karta Ram, the court musicians for the Nawab of Darbhanga, are considered the founders of the tradition. A link to the musical line of Tansen is traced through Bhupat Khan, the teacher of the founders of the family. The performance of the Darbhanga Gharana of Dhrupad singers can be distinguished mainly by the way compositions are sung after the alap.

Talwandi Gharana : The Talwandi tradition is associated with the western parts of India, specifically, Punjab. Presently, the tradition has very few singers, all living in Pakistan. Prominent singers of the tradition include Muhammad Hafiz Khan and Muhammad Afzal Khan. Hafiz Khan claims that Talwandi gharana represents Khandar bani.

Bettiah Gharana : Bettiah Gharana has compositions available from all the Vanis, though more emphasis is placed on Khandar Vani. The ornamentations and rhythmic variations are strictly applied during the rendition of Dhrupad

As with most Indian classical music the artist is accompanied by a tanpura (drone). The tanpura enables the singer's voice to be precisely pitched.

Dhrupad is accepted to be the oldest existing form of North Indian classical music. The Dhrupad tradition is invariably a major heritage of Indian culture. The origin of this music is linked to the recitation of Sama Veda, the sacred sanskriti test. Dhrupad is the oldest vocal style and the form from which the Indian classical music originated. The continuity of Dhrupad, a contemplative and meditative form, has been sustained by traditions of devotional music and worship. Indeed, the leading Dhrupad maestros remark that rather than to entertain the audience, Dhrupad's purpose is Aradhana (worship). The nature of Dhrupad music is spiritual, not to entertain only.

The writer : Kamla Dhyani, PHD in Vocal Music, Delhi University.

Rich Art and Culture of Historical Mithila

Dr. Trilok Nath Jha

Mithila in the historical context:

We shall delineate the history of Mithila art, from the earliest times when it was done on walls and floors to its commoditized form. The objective will be to provide a background of the region- how structures and relations of society, economy, politics and culture have worked together to construct this region, which provides a context in which the theatre tradition emerged.

Political History of Mithila - Though Mithila shares some features with the Hindi belt, owing to being part of the state of Bihar which comprises the other two regions of Bhojpur and Magadh on the one hand, and those of "eastern India", owing to the similarities with Bengal on the other, it developed its own unique features over time, leading to the development of a distinct social formation and cultural identity.

In the context of Mithila, the conflation of myth and history has happened primarily because of the lack of scientific sources. According to the most important historian of Mithila, the chief sources for writing the history of this region are the Atharvaveda, Brahmanas, particularly the Satpatha Brahmana, the Upanishads, Buddhist (Jatakas) and Jain texts, the Puranas (Mahabharata and Ramayana), accounts of a few foreign travellers, medieval Sanskrit literature, the Panjis or genealogical records of the people of Mithila, very few archaeological evidences such as artefacts, inscriptions and coins. However, it is claimed that many of these sources, particularly the Puranas, are not scientific in nature, leading to the conflation of myth and history, as discussed earlier.

Mithila is one of the regions of the Indian sub-continent which has been considered to be an ancient civilization. Most of the historians of the region regard it as a reservoir of the most glorious elements of the history of the Indian sub-continent. This claim is made on the basis of the fact that it was in Mithila that the great and unparalleled philosophical discussions that were ever attempted in the history of human thought and culture were held. It is significant to note that the history of this region is not the history of battles and wars but of courts and kings, who were mostly devoted to pursuits of learning entity. It is evident from the geographical location of Mithila that it is a tract of land locked by the topographical barriers of mountains and rivers, because of which it has developed as an independent

Mithila has been home to four out of the six systems of Indian orthodox philosophical traditions- Navya Nyaya, Vaisesika, Mimamsa and Samkhya.

It has been labelled as the land of the most orthodox Brahminical tradition. But this is also the same place, where 47 non-Aryan philosophies like Buddhism and Jainism flourished. Both Mahavir and Buddha have lived and discoursed in Mithila. But the non-Aryan/ non-Brahmin streams always had strained relationship with the Brahminical religion.

The acclaimed poet Vidyapati was the court poet of this dynasty. His patron was King Sivasimha, under whose behest Vidyapati wrote the prose "Purusa-Pariksha?, which was perhaps the first text in the Indian sub-continent to talk about notions of masculinity. The text constructed the Muslim rulers as hyper-masculine and exhorted indigenous men to rise up to the occasion and confront the former by becoming more masculine.

Art and culture

Naatak - The major source of evidence for Sanskrit theatre is Naatyashastra, a compendium whose date of composition is uncertain and whose authorship is attributed to Bharata Muni. The Treatise is the most complete work of dramaturgy in the ancient world. It addresses acting, dance, music, dramatic construction.

Bharata's Natyashastra was the earliest and most elaborate treatise on dramaturgy written anywhere in the world. India has a longest and richest tradition in theatre going back to at least 5000 years. The origin of Indian theatre is closely related to ancient rituals and seasonal festivities of the country. Hindu theorists from the earliest days conceived of plays in terms of two types of production:

- ***Lokadharmi (realistic),*** which involved the reproduction of human behaviour on the stage and the natural presentation of objects
- ***Natyadharmi(conventional),*** which is the presentation of a play through the use of stylized gestures and symbolism and was considered more artistic than realistic

Theatre in India has encompassed all the other forms of literature and fine arts into its physical presentation: literature, mime, music, dance, movement, painting, sculpture and architecture - all mixed into one and being called 'Natya' or Theatre in English.

Maithili theatre is one of the most ancient forms of theatre and it features detailed textual, sculptural, and dramatic effects which emerged in mid first millennium. Like in the areas of music and dance, the maithili theatre is also defined by the dramatic performance defined by the concept

of Natya, which is a Sanskrit word for drama but encompasses dramatic narrative, virtuostic dance, and music.

With the Islamic conquests that began in the 10th and 11th centuries, theatre was discouraged or forbidden entirely. Later, in an attempt to re-assert indigenous values and ideas, village theatre was encouraged across the subcontinent, developing in a large number of regional languages from the 15th to the 19th centuries.

According to many scholars, Indian theatre emerged in 15th century. Vedic text such as Rigveda provides evidences of drama plays being enacted during Yajna (Yagya) ceremonies. The dialogues mentioned in the texts range from one person monologue to three person dialogue for instance the dialogue between Indra, Indrani and Vrishakapi. The dialogues are not only religious in their context but also secular for instance one rigvedic monologue is about a gambler who's life is ruined because of it and has estranged his wife and his parents also hate him.

Panini in 5th century mentions a dramatic text Natasutra written by two Indian dramatists Shilalin and Krishashva.. Patanjali also mentions the name of plays which have been lost such as kemsavadha and Balibandha. Sitabenga caves dating back to 3rd century and Khandagiri caves from 2nd century are the earliest examples of theatre architecture in India.

The earliest-surviving fragments of Sanskrit drama date from the 1st century. The wealth of archaeological evidence from earlier periods offers no indication of the existence of a tradition of theatre. The Vedas (the earliest Indian literature) contain no hint of it; although a small number of hymns are composed in a form of dialogue. The rituals of the Vedic period do not appear to have developed into theatre. The *Mahabhashya* by Paatanjali contains the earliest reference to what may have been the seeds of Sanskrit drama. This treatise on grammar provides a feasible date for the beginnings of theatre in India.

However, although there are no surviving fragments of any drama prior to this date in Mithila, it is possible that early Religious Ceremonies Besides major festivals like Durgapuja, Kali Puja, Ramnavmi, Holi, Shivratri, Iid, Bakrid, Moharram etc., the localized popular festivals, mostly performed by Hindus' women folk, are Nag Panchmi, Godhan Puja, Jitiya, Jur-sital, Bharatridwitiya, Kojagara etc. Some of these festivals are caste specific as well, for example Kojagara is performed by Maithil Brahmins only.

Mithila Painting - Religion and religious belief finds symbolic and creative expression in the styles of painting. The subject matter, quite often, deals

with the cultural canvass of the people. Since it is inseparable from the Maithili cultural life, painting serve as an essential symbol of Maithili regional identity. Maithila, or Madhubani paintings is unique in the sense that it is quite natural and original in its styles, drawings, colours' use and selection of themes. Mithila has made two special contributions in the fields of paintings. The first is Aripan or floor painting and second is the Kohabra or wall painting. Aripan represents the traditional folk art of Mithila. On any auspicious occasions, Maithili women sketch drawings in the courtyard, door front and other places of the house. It is mostly associated with the tantric designs and Sakti cult of Mithila. On the other hand, Kohabar or 'wall painting' is drawn on the walls of a house where newly married couples enter after marriage for their first meeting. Themes are drawn from folklore and mythology, representing love, erotic etc.

Significantly wall painting is also environmentally conscious. It generates a positive outlook towards the different creatures of nature. It is also worth mentioning that herbs, plants, animals are symbolically attached and integrated with popular belief and culture of Mithila. Therefore, the bamboo tree and the ring of lotuses represent the diagrams of the sexual organs, parrots symbolise the love bird, turtles diagrammatise the lovers' union and fishes the emblem of fertility and sun and the moon symbolise the life-giving qualities. The supernatural colour and splendour in a figure, which is hardly seen in ordinary life, is partly dictated by religious canons. Besides, the above two important forms of arts, Maithili home art broadly are divided into four classes: (i) Aripan or line drawing on the ground; (ii) Kohabar or wall painting; (iii) Terracotta figurines and dolls of other materials; (iv) Utility articles in colourful ' forms. While the upper caste women, especially Brahmin and Kayastha, specialize in the first three categories, the last one is being specialized by lower castes, especially Kumaharas.

Like religion, Maithili painting is also gender and caste specific. On gender basis, it is only the women who specialize in different styles of painting. The reason is partly sociological and partly religious. The joint family norms, headed by a male member, relegated women ln the household activities only. In the higher caste, women fulfil their traditional role not by contributing to the family income but by displaying keen adherence to ritual in prayers, ritualistic cooking, child care and demonstrative care of the sick and elderly.

A fusion of music, dance, drama, and stylized speech, and spectacle, folk theatre is a composite art form with deep roots in local identity and native culture. An important indigenous tool of interpersonal communication,

this form of theatre reflects the social-political realities of its time.

Mithila has a long, rich and illustrious history of folk theatre. In ancient times, Sanskrit dramas were staged at seasonal festivals or to celebrate special events. Between the 15th and the 19th centuries, actors and dancers were given special places of distinction in the courts of several Indian kings.
For instance, the tamasha folk theatre was patronized by the powerful Peshwas of the Mithila kingdom. The Maharajas of Travancore and Mysore also competed with each other to establish the superior talent of their drama troupes. The maharaja of Banaras was the producer and patron of grand ramlila, a 31-day play based on Ramayan with spectators numbering in thousands.

Music and dance in Maithila is intimately connected with the religious beliefs and practices of the people. In form, they are devotional and depictive of the religious and other mythological figures. Even in this field of art, there are two distinguished patterns of 'great tradition' and 'little tradition'. For great tradition, Vedas, Puranas and scriptures serve as the basic sources, other religious but in the 'little tradition', it is popular belief and popular stories of mystique figures from which theme is usually deduced. This is particularly evident in the field of dance and drama and the Maithili songs. However, once again it may be pointed out that like painting, both these traditions, are regionally exclusive, distinct and special to and 'of' Mithila, and together they constitute Maithili identity. Distinct exposition of Maithili music finds place in Vidyapati's Gorakasavijya, Jyotirisvara's Varnaratnakar and Umapati's Parijataharan, and most exquisitely in Lochana' s Ragatarangini and Nanyadeva' s commentary on Bharata 's Natyasastra. In these works references are made of different ragas as prevalent in their respective ages and periods. They are Nataraja, Malva-raga, Vasantraga, Baradiraga, Lalitraga etc. In Mithila, each raga comprises the distinctive notes associated with a particular mode and emotion elicited universally in the cyclical recurrence of seasons and hours in human heart. Each raga comprises of five or six raginis. The distinguishing characteristics of Maithili lyrics are- (i) extraordinarily musical, (ii) directness and spontaneity, (iii) length is invariably suited to the expression of one powerful mood or emotion; (iv) range is wide and unlimited, (v) chief sources of inspiration are the events and experiences of everyday life, (vi) Sanskrit stories and legends, and (vii) Sanskrit poetics and erotic conventions provide eternal background to its colour and imagery.

Folk dances and dramas are performed on some special occasions. Each actor or actress, and symbol used in dance and drama, represents certain

social tradition and popular belief of Mithila. They are sometimes of the ritualistic significance as well. Some of the important dances and dramas are Baskatti (related with marriage ceremony and limited to some of the upper castes of Mithila only) Kirtaniya, Shama-Chakeva, Nayana-Jogin, Salehesa Puja (most popular among backward castes especially Dusaadh/ Paaswaan) , Kamla Puja (a river symbolizing water Goddess and is usually worshipped by the Mallahas), Kosi Puja and above all Ramalila and Krishnalila are other favourite dances and dramas of Mithila.

Cultural identity is a construct of religious practices, customs, traditions, food habits and dresses. They together provide a region specific identity. But in the case of Mithila, culture is internally diversified and diffused even though they can be said, in any sense of the term, as the 'native culture' of Mithila. There exist two parallel cultural identities - elite cultural identity of 'great tradition' and folk cultural identity of 'little tradition'. While through the practice of Kulinism, 'great tradition' lays emphasis on caste, cultural and racial purity, the culture of 'little tradition' is highly flexible, simple and accommodative laying much of the emphasis on community building. Both these 'traditions' are in conflict and harmony simultaneously, subject to the exigencies of overall political process and the socioeconomic factors.

Maithili identity is not uniform and homogeneous. It is a composite regional identity. Therefore, it is not difficult to decide what is Maithili, instead of who are maithils ? Mithila has a composite and distinguished 'native cultural' identity which is different from other regional identity. Another feature of Maithili cultural identity is that it has never been conflicting to the broader composite identity of India. Linguistic Identity of Mithila. The earliest name by which its language of Mithila was known seems to be 'Avahattha', a derivative from apabhransa, a synonym of Apabhransa. It is believed that Apasbhransa (word) signified in Mithila the Desa-Bhasa as distinguished from classical Sanskrit and Praakrts. Maithili has also been referred as Tirahutiya in Alphabetum Brammhanicum (1771). The Chhika-Chhiki bali, which is most popular in the Bhagalpur division of Bihar, ·is also referred as Angika language. This nomenclature is based on the historical and scriptural references such as Mahabharata where this region has been described as the Anga Pradesh with capital at the present day Bhagalpur. Though culturally people of the Bhagalpur and Darbhanga divisions are not different, the linguistic differentiation, based on the historical entity of the region, may lead to the demand for the recognition of separate Angika language and Angika Pradesh. Western Maithili:-The Maithili spoken in the Muzaffarpur district and in eastern side of Darbhanga

the strip of is strongly country infected on by the neighbouring Bhojpuri, spoken in various forms in the aadaa district of Saran (now Chapra, Siwan and Gopalganj) and in the greater part of Champaran.

The language is named after the Vajjian as Vajjika Bhasa. Its independent existence is now being asserted at the cultural, social and political levels of the peoples' existence. Culturally, western Maithili is evidently associated with the Bhojpuria culture of Bihar than the Brahminical culture of Mithila. But in terms of linguistic tradition and preferences, even now Vajjika is clubbed with Maithili and may be called a sub-dialect of Maithili.

Jolaha Boli though the upper class Muslims, such as Sheikh speaks Hindustani language and are more closely associated with the culture and traditions of Awadha, the lower class, such as Kunjra (vegetable sellers), Dhunias (weavers) and others speak Jolaha Boli. It is a dialect of Maithili which includes many Persian and Arabic words in its vocabulary. On the other hand, Pandit Shree Gobindanath Jha regionally classifies Maithili in five sub-dialect zones (a) Eastern Maithili is prevalent in the districts of Purniya, Bhagalpur and eastern parts of the Santhal Pargana. This language is influenced heavily by the Bengali speech; (b) Southern Maithili is prevalent in Maggahand is influenced by the Magahi speech; (c) Western Maithili is spoken in the districts of Muzaffarpur and Champaran, having partial affinity with the Bhojpuri language; (d) Northern Maithili is spoken in the eastern regions of Nepal and Sitamarhi district of north Bihar, and (e) Central Maithili, the purest Maithili, spoken in the nucleus regions (such as Madhubani, Darbhanga, Saharsa and some parts of Samastipur district) of Maithili language and culture.

Writer : Dr. Trilok Nath Jha, Asstt. Prof. (History), AMM College, Behara, Benipur, Darbhanga, Bihar.

Theatre of the Pandemic

Biprajit Bhattacharjee

2020 has been quite a year for everyone. The last three to four months have been downright strange, surreal and unsettling, unlike anything we have experienced before.In a dramatic turn of events the pandemic has set the world in quandary - sweeping lives across the globe, decimating health care and economic systems, thus exposing the festering social problems and the utter inanity of human values. It's like holding a mirror, where we can see ourselves bruised, battered yet passionately undeterred in flaunting a rather vainglorious boast of personal infallibility.The rise of Covid-19 has brought us back to the drawing boards - to recognize the truth that tells us something about ourselves that we had not always been saying or realizing, something that puts a new knowledge of ourselves within our grasp.

Even though humans have started the uphill task of understanding the reason behind the gargantuan appetite of this disease, one cannot help but notice that there is something eerily theatrical, something strikingly'dramatic' about the pandemics.They exhibit a typical pattern of social gestures recognizable across vast stretches of time and space. The sixth century Plague of the Justinian, the 14th century Black-death and the early 20th century Manchurian plague or the Spanish flue might be dissimilar in their biological constitutions yet they are indistinguishable in their approach towards changing the dynamic of social conditions and relations. Noted historian Charles Rosenberg,forming an impression upon reading Albert Camus' *La Peste (The Plague)*, hailed epidemics/pandemics as a 'social phenomenon' that has a dramaturgic form- which "start at a moment in time, proceed on a stage limited in space and duration, following a plot line of increasing and revelatory tension, move to a crisis of individual and collective character, then drift towards closure."[1] Needless to say the gradual unfolding of this pandemic like a three act social drama is intriguing enough to investigate its pattern and also speculate how it might affect the future of theatre.

Something is rotten in the state of Denmark.

Theatre always had a troubled relationship with pandemics/epidemics or illnesses in general, from the ancient plays of Sophocles, like in Oedipus Rex where the citizens of Thebes beg their king, Oedipus, to lift the 'plague' that threatens to destroy the city; to the age of Renaissance in England where

Shakespeare, in a steady, low-level undertone, puts plague in a sort of everyday exclamation: "a plague upon it when thieves cannot be true to one another","a plague upon this howling" or even when Olivia in *Twelfth Night* emphatically says, "How now?Even so quickly may one catch the plague?" to explain the quickness with which she fell in love. Flash forward to Ibsen's portrayal of Syphilis in his plays in the late 19th century, as "this poorly understood but rapidly spreading bacterium provoked the fear, hypocrisy and shame of those diagnosed with the disease and triggered the revulsion and condemnation of everyone else" [2]; and then right on to 20th century plays like Brecht's *Life of Galileo* where the idea of epidemic looms large and the final fallout being the pestilence stricken multitudes of the plays of Beckett where death, paranoia and sense of unending suffering has forestalled the concept of time.

Exploring this relationship between a pandemic, a symbol of destruction and theatre, a symbol of creative spirit and unity might not be a cheerful prospect, nevertheless, it's necessary.Because now, more than ever, it is imperative to assess the position of theatre as an art form which has been somewhat crippled due to the imposition of long-lasting lockdowns and total shutdowns. But also, there is this fear that this sudden lemming-rush towards using of digital platform as the only means for promulgating and disseminating theatrical performances/productions can very well become, after a point of time, counterproductive.

History is a vast early warning system.

Theatre is something that excels on being open, exposed like a nerve, revels when it is being witnessed actively and immediately in the presence of an audience and thrives on the same audience's investment of every ounce of his/her emotions.Not to be condescending but for a staunch believer in the live aspect of a performance it is acutely distressing for me to come to terms with the reality. But in times like these, in a kind of direct response to the crisis, we must consult history, littered with unforeseen closures, crises and interruptions, to educate ourselves about the same and move forward with conviction. Because history has this innate quality of having the answers to the questions it poses.

In London during outbreaks of the bubonic plague,which claimed nearly a third of the city's population, the Elizabethan theatres were closed frequently. As a child, Shakespeare himself barely survived an outbreak

that killed his older siblings. In the 16th century the London administration was very much anxious because the commoners would flock to the city to "see certayne stage plays"and would be "close pestered together in small romes," creating the means "whereby great infeccion with the plague, or some other infeccious diseases, may rise and growe, to the great hynderaunce of the common wealth of this citty."[3]

"Such outbreaks did not rage on forever. With the help of strict quarantines and a change in the weather, the epidemic would slowly wane, as it did in Stratford, and life would resume its normal course. But, after an interval of a few years, in cities and towns throughout the realm, the plague would return. It generally appeared on the scene with little or no warning, and it was terrifyingly contagious. Victims would awaken with fever and chills. A feeling of extreme weakness or exhaustion would give way to diarrhea, vomiting, bleeding from the mouth, nose, or rectum, and telltale buboes, or swollen lymph nodes, in the groin or armpit. Death, often in great agony, would almost inevitably follow." [4]

Similarly, during the 1918-19 Spanish flu in America, journalist and novelist Katherine Anne Porter memorialized her experience in her 1939 novel *Pale, Horse, Pale Rider,* where one character asks her lover about the situation outside, he responds, "It's as bad as anything can be…all the theatres and nearly all the shops and restaurants are closed, and the streets have been full of funerals all day and ambulances all night." [5]

We can discuss hundreds of other incidents to shed more light on the history of pandemics and their invariable effect on theatre, but that's not the point. The point is, from the abovementioned incidents what we get is a pattern. Today there is a resurgence of the same pattern where our patience is being tested on a day-to-day basis. And it would be very remiss of me not to reflect on the extremely volatile nature of the crisis. Because underneath this COVID outbreak a deadly political turmoil is brewing between countries, religions, sects and people due to which hate, bigotry and apathy are on the rise. And this can only lead to chaos of extreme proportions. Karl Marx in his essay, *The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon,* wrote 'History repeats itself, first as tragedy, second as farce'. We're all probably familiar with the first part, but for me the second part is vital. What we are witnessing today is history tragically repeating itself,but what I fear is that this gradual turning of everything into a farce can be extremely fatal and catastrophic for us. The least we can do, for our own sanity, is take care of our mental health,

because this precariousness, this extreme sensation of inaction and hopelessness can suck us right into a deep, unforgivable chasm where there is only endless suffering.

The way forward…

As we all know the origin of theatre dates back to the rituals, the myths, with the essential ingredients being 'the heightened intensity of incident and emotion' [6]. As impactful and empowering drama is because on one hand, it carries traces of every observable human activity; it also expresses basic human impulses in the most fascinating way imaginable. Throughout ages these impulses have been assimilated as historical evidences as theatre has evolved and succeeded in timelessly transcending its historical conditions.[7] It continuously, unapologetically aims at restructuring the values and ethics of the society while connecting with something that is fundamental in human behaviour, the incessant desire to survive. For those who are disillusioned, you must know that theatre will survive, but the challenge lies ahead.The challenge is whether trust can be gained again, the same trust that has epitomized theatre as the most living and communicable form of art available; the challenge lies whether it will once more provide a platform to think through the terrors and the anxieties of life; and most importantly the challenge is whether it can convince us all over again to think and feel beyond the constraints of life and find companionship, goodness in others, immediately, effectively and intimately.

And lastly, with theatrical productions ceased globally various artists have turned to this very alluring virtual medium to share their work and engage with the audience. On the surface it is undoubtedly a very lucrative scenario, but we shouldn't forget that the essence of theatre lies in experiencing it live. Whatever is happening is theatre-like but not really theatre. Getting habituated with it or depending solely on it can only limit the overarching purpose of theatre. Yes, I can't deny the fact that with all the social distancing, lockdowns in place, theatre enthusiasts only get to talk on certain online platforms, and evidently it has helped a certain section but while doing so haven't we marginalized a fraction of the society in the name of those who don't have any access to internet? This is a burning question right now. Because while we sit in our homes with some sort of a psychological comfort, sipping coffee, thinking about which play to watch on YouTube, there is a theatre lover, in some corner of the earth, deprived of food, shelter, job and all the basic necessities required to survive. They have to deal with triple jeopardy now: first, the grave threat of the coronavirus

pandemic, second, the heartless neglect of civil society, and finally the hard and disciplinary measures of the state that have rendered them unemployed, hungry and homeless.I know these are the worst of times, but one of the basic tenets of theatre is its focus on the community. And community survives, prospers through sharing, empathizing and showing a little bit of love and care to our fellow peers.

In the end of the drama *Endgame*, by Beckett, where we find the characters trapped in the eternal ebb and flow of time, in between dying and not dying, we're reminded of our mutual obligation. "It's we are obliged to each other." Let us remember this, adapt and start over, as we stay quarantined at our homes for the foreseeable future, waiting for the post-pandemic era of theatre, apart.

America, during Spanish flu 1918-19.

[1] Rosenberg CE.What is an epidemic?AIDS in historical perspective.Daedalus1989;188:1-17.
[2] Kelly, Katherine E. "Pandemic and Performance: Ibsen and the Outbreak of Modernism." South Central Review 25, no. 1 (2008): 12-35. Accessed July 15, 2020. www.jstor.org/stable/40040017.
[3] There was no official dictionary during Shakespeare's time so words were often spelled in different ways.
[4] Stephen Greenblatt talks about this in detail in his essay, "What Shakespeare Actually Wrote About the Plague", published in The New Yorker.
[5] Pale Horse, Pale Rider is a collection of three short novels by American author Katherine Anne Porter published in 1939.
[6] Esslin, Martin. An anatomy of drama. T. Smith, 1976, London.
[7] See Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism, for a compendium of these comments.

The writer : Biprajit Bhattacharjee, M.Phil Scholar in English, Visva Bharati University.

NATIONAL SCHOOL OF DRAMA

(THEATRE-IN-EDUCATION WING) TRIPURA

DETAILS & ACTIVITIES CONDUCTED DURING THE ACADEMIC YEAR 2019-20.

SELECTION OF NEW CANDIDATES FOR THE YEAR 2019-20

NSD, Tripura Centre received 138 application forms from all over India for admission in One Year TIE Course during the academic session 2019-20, where 127 candidates shortlisted for the final workshop / interview. The workshop / interview were conducted by the selection committee members on 08th July, 2019 at NSD, Tripura Centre, on 17th July, 2019 at Banikanta Auditorium Guwahati & on 18th to 19th July, 2019 at Madhabdeva Auditorium Guwahati. The name of the selection committee members are as follows:-

Sl. No.	**Selection committee for Workshop/Interview on 17th July, 2018 at Banikanta Auditorium, Srimanta Sankaradeva Kalakshetra, Panjabari, Guwahati & on 18th & 19th July, 2019 at Sri Sri Madhavadeva International Auditorium, Srimanta Sankaradeva Kalakshetra, Panjabari, Guwahati**
01.	Dr Abhilash Pillai (Centre In-charge, NSD, New Delhi)
02.	Shri Vijai Kumar Singh, Centre Director, NSD (TIE Wing), Tripura Centre
03.	Mr. Bipin Kumar, Centre Director, NSD, Sikkim Centre
04.	Shri Narendra Debbarma, Playwright & Theatre Personality of Tripura
05.	Ms. Pakija Begum (Children Theatre, Assam)
06.	Dr Asha Singh (Child Development Expert, New Delhi)
07.	Mr Rajneesh Bisht (TIE Experts, New Delhi)

After conducting the workshop/interview, the following candidates have been provisionally selected for admission in one year TIE course during the session 2019-20.

Sl. No.	Fr. No.	Name of the Candidate	Gender	State
01	21	PRAJJWAL CHAKRABORTY	MALE	TRIPURA
02	22	DIPAYAN GOSWAMI	MALE	TRIPURA
03	62	SUSHOBHITA KAR	FEMALE	TRIPURA
04	70	RAJIB CHATTERJEE	MALE	TRIPURA
05	15	SOUMAR JYOTI BORAH	MALE	ASSAM
06	23	TRIPTI BORAH	FEMALE	ASSAM
07	35	SUNAM DEVI	FEMALE	ASSAM
08	37	SUMPEE BORAH	FEMALE	ASSAM
09	74	SOURAV JYOTI PHUKAN	MALE	ASSAM
10	103	MOUCHUMI BORPATRA GOHAINFE	MALE	ASSAM
11	123	TIRTHA KHAKHLARY	MALE	ASSAM
12	57	RAHUL KUMAR	MALE	MANIPUR
13	90	AARUSHI SHARMA	FEMALE	DELHI
14	95	SHWETA SINGH	FEMALE	DELHI
15	136	SAKSHI THAPLIYAL	FEMALE	DELHI
16	108	PITAMBAR BEHERA	MALE	ODISHA
17	127	VANDANA DAVI	FEMALE	PUNJAB
18	66	KUNAL SARKAR	MALE	WEST BENGAL
19	67	YOGESH BALASAHEB PATIL	MALE	MAHARASHTRA
20	14	UMANG KHUGSHAL	MALE	UTTRAKHAND

DIKSHARAMBHA PROGRAMME:-

NSD, Tripura Centre organized "Diksharambha Programme" for the session 2019-20 at Ananda Auditorium Nazrul Kalakshetra Agartala on 09th to 10th August, 2019. On this occasion Mr. Jishnu Debbarma (Deputy Chief Minister, Govt. of Tripura) attended the programme as a Chief Guest & delivered a valuable speech on the role of theatre in modern education system and blessed the new students. Mr. Krishnadhan Das (MLA Bamutia), Mr. Harinath Jha (SNA Programme Director), Dr. Dilip Tripathi (In-charge Lalit Kala Academy) & Mr. Suman Majundar (Artist) also attended the programme as Guest.

CLASSES HELD FROM AUGUST 2019 on the following subjects :-

Script Reading conducted by Ms. Babita Pandey from Agartala .
Theatre Games conducted by Mr. Piklu Ghosh from Tripura
Craft Making conducted by Mr. N. Jadumani Singh from Imphal & Mr. Kaushik Paul from Agartala
Painting conducted by Mr. Amit Modak from Agartala .
Applied Theatre conducted by Mr. Kaustubh Bankapure from Pune & Mr. Piklu Ghosh,Tripura.
Yoga conducted by Mr. Vikram Singh Rathore from Jodhpur .
LIE/DIE conducted by Mr. Daniel A. Kelin from USA & Mr. Dipankar Chouhan (Assistant).
Lecture on Natya Shashtra conducted by Prof. Vijaykumar L. Dharurkar (VC, Tripura University)
Introduction about Jatra conducted by Ms. Bijali Chakraborty (Jatra Expert) from Agartala
Movement conducted by Mr. Suresh Shetty from Delhi,
Acting & Scene Work conducted by Mr. Milind Inamdar from Mumbai,
Indian & World Theatre History conducted by Dr. Devendra Raj Ankur from Delhi
Bal Folk Dance conducted by Mr. Surajit Debbarma from Agartala .
Acrobatics conducted by Mr. Alay Debbbarma from Agartala,
Costume Design conducted by Ms. Babita Pandey from Agartala,
Child Development conducted by Ms. Dimple Rangila from New Delhi.
Maths conducted by Dr. K.B.Subramaniam from Bhopal.
Voice & Speech conducted by Mr. Vijay Kumar from Mumbai.
TIE/DIE conducted by Mr. Daniel Allen Kelin II from USA, Ms. Malvika Bhaskar (Assistant) & Ms. Dolly Konwar (Assistant).
Yoga conducted by Dr. Manuhar Priya from New Delhi.
Indian Aesthetics conducted by Mr. Shailesh Srivastrava.
Make-up conducted by Mr. Sanjoy Samanta from Kolkata.
TIE/DIE conducted by Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director, NSD, Tripura Centre).
Basic Knowledge of Computer conducted by Mr. Avijit Baishya.from Agartala.
Puppet Making conducted by Mr. Prabhitangshu Das from Agartala.
Scenic Design conducted by Mr. Randhir Kumar from Patna.
Light Design conducted by Mr. Randhir Kumar from Patna.

Movement conducted by Ms. Dolly Konwar (TIE Passout) from Assam.
Child Development conducted by Ms. Nikita Agarwal.
alongwith rehearsal on Ganit Manthan conducted by Mr. Vijay Kumar Singh (Centre Director)
Magic conducted by Mr. Bijoy Acharjee..
Indian Music conducted by Mr. Harinath Jha.
Process Drama conducted by Ms. Malvika Bhaskar.
Performance with children conducted by Mr. Daniel A. Kelin.
Introduction conducted by Mr. Suresh Sharma.
Contemporary India & Childhood conducted by Dr. Asha Singh.
Theatre Music conducted by Mr.Sanjay Upadhyay.
Contemporary India & Childhood conducted by Ms. Tultul Biswas
Contemporary India & Childhood conducted by Ms. Nidhi Gulati
Object Theatre conducted by Ms. Choiti Ghosh.
Story Telling conducted by Ms. Gita Ramanujam & Ms. Kavita Venkat & Mr. Jim Paul Tharakan
Bhutoh Dance conducted by Mr. Tatsumi Fujieda .
Labon Dance conducted by Ms. Faezeh Jalali & Asst. Ms. Dolly Konwar..
Oppressed Theatre conducted by Mr. Sanjoy Ganguly & Ms. Sima Ganguly.
Body Movement conducted by Mr. Kishor Sharma.
Grips Play Making conducted by Ms. Shirrang Godbole & Ms. Vibhawari Deshpande .

DEMONSTRATIONS / EXAM / ASSESSMENT HELD FROM AUGUST 2019:-

Demo on "Applied Theatre" under the guidance of Mr. Kaustubh Bankapure.
Demo on "Classroom lesson" conducted by Mr. Daniel A. Kelin (from USA).
Demo on "Yoga" conducted by Mr. Vikram Singh Rathore (from Jodhpur)
Demo on "Mask Making" conducted by Mr. N. Jadumani Singh (from Manipur).
Demo on "Movement" conducted by Mr. Suresh Shetty (from Delhi) .
Demo on "Tribal Folk Dance" conducted by Mr. Surajit Debbarma (from Agartala)
Demo on Theatre History on 02nd Oct, 2019 under the guidance of Dr. Devendra Raj Ankur and in the presence of Mr. Daniel A. Kelin II, Ms. Babita Pandey, Mr. Milind Inamdar & Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director).

Theatre History. Dr. Devendra Raj Ankur, Mr. Milind Inamdar & Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director) were conducted the viva as experts.
Exam on Child Development was conducted by Ms. Dimple Rangila.
Make-up on 30th Oct, 2019 under the guidance of Mr. Sanjoy Samanta.

Indian Aesthetics & Drama under the guidance of Mr. Shailesh Srivastava.
Voice & Speech under the guidance of Mr. Vijay Kumar.
Demo on **Scenic Design** under the guidance of Mr. Randhir Kumar.
Light Design conducted by Mr. Randhir Kumar.
Child Development conducted by Ms. Nikita Agarwal.
Magic conducted by Mr. Bijoy Krishna Acharjee.
On **Contemporary India & Childhood** conducted by Dr. Asha Singh.
On **Music** conducted by ***Mr. Sanjay Upadhyay*** .
On **Contemporary India & Chilhood** conducted by ***Ms. Nidhi Gulati.***
Performance on Story Telling conducted by Ms. Geeta Ramanujam at KV Salbagan, Agartala
Assessment on **Story Telling** conducted by ***Ms. Geeta Ramanujam.***
Assessment on **Object Theatre** conducted by ***Ms. Choiti Ghosh.***
Assessment on **Grips Play Making** conducted by ***Mr. Vibhawari Deshpande & Ms. Shirrang Godbole.***
Assessment on **Oppressed Theatre** conducted by ***Mr. Sanjoy Ganguly & Ms. Sima Ganguly.***

CHILDREN DRAWING COMPETITION:-

NSD, Tripura Centre organized a Drawing competition on 08/08/2019 at the campus, where children approx 400 were participated. The drawings were judged by local experts.

EDUCATIONAL TOUR :-

NSD Tripura Centre organized an educational tour for new TIE Students (2019-20) to "Matabari" & "Nirmahal" on 15th August, 2018.

PRACTICE TEACHING :-

Teaching on classroom lesson conducted by TIE 8th Batch Students on 21/09/2019 at Kendriya Vidyalaya ONGC & Kendriya Vidyalaya GC CRPF Agartala.

STUDENTS PRODUCTION :-

Students of NSD (TIE Wing), Tripura Centre produced a new devised play namely "**IN YOUR HANDS**" and performed it at Ananda Auditorium, Nazrul Kalakshetra, Agartala from 02nd to 06th December 2019 and KV

Salbagan, Agartala on 07th December 2019 directed by Mr. Daniel Allen Kelin II from USA. The main theme of the play is on climate change and its effects on planet earth. Our aim is also to motivate the children to implement the habit which helps them to fight against climate change. The production is conducted as per syllabus & curriculum of one year certificate course in Theatre-In-Education. The performances of the play were also live streaming on YouTube channel "National School of Drama Tripura Centre" on 03rd & 04th December 2019.

TIE PARTICIPATORY PROGRAMME FOR CHILDREN :-

Students of NSD (TIE Wing), Tripura Centre performed TIE Participatory Play "Ganit Manthan" directed & designed by Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director) at Ananda Auditorium, Nazrul Kalakshetra, Agartala on 16th December 2019. The programme aims at emitting the fear of maths, finding its actual meaning and exploration its understanding in real life situations.

Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director) - Direction & Design
Dr. K.B. Subramaniam - Maths Educator & Playwright
Ms. Malvika Bhaskar (TIE Passout) - Assistant Direction & Design

SIX DAYS ADVANCE TRAINING :-

NSD, Tripura Centre organized 06 Days Advance Training for TIE Alumni on the Theme "How To Train Teachers as Facilitators to use Drama into the Classroom" w.e.f. 14th to 19th Oct, 2019, where 34 TIE Alumnus from different states of northeast states completed the training successfully. Dr. K.B.Subramaniam (Guest Faculty), Mr. Daniel Allen Kelin II (Guest Faculty) & Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director) were conducted the training as experts. The training is very fruitful in nature which will help our alumni to know much more about TIE methodology and helps them to work in the field of TIE with more efficient & enthusiasm.

FIVE DAYS ART INTEGRATION WORKSHOP :-

NSD, Tripura Centre organized "05 Days Art Integration Workshop For Teachers & TIE Alumni" w.e.f. 25th to 29th December 2019 at NSD Campus,

FOUR DAYS WORKSHOP ON TEACHING KOKBOROK LANGUAGE THROUGH DRAMA :- SD, Tripura Centre organized **"04 Days Workshop on Teaching Kokborok Language Through Drama"** for Kokborok Teachers at Nazrul Kalakshetra, Agartala w.e.f. 31st December 2019 to 03rd January, 2020.

FIVE DAYS WORKSHOP ON LEBON MOVEMENT :-

NSD, Tripura Centre organized "05 Days Workshop on Lebon Movement" for TIE Passouts at Nazrul Kalakshetra, Agartala w.e.f. 20th to 24th Feb 2020, where TIE Passouts alongwith students of Tripura University (Performing Arts) successfully completed the workshop. Ms. Faezeh Jalali (Guest Faculty) & Ms. Dolly Konwar (Assistant) conducted the workshop as experts.

NATYA UTSAV 2019 :-

NSD, New Delhi organized Natya Utsav from 26th to 30th December 2019 at Ananda Auditorium, Nazrul Kalakshetra, Agartala in collaboration with the Department of Information & Cultural Affairs, Govt. of Tripura, in which NSD's Repertory Company performed its 5 plays at the above auditorium. The name of the plays are as follows:-

Khamoshi Sili Sili, Directed by Prof. Suresh Sharma- on 26th Dec, 2019
Tajmahal Ka Tender, Directed by Chittaranjan Tripathy-on 27th Dec, 2019
Bayen, Directed by Usha Ganguli - on 28th Dec, 2019
Jaat Hi Poochho Sadhu Ki, Directed by Rajinder Nath- on 29th Dec, 2019
Pehla Satyagrahi, Directed by Prof. Suresh Sharma - on 30th Dec, 2019

PRAGJYOTISH FESTIVAL 2020 :-

NSD, Tripura Centre successfully organized Pragjyotish Festival (A Festival of North East Plays in North East Region, 2020) from 01st to 05th March, 2020 at Rabindra Satabarshiki Bhavan Hall No-2, Agartala, where five theatre groups (Assam-02, Manipur-01, Tripura-02) performed plays in the said Festival. The name of the plays performed are as follows:-
"Irikoti Mirikoti", Directed by Mrinal Jyoti Goswami (Group - Aank A Creative Line 1.3.20
"Raj Atithi", Directed by Sanjoy Kar (Group Name: Natyabhumi - Showcased on 02/03/2020.
"Abhibadan Macbeth, the evil inside", Directed by Jyoti Narayan Nath (Group Name: Anubhab 'Tha Actor Guild - Showcased on 03/03/2020.
"Jallianwala Bagh", Directed by Ksh. Phajaton Chanu (Group Name: Banian Repertory Theatre - Showcased on 04/03/2020.
"Waksaa", Directed by Sri Partha Pratim Acharya.Group Name: Natyabhumi Group Theatre - Showcased on 05/03/2020.

ONLINE ACADEMIC ACTIVITIES DURING LOCKDOWN FOR COVID19 PANDEMIC :- Tripura Centre conducted 02 hrs interaction classes on Theatre-In-Education & Drama-In-Education for students through

online on Zoom Video Conferencing App on regular basis during the month of April 2020.
Assignments & Projects related to Theatre-In-Education, Drama-In-Education & Scenario writing for performance with children has given to students during the month of April 2020 through online, whereas classes were also conducted through Google Classroom and Zoom App.
Planning for drama workshop & summer theatre workshop is initiated in the month of April 2020.
During the lockdown Tripura Centre conscious the students regarding the widespread of COVID19 pandemic and also conscious how to prevent from this pandemic.

Online Classes on **Drama-In-Education** conducted by ***Mr. Vijai Kumar Singh (Centre Director)*** w.e.f 01st to 09th May, 2020.

Online Classes on **Curriculum Drama** conducted by ***Mr. Dipendra Rawat*** w.e.f 11-20 May 20.
On **Preparation** of **Summer Theatre Workshop** conducted by ***Mr. Manish Saini*** wef 12-28 May '20

WEBINAR :-

Students of TIE Tripura Centre watched webinar at 04.00 PM through online conducted by different experts of NSD, New Delhi (Experts like Dr. Arjun Deo Charan, Shri. Santanu Bose, Shri. Bharat Sharma, Shri. Ram Dayal Sharma, Shri. Dipankar Paul, Shri. Amitesh Grover, Shri. Aruna Kumar Malik, Shri. Asif Ali Haider Khan, Shri. C. Basavalingaish, Shri. Shashadhar Acharya, Shri. Parag Sarmah, Shri. Amitabh Srivastav, Shri. Amarjit Sharma, Ms. Tripurari Sharma).

ONLINE THEATRE-IN-EDUCATION WORKSHOP :-

NSD, Tripura Centre is going to conduct online Theatre-In-Education Workshop w.e.f. 08/06/2020, where children from all over India will participate in the online workshop. Our current TIE Students (2019-20) under the guidance of ntors & TIE Alumni will organize the workshop through online from NSD Campus (those students who were not able to returned to their hometown due to lockdown) by following the social distancing .

SNA, North East Documentation Centre Agartala

Activity report for the year 2019 - 20

Sangeet Natak Akademi Agartala, is a regional centre of Sangeet Natak Akademi, Delhi, an Autonomous body of Ministry of Culture, Govt. Of India, which was established in 2014 with the purpose of promotion and growth of Indian music dance and drama in high standards of its training and performances! The remarkable activity of this centre in the field of training was one month flute workshop, three months theatre workshop, two times puppet making and manipulation workshop etc. Whereas in the performance field, Chhau Parva, Jashn e Jammu Kashmir, Baul-Sandhya was the most successful and popular events of SNA Agartala.

In December 2018 this regional centre uplifted its working area and decided to work for revival, preservation, documentation and dissemination of the all audio -video material in advance digital formats. The centre has almost installed necessary latest world class equipment's (Compactor, computer desk etc.)to preserve all concerning tapes/hard disk of performing arts and documentary film of outstanding artists of Complete North East area. Since January 2019 onwards this centre is focused on festival documentation and field documentation. In year 2019-20 Agartala SNA centre did very few activities independently. Most of the activity was decided by headquarter New Delhi and Agartala centre had always directed to do the local arrangements and A/V and written documentation. The list of all activity done by Agartala centre directly or indirectly is given below:-

1-International Yoga Day

Sangeet Natak Akademi, Agartala Centre had organised the event "International Yoga day on 21st June 2019. The event was on yoga based, under the guidance of Yogacharya Lipika Saha , at Open air Theatre, Nazrul Kalakshetra, Agartala from 7.00 am to 9.00 am. Around 100 people were participated the event. The chief guest was Shri Sisir Deb, General Council Member, SNA New Delhi. Yogacharya Lipika Saha illustrated how the yoga well kept in our body and mind. She also explain that, how every morning at least 30 minutes is important for health based on yoga exercise. The participants of the said yoga event were much informative about yoga and its benefits.

2. International Music Day

Sangeet Bibhor - It was a musical event, held at Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall 2, at 6.30 pm. To 9.00 pm on the occasion of word music day 2019. The event was inaugurated by Shri Prabitanghu Das, SNA Awardee. The artist of the programme were:- Subal Biswas and group, Agartala presented Violin Ensemble. Minakshi Das, Malaghar, presented Baul song & Mistu Deb,Agartala, presented Shiv Shakti Dance Drama.

3. DURLABH VADYOTSAV ARRANGMENT/DOCUMENTATION

Three days DURLABH VADYOTSAV festival held in Dharm Nagar, Tripura from 25th to 27th July 2020. It was organised by SNA H.Q. New Delhi, and all coordination and management were done by SNA, Agartala i.e. lodging, fooding, transportation, venue etc for the invited artist, and audio - video/written documentation.

4. PERSONALITY DOCUMENTATION IN DHARMANAGAR -

In July 2019 Sangeet Natak Akademi, Documentation Centre Agartala had done three personality visual documentation in Dharmanagar, Tripura, within the festival period of DURLABH VADYOTSAV held in Dharmanagar, 25-27 July 2020.

Thanga Darlong, (Rosem Player)

Thanga Darlong is a 100 years old Rosem (A Tribal Instrument) player, belongs from Darlong tribal community. He is leaving in old kathalchhera, near morai, approximate 40 KM away from Dharma nagar town. He has received Sangeet Natak Akademi national award and also Padma Shri award by govt. of India.

Beside his performance in deferent state of India he has also visited to France, Japan and other country for his Rosem performance.

His documentation has interviewed by a local interpreter Miss. Merlin Darlong. The hired camera crew was arranged by SNA New Delhi.

5. PERSONALITY DOCUMENTATION IN DHARM NAGAR

Dr. Pt. Shri Raj Shekhar Vyas, (Rudra Veena Exponent)

Dr. Pt. Raj Shekhar Vyas is gifted with in numerous qualities, talents and incredible insight of various field of History, Literature, Music, Art and culture.

He has been written and published nearly 30 books, 30 research papers, and almost 500 article on music, heritage, painting, culture, and religious theories.

He has served to state government of Rajasthan as a district

education Officer, lecturer, and head Master cum research officer at DIET, Udaipur.

Dr. Pt. Raj Shekhar Vyas was honoured by the first President of India Dr. Rajendra Prasad in 1954 for his achievements in the field of Indian classical Music. Out of various qualities, his named among a few Indian Musicians who are still keeping alive the tradition of playing Rudra Veena in DagarVaani style. He lives in Udaipur.

6. PERSONALITY DOCUMENTATION IN DHARM NAGAR

Pt. Shri Pushp Raj Koshti, (Sur Bahaar& Sitar Player)

Pt. Shri Pushp Raj Koshti is an eminent exponent and renowned Sur Bahar and Sitar player of India. He is one of the senior lineage holders in the Dagar Dhrupad Tradition. Beside his 'A' grade in All India Radio, he has been performing in different concerts in India and abroad especially in Europe.

He has received Sangeet Natak Akademi National Award in 2011, for his contribution to Hindustani Instrumental Music. He lives in Mumbai and born in 1950. His interview has done in Hindi and interviewed by SNA official in a hotel room of Dharmanagar. The camera crew was hired by SNA head quarter.

7. RITU PARV DOCUMENTATION IN IMPHAL, MANIPUR

SNA New Delhi had a three days RITU PARV festival in Imphal, Manipur, from 29th Augast to 31st August 2019. SNA, Agartala had done all kinds of audio - video and written documentation work in the said event.

8. Documentation in Dhrupad festival, Dhubari, Assam

Three days Dhrupad festival held in Dhubari, Assam from 19th October to 25th October. It was organised by SNA H.Q. New Delhi, and coordinated by SNA, Agartala.

9. Music Workshop Agartala :- Sangeet Natak Akademi, New Delhi had organised a music workshop at Tripura University with the collaboration of Music Department of Tripura University. Workshop was for four days, and every days had two session of lecture demonstration about Hindustani vocal music and Mridangam from 5th to 8th November 2019. Mridangam expert was Guru Shri A. Prem Kumar from Chennai and Vocal expert was Smt.Ruchira Kedar, SNA Ustad Bismillah Khan Awardee from Pune, Maharastra. One hundred students had participated the work shop. Beside the workshop both gurus did their performances on last day. Complete audio and video documentation of the said music workshop has done by Sangeet

Natak Akademi Documentation Centre, Agartala. The supervision and all equipments i.e., technician of camera crewmembers, audio recording system, live wave casting machine etc. was arranged by Documentation centre, Agartala.

10-Music Workshop documentation in Sikkim University :-

Sangeet Natak Akademi, New Delhi had organised a music workshop at Sikkim University, Gangtok with the collaboration of Music Department Sikkim University. Workshop was for four days, and every day had two session of lecture demonstration about Hindustani vocal music and Violin from 13th to 16th November 2019. Hindustani vocal music expert was Guru Ustad F. Wasifuddin Dagar from Delhi and Violin expert was Shri Masoor Manju Nath. One hundred students had participated the work shop. Beside the workshop both gurus did their performances on second last day. Complete audio, video, written documentation and webcasting management was done by Sangeet Natak Akademi Documentation Centre, Agartala. The supervision and all equipments i.e., technician of camera crew members, audio recording system, live wave casting machine etc. was arranged by Documentation centre, Agartala.

11. Bharatanatyam Workshop in Agartala:-

Inaugurated on 25th February 2020 by Shri Rajat Ganguly former director SNANEC, Agarta, accompanied by local Bharatanatyam exponent Smt. Hira day The Sangeet Natak Akademi Documentation Centre, Agartala organised a 4 days Bharatanatyam workshop from 25th to 28th February 2020 under the guidance of Padma Buhusan and SNA Fellow Guru Prof. Shri C.V. Chandrasekhar ji of Tamil Nadu. The workshop was held in mini conference hall at Nazrul Kalakshetra complex, Jail Road, Agartala.

Seventy participants from all over the Tripura state and West Bengal had participated the workshop to gain the knowledge on the techniques & style of traditional Bharatanatyam dance under the eminent Guru Prof. Sri C.V. Chandrasekhar Ji. The workshop continued every day from 9.00 am to 4.00 pm, with a half an hour lunch break.

12. BHARATANATYAM PERFORMANCE

The workshop concluded with a stage performance at Ravindra barshiki Bhawan, Hall No. - 1 on 29th February 2020 in presence of Sri Sisir Deb, GC member, Shri Prabitanghu Das, SNA awardees and Shri Rajat Ganguly, former Director, Agartala. In the evening at valedictory program, the participants presented special group performance, there after Guruji also gave a solo performance. The event was enjoyed and appreciated by the audience. The total expenditure of this program including honorarium

and TA/DA of all invited artist was Rs.5,52,906/- (Rupees. Five Lakhs Fifty Two Thousand Nine Hundred and Six only).

13. ANTARANG WITH PROF. C.V. CHANDRASHEKHAR

An interaction session had been organise by SNA Agartala with Prof. C.V. Chandrashekharji in mini conference hall, Nazarul Kala Kshetra, Jail Road, Agartala on 28th February 2020. This interactive session was an interview based question answer conversation between the anchor and audience. Audience was mainly the musicologist, exponents and music students of Tripura and around.

14. Kathak Dance Workshop:- The Sangeet Natak Akademi Agartala Centre,organised a three days Kathak workshop from 27 - 29 February 2020 under the guidance of Padma bhushan and SNA Awardee Smt. Dr. Uma Sharmaji.

The workshop was inaugurated on 27th February 2020 in the presence of Sri C.V. Chandrasekhar Ji, SNA Ratna member, Shri Prabitangshu Das, SNA awardee and Shri Rajat Ganguly former director SNA NEC, Agartala. Seventy participants was participated the works shop. The workshop continued every day from 11.00 am to 3.00 pmatmini art glary Nazrul Kalakshetra complex, Agartala.

15. KATHAK PERFORMANCE BY SMT. UMA SHARMAJI

The Kathak workshop was concluded by a stage performance of participated student and guru Smt. Uma Sharma at Nazarul Kala Kshetra auditorium on 1st March 2020.

On the 1st March 2020, in the evening the workshop participants presented special group dance, there after Guru Smt. Uma Sharma ji gave her solo performance at Nazrul Kalakshetra auditorium. The event was enjoyed and appreciated by the audience/music lovers.

16. ANTARANG WITH SMT. DR. UMA SHARMAJI

An interaction session had been organised by SNA Agartala with Dr. Uma Sharmaji in Nazarul Kala Kshetra main Hall Jail Road, Agartala, in the evening of her stage performance. This interactive session was an interview based question answer conversation between anchor and audience who were mainly the musicologist, dance exponents and young music students of Tripura and around.

17. Birth Centenary documentation of Padmashri Dr. Vishnu shridhar Wakankar.

The founder of Sanskaar Bharti, Agartala, It was four days birth centenary festival of Padmashri Dr. Vishnu shridharWakankar, which was held in

Agartala. This was organised by Sanskaar Bharti, Agartala. On this occasion legend artist Shri Bhajan sapoori and his son Shri Abhay Rustam Sapoori had participated and performed with his group with Instrumental music - Santoor. SNA, Agartala did the audio-video and written documentation of this music concert on 8th March 2020.

18. Holi Festival documentation at Barpeta,Assam (NE) :-

Apart from the state of Tripura a traditional holi utsav is organized by Barpetta people every year for a week before holi at Barpeta, Assam. This holi festival is most popular folk music based event in the north east area. The main attraction of this festival is holigeet with dance and drama in a big group with traditional colourful costumes of all. The traditional food and drinks (mela) is also a major part of attraction. SNA, NE Documentation Centre Agartala, had organize a festival documentation from 8th to 11th March 2020 to preserve this rare valuable art form for archival purpose. It is a four days documentation of video and still photography. We had interacted with five local folk artist to get the full illustration about the holi festival Barpeta.

PLAY
STAY YET A WHILE

Based on Sabyasachi Bhattacharya's
THE MAHATMA AND THE POET

Performance Text
M. K. RAINA

Opening AV

Lights: all on Dan's Dais

STAY YET A WHILE

Narrator :

Good Evening Ladies and Gentlemen. I am (Name of actor's in Real)

Todays performance puts together letters exchanged by Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore along with some essays which they wrote debating major national issues. They were great icons of the last century and we cannot dare match them or imitate them. We only present to you the text of the exchange that took place between these two great minds. These letters, preserved in the archives at Visva-Bharati, the University founded by Tagore, are of great historical interest. Of more than historical interest is the debate between Gandhi and Tagore over certain issues and questions, which continue to be relevant to this day and age. This intellectual exchange began in 1914-15, when Mahatma Gandhi along with the students of his phoenix school in South Africa visited Tagore's Santiniketan. Gandhi recalled later: Gandhi moves to his mat " It was here that the members of my South African family found warm hospitality in 1914, pending my arrival from England and I too found shelter here for nearly a month."

At that time, Tagore's school at Santiniketan was not yet 15 years old. Tagore was 53 years of age and he had received the Nobel Prize just a year earlier. Gandhi was younger by eight years and yet to attain a national stature in India, though his great work in South Aftica was widely known There were many striking contrasts between these two personalities. Yet, they found some common chord and there began a friendship, which lasted till Tagore's death in 1941. As early as February1915 we find Tagore referring to Gandhi as ' Mahatma and Gandhi readily adopted the form of addressing Tagore as 'Gurudev'.

Light : Tagore moves to his chair.

Avijit :

But theirs was not a friendship based on just mutual admiration. They had differences on fundamental philosophical questions, which led to disputation about many political, social and economic matters. Both were unsparing in their debate and indeed, it cannot be said that either of them was very successful in persuading the other towards a path of convergence of views. Each accepted cordially the others right to differ. These differences on public issues never affected, as far as one can judge from the letters, their personal

relationship. They were not total strangers to each other . It is on record that in 1901 at the Calcutta Session of the Indian National Congress, M.K. Gandhi moved a resolution “as a petitioner on behalf of the hundred thousand British Indians in South Africa. On that occasion, he met Rabindranath’s elder brother Jyotirindranath and, shortly after that, a translation of one of Gandhi’s articles on the Indian settlers in South Africa was published in the journal Bharati, with which the Tagores were associatied.

Narrator :

There is no evidence of personal encounter at this time between Rabindranath and Gandhi. However, there is an affinity of spirit evident in what Tagore wrote of the Indian struggle as early as 1908: “God save us from the disastrous notion that dharma is not, for the powerless. Let us not depart from the path of Truth(satya), that which is Right..... It is regrettable that the terror and upheavals of Europe are the only models before us. But the Christian saints who, by the strength of their faith, withstood the oppression of the Roman Emperor triumphed in their death over the Emperor ..... Dharma can help us surpass oppression....” In this statement and in others Tagore’s philosophical approach appears to approximate that of Gandhi’s.

Narrator moves down stage and back : stands on his dias

1915-1922

Narrator: The first letter from Tagore bears no date.

AV of Phoenix School boys

Tagore : Dear Mr. Gandhi,

That you could think of my school as the right and the likely place where your phoenix boys could take shelter, when they are in India, has given me real pleasure and that pleasure has been greatly enhanced when I saw those dear boys in that place. We all feel that their influence will be of great value to our boys and I hope that they, in their turn, will gain something, which will make their stay in Santiniketan fruitfull. I write this letter to thank you for allowing your boys to become our boys as well and thus, form a living link in the Sadhana of both of our lives.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore

Narrator comes and sits on the block/stool on his dias.

Narrator:

It was most certainly written in January 1915, after Gandhi's arrival from England and shortly before his visit to Santiniketan. However, they did not meet during his first visit. They both met during Gandhi's second visit to Shantiniketan in March 1915 and after that they kept in touch regularly.

In 1918 Gandhi wrote to Tagore on the question of national language.

21 January, 1918
Motihari,

Dear Gurudev,

For my forthcoming address before the Hindi Sammelan at Indore, I am trying to collect the opinions of leaders of thought on the following questions:

(i) Is not Hindi (as bhasa or Urdu) the only possible national lan guage for inter- provincial intercourse and for all other national proceedings?

(ii) Should not Hindi be the language principally used at the forth coming Congress?

(iii) Is it not desirable and possible to give the highest teaching in our schools and colleges through the vernaculars?

And should not Hindi be made a compulsory second language in all our post - primary schools?

I feel that if we are to touch the masses and if national servants are to come in contact with the masses all over India, the questions set forth above have to be immediately solved and ought to be treated as of the utmost urgency. Will you kindly favour me with your reply, at your early convenience?

I am
Yours sincerely,
M. K. Gandhi

Narrator:

Despite formal address till 1919 ("Dear Mr. Gandhi") Tagore refers to Gandhi as the 'Mahatma' as early as February 1915. His friend C.F. Andrews used this nomenclature for Gandhi in a letter to Tagore even earlier, in January 1914: " I had no difficulty in seeing from the first Mr. Gandhi's position and accepting it; for in principle, it is essentially yours and Mahatmaji's - a true independence."

Gandhi : 30 April 1918
Delhi

Dear Gurudev,

Much as I should like to keep Mr. Andrews with me a little longer, I feel sure that he must leave for Calcutta tonight. I know you want his soothing presence by you whilst you are keeping indifferent health. And you must have him while you need him.

We are on the threshold of a mighty change in India. I would like all the pure forces to be physically in the country during the process of her new birth. If therefore you could at all find rest anywhere in India, I would ask you and Mr. Andrews to remain in the country and kindly to lend me Mr. Andrews now and then. His guidance at times is most precious to me.

I do hope you will soon recover from the nervous strain you are suffering from.

Yours sincerely
M. K. Gandhi

Narrator : Moves to the screen

On 23 March, 1919, Gandhiji called upon the people of India to Mobilize in thousands and observe a day of humiliation and prayer as mark of protest against the Rowlett acts.

Video of Rowlett acts.

Gandhi : 5 April, 1919
Bombay

Dear Gurudev,

This is an appeal to you against our mutual friend, Charlie Andrews. I have been pleading with him for a message from you for publication in the national struggle which, though in form it is only directed against a single piece of legislation, is in reality/ a struggle for liberty worthy of a self-respecting nation. I have waited long and patiently. Charlie's description of your illness made me hesitate to write to you personally. Your health is a national treasure and Charlie's devotion to you is superhuman. I have respected this lofty desire of his to protect you from all harm. But I find that you are lecturing in Benares. I have, therefore, in the light of this fact corrected Charlie's description of your health which somewhat alarmed me and I venture to ask you for a message from you-a message of hope and inspiration for those who have to go through the fire.

I do it because you were good enough to send me your blessings when I embarked upon the struggle. The forces arrayed against me are, as you know, enormous. I do not dread them, for I have an unquenchable belief that they are supporting untruth and that if we have sufficient faith in truth, it will enable us to overpower the former. But all forces work through human agency. I am therefore anxious to gather round this mighty struggle the ennobling assistance of those who approve it. I will not be happy until I have received your considered opinion on this endeavour to purify the political life of the country. If you have seen anything to alter your first opinion of it, I hope you will not hesitate to make it known. I value even adverse opinions from friends, for though they may not make me change my course, they serve the purpose of so many lighthouses to give out warnings of dangers lying in the stormy paths of life. Charlie's friendship has been to me on this account an invaluable treasure, because he does not hesitate to share with me even his unconsidered notes of dissent. This I count a great privilege. May I ask you to extend at this critical moment the same privilege that Charlie has?

I hope that you are keeping well and that you thoroughly recuperated after your fatiguing journey through the Madras Presidency.

Yours sincerely,
M. K.Gandhi

Narrator :

Tagore replied a week later. He wrote the letter on the eve of the Jallianwala Bagh Massacre. Lights: Narrator moves forwards Tagore A copy of the same was communicated to the press.

AV

Tagore : 12 April, 1919
Santiniketan,

Dear Mahatmaji,

Power in all its forms is irrational, it is like the horse/that drags the carriage blind-folded. The moral element in it is only represented in the man who drives the horse. Passive resistance is a force, which is not necessarily moral in itself; it can be used against truth as well as for it. The danger inherent in all force grows stronger when it is likely to gain success, for then it becomes temptation.

I know your teaching is to fight against evil by the help of the good. But such a fight is for heroes and not for men led by impulses of the moment. Evil on one side naturally begets evil on the other, injustices

leading to violence and insult to vengefulness. Unfortunately such a force has already been started and either through panic or through wrath, our authories have shown us their claws whose sure effect is to drive some of us into the secret path of resentment and others into utter demoralization.

In this Crisis you, as a great leader of men have stood among us to proclaim your faith in the ideal which you know to be that of India, the ideal which both against the cowardliness of hidden revenge and the cowed submissiveness of the terror-stricken. You have said, as Lord Buddha has done in his time and for all time to come:

"*Akkodhena jine kodhan asadhum sadhuna jine*"

" Conquer anger by the power of non-anger and evil by the power of good. "

I have always felt, and said accordingly that the great gift of freedom can never come to a people through charity. We must win it before we can own it. And India's opportunity for winning it will come to her when she can prove that she is morally superior to the people who rule her by their right of conquest. She must willingly accept her penance of suffering, the suffering which is the crown of the great.

This is why I pray most fervently that nothing that tends to weaken our spiritual freedom may intrude into your marching line, that martyrdom for the cause of truth may never degenerate into fanaticism for mere verbal forms, descending into self-deception that hides itself behind sacred names.

With these few words for an introduction allow me to offer the following as a poet's contribution to your noble work :-

Lights : Tagore gets up and beigns to walk towards down centre

Let me hold my head high in this
faith that thou art our shelter,
that all fear is mean distrust of thee.
Fear of man? But what man is there
in this world, what king, O king of kings
who is thy rival, who has hold of me
for all time and in all truth?
What power, is there in this world to rob
me of my freedom? For do not the arms reach
the captive through the dungeon-walls bringing
unfettered release to the soul?

And must I cling to this body in fear of
death, as a miser to his barren treasure?
Has not this spirit of mine the eternal call
to the feast of everlasting life?

Give me the supreme courage of love, this is
my prayer, the courage to speak, to do, to
suffer at thy will, to leave all things of be
left alone.
Give me the supreme fath of love, this is
my prayer, the faith of the life in death,
of the victory in defeat, of the power hidden in
the frailness of beauty, of the dignity of pain
that accepts hurt, but disdains to return it.

Lights fade out for video

Sound of Bullets + AV Images of Jaliannwala Bagh on screen

Tagore : 30 May, 1919

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by the Government in the punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The dispropertionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilized governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resource-less, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of the insults " and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers- possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making

fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers.

Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government which could so easily afford to be magnanimous as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency with due deference and regret to relieve me of my title of kinghthood which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

AV of Non-Co-operation movement

Tagore comes down stage then goes and sit on his bed

Lights: narrator moves to the down centre area. Gandhi and Tagore are both are on their respective beds.

Narrator:

From 1919 to 1922, the Khilafat and Non-cooperation movements catapulted Mahatma Gandhi to the leadership of a mass movement, which included a programme of "boycott of government schools" and of "inducing the people" to give up foreign cloth and take to swadeshi products. Tagore began to feel uncomfortably at variance with some of the actions, agenda and practices which these programmes led to.

..... Tagore was out of India when the Non-cooperation movement started in full swing. But he observed its progress. And he shared his anxieties about some failings of the movement, as he perceived it, with C.F. Andrews. Gandhi might have had an inkling of Tagore's line of criticism, for Gandhi writes to Andrews in March 1921 that in his opinion Tagore " had not understood the simple beauty and the duty of non-cooperation. When the circiticism became public he was indeed exercised. Gandhi rejected the idea that Tagore and M.M, Malviya , who also voiced criticism, were " envious" ; but he said,

Gandhi :

"Both lack fearlessness and are proud of their opinion and ideas. You can tolerate pride if not accompanied by fear....."

Tagore :

The day is sure to come, when the frail man of spirit, completely unhampered by arms and air fleets, and dreadnoughts will prove that the meek is to inherit the earth. It is in the fitness of things, that Mahatma Gandhi, frail in body and devoid of all material resources, should call up the immense power of the meek, that has been lying waiting in the heart of the destitute and insulted humanity of India.

Our fight is a spiritual fight, it is for Man. We are to emancipate Man from the meshes that he himself has woven round him,- these organisations of National Egoism. The butterfly will have to tbe persuaded that the freedom of the sky is of higher value than the shelter of the cocoon. If we can defy the strong, the armed , the wealthy, revealing to the world power of the immortal spirit, the whole castle of the Giant Flesh will vanish in the void. And then Man will find his swaraj. We, the famished, ragged ragamuffins of the East, are to win freedom for all Humanity. We have no word for Nation in our language. When we borrow this world from other people, it never fits us. I hve seen the West; I covet not the unholy feast, in which she revels every moment, growing more and more bloated and red and dangerously delirious. **Lights : Tagore moves to his chair Not for us, is this mad orgy of midnight, with lighted torches, but awakenment in the serene light of morning.**

The idea of non-cooperation is political asceticism. in its passive moral form is asceticism and in its active moral form is violence. The desert is as much a form of himsa (malignance) as is the raging sea in storms, they both are against life.

I say again and again that I am a poet,that I am not a fighter by nature. I would give everything to be one with my surroundings. I love my fellow beings and I prize their love. Yet I have been chosen by destiny to ply my boat there where the current is against me. What irony of fate is this that I should be preaching cooperation of cultures between East and West on this side of the sea just at the moment when the doctrine of non-cooperation is preached on the other side.

Therefore, it hurts me deeply when the cry of rejection rings loud against the West in my country with the clamour that the Western education can only injure us. It cannot be true. What has caused the mischief is the fact that for a long time we have been out of touch with our own culture and therefore the Western culture has not found its prospective giving our mental

eye a squint. When we have the intellectual capital of our own, the commerce of thought with outer world becomes natural and fully profitable. But to say that such commerce is inherently wrong is to encourage the worst form of provincialism, productive of nothing but intellectual indigence. The West has must understood the East, which is at the root of the disharmony that prevails between them, but will it mend the matter if the East in her turn tries to misunderstand the West?The present age has powerfully been possessed by the West; it has only become possible because to her is given some great mission for man. We from the East have to come to her to learn whatever she has to teach us; for by doing so we hastern the fulfillment of this age. We know that the East also has her lessons to give and she has her own responsibility of not allowing her light to be extinguished, and the time wll come when the West will find leisure to realize that she has a home of hers in the East where her food is and her rest.

Rabindranath Tagore

Narrator : Gandhi responded immediately with an article in the June 1921 issue of Young India. His critique was titled “English Learning.”

Gandhi :

Elsewhere the reader will see my humble endeavour in reply to Dr. Tagore’s criticism of Non-Cooperation. I have since read his letter to the Manager of Santiniketan. I am sorry to observe that the letter is written in anger and in ignorance of facts. The poet was naturally incensed to find that certain students in London would not give a hearing to Mr. Pearson, one of the truest of Englishmen, and he became equally incensed to learn that I had told our women to stop English studies. The reasons for my advice, the Poet evidently inferred for himself.

(Lights Gandhi begins to move to his mat and down centre and then goes and sits on his mat.)

If he, with a poet’s imagination, had seen that I was incapable of wishing to cramp the mind of the Indian women, and I could not object to English learning as such, and recalled the fact that throughout my life I had fought for the fullest liberty for women, he would have been saved the injustice which he has done me, and which, I know, he would never knowingly do to an avowed enemy.

The Poet does not. Know perhaps that English is today studied because of its commercial and so-called political value. Our boys think, and rightly in the present circumstances, that without English they cannot get Government service. Girls are taught English as a passport to marriage. I know several instance of women wanting to learn English so that they may

be able to talk to Englishmen in English. I know husbands who are sorry that their wives cannot talk to them and their friends in English. I know families in which English is being made the mother tongue. Hundreds of youths believe that without a knowledge of English freedom for India is practically impossible. The canker has so eaten into the society that, in many cases, the only meaning of Education is a knowledge of English.

(Tagore moves towards the back and stands behind his chair looking out.)

All these are for me signs of our slavery and degradation.It is unbearable to me that the vernaculars should be crushed and starved as they have been. I cannot tolerate the idea of parents writing to their children, or husbands writing to their wives, not in their own vernaculars, but in English. I hope I am as great a believer in free air as the great Poet. I do not want my house to be walled in on all sides and windows to be stuffed.

I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any. I refuse to live in other people's houses as an interloper , a bigger or a slave. I refuse to put the unnessessary strain of learning English upon my sisters for the sake of false pride or questionable social advantage. I would have our young men and young women with literary tastes to learn as much of English and other world-languages as they like, and then expect them to give the benefits of their learning to India and to the world, like a Bose , a Roy or the Poet himself.

But I would not have a single Indian to forget, neglect or be ashamed of his mother -tongue , or to feel that he or she cannot think or express the best thoughts in his or her own vernacular. Mine is not a religion of the prison house. It has room for the last among God's creation . But it is proof against insolence, pride of race, religion or colour. I am extremely sorry for the Poet's misreading of this great movement or reformation, purification and patriotism spelt humanity. If he will be patient, he will find no cause for sorrow or shame for countrymen. I respectfully warn him against mistaking its excrescences for the movement itself. It is as wrong to judge Non-cooperation by the students' misconduct in London or Malegaon's in India, as it would be to judge Englishmen by the Dyers or the O'Dwyers.

M. K. Gandhi

Narrator :

Gandhi didn't stop at this . The June 1921 issue of Young India carries another piece by him critiquing Tagore's viewpoint. The piece was titled "The Poet's Anxiety." Gandhi writes.......

(Lights : Narrator moves down stage/moves stage right.)

The Poet of Asia, as Lord Hardinge called Dr. Tagore, is fast becoming, if he has not already become, the Poet of the world. Increasing prestige has brought to him increasing responsibility. His greatest service to India must be his poetic interpretation of India's message to the world. The Poet is, therefore, sincerely anxious that India should deliver no false or feeble message in her name. He is naturally jealous of his country's reputation. He says he has striven hard to find himself in tune with the present movement. He confesses that he his baffled. He can find nothing for his lyre in the din and the bustle of Non-Cooperation. In three forceful letters, he has endeavoured to give expression to his misgivings, and ha has come to the conclusion that Non-cooperation is not dignified enough for the India of his vision, that it is a doctrine of negation and despair. He fears that it is a doctrine of separation, exclusiveness, narrowness and negation.

Gandhi :

In all humility, I shall endeavour to answer the Poet's doubts. I may fail to convince him or the reader who may have been touched by his eloquence, but I would like to assure him and India that Non-cooperation in conception is not any of the things he fears, and he need have no cause to be ashamed of his country for having adopted Non-cooperation. If, in actual application, it appears in the end to have failed, it will be no more the fault of the doctrine, than it would be Truth, if those who claim to apply it in practice do not appear to succeed. Non-cooperation may have come in advance of its time. India and the world must then wait, but there is no choice for India save between violence and Non-cooperation.

Nor need the Poet fear that Non-cooperation is intended to erect a Chinese wall between India and the West. On the contrary, Non-cooperation is intended to pave the way to real, honourable and voluntary co-operation based on mutual respect and trust.

The present struggle is being waged against compulsory cooperation, against one-sided combination, against the armed imposition of modern methods of exploitation, masquerading under the name of civilization.

Non-cooperation is a protest against an unwitting and unwilling participation in evil.

Lights : Tagore moves back to his chair.

Tagore :

Parasites have to pay for their readymade victuals by losing the

power of assimilating food in natural form. In the history of man, this same sin of laziness has always entailed degeneracy.

But Providence displayed a sudden accession of creative courage when it came to man; for his inner nature has not been tied down, though outwardly the poor human creature has been left naked, weak and defenceless. Inspite of these disabilities, man in the joy of his reward freedom has stood up and declared: ' I shall; achieve the impossible ". That is to say, he has consistently refused to submit to the rule of things as they always have been, but is determined to bring about happenings that have never been before.

The Mahatma has won the heart of India with his love; for that we have all acknowledged his sovereignty. He has given us a vision of the *shakti* of Truth ; for that our gratitude to him is unbounded. We read about Truth in books: we talk about it: but it is indeed a red letter day, when we see it face to face. Rare is the moment, in many a long year, when such good fortune happens. We can make and break Congresses every other day. It is at any time possible for us to stump the country preaching politics in English. But the golden rod, which can awaken our country in Truth and Love is not a thing which can never be manufactured by the nearest goldsmith. To the weilder of that rod our profound salutation! But if having seen Truth, our belief in it is not confirmed, what is the good of it all?

The command to burn our foreign clothes has been laid on us. I, for one, am unable to obey it. Firstly, because I conceive it to be my very first duty to put up a valiant fight against this terrible habit of blindly obeying orders, and this fight can never be carried on by our people being driven from one injunction to another. Secondly, I feel that the clothes to be burnt are not mine, but belong to those who most sorely need them. If those who are going naked should have given us the mandate to burn, it would , at least, have been a case of self-immolation and the crime of incendiaries would not lie at our door. But how can we expiate the sin of the forcible destruction of clothes, which might have gone to women, whose nakedness is actually keeping them prisoners unable to stir out of the privacy of their homes?

I have said repeatedly and must repeat once more that we cannot afford to lose our mind for the same of any external gain. Where Mahatma Gandhi has declared war against the tyranny of the machine, which is oppressing the whole world. we are all enrolled under his banner. But we must refuse to accept as our ally the illusion-haunted magic-ridden slave mentality that is at the root of all the poverty and insult under which our country groans. Here is the enemy itself on whose defeat alone swaraj within and without can come to us.

The time, moreover, has arrived when we must think of one thing more, and that is this.The awakening of India is a part of the awakening of the world. The door of the New Age has been flung open at the trumpet blast of a great war. We have read in the Mahabharata how the day of self-revelation had to be preceded by a year of retirement. The same has happened in the world to day.

From now onward, any nation which takes an isolated view of its own country will run counter to the spirit of the New age, and know no peace. From now onward, the anxiety that each country has for its own safety must embrace the welfare of the record.

Rabindranath Tagore

Lights : Narrator goes and sits on his table.

Narrator:

The Call of Truth, This was Tagore's response to Gandhi's criticism. Gandhi's rejoinder was equally unsparing though it came a couple of months later in the October 1921 issue of Young India and was titled " The Great Sentinel."

Gandhi :

The Bard of Santiniketan has contributed to the Modern Review a brilliant essay on the present movement. It is a series of word pictures which he alone can paint. It is an eloquent protest against authority, slave mentality or whatever description one gives of blind acceptance of a passing mania whether out of fear or hope. It is a welcome and wholesome reminder to all workers that we must not be impatient; We must not impose authority no matter how great. The Poet tells us summarily to reject anything and everything that does not appeal to our reason or heart. If we would gain swaraj we must stand for Truth as we know it, at any cost. And I would feel extremely sorry to discover that the country had unthinkingly and blindly followed all I had said or done. I am quite conscious of the fact that blind surrender to love is often more mischievous than a forced surrender to the lash of the tyrant. There is hope for the slave of the brute, none for that of love. Love is needed to strengthen the weak, love becomes tyrannical when it exacts obedience from an unbeliever. To mutter a mantra without knowing its value is unmanly. It is good, therefore, that the Poet has invited all who are slavishly mimicking the call of the charkha boldly to declare their revolt. His essay serves as a warning to us all who in our impatience are betrayed into intolerance or even violence against those who differ from, us. I regard the Poet as a sentinel warning us against the approaching enemies called Bigotry,Lethargy, Intolerance, Ignorance, Inertia and other members of that brood.

But whilst I agree with all that the Poet has said as of the necessity of watchfulness lest we cease to think, I must not be understood to endorse the proposition that there is any such blind obedience on a large scale in the country today. I have again and again appealed to reason, and let me assure him that if happily the country has come to believe in the spining wheel as the giver of plenty, it has done so after laborious thinking, after great hesitation. I am not sure that even now educated India has assimilated the truth underlying the charkha. He must not mistake the surface dirt for the substance underneath. Let him go deeper and see for himself whether the charkha has been accepted from blind faith or from reasoned necessity.

Hunger is the argument that is driving India to the spining wheel. **(AV of the Spinning Wheel)** The call of the spinning wheel is the noblest of all. Because it is the call of love. And love is swaraj ' Why should I who have no need to work for food, spin'? may be the question asked . Because I am eating what does not belong to me. I am living on the spoliation of my countrymen. Trace the course of every pice that finds its way into your picket, and you will realise the truth of what I write. Swaraj has no meaning for the millions if they do not know to employ their enforced idleness. The attainment of this swaraj is possible within a short time and it is so possible only by the revival of the spinning wheel.

I do want growth. I do want self -determination. I do want freedom, but I want all these for the soul. A plea for the spinning wheel is a plea for recognising the dignity of labour

I claim that in losing the spinning wheel we lost our left lung. We are therefore suffering from galloping consumption. The restoration of the wheel arrests the progress of the fell disease.

I venture to suggest to the Poet that the clothes I ask him to burn must be and are his. If they had to his knowledge belonged to the poor or the ill-clad, he would long ago have restored to the poor what was theirs. In burning my foreign clothes I burn my shame. I must refuse to insult the naked by giving them clothes they do not need, instead of giving them work which they sorely need. I will not commit the sin of becoming their patron, but on learning that I had assisted in impoverishing them, I would give them a privileged position and give them neither crumbs nor cast off clothing but the best of my food and clothes and associate myself with them in work.

Nor is the scheme of Non-cooperation or Swadeshi an exclusive doctrine. My modesty has prevented me from declaring from the house top that the message of Non-cooperation, Nonviolence and Swadehsi, is a

message to the world. It must fall flat , it does not bear fruit in the soil where it has been delivered.

The hungry millions ask for one poem- invigorating food. They cannot be given it. They must earn it. And they can earn only by the sweat of their brow.

In these verses of the Bhagwad Gita is contained for me the whole truth of the spinning wheel as an indispensable sacrament for the India of today. If we will take care of to day, God will take care of the morrow.

Niyatham kuru karmathvam karmajyaayohyakarmanah:

....

Yagnyaarthaath karmanonyathra lokoyam karmabandhanah: (8)

Thadarttham karma Kountheya mukthasanga: samachara (9)

Saha Yagnaah : Praiaah srishtva purovaacha praaiaanathini;

Arena prasavishyaddvamesha Voasthishtakaamaddhuk (10)

Devaanbhaavayathaanena the devaabhaavayanthu vah:

Parasparam bhaavayanthah: sreyah: paramavaapsyattha (11)

Ishtaanbhogaanhivodevaa daasyanthe yagnyanhaavithaah:

Thairdattaanapradayaibhyo yo bhungthe sthena eva sah: (12)

Yagnasishtaasinah: santho mutchyamte sarvakilbishaii:

Bhujamthe the thvagham paapaa ye pachanthyaathmakaranaath (13)

Annaathbhavanthi dhuthaani parjanyaadannrsambhavah :

karmasamudbhavah: (14)

Karma brahmoobhavam viddhi brahmaaksharasamudbhavam

Thasmaathsarvagatham brahma nithyma yagne prathishtitham (15)

Evam pravarthitham chakram naanyvarthayathuiiha yah:

Aghaayurindriyaaraamo mogham paarttha sa jiivathi (16)

M. K. Gandhi

Lights : **Interval**

AV+ Title Card 1923-1928 Lights : All three in position/Video

Narrator :

Soon after this debate on Charkha and Swaraj, Gandhi was arrested. With Gandhi in prison Tagore suspended the debate. Upon Gandhi's release from the prison in February 1924, in fact on his very day of release Tagore sent him a cable.

Tagore : 5.2.1924

Santiniketan,

To Mahatma Gandhi Sasoon Hospital Poona

We Rejoice

Rabindranath

Gandhi:

Dear Gurudev, 18.5.25

Nepal Babu has sent me your very kind and cordial note. I do want to pass a day or two at Bolpur. I would not think of your leaving Bolpur to meet me. I know the delicate state of your health. I shall inform you of the date when I can come.

I am
Yours
M. K. Gandhi

Tagore :

Santiniketan
Bengal, India
27 Dec., 1925

Dear Mahatmaji,

I have seen the letter you have written to our Shastrimahashaya. It is full of your noble spirit. You have my assurance that even if you ever hit me hard in the cause of what you think as truth our personal relationships based upon mutual respect will bear that strain and will remain uninjured.

With Namaskar

Rabindranath Tagore

Gandhi: Sabarmati,

Dear Gurudev,

I sm thankful for your sweet letter. It has given me much relief.

Yours sincerely,

M. K. Gandhi

Lights : narrator moves to the edge of the platform up centre

Narrator :

With Gandhi out of prison, Tagore resumed his debate on Charkha and Swaraj. His contribution " The Cult of Charkha" appeared in the September 1925 issue of the Modern Review.

Tagore :

I am not ashamed,- though there is every reason to be afraid- to admit that the depth is of my mind have not been moved by the charkha agitation.

I am strongly of opinion that all intense pressure of persuation brought upon the crowd psychology is unhealthy for it. Some strong and wide -spread intoxication of belief among a vast number of men can suddenly produce a convenient uniformity of purpose, immense and powerful. It seems for the moment a miracle of a holesale conversion ; and a catastrophic phenomenon of this nature stuns our rational mind, raising high some hope of easy realization, which is very much like a boom in the business market. The amazingly immediate success is not criterion of its reality,- the very dimension of its triumph having a dangerous effect of producing a sudden and universal eclipse of our judgement. Human nature has its elasticity; and in the name of urgency, it can be forced towards a particular direction far beyond its normal and wholesome limits. But the rebound is sure to follow, and the consequent disillusionment will leave behind it a desert track of demoralisation. We have had our experience of this in the tremendous exultation lately produced by the imaginary easy prospect of Hindu- Muslim unity. And therefore I am afraid of a blind faith on a very large scale in the charkha, in the country, which is so liable to succumb to the lure of short cuts when pointed out by a personality about whose moral earnestness they can have no doubt.

There are many who assert and some who believe that swaraj can be attained by the charkha; but I have yet to meet a person who has a clear idea of the process. That is why there is no discussion, but only quarreling over the question. If I state that it is not possible to repel foreign invaders armed with guns and cannons by the indigenous bow and arrow, there will I suppose be still some to contradict me asking, 'Why not?' It has already been said by some, " Would not the foreigners be drowned even if every one of our three hundred and thirty millions were only to spit at them?" While not denying the fearsomeness of such a flood, or the efficacy of such a suggestion, the difficulty, which my mind feels to be insuperable, is that you can never get all these millions even to spit in unison. It is too simple for human beings. The same difficulty applies to the charkha solution.

It is extremely distasteful to me to have to differ from Mahatma Gandhi in regard to any matter of principle or method. Not that, from a higher standpoint, there is anything wrong in so doing; but my heart shrinks from it. For what could be a greater joy than to join hands in the field of work with one for whom one has such love and reverence? Nothing is more

wonderful to me than Mahatmaji's great moral personality. In him divine providence has given us a burning thunderbolt of shakti. May this shakti give power to India,- not overwhelm her, - that is my prayer!The difference in our standpoints and temperaments has made the Mahatma look upon Rammohan Roy as a pygmy- while I revere him as a giant. The same difference makes the Mahatma's field of work one which my conscience cannot accept as its own. That is a regret, which will abide with me always. I feel sure that Mahatma himself will not fail to understand me, and keep for me the same forbearance, which he has always had. As for my countrymen the public,- accustomed as they are to drown, under the facile flow of their minds, both past services and past disservices done to them,- if today they cannot find it in their hearts to forgive, they will forget tomorrow. Even if they do not,- if for me their displeasure is fated to be permament, so be it.

Lights: Tagore moves to his bed.

Gandhi :

When (Sir) Rabindranath's criticism of the charka was published some time ago, several friends asked me to reply to it. Being heavily engaged I was unable then to study it in full. But I had read enough of it to know its trend. I was in no hurry to reply. Those who had read it were too much agitated or influenced to be able to appreciate what I might have then written even if I had the time. Now therefore is really the time for me to write on it and to ensure a dispassionate view being taken of the Poet's criticism or my reply if such it may be called

The poet sent me the message that he had written something on the charkha, which might not quite please me. I knew therefore what was coming. But it has not displeased me. Why should mere disagreement with my views displace? If every disagreement were to displease, since no two men agree exactly on all points, life would be bundle of unpleasant sensations and therefore a perfect nuisance. On the contrary, the frank criticism pleases me. For our friendship becomes all the richer for our disagreements. Friends to be friends are not called upon to agree even on most points. Only disagreement must have no sharpness, much less bitterness, about them. And I gratefully admit there is none about the Poet's criticism.

I am obliged to make these prefatory remarks as Dame Rumour has wishpered that jealousy is the root of all that criticism. Such baseless suspicion betrays an atmosphere of weakness and intolerance. A little reflection must remove all ground for such a cruel charge . Of what should the Poet be jealous in me? Jealousy presupposes the possibility of rivalry. Well, I have never succeeded in writing a single rhyme in my life. There is nothing of the Poet about me. I cannot aspire after life. I cannot aspire after

his greatness. He is the undisputed master of it. The world today does not possess his equal as a poet. My 'Mahatmaship' has no relation to - the poet's undisputed position. It is time to realise that our fields are absolutely different and at no point overlapping. The Poet lives in a magnificient world of his own creation- his world of ideas. I am a slave of somebody else's creation- the spinning wheel. The Poet makes his gopis dance to the tune of his flute. I wander after my beloved Sita, the charkha and seek to deliver her from the ten-headed monster from Japan, Manchester, Paris etc. The Poet is an inventor- he creates, destroys and recreates. I am an explorer and having discovered a thing I must cling to it. The Poet presents the world with new and attractive things from day to day. I can merely show the hidden possibilities of old and even worn-out things. The world easily finds a honourable place for the magician who produces new and dazzling things. I have to struggle laboriously to find a corner for my worn-out things. Thus, there is no competition between us. But I may say in all humility that we complement each the other's activity.

The Poet does not, he is not expected, he has no need, to read Young India. All he knows about the movement is what he has picked up from table talk. He has therefore denounced what he has imagined to be the excesses of the charkha cult.

He thinks for instance that I want everybody to spin the whole of his or her time to the exclusion of all other activity; that is to say that I want the Poet to forsake his muse, the farmer his plough, the lawyer his brief and the doctor his lancet. So far is this from truth that I have asked no one to abandon his calling, but on the contrary to adorn it by giving everyday only thirty minutes to spinning as sacrifice for the whole nation. I have indeed asked the famishing to spin for a living and the half-starved farmer to spin during his leisure hours to supplement his slender resources. If the poet spun half an hour daily his poetry would gain in richness. For it would then represent the poor man's wants and woes in a more forcible manner than now.

It is not my purpose to traverse all the Poet's arguments in detail.

One thing, and one thing only, has hurt me, the Poet's belief, again picked up from table talk, that I look upon Ram Mohan Roy as a 'pygmy' . Well, I have never anywhere described that great reformer as a pygmy much less regarded him as such. He is to me as much a giant as he is to the Poet. I do not remember any occasion save one when I had to use Ram Mohan Roy's name. That was in connection with Western education. This was on the Cuttacks's sands now four years ago. What I do remember having said was that it was possible to attain highest culture without Western education. And when some one mentioned Ram Mohan Roy, I remember

having said that he was a pygmy compared to the unknown authors say of the Upanishads. This is altogether different form looking upon Ram Mohan Roy as a pygmy. I do not think meanly of Tennyson if I say that he was a pygmy before Milton or Shakespeare. I claim that I enhance the greatness of both. If I adore the Poet as he knows, I do inspite of differences between us. I am not likely to disparage the greatness of the man who made the great reform movement of Bengal Possible and of which the Poet is one of the finest of fruits.

M.K. Gandhi

AV : Date card 1929-1933

Narrator : moves

Tagore was away from India a good deal of time in 1929 and 1930 - for almost fourteen months in those two years lecturing in Japan, Indo-China, Canada, USA, USSR and about five West European countries. No letters were exchanged with Gandhi in this period. However, on 18 January 1930 Tagore visited Gandhi at Sabarmati, while on tour to collect funds for his school in Santiniketan. Later that year when Tagore was in England he was pressed by journalists to comment on Gandhi's politics in the context of the Round Table Conference; most notable was Tagore's statement, supportive of Gandhi, in November 1930 . Gandhi contributed a message to the felicitaion volume for Tagore in July 1931.

On 20th September 1932 at 3 a.m., minutes before his arrest, Gandhi wrote very touchingly to Tagore about the impending resumption of the Civil Disobedience Movement.

Gandhi :

Dear Gurudev,

This is early morning 3 O'clock of Tuesday. I enter the fiery gate at noon. If you can bless the effort, I want it. You have been to me a true friend because you have been a candid friend often speaking your thoughts aloud. I had looked forward to a firm opinion from you , one way or the other. But you have refused to criticise. Though it can now only be during my fast, I will yet prize your criticism, if your heart condemns my action. I am not too proud to make an open confession of my blunder, whatever the cost of the confession, if I find myself in error. If your heart approves of the action I want your blessing. It will sustain me. I hope I have made myself clear.

My love,
M. K.Gandhi

Narrator : before Gandhi could despatch this letter he received a cable.

Tagore: 19.9. 1932

To: Mahatma Gandhi Yeravada Jail Poona.

It is worth sacrificing precious life for the sake of India's unity and her social integrity stop though we cannot anticipate what effect it may have upon our rulers , who may not understand its immense importance for our people, we feel certain that the supreme appeal of such self offering to the conscience of our own countrymen will not be in vain stop.

Rabindrantah Tagore

Gandhi :

20.9.32, 10.36 a.m.

Just as I was handing this is to the Superintendent, I got your loving and magnificent wire. It will sustain me in the midst of the storm I am about to enter. I am sending you a wire. Thank you.

M.K.Gandhi

Narrator:

Ten days latter Gandhi broke his fast. Tagore immediately shot a letter to Gandhi expressing his relief at the abandonment of the fast.

Tagore: 30th September, 1932
Santiniketan,Calcutta

Mahatmaji,

Our people are wonderstruck at the impossible being made possible in these few days and there is a universal feeling of immense relief at your being saved for us. Now is the opportune moment when a definite command from you will rouse the Hindu community to make a desperate effort to win over the Mahomedans to our common cause. (Leghts: Tagore moves to back to his chair.) It is more difficult of success than your fight against untouchability, for there is a deep-rooted antipathy against the Muslims in most of our people and they also have not much love for ourselves. But you know how to move the hearts of those that are obdurate, and only, I am sure , have the patient love that can conquer the hatred that has accumulated for ages. I do not know how to calculate political consequences, but I believe that nothing can be too costly which would enable us to win their confidence and convince them that we understand their diffuculties and their own point

of view. However, it is not for me to advise you and I shall fully rely upon your own judgement as to the course that should be taken . Only one suggestion I must venture to make to you might ask the Hindu Mahasabha to make a conciliatory gesture towards the other party.

I have no doubt that you are gaining strength and inspiring every moment strength and hope around you.

With reverent love,

I am ever yours,
Rabindranath Tagore

Gandhi : 9 October, 1932

Dear Gurudev,

I have your beautiful letter. I am daily seeking light. This unity between Hindus and Muslims is also life's mission. The restrictions too hamper me. But I know that when I have the light it will pierce through the restrictions, meanwhile I pray, though I do not yet fast.

I hope you are none the worse for the strenuous work in Poona and equally fatiguing long journey.

Mahadev translated for us your beautiful sermon to the villagers on 20th.

You must have seen the statement I have circulated to the Press. I want your blessings if I can have them for this further effort. I do not know whether you feel that this effort is, if possible, purer than before. The last fast had a political tinge about it and superficial critics were able to say that it was aimed at the British Government. This time if the ordeal has to come, it will not be possible to give any political colour to it. You will of course recall that the last fast was broken on the clearest possible notice that I might have to resume if there was any breach of faith by the so called caste Hindus. The prospective fast about Guruvayyur Temple is absolutely a point of honour. It is being made by the orthodox section of the centre of attack and is being given all India significance. I rather like it. But it makes it all the more necessary for the liberalising influences to be collected together and set in motion in order to overthrow the monster of untouchability. I want your whole hearted cooperation if you feel as I do .

I hope you are keeping well

With deep love, Yours
M.K. Gandhi.

Tagore :

15 November 1932
Visva- Bharati
Santiketan, Bengal

Dear Mahatmaji,

What I fear is that following so close upon the tremendous impact made on our consciousness by the recent fast, a repetition of it may psychologically be too much for us properly to evaluate and effectively to utilise for the uplift of humanity. The mighty liberating forces set in motion by our fast still continue to operate and spread from village to village, removing age-long iniquities, transforming the harshness of callously superstitious to a new feeling of sympathy for the distressed. Were I convinced that the movement has suffered any abatement or in any way shows signs of lacunae, I would welcome even the highest sacrifice of your life in penance for our sins. Should we take too seriously the activities of some isolated groups of individuals and subject millions of our countrymen to the extremist form of sufferings while they themselves are unquestionably on the saide of truth? The influence which is at work may have a check if anything happens to you. Should we risk that possibility now that we have won? These are the thoughts, which naturally rise in my mind, and I was thinking of putting them before Mahadev when your letter arrived.

With reverent love,

Yours,
Rabindranath Tagore

Narrator : Gandhiji's letter in response to Tagore's last letter was censored. We do not know what Gandhi wrote except.....

Gandhi :

Your precious letter comforts me. It is enough for me that you are watching and praying.

With deep love,

Tagore:

Dear Mahatmaji,

It is needless to say that I do not at all relish the idea of divinity being enclosed in a brick and mortar temple for the special purpose of exploitation by a particular group of people. I strongly believe that it is possible for the simple hearted people to realise the presence of God in the open air, in a surrounding free from all artifical obstruction . We know a sect in Bengal,

illiterate and not dominated by Brahmimcal tradition, who enjoy a perfect freedom of worship profoundly universal in character. Sings gram chada - It was the prohibition for them to enter temples that has helped them in their purity of realization.

As to the Santiniketan prayer hall it is open to all peoples of every faith. Just as its doors do not shut out anybody so there is nothing in the simple form of worship, which excludes peoples of different religions. I do not think separate buildings are really necessary for prayer and communion with the Divine.

I have sent a poem for the 'Harijan' - translating it from one of my recent Bengali writings. I do hope it is one in spirit with the ideal of the Harijan , which I read with much pleasure and interest. There can be no more hopeful sign for India than the fact that her repressed humanity is waking up as a result of the great fast.

With loving regards,

Yours sincerely,

Gandhi:

Yeravada Central Prison,
Poona, 2nd May,1933

Dear Gurudev,

It is just now 1.45 a.m. and I think of you and some other friends. if your heart endorses contemplated fast, I want your blessings again.

My love and respects,

Yours,
M.K. Gandhi

Tagore:

Glen Eden,
Darjeeling,
9 May 1933

Dear Mahatmaji,

Evidentally the telegram which I sent you some days ago has failed to reach its destination though it has appeared in some of the papers.

You must not blame me if I can not feel a complete agreement with you at the immense responsibility you/ incur by the step you have taken.

However I must confess that I have not the vision which you have before your mind, nor can I fully realize the call which has come only to yourself, and therefore whatever may happen I shall try to believe that you

are right in your resolve and that my misgivings may be the outcome of a tirmdity of ignorance.

With love and reverence,

A.V Date Card. 1934-41

Narrator,

Notes on Documents

Documents in this period centre around four major issues. First, the controversial statement of Gandhi linking the earthquake of Bihar in 1934 with the sin of castism. In the middle of this controversy Tagore issued a statement defending Gandhi against his detractors.

The second issue was the posture of the Congress establishment, led by prominent Gandhians, towards Subhas Chandra Bose who was forced to resign presidentship of the Congress. Tagore was unwilling to intervene too much into such matters but he was deeply worried about the fate of the congress. Gandhi wrote to Andrews on 15 January 1940 to assuage Tagore's anxieties and to assure Tagore that Subhas was " as my son'' but he behaved "liked a spoilt child".

The third issue pertained about the financial stability and the future of the Visva Bharati University and the issue of the university 's trusteeship that Tagore offered Gandhi.

Gandhi :

21 January 1934

Dear Gurudev,

The news about the Govt. measures in Midnapur has dazed me . They appear to be worse than the Martial Law measures in the Punjab in 1919. I get here only the Hindu. Are you doing anything? Is Bengal doing anything ? Our cowardice chokes me. Or do I see cowardice where mere is none? Can you give me any solace? I hope you are keeping well. With deep love.

Ever Yours,

M. K. Gandhi

Tagore :

Dear Mahatmaji,

I have received your letter in which you mention the government measures in Midnapore. Midnapore is by no means an isolated case, it

seems the accepted policy of the government is to terrify the people into submission. Detailed news about the latest manifestations of government lawlessness are just reaching us, but I have experience enough not feel surprised. As for protest against these, I am afraid old people like me are of very little practical value. The government as well as my countrymen know my views and there is no sense in my issuing a fresh statement. But I hope I shall be able to discuss the matter in an article I shall set myself to write soon and thus make my protest in a manner which best suits my temperament and capacity.

The press reports that you in a recent speech referring to the recent earthquake in Bihar spoke as follows, I want you, to be superstitious enough(sic) to believe with me that the earthquake in divine chastisement for the great sin we have committed against those whom we describe as 'Harijans.' I find it difficult to believe it. But if this be your real view on the matter, I do not think it should go unchallenged. Herewith you will find a rejoinder from me. If you are correctly reported in the press, would you kindly send it to the press? I have not sent it myself for publication, for I would be the last person to criticise you on unreal acts.

Looking forward to meeting you here.

With deep love,

Gandhi :

Coonoor,
2nd February 1934

To : Gurudev, Santiniketan,

Your letter has given considered opinions stop posting Harijan advanced copy stop since you it deem necessary, it can be published at your end or mine as you desire stop.

M. K. Gandhi

Narrator :

Tagore's protest against Gandhi remark of "divine chastisement" of Bihar did eventually get published in the February issue of 1934.

Tagore writes,

It has caused me painful surprise to find Mahatma Gandhi accusing those who blindly follow their own social custom of untouchability of having brought down God's vengeance upon certain parts of Bihar, evidently specially selected for His desolating displeasure. It is all the more unscientific because this kind of unscientific view of things is too readily accepted by a

large section of our countrymen. I keenly feel the iniquity of it when I am compelled to utter a truism in asserting that physical catastrophies have their inevitable and exclusive origin in certain combination of physical facts. unless we believe in the inexorableness of the universal law in the working of which God himself never interferes , we find it impossinle to justify his ways on occasions like the one which has sorely to justify his ways on occasions like the one which has sorely stricken us in an overwhelming manner and scale.

Tagore :

What is truly tragic about it is the fact that the kind of argument, that Mahatmaji uses by exploiting an event of cosmic disturbance far better suits the psychology of his opponents than his own, and it would not have surprised me at all if they had taken this opportunity of holding him and his followers responsible for the visitation of Divine anger. As for us, we feel perfectly secure in the faith that our own sins and errors, however enormous, have not enough force to drag down the structure of creation to ruins, We can depend upon it, sinners and saints, bigots and breakers of convention. We, who are immensely grateful to Mahatmaji for inducing , by his wonder working inspiration, freedom from fear and feebleness in the minds of his countrymen, feel profoundly hurt when any words from his mouth may emphasise the elements of unreason in those very minds- unreason, which is a fundamental source of all the blind powers that drive us against freedom and self-respect.

Gandhi moves towards the centre

Gandhi :

The Bard of Santiniketan is Gurudev for me as he is for the inmates of that great institution. But Gurudev and I early discovered certain differences, and it cannot suffer by Gurudev's latest utterance on my linking the Bihar calamity with the sin of untouchability. He had a perfect right to utter his protest when he beleived that I was in error. My profound regard for him would make me listen to him more readily than to any other critic. But in spite of my having read the statement three times, I adhere to what I have written in these columns.

When at Tinnevelly I first linked the event with untouchability, I spoke with the greatest deliberation and out of the fullness of my heart, I spoke as I believed. I have long believed that physical phenomena produce results both physical and spiritual. The converse I hold to be equally true.

To me the earthquake was not caprice of God nor a result of a meeting of mere blind forces. We do not know all the laws of God nor

their working. Knowledge of the tallest scientist or the greatest spiritualist is like a particle of dust. If God is not a personal being for me like my earthly father, He is infinitely more. He rules me in the tiniest detail of my life. I believe literally that not a leaf moves but by His will. Every breath I take depends upon His sufferance.

I have not the faith , which Gurudev has that "our own sins and errors, however enormous, have not got enough force to drag down the structure of creation to ruins. " On the contrary I have the faith that our sins have more force to ruin that structure than any mere physical phenomenon.

With me the connection between cosmic phenomena and human behaviour is a living faith that draws me nearer to my God, humbles me and makes me readier for facing him. Such a belief would be a degrading superstition, if out of the depth of my ignorance I used it for castigating my opponents.

M. K. Gandhi

Gandhi goes and sits on Tagore's bed vice versa.

Tagore : 12th September 1935
Sings Santiniketan, (Birbhum)

My dear Mahatmaji,

I am glad Suren had an opportunity to discuss with you in detail the financial situation of the asrama during his recent visit to Wardha. I know how busy you are with your various activities and though I have often thought of telling you of my difficulties. I have never done so before. But Charlie insisted that you must be informed about the situation and then only I gave permission to discuss it with you. Over thirty years I have practically given my all to this mission of my life and so long as I was comparatively young and active I faced all my difficulties unaided and through my struggles the institution grew up in its manifold aspects. And now, however, when I am 75 feel the burden of my responsibility growing too heavy for me, that owing to some deficiency in me that my appeals fail to find adequate response in the heart of my people though the cause that I have done my utmost to serve is certainly valuable. constant begging excursions with absurdly meagre results added to the strain of my daily anxieties and have brought my physical institution nearly to an extreme verge of exhaustion. Now I know of none else but yourself whose words may help my countrymen to realise that it is worth their while to maintain this institution in fullness of its function and to relieve me of perpetual worry at this last period of my waning life and health.

With deepest love,

Gandhi: 13th October 1935
Wardha

Dear Gurudev,

Your touching letter was received only on 11th inst. when I was in the midst of meetings. yes, I have the financial position before me now. You may depend upon my straining every nerve to find the required money. I am groping. I am trying to find the way out. It will take sometime before I can report the result of my search to you.

It unthinkable that you should have to undertake another begging mission at your age. The necessary funds must come to you without your having to stir out of Santiniketan.

I hope you are keeping well, Padmaja who was with you a few days ago, is here for the day and has been telling me how you have aged.

With reverential love,

Yours
M. K. Gandhi

Gandhi : 27th March,1936,
Delhi,

Dear Gurudev,

God has blessed my poor effort. And here is the money. Now you will relieve the public mind by announcing cancellation of the rest of the programme.

May God keep you for many a year to come.

Yours with love,
M. K. Gandhi

Narrator : moves towards Tagore and reads out the letter.

27th March 1936
Delhi

Respected Sir,

Please find the enclosed draft for Rs. 60,000 which we believe is the deficit on the expenses on Shantiniketan to cover for which you have been exhibiting your art from place to place. When we heard this we felt humiliated. We believe that at your advanced age and in your weak state of health you ought not to have to undertake these arduous tours. We must confess that we know very little of the Institution except the name. But we have not been unaware of your great fame as the Poet of the age. You are

not only the greatest Poet of India, you are the Poet of Humanity. Your poems remind one of the hymns of the ancient Rishis. You have by your unrivalled gifts raised the status of our country. And we feel that those whom God has blessed with means should relieve you of the burden of finding the funds required for the conduct of the institution. Our contribution is a humble effort in that direction. For reasons which need not be stated we prefer to remain anonymous. We hope that you will now cancel all the engagement taken for raising the sum above mentioned.

Praying for your long life to continue the service you are rendering to our country.

We remain,
Your Humble Countrymen

Tagore :
Dear Mahatmaji

Your love for me has greatly exceeded my expectation and I assure you that the gift you have bestowed on me is a gift of profound peace and freedom from daily worries that had been sapping my strength. I have struggle almost singlehanded for about forty years for a cause which has failed to find helping hand in a neighbourhood jealously antagonistic and therefore when I am nearing the end of my journey suddenly to be blessed with an unquestioning sympathy lavish in generosity overwhelms my famished heart with joy. I have no other words to say. God bless you.

With love,

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

Narrator moves to his desk.

Gandhi :

Dear Gurudev,

Your messenger has brought your precious note with receipt. I have done nothing. It is God's prompting ; your labours and prayers have borne fruit. May you have complete rest from worry and toil over the financial difficulties.

I am well, thanks.

Love,
M. K. Ganhdi

Tagore :

My dear Mahatmaji,

I have taken the liberty of nominating you as a Life Trustee of our

Visva-Bharati. In these last frail years of my life it will give me great consolation to know that the Institution to which I have given the best part and energy of life will have you as one of its guardians. You will see from the Bulletin of Statutes and Regulations that is being sent under a separate cover that no strain of actual work will be put upon you, save what is entailed in occasional advice and decision in regard to matters that touch the financial secutriy of the Institution. I feel justified in sharing my responsibilities with you for I know that no difference in our sphere of activity can loosen the bond of mutual love and common aspiration. I hope you will allow me that privilege.

Yours affectionately,
Rabindranath Tagore

Gandhi : 19th February 1937
Segaon, Wardha,

Dear Gurudev,

I got your letter five days ago. Your trust in me and affection for me are there to be seen in every line but what about my amazing limitation? My shoulders are too weak to bear the burden you wish to impose upon me. My regard to you pulls me in one direction, my reason in the opposite, and it the would be fully on my part ot surrender reason to emotion in a question like one that faces me. I know that if I undertake the trust I would not need to go into details of administration but it does imply capacity for financing the Institution and what I heard two days ago has deepend my reluctance for, I understand that inspite of your promise to me in Delhi you are about to go to Ahmedabad on a begging expedition. I was grieved and I would ask you on bended knees to forgo the expedition if it really decided upon. And in any case I would beg of you to recall my appointment as one of the Trustees.

With love and reverence,

M. K. Gandhi

Tagore : during speech begins to go back to his seat.

Dear Mahatmaji,

You have grievously misjudged me on mere suspicion which is so unlike your great and gracious ways that it has started me into a painful amazement. I feel ashamed to have to assert that it was never my intentiion financially to exploit you or your name when I asked you to accept the trusteeship of Visva-Bharati. However, if it has been a mistake on my part,

be the reason what it may, I readily withdraw my request and ask to be forgiven.

In our lettter you have strangely accused me of contemplating to break my promise and go to Ahmedabad for the purpose of raising funds. You were not certain of the facts, and had no justification for hinting such a charge against me. Allow me to be frank in return and to tell you that possibly your own temperament prevents you to understand the dignity of the mission which I am glad to call my own, - mission that her sectarian religions, but which comprehends the culture of the human mind in its broadest sense. And when I feel the urge to send abroad some poetical creation of mine, which according to me carries within it a permanent standard of beauty, I expect, not alms or favour, but grateful homage to my art from those who, have the sensitiveness of soul to respond to it. And if I have to receive contribution in the shape of admission fees from the audience. I claim it as very much less than what is due to me in return for the rare benefit conferrerd upon them. Therefore, I must refuse to accept the term "Begging expedition " as an accurate or worthy expression coming from your pen.

It is a part of poet's religion to entertain in his life a solemn faith in his own function, to realise that he is specially called to collaborate with his creator in adding to the joy of existence. Let me confess that I should like nothing better than proudly to sit by the side of the artists trained by me when they try to give perfect expression to my dreams of beauty in their rhythmic movements and voice, and so be able to tell them that they have done well.

Rabindranath Tagore

Gandhiji :

Dear Gurudev,

Your letter has caused me much distress. That a letter which was written out of love and reverence should have been so misunderstood is a revelation. There was no question of suspicion and , therefore, no question of misjudging you. I simply put before you my meaning of trusteeship. I have been trustee before now of several institutions and I have worn myself out to see that they were properly financed. Acceptance of the burden by me of Visvabharati could mean nothing to me financial burden. As to the breach of promise , I thought myself to be so near you that I could dare playfully to accuse you of a contemplated breach of promise. My motive was absolutely plain. I wanted, somehow or other, to wean you from any

further begging expedition- a phrase which you and I used often enough in Delhi . Of course I know your religion and all India is proud of it. Let us have as much of it as you can give but never with the burden hanging over your head of collecting money for Visva-Bharati against the expression of yourself before the public.

I hope this letter will undo the grief that has been caused to you by my previous letter

With love and reverence,

Yours,
M . K. Gandhi

Gandhi, moves back to his mat.

Tagore :

19th Septermber 1937
Santiniketan

Dear Mahatmaji,

The first thing which welcomed me into the world of life after the period of stupor I passed through was your message of affectionate anxiety and it was fully worth the cost of sufferings which were unremitting in their long persistence.

With grateful love,
Rabindranath Tagore

Gandhi:

Dear Gurudev,

Your precious letter is before me. You have anticipated me. I wanted to write as soon as Sir Nilratan sent me his last reassuring wire. But my right hand needs rest. I did not want to dictate. The left hand works slow. This is merely to show you what love some of us bear towards you. I verily believe that the silent prayers from the hearts of your admirers have been heard and you are still with us. You are not a mere singer of the world. Your living word is a guide and an inspiration to thousands. May you be spared for many a long year yet to come.

With deep love,

Yours sincerely,
M. K. Ganhdi

Tagore :

To : Mahatma Gandhi, Wardha.

We are all grateful for the great gift of your life.

Rabindranath Tagore.

Narrator :

The inappropriate ejection of Subhas Chandra Bose's from the Congress presidency deeply disturbed Tagore. He wrote a letter to Gandhi seeking solace. To Mahatma Gandhi, Birla House, New Delhi.

Tagore :

Dear Mahatmaji,

At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence. Please apply without delay balm to the wound with your own kind hands and prevent it from festering.

Just learn from papers your visit to Bengal. Hope you will spend a few days with me at Santiniketan.

Rabindranath Tagore

Gandhi :

To: Gurudev, Santiniketan

Arranging reach Santiniketan fifteenth or sixtineeth staying there least two days. Love.

Gandhi

Video/lights : Gandhi moves to his bed.

Tagore :

Dear Mahatmaji,

You have just had a bird's -eye view this morning of our Visva - Bharati centre of activities. I do not know what estimate you have formed of its merit. You know that though this institution is national in its immediate aspect, it is international in its spirit offering according to the best of its means India's hospitality of culture to the rest of the world.

At one of its critical moments you have saved it from an utter breakdown and helped it to its legs. We are ever thankful to you for this act of friendliness.

And, now, before you take your leave from Santiniketan, I make

my fervent appeal to you, accept this institution under your protection giving it an assurance of permanence if you consider it to be a national asset. Visva -Bharati is like a vessel, which is carrying the cargo of my life's best vessel, which is carrying the cargo of my life's best treasure and I hope it may claim special care from my countrymen for its preservation.

Rabindranath Tagore.

Gandhi :

Dear Gurudev,

The touching note that you put into my hands as we parted has gone straight into my heart. Of course Visva-Bharati is a national institution. It is undoubtedly also international. You may depend upon my doing all I can in the common endeavour to assure its permanence.

I look to you to keep your promise to sleep religiously for about an hour daily during the day.

Though I have always regarded Santiniketan as my second home, this visit has brought me nearer to it than ever before.

With reverence and love

Yours

M. K. Gandhi

Narrator: moves to Tagore's bed

1st October 1940

Delhi,

Gandhi :

Dear Gurudev,

You must stay yet a while. Humanity needs you. I was pleased beyond measure to find that you were better. With love.

Yours,

M. K. Gandhi

Gandhi :

17th July 1941

Postmark : Santiniketan

To : Gurudev Santiniketan

Press reports disturbing wire exact conditions.

Gandhi

Gandhi : 1st August 41

Wardhaganj

To : Rathindranath Tagore, Calcutta

Thank God hope speedy complete recovery

Gandhi

6 Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta

Tagore :

To : Mahatma Gandhi, Wardha

Your constant good wishes have brought me back from the land of darkness into the land of light and life and my first offering of thanks goes out to you.

Rabindranath Tagore

Narrator :

Happy Birthday Gurudev !

Gandhi :

To : Gurudev, Shantiniketan

Four score not enough may you finish five. Love

Gandhi

Tagore :

Thanks message but four score is impertinence, five score intolerable.

AV last video

Gandhi : 7th August 1941

In the death of Rabindranath Tagore, we have not only lost the greatest poet of the age/but an ardent nationalist who was also a humanitarian. There was hardly any public activity on which he has not left the impress of his powerful personality. In Santiniketan and Sriniketan, he has left a legacy to the whole nation, indeed, to the world. May the noble soul rest in peace and may those in charge at Santiniketan prove worthy of the responsibility resting on their shoulders.

Mahatma Gandhi

The writer : M. K. Rina, Delhi, eminent Theatre personality of India.

স্মৃতির অলিন্দ থেকে

নাটক রচনায় ত্রিপুরা রাজ্যের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। ১৮৯৭ সাল থেকে পাশ্চাত্য রীতিতে স্টেজ বেঁধে নাটক শুরু। মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সংস্কৃতিপরায়ণ সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্টপোষকতায় "উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ" এর পরিবেশনায় নাটক "পতিব্রতা"। নাটককার মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মা। এটিই রাজ্যের প্রথম নাটক হিসাবে পরিগণিত এবং মুদ্রিত। পরবর্তি নাট্যানুরাগী মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নাট্যচর্চা অধিকতর সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দেশ স্বাধীন হলে ত্রিপুরা ভারতে যোগ দেবার পর শুরু হয় আরেক অধ্যায়। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুধন্ব দেববর্মা, ত্রিপুরেশ মজুমদার, শক্তি হালদার সহ বহু নাট্য-নিবেদিত প্রাণ নাটক লিখে এবং মঞ্চস্থ করে নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ষাট এর দশক পেরিয়ে এলো সত্তর এর দশক। ত্রিপুরার নাটকে লাগল আধুনিকতার ছোঁয়া। গঠিত হলো অনেক গ্রুপ এবং সৃষ্টি হলো বহু মৌলিক নাটক। নাটক লেখায় যেন জোয়ার এলো। বিশিষ্টদের মধ্যে নাটক লিখে সাড়া জাগালেন অজিত মজুমদার, নিখিল ভট্টাচার্য, কমল রায়চৌধুরী, চন্দন সেনগুপ্ত সহ অনেকে। ত্রিপুরার নাট্যক্ষেত্রে 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'দেবোনা তিতুন', 'সাদা পায়রার জন্য' বা ' অন্য পৃথিবী' সহ বহু নাটক রাজ্য এবং বহিরাজ্যে বিশিষ্ট নাট্যজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চমক সৃষ্টি করলো। জীবনে সমসাময়িকতার আঙিকে এইসব কালজয়ী রচনা ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে গভীরভাবে ঋদ্ধ করলো।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা অতীতে সফল নাট্য রচনা করে সারা দেশে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের একটি করে নাটক ত্রিপুরা থিয়েটার প্রতি সংখ্যায় ছাপা হবে। আমরা বিশ্বাস করি তাদের নাট্যরচনা পাঠ করে বর্তমান প্রজন্ম বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হবে। ২০২০ সাল থেকে শুরু। এবার প্রথম নাটক, চন্দন সেনগুপ্তের "অন্য পৃথিবী" - সম্পাদক)

অন্য পৃথিবী

চন্দন সেনগুপ্ত (প্রয়াত)

চরিত্র লিপি : মনোজিত, আলতাফ, প্রথম গাছ, মৌলভী/দ্বিতীয় গাছ, হিন্দু নেতা/তৃতীয় গাছ, চতুর্থ গাছ, পঞ্চম গাছ, ষষ্ঠ গাছ, সপ্তম গাছ, অষ্টম গাছ, মুসলমান নেতা/ নবম গাছ, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতা/ দশম গাছ

[পর্দা উঠবার আগে থেকেই মিউজিক বাজতে থাকবে। পর্দা সরলে দেখা যাবে একটি অরণ্য। গোধূলির আলোয় মায়াময়। প্রত্যেকটি গাছ একজন অভিনেতা। পরনে সবুজ পোশাক। কোমরে হলুদ বন্ধনী এবং উত্তরীয় । ওরা গাইছে]

<u>অরণ্যের গান</u>

দিন শেষের গান গাই মোরা
আঁধারে ডুবে যাবে বসুন্ধরা।।
দিন শেষের এই বৃষ্টি, অঙ্কুর সৃষ্টির
নতুন বারতা আনে, সাজবে নূতন করে ধরা।।

[সহসা এক ঝাঁক বিমান উড়ে যায়। আশেপাশে বোমা ফেলে। ক্ষুব্ধ বনভূমি গান গায়]

প্রবলের দর্পে, অন্যায় রণে
আমরা মরি হায় অকারণে
বিদীর্ণ পৃথ্বীর লাঞ্ছিত হৃদয়
ক্ষুব্ধ অপমানে কাঁদে।।

১ম গাছ : চুপ, চুপ, চুপ, কে যেন আসছে
সব গাছ : কে?
[আহত আলতাফ প্রবেশ করে। একটা গাছের নীচে আশ্রয় নেয়।]
১ম গাছ : একজন আহত সৈনিক।
সব গাছ : আহত।
২য় গাছ : হায়, রক্তক্ষরণে ও ক্লান্ত।
৩য় গাছ : ও সঙ্গীহীন, একা।
৪র্থ গাছ : ও ভয়ার্ত, —দিশাহারা—
১ম গাছ : চুপ, চুপ, চুপ— কে যেন আসছে
সব গাছ : কে— ?
১ম গাছ : একজন সৈনিক
সব গাছ : সৈনিক,
২য় গাছ : এবারও সঙ্গী পাবে।
১ম গাছ : না।
সব গাছ : কেন?
১ম গাছ : ওরা পরস্পরের শত্রু
সব গাছ : শত্রু—
২য় গাছ : ওর হাতে কি?
১ম গাছ : জানি না।
৩য় গাছ : ওর ভাষা কি?
১ম গাছ : জানি না।
৪র্থ গাছ : ওর ধর্ম কি?
১ম গাছ : জানি না। হায়—
মানুষ চেনা বড় দায়

সব গাছ : মানুষ চেনা বড় দায়,
[আলতাফ কঁকিয়ে ওঠে]
মনোজিত : কে?— কে ওখানে?
[কোন উত্তর আসে না। মনোজিত সন্তর্পণে সরে অন্য একটি গাছের আড়ালে যেতে চেষ্টা করে]
আলতাফ : বন্দুক মাটিতে ফেলো। নড়লেই গুলি করবো।
মনোজিত : কে তুমি?
[কোন উত্তর আসে না। যন্ত্রণায় আলতাফের বন্দুক ধরে রাখতে কষ্ট হয়।]
উত্তর দিচ্ছ না কেন ? কে তুমি?
আলতাফ : তুমি কে?
মনোজিত : ফ্রেণ্ড— দোস্ত।
আলতাফ : পাস ওয়ার্ড?
মনোজিত : ইতস্তত করে ব্ল্যাক রোজ। তোমার?
আলতাফ : বন্দুক মাটিতে ফেলো। হাত তুলে এগিয়ে এসো।
মনোজিত : [স্বগত] শালা—
[কেউ জায়গা ছেড়ে নড়ে না। আলতাফের হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায়। যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকে]
সব গাছ : [বিলাপের মত] হায়, মানুষ চেনা বড় দায়—
[সাবধানে মনোজিত এগিয়ে আসে। প্রচন্ড তৎপরতায় আলতাফের বন্দুকটি তুলে নেয়। পরক্ষণেই আলতাফকে একটানে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। যন্ত্রণায় আলতাফ কঁকিয়ে ওঠে। জল চায়। দ্রুত হাতে মনোজিত আলতাফকে সার্চ করে। একে একে ওর ডাইরী, দেশলাই, কাগজপত্র সব নিয়ে নেয়।]
আলতাফ : পানি।
সব গাছ : হায়!
মনোজিত : শালা-কুত্তা।
আলতাফ : একটু পানি।
মনোজিত : এ্যাই, এই জায়গাটার নাম কি? — এ্যাঁ?
আলতাফ : পানি — একটু পানি।
মনোজিত : ভান করছে। এ্যাই — এই জঙ্গলটা কত বড়? বেরুবার পথ কোথায়?
আলতাফ : পানি—
মনোজিত : এ্যাই,— কোন চালাকিতে কাজ হবে না। কথার উত্তর না দিলে জল পাবে না। বল, জঙ্গল থেকে বেরুবার পথ কোথায়? এ্যাই ? শুনছো। যাব্বাবা— মরে গেল নাকি? না বেঁচে অছে। জ্বর। শালা কাছিমের জান। সহজে মরবে না। কিন্তু আমি বেরুবো কি করে? এ্যাই— শুনছো? এ্যাই—

[ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে আলতাফকে খাওয়ায়]

আলতাফ : আঃ [চোখ খুলে মনোজিতকে দেখে শব্দ করে ওঠে। বন্দুক খোঁজে। না পেয়ে হতাশ হয়ে যায়] আমাকে মেরো না। আল্লার কসম আমাকে মেরো না।

মনোজিত : এ্যাই, কাছাকাছি তোমাদের শিবির আছে— তাই না?

আলতাফ : না—।

মনোজিত : কোন চালাকি করবার চেষ্টা করো না। লাভ হবে না। বল, কতদূরে তোমাদের শিবির? কোনদিকে?

আলতাফ : জানি না।

মনোজিত : এমনি বলবে না হাত চালাতে হবে?

আলতাফ : না—না, আমায় মেরো না, — বিশ্বাস করো আমি জানি না। [হাঁফাতে থাকে]

মনোজিত : [বন্দুকের দিকে হাত বাড়ায়] বলবে কি বলবে না?

আলতাফ : আল্লার কসম, আমি জানি না, কিচ্ছু না।

মনোজিত : এ্যাই চুপ। চিৎকার করলে খুন করে ফেলবো।

আলতাফ : আমি জানি না—।

মনোজিত : এই জায়গাটার নাম কি?

আলতাফ : জানি না।

মনোজিত : এই জঙ্গল থেকে বেরুবার পথ কি?

আলতাফ : জানি না।

মনোদিত : বলবে কি বলবে না?

আলতাফ : আমি জানি না? আল্লার কসম [হাঁফাতে থাকে]

মনোজিত : তুমি এখানে কি করে এলে?

আলতাফ : আমরা দুজন আসছিলাম।

মনোজিত : [চমকে] দুজন? অন্যজন... অন্যজন কোথায়?

আলতাফ : মরে গেছে।

সব গাছ : হায় হায় মরে গ্যাছে।

মনোজিত : কোন চালাকির চেষ্টা করবে না, সত্যি করে বল।

আলতাফ : হ্যাঁ, সত্যি সত্যি ও বেঁচে নেই।

মনোজিত : আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে, তাই না?

আলতাফ : না, না, ও মরে গেছে।

মনোজিত : কি করে মরলো?

আলতাফ : পথে, হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসতে লাগলো... আর ও [হাঁফাতে থাকে]

মনোজিত : কোথা থেকে আসছিল?

আলতাফ : ১৭ নম্বর ক্যাম্প থেকে।

মনোজিত : সেটা কোথায়?

আলতাফ : পিলাক কোট।
মনোজিত : পিলাক কোট ? কোথায় যাচ্ছিলে?
আলতাফ : ১৮ নম্বরে।
মনোজিত : জায়গাটা কোথায়?
আলতাফ : পিলাকের ২২ মাইল পূর্ব দক্ষিণ কোণে। সুক্রি নদীর মোহনার ১০ মাইল বাঁয়ে।
মনোজিত : ও..... ওটা তো আমরা উড়িয়ে দিয়েছি।
আলতাফ : আমরা জানতাম না।
মনোজিত : কেন যাচ্ছিলে?
আলতাফ : একটা ম্যাসেজ।
মনোজিত : ম্যাসেজ কি?
আলতাফ : না... আমি বলব না।
মনোজিত : বলবে কি বলবে না?
সবগাছ : হায়!
আলতাফ : আমাদের সর্ট সার্কিটের ওয়েভ কোড তোমরা ধরে ফেলেছিলে। আমরা মার খাচ্ছিলাম। সার্কিটের নতুন কোড নিয়ে
মনোজিত : কোডটা কি?
আলতাফ : না আমি বলব না। বলতে পারি না।
মনোজিত : [বন্দুক তোলে] এবার বলবে? না কি?
আলতাফ : [হঠাৎ দৃঢ়তা এনে] বেশ, তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরেই ফেলো। আমি বলবো না, — কিছুতেই না।
মনোজিত : শোন, যদি আমার সঙ্গে কোন চালাকি করে থাকো, বিপদে পড়বে। যা বলেছো তা সব সত্যি ত? তোমার আর কোন বন্ধু এখানে নেই? তাই তো?
আলতাফ : না— নেই।
সব গাছ : নেই
মনোজিত : যাকগে, তাহলে তোমাদের পিলুক আর ঐ ১৭ নম্বর ক্যাম্পটা কোথায় যেন?
আলতাফ : পিলাক কোট।
মনোজিত : যাকগে, তাহলে আমরা তোমাদের পিলক আর পিলাককেটের মাঝামাঝি আছি। সুক্রির মোহনা— পাওয়া যেতে পারে, এ্যাই, এই জায়গাটা তুমি চেনো?
আলতাফ : না।
মনোজিত : তোমাদের কাছে কোন ম্যাপ ছিল না?
আলতাফ : ম্যাপটা নরুলের কাছে ছিল—।
মনোজিত : নরুল কে?
আলতাফ : আমার সঙ্গী— সে মরে গেছে [মনোজিত কিছু ভাবতে থাকে]

মনোজিত : এ্যাই শোন, আমি যাচ্ছি। তোমার এই জিনিসগুলো নিলাম। [আলতাফ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে]

মনোজিত : [একটু অস্বস্তি হয়] এগুলি রেখে গেলেই তুমি আমার সাথে চালাকি করতে। নিচ্ছি আমার নিরাপত্তার জন্যই। তুমি হলেও তাই করতে। বুঝেছো? [আলতাফ তাকিয়ে থাকে] তোমার অনেক ভাগ্য তোমাকে মেরে রেখে যাইনি। আমার জায়গায় তুমি হলে এতক্ষণ তুমিও আমাকে মেরে ফেলতে। [আলতাফ তাকিয়ে থাকে, মনোজিতের অস্বস্তি বাড়ে] আমরা তোমাদের মত বেইমান নই বুঝেছো? [আলতাফ কিছু বলে না, শুধু তাকিয়ে থাকে] আচ্ছা থাক্, তোমার বন্দুক আর ছুড়িটা ছাড়া তোমার সব জিনিষই তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট। এই নাও। [এগিয়ে গিয়ে জিনিষগুলো ফেরৎ দিতে যায়। সহসা একঝাঁক বোমারু বিমান আশেপাশে বোমা ফেলতে চলে যায়]

মনোজিত : শুয়ে পড়, ক্যুইক।
[আলতাফ হাতের যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। তা দেখে মনোজিত ওকে শুতে সাহায্য করে। বিমান চলে যায়। অবশেষে ওরা উঠে বসে। পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে মনোজিত উঠে দাঁড়ায়]

মনোজিত : [দ্বিধা নিয়ে] আচ্ছা চলি [আলতাফ তাকিয়ে থাকে। মনোজিত ধীরে ধীরে জিনিষপত্র গুছায়। বন্দুক দুটো হাতে নিয়ে দ্বিধায় আটকে পড়ে]
শোন, এছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো।

আলতাফ : [উত্তর দেয় না। শুধু তাকিয়ে থাকে। মনোজিত সংশয় ছেড়ে বেপরোয়াভাবে পা বাড়ায়] আচ্ছা চলি—

আলতাফ : শোন—

মনোজিত : কিছু বলবে?

আলতাফ : হ্যাঁ—

মনোজিত : কি?

আলতাফ : নরুল—

মনোজিত : সে মরে গ্যাছে।

আলতাফ : হ্যাঁ, ও আমার বন্ধু ছিল। আমরা এক গাঁয়েরই মানুষ ছিলাম। ও খুব ধর্মভীরু ছিল। যুদ্ধের মধ্যেও ও কোরান পাঠ করতো।

মনোজিত : এসব জেনে আমি কি করবো?

আলতাফ : আমিও আমার বন্ধুর পাশে থাকিনি। ছুটছিলাম শুধু নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই জঙ্গলে ছুটছিলাম। ওর পাশে ছিলাম না।

সব গাছ : ছিলাম না....

মনোজিত : আমাকে এসব বলার অর্থ কি? এ্যাঁ?

আলতাফ : আমাকে নিয়ে তোমার ভাববার কিছু নেই। কোনো দ্বিধা, কোন সংশয় করতে হবে না। নরুল মরবার সময় আমি নরুলের কথা ভাবিনি। আমার মরবার সময় আমার কথাও কেউ ভাববে না। এটা আমি জানি। ভাল করেই জানি। তোমার কাছে আমার কোন প্রত্যাশা নেই। [হাঁফাতে থাকে] তুমি অনায়াসে যেতে পার। [মনোজিত বিব্রত হয়। ছটফট করে পায়চারী করে। সহসা বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নেয়]

মনোজিত : শোন, আমি শুধু আজকের রাতটাই তোমার কাছে থাকবো। আশা করি এর মধ্যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে। এর বেশী কিছু তুমি আমার কাছে আশা করবে না।

আলতাফ : আমার আশা করার কিছু নেই, আমি কিছুই আশা করছি না।

মনোজিত : তোমার আশা না করায় আমার কিছু যায় আসে না, ব্যাপারটা আমার জন্যে বিপদজনক, বোকামী... ঠিক আছে, তবু থাকবো... শুধু আজকের রাতটা, — বুঝেছো

আলতাফ : তোমাকে— তোমাকে থাকতে হবে না।

মনোজিত : সেটা আমি বুঝবো। [সব জিনিষ আগের জায়গায় গুছিয়ে রাখে। আলতাফ ক্ষতস্থান দেখতে গিয়ে ব্যাথা পায়] খুব কষ্ট হচ্ছে না?

আলতাফ : হ্যাঁ।

মনোজিত : গুলিটা কি আটকে আছে?

আলতাফ : জানি না।

মনোজিত : দেখি–। [দেখতে দেখতে] না, আটকে নেই। [আশেপাশের গাছগুলিকে লক্ষ্য করতে করতে] ওধারে একটা জলা আছে, ওখানে কিছু লতাপাতা পাওয়া যেতে পারে, এন্টিসেপটিক্ এ্যাই চল— ওখানে যাই। তোমার হাতটা বাঁধা দরকার। [আলতাফ তাকিয়ে থাকে]

মনোজিত : কি হল? চল—
[হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে। খানিকটা ভাবে , দাঁড়ায়। আলতাফের দৃষ্টি আকাশে]

আলতাফ : কি সুন্দর। না?

মনোজিত : সত্যি সুন্দর।— আজ কি পূর্ণিমা?

আলতাফ : জানি না, হতে পারে। মনে হচ্ছে ... মনে হচ্ছে ঐ মস্ত বড় চাঁদটা ধুইয়ে দিচ্ছে— ধুইয়ে দিচ্ছে— ধুইয়ে দিচ্ছে

মনোজিত : [একটু পর] কি নাম তোমার?

আলতাফ : আলতাফ। তোমার?

মনোজিত : মনোজিত, চল।
[ওরা চলতে থাকে, ওদের চলার সাথে সথে গাছেদের গান শুরু হয়]

দ্যাখো সুন্দর জেগেছে,
মঙ্গল হৃদয় দেখেছে—
পাতায় পাতায় খুশীর হাওয়ায়
শিহরণ তুলেছে।
[জলাশয়ের কাছে থামে। মনোজিত আলতাফের হাত বেঁধে দেয়]

মনোজিত : আমার অবস্থাটাও অনেকটা তোমার মত হয়েছিল, [আলতাফ তাকায়] আমরা তোমাদের পিলুকের ক্যাম্পটা দখল করে তোমাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছিলাম। আমাদের দূর পাল্লার কামানগুলি পেছন থেকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছোঁড়া হচ্ছিল। আচম্‌কা আমাদের ডানদিক থেকে বৃষ্টির মত অনবরত গুলি আসতে লাগলো। কেন জানি না, আমাদের দূরপাল্লার কামানগুলি হঠাৎ থেমে গেলো। এবার সামনের দিক থেকেই গুলি আসতে লাগলো। বুঝতে পারলাম আমরা এখন শত্রুর ফাঁদে ইঁদুরের মত খাঁচায় আটকা পড়েছি। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। মাটি আঁকড়ে পড়েছিলাম।

আলতাফ : তারপর?

মনোজিত : কতক্ষণ জানি না। একসময় গুলি থেমে গেলো। কোন শব্দ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলার আওয়াজ নেই, ভাবা যায়?

আলতাফ : তারপর?

মনোজিত : শুধু মাথার উপর একটা মড়া চাঁদ প্রেতের মত তাঁকিয়ে আছে। বন্ধুদের ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। হয় আমি অনেক এগিয়ে গেছি, নয়তো পিছিয়ে পড়েছি। বাদিকে একটা জঙ্গল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। তারপর— তারপর একটু নিরাপদ জায়গা— আশ্রয় নেবার মত একটা জায়গা খুঁজতে — হা ঈশ্বর— আমি পথ হারালাম।

সমস্ত গাছ: পথ হারালাম—

আলতাফ : পথ হারালে?

মনোজিত : হ্যাঁ, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না। যেদিকে তাকাই সবই একই রকম— একই রকম গাছ— একই জঙ্গল।। ঘুরছি আর ঘুরছি। হঠাৎ মনে হলো, এ একটা গোলক ধাঁধাঁ, মনে হলো আমি একই জায়গায় ঘুরছি।

আলতাফ : আর আমার? আমার অবস্থা? জঙ্গলে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার জামা রক্তে ভিজে একাকার, বাঁ হাত নাড়তে পারছি না। — প্রচণ্ড ব্যথা। মনে হলো আমি মরে যাচ্ছি, আমি আর বাঁচবো না। একটা যন্ত্রণা আমার বুকের ভেতরটাকে তোলপাড় করে দিছিল। আমি কাঁদছিলাম। সারি সারি শুধু ছায়া ছায়া গাছ, কোথায় আমার আম্মা? বাপজান, ভাইজান? চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মত বলছিলাম, আম্মা বাঁচাও, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও— আমি বাঁচতে চাই।

সমস্ত গাছ : বাঁচতে চাই—

মনোজিত : তারপর?

আলতাফ : বৃষ্টি। ঝির ঝির করে বৃষ্টি। আম্মার চোখের জলের মতো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আমার রক্ত একটু একটু করে ধুয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মধ্যে আমি আমার আম্মার গান— আমার ছোটবেলার গান আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। মাটি আমাকে আঁকড়ে ধরলো। মাটিতে মায়ের গন্ধ।
একটা দোলনা— একটা দোলনা— আমি দুলছিলাম। কেউ দোলাচ্ছিল। আমার মা— বৃষ্টির গান— দোলনা— মায়ের গন্ধ আর ঘুম— দুচোখে গভীর ঘুম নেমে এলো।

মনোজিত : তারপর?

আলতাফ : কতক্ষণ জানি না তুমি এলে।

সমস্ত গাছ : তুমি এলে—

মনোজিত : যাকগে, এখন জঙ্গল থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে হবে। আচ্ছা এ জঙ্গলটা কত বড়?

আলতাফ : আমি জানি না।

মনোজিত : এটা কি তোমাদের এলাকা?

আলতাফ : হতে পারে— আমি জানি না। আমি এ অঞ্চলের লোক নই।

মনোজিত : এলাকাটা কাদের? আমাদের না তোমাদের?

আলতাফ : জানি না।

সমস্ত গাছ : জানি না।

মনোজিত : যাক্‌গে— মনে হচ্ছে এলাকাটা পরিত্যক্ত। No mens land , এ্যাই শোন, তুমি একটু হাঁটতে পারবে?

আলতাফ : পারবো । কেন?

মনোজিত : চল বেরুবার একটা পথ খুঁজি। বেশ জ্যোৎস্না। কোন অসুবিধা হবে না।

আলতাফ : চল। [মনোজিত জিনিষ গুছাতে থাকে]

মনোজিত : মনে হয় তোমার একটা দেশলাইয়ের বাক্স দেখেছিলাম।

আলতাফ : হ্যাঁ, ছিল।

মনোজিত : সিগারেট ছিল না, আগেই দেখেছি।

আলতাফ : নেই, তাহলে হারিয়ে গেছে। তাহলে দেশলাই থেকেই বা লাভ কি?

মনোজিত : আগুন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এখন আমাদের প্রচণ্ড দরকার, বুঝেছ।

আলতাফ : আমার একটা ছুরি ছিল। আছে?

মনোজিত : আছে। এই টাকাগুলি থেকে কোন লাভ হল না। এখানে অচল।

সমস্ত গাছ : এখানে অচল—

আলতাফ : এই টাকাগুলো আমাকে দাও না। তোমার আমার সবগুলো টাকা দাও—

সবগুলো।

মনোজিত : [দিতে দিতে] কি করবে?

আলতাফ : দ্যাখোই না। [টাকাগুলি মিলিয়ে ছোট ছোট বল করে জলে ছুঁড়তে থাক]

মনোজিত : এ্যাই, কি করছো?

আলতাফ : খেলছি। কি হবে এই টাকা থেকে জঙ্গলে? তার থেকে ফেলাই ভালো। তুমিও এসো,— খেলবো সত্যিকারের টাকার খেলা।
[এরা ছোঁড়াছুড়ির খেলা খেলতে থাকে]

মনোজিত : তুমি অনেক পিছনে—

আলতাফ : দেখা যাক। না— হলো না—

মনোজিত : হেরে ভূত।

আলতাফ : আমার একটা হাত অকেজো, তাই। [সহসা এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যায়। ওরা শুয়ে পরে। কিন্তু কোন বোমা বিস্ফোরণ হয় না।]

আলতাফ : কাদের বিমান?

ম্যনাজিত : জানি না। যাদের বিমানই হোক না কেন, ওদের ফেলা বোমাতে মরব দুজনই। সব যুদ্ধ বিমানই এখন আমাদের শত্রু।

সমস্ত গাছ : শত্রু—

আলতাফ : আমার কলমটা একটু দাওতো।

মনোজিত : কি করবে? [কলম দেয়]

আলতাফ : এই টাকা দুটোয় তোমার নাম লিখে দাও।

মনোজিত : কেন?

আলতাফ : বলছি— তুমি লেখ। [মনোজিত লিখে দেয়] এবার এর তলায় আমার নাম লিখব।

মনোজিত : উদ্ভট খেয়াল।

আলতাফ : [একটা টাকা মনোজিতকে দেয়] এই টাকাটা তোমার পকেটে রাখ।

মনোজিত : একটা টাকা থাকবে তোমার পকেটে। অন্যটা থাকবে আমার পকেটে। একদিন হয়তো কোন বোমা আমাদের উপর পড়বে। হয়তো গুলি খেয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে আমাদের এই জঙ্গলে। যদি কেউ কোনদিন আমাদের মৃতদেহ অথবা কঙ্কাল খুঁজে পায়, তাহলে আমাদের পকেটে খুঁজে পাবে এই দুটি টাকা। ওরা দেখবে, তাতে লেখা আছে 'আলতাফ মনোজিত' 'মনোজিত আলতাফ' দু'দেশের দু'জনের নাম। আর কিছু না।

মনোজিত : আলতাফ!

আলতাফ : কেউ জানবে না, কে আলতাফ, কে মনোজিত। শুধু জানবে এই মৃতদেহগুলি আলতাফ আর মনোজিতের। দু'জন মানুষের ..... আমরা দু'জন একজন হয়ে যাবো। শুধু একটি পরিচয় 'মনোজিত আলতাফ' 'আলতাফ মনোজিত' ।

মনোজিত : আলতাফ!

আলতাফ : প্রতিজ্ঞা কর মনোজিত, আমরা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হব না। কোনদিন না।

মনোজিত : বিচ্ছিন্ন হবো না— হবো না— কোনদিন না।

আলতাফ : চল। [ওরা চলতে থাকে। গাছেরা গান গায়।
প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে দাও—
করুণা ধারায় বদ্ধ প্রাণের
আবর্জনা পুড়িয়ে দাও।।
এসো মঙ্গল, এসো সুন্দর,
রুদ্ধ প্রাণের আগল ভেঙ্গে
প্রাণের প্রাণে দীপ জ্বালাও।

আলতাফ : একটু থাম।

মনোজিত : খুব কষ্ট হচ্ছে?

আলতাফ : এ—ক—টু।

মনোজিত : আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

আলতাফ : আমারও।

মনোজিত : [চারদিকে দেখতে দেখতে] সকাল না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। জঙ্গলটা যে কত বড় কে জানে।

আলতাফ : জঙ্গলের রাতটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। কি সব অদ্ভূত শব্দ। কোথায় যেন একটা গোপন রহস্য রয়েছে। খুব জীবন্ত। তাই না?

মনোজিত : হতে পারে। আমি ওসব বুঝি না।

আলতাফ : আচ্ছা তোমার দেশের কথা মনে পরছে না। দেশ?

সমস্ত গাছ : দেশ....

আলতাফ : তোমার বাড়ীর গল্প বল না। সবার কথা বল।

মনোজিত : বলার মতো কিছুই নেই। খুবই সাধারণ। তার চেয়ে তুমি বল।

আলতাফ : পরে বলব, আগে তুমি বল।

মনোজিত : বাড়ী অমৃতসরের ছোট একটি গ্রামে। বাবা—

আলতাফ : অমৃতসর? [উত্তেজিত ভাবে] তোমার বাড়ী অমৃতসরে?

মনোজিত : হ্যাঁ। তুমি ওরকম করছ কেন?

আলতাফ : আমাদেরও বাড়ী ছিল অমৃতসরের কন্দেলাবাদে। আমাদের আদি বাড়ী, বাবা, দাদুর জন্মস্থান।

মনোজিত : আমাদেরও আদি বাড়ী লাহোরের চৌবরা গ্রামে। আমাদের পিতৃপুরুষের বাড়ী। আমাদের দেশের বাড়ী।

সমস্তগাছ : দেশের বাড়ী।

আলতাফ : তুমি কখনও চৌবরা গিয়েছ? দেশ দেখেছ?

মনোজিত : না। তুমি?

আলতাফ : না।

মনোজিত : আমরা কেউ আমাদের দেশ দেখিনি।

আলতাফ : একদিন সব কিছু অন্যরকম ছিল। পুরো দেশটাই ছিল তোমার আমার। আমাদের প্রত্যেকের। আর আজ?

মনোজিত : আজ সব পাল্টে গেছে। তুমি তোমার দেশ দেখনি, আমি আমার দেশ দেখিনি। আমরা শুধু উদ্বাস্তু।

আলতাফ : হ্যাঁ... উদ্বাস্তু... ছিন্নমূল উদ্বাস্তু।

সমস্ত গাছ : অথচ একদিন এই দেশের স্বাধীনতার জন্যে দাদু, বাবা লড়েছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গার স্বপ্ন দেখেছে।

আলতাফ : ভাব মনোজিত, ভাবো, একদিন সমস্ত দেশটা যখন স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে পাগল, তখন তোমার দাদু, আমার দাদু মিটিং মিছিলে সবার সঙ্গে বলছে, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো। [প্রচণ্ড শ্লোগান উঠে। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" 'ইংরাজ ভারত ছাড়ো" "বন্দেমাতরম্"। সঙ্গে সঙ্গে কোরাস গান শোনা যায়, 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থা হামারা।' আস্তে আস্তে আওয়াজ কমে যায়। মঞ্চের অপর প্রান্তে আলো পরে। একজন মুসলমান ভাষণ দিচ্ছে]

জনৈক মুসলমান : ভাইসব, লালা লাজপত রায়ের উপর প্রহার করে ইংরাজ সমস্ত জাতিকে প্রহার করেছে। আজ জাতি অপমানিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ, জৈন, খ্রীষ্টান আজ সমস্ত জাতির পৌরুষের উপর ইংরাজ মস্ত আঘাত হেনেছে। আমরা কি এতই অসহায় আর ঘৃণার পাত্র যে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে আমরা অপারগ? এই অপমানের উত্তর কি? এর একমাত্র যোগ্য উত্তর, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আমাদের পরিচয় আমরা ভারতীয়। আমাদের পবিত্র স্বপ্ন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের একমাত্র পবিত্র শপথ,স্বাধীনতার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালানো। আমাদের একমাত্র পবিত্র ত্যাগ স্বাধীনতার জন্যে লালা লাজপত রায়ের মতো জীবন উৎসর্গ করা। আমাদের একমাত্র পবিত্র শ্লোগান 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ইংরাজ ভারত ছাড়ো', বল ভাই, বন্দেমাতরম্। [শ্লোগান ভেদ করে সঙ্গীত শোনা যায়। গান কমতে থাকে]।

জনৈক পাঞ্জাবী : বন্ধুগণ, আজ দেশ তাঁর প্রিয় সন্তান ভগত সিংকে হারিয়েছে। ফাঁসীর দড়িতে আজ ইংরাজ তাকে খুন করেছে। কিন্তু এই পবিত্র ভূমিতে শুধুমাত্র একজন ভগত সিং জন্মগ্রহণ করেনি। লাখো ভগত সিংহের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। যতদিন ভারতবর্ষে একজন ভগত সিংহ বেঁচে থাকবে, ততদিন স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আজ শপথের দিন। ভগত সিং- এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার দিন। বন্ধুগণ, আসুন আমরা কান পেতে শুনি ভগতসিংহের

শেষবাণী। 'বিপ্লবের পথে পা বাড়াবার সময় আমি ভেবেছিলাম যদি জীবন দিয়ে দেশের চতুর্দিকে 'ইনকিলাব' ধ্বনি পৌছে দিতে পারি তাহলে মনে করবো আমার জীবনের মূল্য পেয়ে গিয়েছি। আজ ফাঁসীর এই কুঠুরীর মধ্যে গারদের পিছনে বসেও আমি কোটি কোটি দেশবাসীর কণ্ঠে এই ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি এই ধ্বনি স্বাধীনতা সংগ্রামের চালক শক্তিরূপে সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ শক্তির উপর শেষ আঘাত করতে থাকবে। " অতি শীঘ্র শেষ সংগ্রামের দুন্দুভি বাজাবে। আসুন আমরা প্রস্তুত হই। মুক্তকণ্ঠে বলি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হউক' [প্রচণ্ড শ্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হউক'। সঙ্গে সঙ্গীত শোনা যায়। ক্রমশ আওয়াজ কমতে থাকে। আলো পড়ে আলতাফ মনোজিতের উপর]

আলতাফ : মনোজিত,—

মনোজিত : কি

আলতাফ : কি ভাবছো?

মনোজিত : ভাবছি... ভাবছি আমাদের ইতিহাস এক ... সংগ্রামের ইতিহাস এক...

সমস্ত গাছ : এক

আলতাফ : হ্যাঁ— এক, আমরা এক ছিলাম, এখন নই

মনোজিত : থাক এ সমস্ত কথা—

আলতাফ : যদি সব আগের মত থাকতো... তাহলে যুদ্ধ হতো না... আমরা পরস্পরের শত্রু হতাম না। এমনি করে জঙ্গলের মধ্যে—

মনোজিত : আলতাফ, এ সমস্ত কথা শুনতে আমার একদম ভাল লাগছে না, তুমি চুপ করো।

আলতাফ : (গ্রাহ্য না করে) আমি আমার দেশকে দেখতে পেতাম, দাদুর জন্মস্থান... বাবজানের জন্মস্থানে আমিও জন্মাতাম, বড় হয়ে উঠতে পারতাম।

মনোজিত : আঃ আলতাফ, চুপ করবে?

আলতাফ : ভাবো মনোজিত, — কি অদ্ভূত, তোমার জন্মস্থান হতো লাহোর আর আমার অমৃতসর— তুমি আমি এক দেশের আর আজ— আজ সব উল্টে গেছে, কি আশ্চর্য্য না?

মনোজিত : আলতাফ, তোমাকে আমি চুপ করতে বলেছি, তুমি চুপ করো।

আলতাফ : চুপ করবো?— কেন?

মনোজিত : কেন আবার, — তোমরাই তো এই অবস্থার জন্যে দায়ী।

আলতাফ : মনোজিত! কি বলতে চাও তুমি?

মনোজিত : যা বলার স্পষ্ট করেই বলছি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে — স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে যে মানুষটা পাগল ছিল সেই দাদুই মরেছে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আর, আর আমার বাপ ? আমার বাবাকে কসাই এর মত খুন করেছো

তোমরা, — হ্যাঁ তোমরা।

আলতাফ : মনোজিত— !

মনোজিত : অথচ— অথচ আমার দাদু তো বিশ্বাস করতে চাননি। যে দেশ নিয়ে তার এত স্বপ্ন ছিল, সেই দেশ ছেড়ে আসতে হবে, একথা তিনি কখনো ভাবতেও পারেন নি এত দিনকার চেনা প্রতিবেশীরা হঠাৎ কেন জহ্লাদ হয়ে গেল। জোর করে এদেশে যখন তাকে নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, বুঝেছ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সারা পথ গাইতে গাইতে আসছিলেন। 'জাগো নব ভারতের জনতা এক জাতি এক প্রাণ একতা।' আমার দাদু মরবার সময় তার দেশের মাটির স্পর্শ পায়নি। তোমরা, হ্যাঁ তোমরাই দায়ী।

আলতাফ : বাঃ বাঃ মনোজিত বাঃ। কতটুকু জানো আমাদের কথা? দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের কোন ভূমিকা নেই? কোন স্বপ্ন ছিল না। আমার দাদু সারা জীবন লড়েছেন, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। আমার চাচা আজাদ হিন্দ ফৌজে লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন। বুঝেছো জান দিয়েছেন। কতটুকু জান আমাদের কথা? আর তোমরা? তোমাদের দৃষ্টিতে আমরা ছিলাম ম্লেচ্ছো — ক্রীতদাস— কোন মূল্যই ছিল না আমাদের। যারা দেশ বিভাগ মানতে চায়নি, যারা তাদের আজন্ম চেনা মাতৃভূমিকে আঁকড়ে ধরে দেশবিভাগকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলো, তারা- তারা কতজন তোমাদের দয়া পেয়েছে মনোজিত? তোমরা কসাই। কসাই এর মতো প্রত্যেককে খুন করেছো। আমরা নই— তোমরা, হ্যাঁ শুধু তোমরাই দায়ী।

মনোজিত : [চিৎকার করে] আলতাফ—

[ভীষণ ঝগড়া বেঁধে যায়। ওদের কণ্ঠ ছাপিয়ে শ্লোগান উঠে 'আল্লাহো আকবর' 'বন্দেমাতরম্।' আলো এসে পরে মঞ্চের একপ্রান্তে মৌলভীর উপর]

মৌলভী : ভাইসব, মনে রাখবে তোমরা আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছো। বিশ্বাসঘাতককে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। তার জন্যে আছে কঠোর শাস্তি। এই দেশ আমাদের। খাঁটি মুসলমানরাই এর অধিকারী। হিন্দু বিধর্মী, কাফের। ওরা মুসলমানদের ঘৃণা করে । পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে চায়। ওরা আমাদের পরিশ্রমের ধনে ফায়দা লোটে। ওঁরা লুঠেরা। যতদিন মুসলমানদের গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততদিন মুসলমানদের এই পবিত্র ভূমিতে একটি হিন্দুরও স্থান নেই। এ আল্লাহর নির্দেশ। বিস্‌মিল্লাহ।

[সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শ্লোগান ওঠে 'আল্লাহো আকবর ' আলো কমতে কমতে এসে পড়ে হিন্দুর উপর। গেরুয়া পোষাক, কালো টুপি।]

হিন্দু : ভাইসব, গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। হাজার হাজার হিন্দু জবাই হচ্ছে। নদীতে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য হিন্দুর লাশ। কত অসহায় মা বোনের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে তার শেষ নেই। শিশুদের হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাওয়ান হচ্ছে। মন্দিরের

পবিত্র স্থানকে বানানো হচ্ছে গো-হত্যার কসাইখানা। ভাইসব আমরা অনেক সয়েছি। আর নয়। যতদিন একটি হিন্দুরও শিরায় রক্ত বইবে ততদিন হিন্দুরা এই অপমানের বদলা নেবে, আজ আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে 'রক্তের বদলে রক্ত - প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ'। বলোভাই, বন্দেমাতরম্। (সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ ওঠে, 'বন্দে মাতরম্' 'আল্লাহো আকবর'। আলো এসে পড়ে আলতাফ মনোদিতের উপর)

আলতাফ : এই যদি তোমার ধারণা , তবে তো হাতের কাছে আমিই আছি, প্রতিশোধ নাও। — ঐ তো আমার বন্দুক, গুলি করে মার আমাকে। কি মার? যখন এই জঙ্গলে মরে যাচ্ছিলাম যখন আমাকে মেরে ফেলাই ছিল তোমার নিরাপত্তার একমাত্র উপায়—তখন তুমি আমাকে মারোনি। বাঁচিয়ে রেখেছিলে, শুধু মুসলমান জেনেই নয়— শত্রু জেনেও মারতে পারনি। কেন তুমি আমাকে মারতে পারোনি মনোজিত? কেন?

মনোজিত : জানি না, আমি বলতে পারবো না। শুধু জানি আমরা অসহায়। আমাদের কোন দাম নেই। আমাদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কিছু ঘটে না। দাদু, বাবার স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, কি পেল? আর আমরা? আমরা পেয়েছি শুধু একটা নাম 'উদ্বাস্তু' যখন বাবার কথা মনে হয়, দাদুর কথা মনে হয় তখন, হঠাৎ মনে হয় কেন এমন হোল? কে দায়ী?

সমস্ত গাছ : কে দায়ী?

আলতাফ : মনোজিত!

মনোজিত : থাক আলতাফ। এ সমস্ত কথা থাক। এখন শুধু জঙ্গল থেকে বেরুবার কথা ভাবতে হবে। যে করেই হোক নিজেদের বাঁচাতে হবে। তুমি পারবে হাঁটতে।

আলতাফ : পারবো। (ওরা চলতে থাকে, গাছেরা কান গায় ভোর হতে থাকে)

সূর্য আলো দাও
করুণা ধারায় বদ্ধ প্রাণের
আবর্জনা যত ধুইয়ে দাও।

মনোজিত : আলতাফ— ওটা কি? ধোঁয়া, ধোঁয়া নয়তো?

আলতাফ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধোঁয়া। তার মানে—

মনোজিত : আলতাফ—
তারমানে এই জঙ্গলে আমরা দুজন নই। অন্য কেউ আছে। কিন্তু কে?

সমস্ত গাছ : কে?

আলতাফ : একজন? না অনেকে?

মনোজিত : ধোঁয়াটা এক জায়গা থেকে উঠছে।

আলতাফ : বোমার আঘাতে কোন গাছে আগুন জ্বলে উঠেনি তো?

মনোজিত : না— না। তাহলে ছড়িয়ে পড়তো।

আলতাফ : কত দূরে মনে হচ্ছে ঐ ধোঁয়াটা? এক মাইল?
মনোজিত : না না। দু'মাইল হবে।
আলতাফ : গড়ে দূরত্বটা দাঁড়ালো দেড় মাইল। এখন আমরা কি করবো?
মনোজিত : প্রথমেই জানতে হবে সত্যিই কেউ আছে কি না।
আলতাফ : মনে করা যাক, আছে। তারপর?
মনোজিত : তারপর জানতে হবে,কে? শত্রু না মিত্র?
আলতাফ : কার শত্রু? তোমার না আমার?
মনোজিত : মানে?
আলতাফ : আমার শত্রু তোমার বন্ধু, তাই না?
আর তোমার শত্রু আমার বন্ধু, তাই তো?
মনোজিত : (অসহয়ভাবে) তাহলে?
সমস্ত গাছ : তাহলে?
মনোজিত : আচ্ছা, তুমি বলেছিলে তোমরা দু'জন আসছিলে, তাই না?
আলতাফ : (অবাক হয়ে) হ্যাঁ—
মনোজিত : সত্যি তুমি জানতো , ও মরে গ্যাছে?
আলতাফ : গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। ওর চিৎকার আমি শুনেছি। ও—ও নিশ্চয়ই এখন আর বেঁচে নেই।
মনোজিত : তাহলে ঐ ধোঁয়া? আচ্ছা আলতাফ, তোমাদের সামনে যে ট্রুপ কভার করেছিল, ওরা তোমাদের কত সামনে ছিল ?
আলতাফ : কোন ট্রুপ আমাদের কভার করছিল না।
মনোজিত : তাহলে পিছন পিছন আসছিল , তাই না?
আলতাফ : না। অন্তত আমি তা জানি না।
মনোজিত : জানি না (রেগে যায়) তাহলে তুমি কি জান?
আলতাফ : মনে হচ্ছে কোন নতুন সমস্যায় পড়েছো?
মনোজিত : হ্যাঁ—সমস্যা। নিশ্চয়ই সমস্যা— জানতে হবে কে ওখানে আছে । ও কার শত্রু?
সমস্ত গাছ : কার শত্রু?
আলতাফ : আমরা দুজন থাকতেই এই সমস্যা, তাই না?
মনোজিত : নয়তো কি? ওখানে যে বা যারাই থাকুক ওদের টার্গেট আর এখন শত্রু মিত্র যাচাই করবে না।
আলতাফ : তাহলে আমরা কি করবো মনোজিত? আমরা দুজনে একসাথে আছি বলেই ওরা শত্রু চিনতে ভুল করবে। ওরা ভুল টার্গেট করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত, মনোজিত? বল কি করবো?
মনোজিত : জানি না। আমি কিছু জানি না। কে যে আমাদের শত্রু, কে যে আমাদের মিত্র,

আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এতদিনকার ধ্যান ধারণা সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত অবস্থা আমাদের। আমরা যেন, আমরা যেন অন্য মানুষ। এখন আর আমাদের উপর কোন দেশের আবরণ নেই... জাতির কোন আবরণ নেই—ধর্মের কোন আবরণ নেই। এখন আমরা শুধু মানুষ— শুধুই মানুষ।

সমস্ত গাছ : শুধু মানুষ—

আলতাফ : মনোজিত?

মনোজিত : আলতাফ, সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আমরা — আমরা এক স্বতন্ত্র পৃথিবীতে বাস করছি। এখানকার চলার নিয়ম আলাদা।

আলতাফ : যদি—যদি আমাদের পরিচিত পৃথিবীটা এরকম হ'তো?

মনোজিত : তাহলে—তাহলে সব পাল্টে যেতো। আলতাফ— ঐ দ্যাখ।

আলতাফ : শকুন—অনেকগুলো—

মনোজিত : জঙ্গলে— ভোরের আকাশে প্রথম শকুন উড়ছে। শকুন।

আলতাফ : তার মানে ওখানে — ওখানে— ওখানে কোন মৃতদেহ?

মনোজিত : কোন মৃত পশুরও হতে পারে।

আলতাফ : ধোঁয়াটা— ধোঁয়াটা খুব কাছেই উড়ছে— একটা পোড়া গাছ।

মনোজিত : চল ওখানে যাই।

আলতাফ : আমি পারবো না। আমি ওখানে যেতে পারবো না।

মনোজিত : আঃ কি হচ্ছে আলতাফ। সামান্য একটু শুধু যেতে হবে।

আলতাফ : না, আমি পারবো না মনোজিত— আমার ভয় করছে। ভয়—

সমস্তগাছ : ভয়—

মনোজিত : ভয়! কেন?

আলতাফ : জানি না। আমার নুরুলের কথা মনে পড়ছে।

মনোজিত : নুরুল, হঠাৎ করে নুরুলের কথা মনে হলো কেন?

আলতাফ : জানি না। ধোঁয়া দেখার পর থেকেই ওর কথা মনে পড়ছে। ওকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু —কিন্তু মরতে দেখিনি।

মনোজিত : বেশ তো — চল গিয়েই দেখে আসা যাক।

আলতাফ : কিন্তু—কিন্তু ঐ শকুন — না মনোজিত—না, আমি পারবো না।

মনোজিত : বেশ তুমি এখানে একটু বস। আমি দেখে আসছি।

আলতাফ : মনোজিত—মনোজিত, যদি নুরুল ওখানে ওভাবে মরে গিয়ে থাকে— আমি — আমি নিজেকে ক্ষমা করবো না মনোজিত — কিছুতেই না।

মনোজিত : ওসব পরে হবে, আমি দেখেই আসি।
(মনোজিত চলে যায়, আলতাফ ছটফট করতে থাকে। off voice।। এ পুরুষ কণ্ঠ শোনা যায়। নুরুল।)

Off Voice : আমাকে এত ভয় কেন আলতাফ, আমি তো মৃত।

আলতাফ : নুরুল, আমি—আমি—

Off Voice : যখন মাটিতে আমি লুটিয়ে পরেছিলাম, ছটফট করছিলাম। তখন তুমি কোথায় ছিলে আলতাফ? কোথায়?

আলতাফ : না— নুরুল—না।

Off Voice : আমি তো তোমার বন্ধু, এক গাঁয়ের ছেলেবেলাকার বন্ধু। তাই না?

আলতাফ : আঃ

(মনোজিতের প্রবেশ)

মনোজিত : আলতাফ , ওখানে — কি হয়েছে আলতাফ?

আলতাফ : না— কিছু না, বল কি দেখলে?

মনোজিত : একটি মৃতদেহ, — বোধহয় কোন সৈনিকের।

আলতাফ : সৈনিক?— তোমাদের না আমাদের? মানে কোন দেশের?

সমস্ত গাছ : কোন দেশের?

মনোজিত : জানি না। কিছু বোঝা গেল না। বুনো জন্তু বিশেষ কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। বেচারা নিজের জামা খুলে আগুন জ্বেলে বিপদ সংকেত জানাতে চেয়েছিল। ঐ আগুন একুট একটু করে ওর শরীরকে স্পর্শ করেছে। এখন পরনের অবশিষ্ট পোষাক সহ ওর শরীরটা জ্বলছে। আমি কিছু শুকনো ডাল ছড়িয়ে দিয়েছি ওর শরীরে। অন্তত বুনো জন্তু আর শকুন ওকে আর স্পর্শ করতে পারবে না।

আলতাফ : ও...ও— কে?

মনোজিত : জানি না, আশ্চর্য, ওর বন্দুকটা কোথাও খুঁজে পেলাম না।

আলতাফ : কেন—?

মনোজিত : হয়তো ও আহত ছিল, হয়তো ছুটে পালাবার সময় বন্দুকটা বইতে পারছিল না— কোথাও পড়ে গেছে।

আলতাফ : ও নুরুল— হ্যাঁ নুরুল, কোনও সন্দেহ নেই— এ আমি কি করলাম মনোজিত? এখন আমি নিজেকে কি করে ক্ষমা করবো?

মনোজিত : কি হবে এই আলোচনা করে? হয়তো নুরুল, হয়তো না। তবে যে মরেছে সে আমাদের মতই একজন —একজন মানুষ।

সমস্ত গাছ : মানুষ—

মনোজিত : যখন আকাশে ধোঁয়া উড়তে দেখলাম, তখন ওখানে কেউ আছে জেনে ভয় পেয়ে গেলাম। ও কার শত্রু, কার মিত্র— এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলাম। — অবিশ্বাস আর সন্দেহ আমাদের কুঁড়ে কুঁড়ে খেলো— আর ঠিক তখন? তখন ও আহত শরীর নিয়ে অনেক কষ্টে একটু — একটু করে শরীর থেকে জামা খুলে আগুন ধরিয়ে বিপদ সংকেত দেখাচ্ছিলো। ওর শেষ আশা ছিল, কেউ ওর ঐ ধোঁয়া দেখবে, ছুটে আসবে— ওকে বাঁচাবে—

আলতাফ : আমরা তখন থর থর করে কাঁপছিলাম— ভয়ে— জানের ভয়ে। আর ও... আমরা কাপুরুষ— মনোজিত— কাপুরুষ—

সমস্ত গাছ : কাপুরুষ—

আলতাফ : মনোজিত, চলো— আর একটুও দেরী নয় আমরা পালাই— পালাই এই জঙ্গল থেকে। এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো মনোজিত।

মনোজিত : হ্যাঁ— চলো।

(ওরা চলতে থাকে। গাছেদের গান)

ওরা আপনি ভাঙে
আপনি রচে
যায় না বোঝা, ছন্দ ছাড়া।
মিথ্যে ওদের কাঁদা হাসা,
যায় না বোঝা ছন্নছাড়া।

মনোজিত : জঙ্গলটা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে।

আলতাফ : হ্যাঁ (উত্তেজিতভাবে) মনোজিত, ঐ দ্যাখো।

মনোজিত : কা-টা-গা-ছ ? তার মানে— তার মানে এখানে কাঠুরিয়া আসে— তার মানে— আলতাফ জঙ্গল শেষ হয়ে আসছে। ঐ দ্যাখো পায়ে চলা পথ। আর ঐ—ঐ দ্যাখো—

আলতাফ : কাঁটা তারের বেড়া?

মনোজিত : হ্যাঁ, কাঁটা তারের বেড়া— দুই দেশের সীমান্ত বেড়া—

সমস্ত গাছ : সীমান্ত বেড়া—

আলতাফ : কোন দেশটা কাদের?

সমস্ত গাছ : কাদের?

মনোজিত : ফ্রন্ট লাইনের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মনে হচ্ছে

আলতাফ : সারারাত যুদ্ধ বিমানের আনাগোনা হয়েছে। প্রায় মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছে।

মনোজিত : আমরা নিরাপদ নই, যে কোনো মুহূর্তে ধরা পরবো।

আলতাফ : এখন আমরা কি করবো?

সমস্ত গাছ : কি করবো—

মনোজিত : আমরা তোমাদের সীমানার ভিতর ঢুকে গিয়েছিলাম

আলতাফ : বেশ পিছিয়েও এসেছি।

মনোজিত : পিছিয়ে নয়,— বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম।

আলতাফ : তোমার বাঁ দিক- আসলে এটা সীমান্তের পশ্চিম দিক। খুব কাছেই তোমাদের এলাকা।

মনোজিত : না, না, তোমার ভুল হচ্ছে।

আলতাফ : বেশ ধরেই নিলাম— তোমার কথা সত্য। কিন্তু কি লাভ? ওখানে আমরা কেউই নিরাপদ নই। যদি আমাদের দেশ হয়ে থাকে তাহলে ওরা তোমাকে রেহাই দেবে না। আর আমিও সন্দেহের উর্দ্ধে থাকবনা।

মনোজিত : তাহলে তুমি কি করতে বলছো?

আলতাফ : জানি না... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তোমার দেশ সব একাকার হয়ে গেছে... জানি না কোনটা এখন আমার তোমার দু'জনের দেশ।

[সহসা এক ঝাঁক বিমান বোমা ফেলতে ফেলতে চেলে যায়। ওরা শুয়ে পড়ে]

আলতাফ : মনোজিত... বলতে পারো কাদের বিমান বোমা ফেলে গেলো? বলতে পারো ঐ বিমান চিনে আমাদের কি লাভ? বলতে পারো কোথায় আমাদের নিরাপদ আশ্রয়।

মনোজিত : জানি না, কিছু বুঝতে পারছি না। একটা স্বতন্ত্র পৃথিবীর মাত্র একটি রাত আমাদের অন্যরকম করে দিয়েছে, আমাদের পৃথিবী এখন আমাদের কাছে অচেনা। আমরা এখন অন্য পৃথিবীর বাসিন্দা ... অন্য মানুষ।

সমস্ত গাছ : অন্য মানুষ...

আলতাফ : মনোজিত!

মনোজিত : আলতাফ... তোমার ... তোমার ইচ্ছে করছে না, ছুটে গিয়ে ঐ কাঁটাতারের বেড়াটা ভেঙে টুকরো করে দিতে?

আলতাফ : মনোজিত—,

(গাছেদের গান)

প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে দাও,
করুণা ধারায় বদ্ধ প্রাণের ।।
আবর্জনা পুড়িয়ে দাও।।
এসো মঙ্গল, এসো সুন্দর,
রুদ্ধ প্রাণের আগল ভেঙে
প্রাণে প্রাণে দীপ দ্বালাও।।

(ধীরে ধীরে সারিবদ্ধ গাছ গোল হয়ে ওদের কক্ষে ফেলে। আলো ধীরে ধীরে অফ হয়)

লেখক : চন্দন সেনগুপ্ত - (প্রয়াত) ত্রিপুরার প্রবাদপ্রতিম নাটককার।

ওথেলো (OTHELLO)

রচনা - উইলিয়াম শেক্সপীয়র

অনুবাদ - কমল রায়চৌধুরী

চরিত্রলিপি

ওথেলো - নিগ্রো, রোমের সেনাপতি
ইয়াগো - সেনা অফিসার
রোডারিগো - জমিদার নন্দন ডেসডিমোনার পাণিপ্রার্থী
ব্রাবানশিও - বয়স্ক সেনেটর। ডেসডিমোনার পিতা
ডিউক - ভেনিস নগরীর শাসনকর্তা
ক্যাশিও - সেনা অফিসার
লোডোফিগো - ভেনিসের দূত
মন্টিয়াগো - সাইপ্রাসের শাসক
(সেনেটরগণ, সাইপ্রাসের নাগরিক ও সৈনিকগণ)
স্ত্রী - ডেসডিমোনা, ব্রাবানশিওর কন্যা,
এমিলি - ইয়াগোর স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ ভেনিস । পথ।

[রোডারিগো এবং ইয়াগো কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে]

রোডা : তুমি জানতে না? এ হতেই পারে না! তোমার পেছনে এত টাকা ঢাললুম অথচ—
ইয়া : ঈশ্বরের দোহাই। বিশ্বাস করো রোডারিগো, আমার কথা যদি মিথ্যা হয়—
রোডা : তুমি বলছো, তুমি তাকে ঘৃণা কর—
ইয়া : যদি না করি, আমাকে যা খুশী বল তুমি। হুঁ, এ শহরের তিন তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাকে লেফটেন্যান্ট বানাবার জন্যে তাকে বলেছিলেন। জানো তুমি, তাঁদের কথা সে রাখেনি! বার বার সে যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে লম্বা চওড়া ব্যক্তিমে ঝেড়ে মান্যব্যক্তিদের অনুরোধ এড়িয়ে যায়। বার বারই তার এক কথা, 'আমি সহকারী নির্বাচন করে ফেলেছি। এখন আর পাল্টানো যাবে না।'

রোডা, সহকারী নির্বাচন করে ফেলেছে, কিন্তু কাকে? এক গণিতের পণ্ডিত, ক্যাশিও। যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কেবল বইপড়া বিদ্যে— এমন ব্যক্তিকেই তার পছন্দ হল! রোডস-এ সাইপ্রাসে কি লড়াইটা লড়েছিলাম— তার নিজের চোখেই দেখা। যে ছিল যুদ্ধের সময়ে ঘরের ভেতরে বসে, নিশ্চিন্ত আরামে; সেই ক্যাশিওকেই বানিয়ে দেওয়া হল লেফট্যান্যান্ট। আর আমি? হায় ঈশ্বর! এই নিগ্রোবেটার ধ্বজাধারী, তার দেহরক্ষী।
রোডা : আমি হলে তার গলা টিপে ধরতুম—

ইয়া : আহা, ওতো কোন কাজ হয় নাকি! সেনা বিভাগের দস্তুরই এই— আমড়াগাছি করতে পারবে যে, তাকেই উপরওয়ালার পছন্দ! অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই। এখন তুমি ভেবে দেখো, ঐ নিগ্রোর বাচ্চাকে আমি কি ভালোবাসতে পারি?

রোডা : আমি হলে কিন্তু ওর গোলামী করতুম না। অথচ তুমি—

ইয়া : আঃ, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিষয়টাকে ভাবো। বশ্যতা স্বীকার করে তার অধীনে কাজ করছি তো সময়মতো বদলাটা নেবো বলে। ঐ বেজন্মা নিগ্রোটার জায়গায় যদি আমি থাকতুম তাহ'লে আমার জায়গায়, আমার মতো ইয়াগো কেউ থাকতো না। তার গোলামী আমি করছি না, আমি করছি আমারই গোলামী।

রোডা : ঐ ঠোঁটমোটাটার ভাগ্যেই দেখা যায় শিঁকে ছিঁড়ল। বুড়ো ভাম, নিজের সুন্দরী মেয়েটাকে তুলে দিলো ঐ কালো মনিবের হাতে!

ইয়া : না - না - এ কি করে হয়! বুড়ো নিশ্চয়ই মেয়েকে ঐ বেজন্মার হাতে তুলে দেয়নি। তুমি এক্ষুনি বুড়োকে গিয়ে সব বল।

রোডা : এত রাতে?

ইয়া : আরে ভায়া। ঐ শালা তো এখনই মজা লুটছে। এখনই যদি সুন্দরীর বাপকে ডেকে তুলে লোকজন জুটিয়ে তার বাড়ীতে একটা হামলা না করাতে পারো, তাহ'লে চিড়িয়া ফস্কে যাবে জন্মের মতন। আর কিছু না পার - হট্টগোল বাধিয়ে নিগ্রো দানবটার ফুর্তি মাটি করে দাও। এই তো, এইতো এসে গেছো তোমার স্বপ্নের রানী ডেসডিমোনার বাড়ী, ডাক, ডাক, তার বাপকে ডাক—

রোডা : ডাকবো?

ইয়া : ডাকবে মানে? গলা ফাটিয়ে ডাকবে। যেন ডাকাত পড়েছে, যেন আগুন লেগেছে— (এমন মনে করতে বাধ্য হয় সবাই)

রোডা : আরে, ও মশাই ব্রাবানশিও! মিস্টার ব্রাবানশিও!

ইয়া : আবার ডাকো। আরো জোরে—

রোডা : এই যে শুনতে পাচ্ছেন, ও মশাই—

ইয়া : হ্যালো, মিস্টার ব্রাবানশিও! আপনার বাড়ীতে চুরি হয়ে গেছে, তবু সাড়াশব্দ নেই? নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন?

রোডা : [চিৎকার] চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত পড়েছে—

ব্রাবা : [নেপথ্যে] কি হলো মশাই রাত-দুপুরে চেঁচামেচি কেন?

রোডা : আরে, আপনার পরিবারের সবাই আছেন কি ঘরে?

ইয়া : দেখুন তো দরজা, জানালা আটকানো আছে কিনা ঠিকমত? [ব্রাবানশিও-র প্রবেশ]

ব্রাবা : তাতো আছেই। কেন এসব জিজ্ঞাসা করছেন?

ইয়া : আপনার ঘরে চুরি হয়েছে। বড় রকমের চুরি।

ব্রাবা : কি বলছেন যা তা?

রোডা : আপনি মান্য ব্যক্তি। আপনার কাছে কি যা তা বলা চলে? আপনি আমাকে চেনেন নিশ্চয়ই?

ব্রাবা : নাঃ। কে তুমি?

রোডা : আজ্ঞে আমার নাম রোডারিগো।

ব্রাবা : ও, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি আগে। তা বারবার আসো কেন? তোমাকে না বলে দিয়েছি তুমি আমার মেয়ের যোগ্য পাত্র নও? রাত-দুপুরে মদ গিলে এখানে মাতলামো করতে এসেছো? শয়তান, বদমাস, মাতাল!

রোডা : আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে—

ব্রাবা : আর কোনদিন এলে ঠ্যাং ভেঙে দেবো।

রোডা : আপনার পায়ে পড়ছি, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। আপনার বাড়ীতে চুরি হয়েছে।

ব্রাবা : কি বললে? চুরি? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাওনি? এটা ভেনিস্ শহর, মনে রেখো। আর আমার বাড়ীটাও গ্রামের খামার বাড়ী নয়

রোডা : আপনি আমার পিতৃতুল্য। তাই দায়িত্ব পালন করতেই আপনাকে জানাতে এসেছি।

ইয়া : আসল কথাটা হচ্ছে, আপনি ধরে নিয়েছেন আমরা খুব খারাপ লোক, তাই আপনাকে বিশ্বাস করানো যাচ্ছেনা যে, আপনার সাদা ভেড়াটা এখন এক কালো ভেড়ার গা চেটে দিচ্ছে; আপনার আদরের পরমাসুন্দরী কন্যাটি এখন ঘোড়ার আস্তাবলে—

ব্রাবা : ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো। ইতর। কে তুমি?

ইয়া : আজ্ঞে, আপনার কন্যা এখন নিগ্রো বিধর্মীটার ঘরে।

ব্রাবা : তুমি পাকা শয়তান, হাড়বজ্জাত। আমার মেয়ের নামে বদনাম ছড়াচ্ছ!

ইয়া : মোটেই না। আপনি একজন সেনেটর। আপনার মেয়ের নামে বদনাম দেবার সাহস হবে আমার?

ব্রাবা : ইয়ে, আমার মেয়ে কী করছে বললে?

রোডা : আজ্ঞে। ও এখন এক নিগ্রো ক্রীতদাসের জীবন সঙ্গীনি। এ খবর যদি আপনার জ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে তাহ'লে অবশ্য বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি এ ঘটনা আপনার অজ্ঞাতেই ঘটে থাকে তাহ'লে বলব আমাদের গালাগাল করাটা মোটেই উচিৎ হয়নি; কেননা, এই রাত-দুপুরে আপনার বাড়ীর দুয়ারে আমরা এসেছি শুধু একটা কর্তব্যবোধ থেকেই—
— আপনি নিজেই না হয় গিয়ে দেখুন, আপনার কন্যা তার শোবার ঘরে ঘুমিয়ে আছে কিনা। যদি তা হয়, যা ইচ্ছে শাস্তি দেবেন আমাদের—

ব্রাবা : ঠিক আছে। দেখছি। ওরে কে কোথায় আছিস্! আলো আন। আলো আন্।

[প্রস্থান]

ইয়া : শোন। আমি যাচ্ছি। এখন আর আমার থাকাটা উচিৎ হবে না। ঐ বুড়োকে নিয়ে

সোজা চলে এসো ওথেলোর প্রাসাদে। সেখানেই আমি থাকবো, ওথেলো আর তোমার ডেসডিমোনা— কপোতকপোতী সেখানেই আছে। সেখানেই আমাকে পাবে। যাই। [ইয়াগো দ্রুত চলে যায়]

[প্রবেশ করে ব্রাবানশিও। সঙ্গে ভৃত্যগণ মশাল নিয়ে]

ব্রাবা : না, এ সত্যি হতে পারে না। ও চলে গেছে। দুঃসময়! কি দুঃসময়! জীবনটা আমার তেতো হয়ে গেছে। আচ্ছা রোডারিগো তুমি তাকে কোথায় দেখেছো।

রোডা : ঐ যে নিগ্রো। ওথেলো—

ব্রাবা : ওঃ! সেই ক্রীতদাসটার সঙ্গে? না, এ হতে পারে না। তুমি ভুল দেখেছো। তুমি আর কাউকে দেখেছো।

রোডা : আহা, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আপনার মেয়ে ডেসডিমোনা সম্পর্কে আমার কখনো ভুল হতে পারে না।

ব্রাবা : হায়, মেয়ের বাপ হওয়াই একটা দুর্ভাগ্য। তোমার কি মনে হয় ওদের বিয়ে হয়ে গেছে?

রোডা : মনে হয় এতক্ষণে হয়ে গেছে?

ব্রাবা : হায় ভগবান! কেমন করে মেয়ে আমার বেড়িয়ে গেল! আমার নিজের রক্ত আমার সঙ্গে বিশ্বসঘাতকতা করল? এই সবাইকে ডেকে তোল্। তাকে খুঁজে আনব। কি বল রোডারিগো, ও বেটা নিশ্চয়ই বশীকরণ জাতীয় কিছু জানে। না হলে আমার মেয়ে কেন ঐ কালো ষণ্ডা মার্কা কিম্ভুত একটা ক্রীতদাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে? কি বল তুমি?

রোডা : হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

ব্রাবা : এই সবাইকে ডাকো। ডেকে তোল। হায়! হায়! রোডারিগো, তোমার সঙ্গে যদি তার বিয়ে দিতুম তাহ'লেই ভাল ছিল। আচ্ছা বলতে পারো, ঠিক কোথায় ওকে পাওয়া যাবে?

রোডা : আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, তাহলেই ওকে পেয়ে যাবেন।

ব্রাবা : প্রতিবেশীদের নিয়ে যাব। লাঠি-বন্দুক নিয়ে যাব। নিগ্রো বেটাকে আজ খতম করব। চল, চল, রোডারিগো, আমার জন্য কত কষ্ট করছ তুমি। একথা আমার মনে থাকবে।

রোডা : আজ্ঞে, আজ্ঞে— চলুন— [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভেনিস। অরেকটি সড়ক।

[ওথেলো, ইয়াহো এবং মশাল হাতে ভৃত্যগণের প্রবেশ]

ইয়া : রোডারিগো হারামজাদাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়েছিল। আপনি তো জানেন স্যার, যুদ্ধে অনেক লোক আমি হত্যা করেছি। এখন আর খুন খারাপি ভাল লাগে

না। তবু এই অস্ত্রখানা হাতে রেখেছি। শুধু ন্যায় রক্ষার জন্যে। দেখুন স্যার, খলবুদ্ধিতে আমি ঠিক পারদর্শী নই। ভেতরে এক রকম বাইরে আরেক রকম, এমনটা আমি পারি না। ইচ্ছে করছিল তার পাঁজরটাকে এফোড় ওফোড় করে দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে দমিয়ে রেখেছি।

ওথে : ভালো হয়েছে, রাগকে সামলে রেখেছো, সেটাই ভালো হয়েছে।

ইয়া : কিন্তু সে আপনার নামে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছিল। স্যার। বিবাহটা সেরে ফেলেছেন তো? ডেসডিমোনার বাবা কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেবে না। প্রবীন সেনেটর, বোঝেন তো, ডিউকের কাছে এর খুব সমাদর। শুনেছি, ডিউকের কাছে নালিশ করবে।

ওথে : করুক, কিছু যায় আসে না। যুদ্ধ জয় করে এসেছি। আমার বীরত্ব, আমার কৃতিত্বই তার সকল নালিশকে ম্লান করে দেবে। রাজশক্তি আমার পেছনে। আর আমার ঘৃণিত অতীত? তাও মুছে গেছে আজকের গৌরবে। তার চেয়ে বড় কথা, আমি ভালোবাসি প্রিয়তমা ডেসডিমোনাকে। তার প্রেমের জন্য, আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি সব কিছু। এই প্রেম আমাকে দিয়েছে সমুদ্রের চেয়েও সীমাহীন মুক্তির আনন্দ। দেখতো আলো হাতে কারা আসছে।

[ক্যাশিও এবং তার সহকর্মীরা মশাল হাতে আসতে থাকে।]

ইয়া : ওই তো আসছে। আমি তো আগেই বলেছিলাম লোক-লস্কর নিয়ে বুড়ো আসছে। পথ দেখিয়ে আনছে ঐ শয়তান রোডারিগো। আপনি বরং স্যার বাড়ীর ভেতরে চলে যান।

ওথে : না। আসুক ওরা। দেখবো, ওরাই নাকি?

ইয়া : ও জেসাস! ওরা নয়—

ওথে : আরে, লেফটেন্যান্ট ক্যাশিও। এসো এসো। শুভরাত্রি। কি খবর?

ক্যাশিও : স্যার, মহামান্য ডিউক আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তিনি এই মুহূর্তে আপনার দর্শন প্রত্যাশা করছেন।

ওথে : এত রাতে?

ক্যাশিও : মনে হয় সাইপ্রাসের কোন বিষয়। মনে হয় খুব জরুরী। সেখান থেকে একের পর এক দূত আসছে। সেনেটররা সকলেই এসে গেছেন দরবারে।

ওথে : ঠিক আছে। একটু বাসায় যেতে হবে। এক্ষুণি আসছি। অপেক্ষা করো। [প্রস্থান]

ক্যাশিও : হ্যালো গার্ড! এখানে এত রাতে তিনি কেন এসেছিলেন?

ইয়া : তিনি আজ ডাঙ্গার জাহাজে চড়েছেন। যদি এ বাণিজ্য লাভজনক হয় তাহলে চিরদিনের জন্যই তাতে লেগে যাবেন।

ক্যাশিও : কি বলছ ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ইয়া : বুঝলেন না? সেনাপতি মশায় আজ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

ক্যাশিও : কার সাথে?

ইয়া : তিনি, তিনি — [ওথেলোর পুন: প্রবেশ] আসুন স্যার, আপনি কি যাবার জন্য প্রস্তুত?

ওথে : হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো।
[ব্রাবানশিও, রোডারিগো এবং কর্মচারীবৃন্দ মশাল ও অস্ত্র হাতে,]

ক্যাশি : ঐ আরেক দল এল আপনাকে খুঁজতে। হয়ত ডিউক পাঠিয়েছেন।

ইয়া : না, না। এসেছে ব্রাবানশিও। স্যার, আপনি সাবধান থাকুন। তরোবারিটা খুলে ধরুন। ওদের মতিগতি ভাল দেখছি না।

ওথে : সাবধান! দূরে দাঁড়াও। সামনে এগিয়ো না।

রোডা : [ব্রাবানশিওকে] স্যার, এই তো সেই নিগ্রো ক্রীতদাস—

ব্রাবা : এই শয়তান! বদমাস! আমার মেয়েকে চুরি করে এনেছিস্ তুই? [ওথেলোকে দুই দিক থেকে আক্রমণ করতে এগোয় তারা]

ইয়া : [রোডারিগোকে] আরে রোডারিগো, তুমি? [বিস্ময়ের ভান]

ওথে : এই অস্ত্র নামাও। মহামান্য সেনেটর, অস্ত্রের চেয়ে আপনার বয়সটাই বেশী কার্যকরী হবে।

ব্রাবা : চোর, বদমাস্! বল আমার মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ? আমার মেয়েকে ভুলিয়ে যাদু মন্ত্রে বশ করে রেখেছিস তুই। তোর মত কুৎসিত একটা নিগ্রোকে ও বিয়ে করবে ভেবেছিস? এই! [নিজের লোকদের] শয়তানটাকে ধরে নিয়ে চল ডিউকের কাছে। [ব্রাবানশিও-র লোকেরা অস্ত্র তুলে এগায়। ওথেলোর লোকেরা প্রতিরোধ করতে থাকে।]

ওথে : থামো! হাত গুটাও। সবাইকে বলছি হাত গুটাও। যদি ইচ্ছা থাকতো, লড়াইটা আমিই শুরু করতাম। মান্যবর সেনেটর! আপনার অভিযোগের জবাব দিতে কোথায় যেতে হবে?

ব্রাবা : জেলখানায়।

ওথে : সেখানে যেতে পারি যদি মহামান্য ডিউক তাতে সম্মতি দেন। কারণ তিনি তো আমাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন। এইতো এরা।

ক্যাশি : হ্যাঁ, মান্যবর সেনেটর। মহামান্য ডিউক দরবারে বসেছেন। হয়ত আপনাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন।

ব্রাবা : মহামান্য ডিউক দরবারে বসেছেন? এত রাতে? তাহ'লে সেখানেই যাবো। আমার অভিযোগও হেলাফেলার নয়। মহামান্য ডিউক স্বয়ং এবং আমার সেনেটর বন্ধুগণ সকলেই একবাক্যে আমার পক্ষে দাঁড়াবেন। নিয়ে এসো ওকে। শয়তানির উপযুক্ত বিচার করতে হবে। ক্রীতদাস, চাষা, ছোটলোক— সব মাথায় চড়ে বসতে চাইছে! [প্রস্থান সকলের]

তৃতীয় দৃশ্য

ভেনিস্। ডিউকের দরবার।

[ডিউক ও সেনেটরগণ উপবিষ্ট । টেবিলে আলো জ্বলছে, ভৃত্যগণ দাঁড়িয়ে]

ডিউক : খবরগুলোতে অতি রঞ্জিত কিছু নেই, তার জন্যই এগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

১ম সেনে : মূল কথা হ'ল যুদ্ধ জাহাজগুলো হ'ল তুর্কীদের ।

২য় সেনে : আর তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হ'ল সাইপ্রাস—

ডিউক : খুবই আশংকার বিষয়। আজ রাতেই রওনা হতে হবে ওথেলোকে, কিন্তু ও আসতে খুব দেরী করছে—

১ম সেনে : ওইতো বীর সেনাপতি ওথেলো।

২য় সেনে : আরে ব্রাবানসিও মশাইও আসছেন ব্যস্ত হয়ে।

ডিউক : মহাবীর ওথেলো। শত্রু অটোম্যানের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে তোমাকে অভিযান করতে হচ্ছে। [ব্রাবানশিওকে] আপনাকে আগে পাইনি ব্রাবানশিও। আসুন। আজ রাতে আপনার মূল্যবান পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

ব্রাবা : তেমনি আমিও। আপনার সুপরামর্শ থেকে। মহামহিম আমাকে ক্ষমা করুন। আমি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে মন দিতে পারছি না। এক ভয়ঙ্কর আঘাত আমার শোককে বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মত উত্তাল করে তুলেছে। আমার দুঃখ আজ পৃথিবীর সকল শোক তাপকে ছাড়িয়ে গেছে।

ডিউক : কী দুঃখ আপনার? বলুন সেনেটর।

ব্রাবা : [শোকে ভেঙে পড়ে] আমার মেয়ে, আমার মেয়ে!

সকলে : মারা গেছে?

ব্রাবা : হ্যাঁ, আমার কাছে সে মৃতা। সে ধর্ষিতা।

ডিউক : কে, কে, সেই দুরাচার? বলুন তার নাম। তাকে উচিৎ শিক্ষা দেব।

ব্রাবা : এই, এই সেই প্রতারক। এই ক্রীতদাস। হয়ত আপনি তাকে রাজকার্যে ডেকে এনেছেন। কিন্তু সে যাদুবলে আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছে।

ডিউক : ওথেলো। অভিযোগ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য ?

ব্রাবা : ওর আর কি বক্তব্য থাকবে? এতো সত্যি কথা।

ওথে : পরম শ্রদ্ধেয় ডিউক এবং মাননীয় সেনেটরগণ। আমি যে এই প্রবীণ ব্যক্তির কন্যাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছি, তা সত্যি। আর এও সত্যি আমি তার পাণিগ্রহণ করেছি। ....আমার ভাষা মার্জিত নয়। বিনয় নম্র বচন আমার মুখে আসে না। এ আমার দুর্ভাগ্য। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছি সুদীর্ঘ সাতটি বছর। ফিরে এসেছি মাত্র নয় মাস আগে। এই দীর্ঘকাল শুধু রক্তপাত আর সংঘর্ষ ছাড়া বিশ্বের কোন খবরই আমি রাখতে পারিনি। তাই আমি খুব কাঠখোট্টা। তবু, আমার বিরুদ্ধে যাদুবিদ্যা ও বশীকরণের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব। আমি বলব, কোন সে ইন্দ্রজাল, যার মায়ায় আমরা পরস্পর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

ব্রাবা : বললেই হবে! এতটুকু মেয়ে, যে চোখ তুলে তাকাতে ভয় পায়, নিজের ভেতরে

লজ্জায় যে কুঁকড়ে থাকে, সে কিনা— বয়স, বংশমর্যাদা, ধর্ম, জাতি সবকিছুর পার্থক্য ভুলে মন দিয়ে বসবে তোমার মত একটা জানোয়ার সদৃশ মানুষকে! মাননীয় ডিউক! এ নিশ্চয়ই কোন তুক্‌তাক্ করেছে!

ডিউক : শুধু এটা বললেই যথেষ্ট হল না সেনেটর। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাই। না হ'লে একে দোষী সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না।

১ম সেনে : আচ্ছা, ওথেলো, তুমি বলত, মেয়েটির ওপর তুমি কি কোনো বশীকরণ মন্ত্র বা তুক্‌তাক্ প্রয়োগ করেছো? না ওকে তুমি প্রেম নিবেদন করে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছো—

ওথেলো : আপনাদের কাছে বিনীত প্রার্থনা করছি, ওকে এখানে আনিয়ে ওর মুখ থেকেই আপনারা প্রকৃত ঘটনা জেনে নিন। ও এখন আছে আমার শিবিরে।

ডিউক : ডেসডিমোনাকে নিয়ে এসো।

ওথেলো : যাও ইয়াগো, ডেসডিমোনাকে নিয়ে এসা। [ইয়াগো এবং ভৃত্যরা চলে যায়] এ অবসরে ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে আমি আপনাদের গোচরে আনব, কেমন করে ওর হৃদয়ে আমি স্থান পাই, আর কেমন করে ও হয়ে ওঠে আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী—

ডিউক : বল ওথেলো, বল তুমি।

ওথেলো : তার পিতা মাননীয় ব্রাবানশিও আমাকে খাতির করতেন, প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতেন। জানতে চাইতেন, আমার জীবনের কাহিনী। যে সব যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আমি বিস্তৃতভাবে বলেছি, ভয়াবহ ঘটনাবলীর কথা। সংকট ও উত্থান পতনের কথা। কেমন করে জীবন সংশয় হওয়া সত্বেও আমি বার বার রক্ষা পাই। কেমন করে নিষ্ঠুর শত্রুদের হাতে আমি বন্দী হই। এবং আমাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় গোলাম হিসাবে। তারপর আবার আমার মুক্তি ও উত্থান। অজানা সব দেশের কথা আমি বলি। ডেসডিমোনা সে কথাগুলো তন্ময় হয়ে শুনত। সংসারের কাজের জন্য তাকে উঠে যেতে হলে, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সে এসে বসত। শুনতে শুনতে সে গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলত আর বলত—'এ বেদনাভরা কাহিনী আর আমি শুনতে পারছি না।' সে আমাকে দেখতে লাগল প্রেমের চোখে, আমাকে পেতে চাইল দয়িত হিসাবে। আমাকে সে ভালবাসল। এই হল আমার যাদুবিদ্যা। ওইতো এসেছে ও, ওই বলবে—
[ডেসডিমোনা, ইয়াগো এবং ভৃত্যদের প্রবেশ]

ডিউক : এসব কাহিনীতো আমার মেয়েকেও জয় করে নিত, ব্রাবানশিও। ব্যাপারটা মেনে নিলেই বোধ হয় ভালো হত।

ব্রাবা : আমার অনুরোধ, আগে আমার মেয়ের কথা শুনুন। বল্ মা, বল্ । এ পৃথিবীতে কাকে তুই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসিস্?

ডেসডিমো : আমার ভালবাসা, বাবা, আমার ভালবাসা, আজ দুই ভাগে বিভক্ত। আপনি জন্মদাতা, আমার পালক, আমার শিক্ষা-দীক্ষা সবই আপনার দান। এ শিক্ষার

জন্যই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কিন্তু আমার ভালোবাসার আরেকটি অংশ আজ নিবেদিত ঐ বীর নিগ্রোর প্রতি। একদিন আমার মাও এমনি করেই ভালোবেসেছিলো আপনাকে— [নীরবতা]

ব্রাবা : তাহলে তো আর কিছুই বলার থাকে না। মহামান্য ডিউক, আমি আর আপনার রাজকার্যে বিঘ্ন ঘটাবো না। এমন মেয়ের জন্ম দেয়ার চাইতে, অন্যের ছেলেকে দত্তক নিলেই ভালো ছিল।

ডিউক : আশীর্বাদ করছি এরা সুখে থাকুক আর লাভ করুক আপনার স্নেহ। যা ঘটে গেছে, ভবিতব্য হিসেবেই মেনে নিন তাকে। সম্পদ যার চুরি হয়, সে যদি প্রাণ খুলে হেসে ওঠে, তা'হলে তস্কর তার কিছুই নিতে পারে না।

ব্রাবা : চমৎকার! মহামান্য ডিউক! তা'হলে সাইপ্রাসে তুর্কীরা আমাদের আক্রমণ করুক, আর আমরা হাসতে থাকি! এই কি বলতে চান আপনি?

ডিউক : ওথেলো। তুর্কীরা প্রবল পরাক্রমে সাইপ্রাসের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সাইপ্রাস সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা প্রচুর। ধারণা প্রশ্নাতীত। তাই তোমার নতুন সৌভাগ্যের কমনীয়তাকে উপেক্ষা করে তোমাকে বরণ করে নিতে হচ্ছে দুর্গম পথের বিপদসঙ্কুল কঠোর অভিযানকে।

ওথেলো : মাননীয় ডিউক, সম্ভ্রান্ত সেনেটরগণ, শত্রুরা হিংস্র আচরণ রচনা করেছে কাঁকড় ও ইস্পাতের যুদ্ধ-শয্যা, এ শয্যা আমার কাছে পালকের চাইতেও কোমল। কঠোরতার মধ্যে আমি অনুভব করি এক দুর্নিবার আকর্ষণ। অটোম্যানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অবশ্যই আমি অভিযান করব। তাই আমার স্ত্রীর জন্য চাই যোগ্য আশ্রয়।

ডিউক : যদি তোমার সম্মতি থাকে, তা'হলে সে তার বাবার স্নেহের আশ্রয়েই থাকুক।

ব্রাবা : না । আমার ওখানে নয়।

ওথেলো : আমারও সম্মতি নেই।

ডেসডিমো : আমিও যাবো না। পিতার চক্ষুশূল হয়ে আমি থাকতে চাই না তার আশ্রয়ে। মহামহোদয় ডিউক, আমার সরল হৃদয়ের একান্ত প্রার্থনা শুনুন।

ডিউক : কি তোমার প্রার্থনা? বল মা?

ডেসডিমো : এই বীর নিগ্রোকে আমি ভালোবেসেছি। সম্পদের চাকচিক্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; কিন্তু হৃদয় আমার আনত হয় ওথেলোর গুণের কাছে। ওর মনের ভেতর রয়েছে মণিমুক্তা, রত্নরাজি। আমি যেতে চাই ওর সাথে। ওর দুঃখের জীবনের সঙ্গিনী হয়ে।

ওথেলো : মহামান্য ডিউক ! ওর উপস্থিতি কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটাবে আমার। যেখানে অসির ঝংকার, সেখানে গৃহস্থালীর টুং টাং শব্দ একেবারে বেমানান। দুর্যোগ ও বিপদ সেখানে অকল্পনীয়। ওখানে ওকে আমি নিতে চাই না।

ডিউক : ও তোমার সঙ্গে যাবে কিনা তা তোমরাই বরং নিভৃতে আলোচনা করে ঠিক

কর। পরিস্থিতি খুবই জরুরী। তোমাকে যেতে হবে আজ রাতেই।

ডেসডিমো : আজ রাতেই!

ডিউক : হ্যাঁ, আজ রাতেই।

ওথেলো : সানন্দে আমি যেতে প্রস্তুত।

ডিউক : সকাল ন টায় আবার আমরা মিলিত হচ্ছি। ওথেলো, তোমার কোন কর্মচারীকে রেখে যাও, যার মাধ্যমে আমরা তোমাকে পরবর্তী বার্তা পাঠাবো।

ওথেলো : তাহলে রেখে যাই ইয়াগোকে । সে খুবই বিশ্বস্ত। ওর ওপরেই আমার স্ত্রীকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। যা কিছু নির্দেশ, ওর মারফৎ পাঠালেই ভালো হবে।

ডিউক : তবে তাই হোক। সবাইকে জানাই শুভরাত্রি। [ব্রাবানশিওকে] মহৎ সেনেটর, গুণ হল সৌন্দর্যের আকর। আপনার জামাতা কালো হতে পারে, কিন্তু সে অনেক সুন্দর, গুণের গৌরবে।

১ম সেনে : বিদায়! বীর নিগ্রো! ডেসডিমোনাকে ভালোবেসো।

ব্রাবা : হ্যাঁ, দেখে রাখো তাকে। অবশ্য তোমার যদি দেখার মত চোখ থাকে। সে তার পিতাকে প্রতারণা করেছে। তোমাকেও করতে পারে।

[ডিউক এবং পারিষদবর্গের প্রস্থান]

ওথেলো : বন্ধু ইয়াগো! আমার ডেসডিমোনাকে রেখে যাবো তোমার কাছে। তোমার স্ত্রীর সাহচর্যে। সুযোগ পেলেই ওদের নিয়ে তুমি চলে এসো সাইপ্রাসে। এসো ডেসডিমোনা। আর মাত্র একটি ঘন্টা হাতে আছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। সময়ের শাসন তো মানতেই হয়।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

রোডা : ইয়াগো!

ইয়াগো : কি বলছেন, জাঁহাপনা?

রোডা : এখন আমি কী করব?

ইয়াগো : কি আর করবে, ঘুমোতে যাও।

রোডা : আমি ডুবে মরব।

ইয়াগো : কি করবে?

রোডা : ডুবে মরব।

ইয়াগো : কেন?

রোডা : বেঁচে থাকাটাই বোকামি।

ইয়াগো : হ্যাঁ, বোকাদের বেঁচে থাকাটাই বোকামি। যাও ডুবে মরগে। তবে মরার আগে দেখে নিও চেহারাটা মানুষের না বাঁদরের!

রোডা : তাহলে কী করা উচিৎ আমার? তুমিই তো আমাকে ও মেয়ের প্রেমে এত মজিয়েছ। এখন সে চলে গেল পরের ঘরে।

ইয়াগো : শোনো ভাই। প্রেম-টেম কিছু নয়। স্রেফ্ লালসা। দৈহিক লালসা মেটানো ছাড়া আর কি? এ্যাঁ? ওঠো চাঙ্গা হও! আশা ছেড়ে দিও না। আমি আছি। আমার ওপর ভরসা রাখো। আর পকেট ভর্তি টাকা রাখো। কাজে লাগবে। ঐ নিগ্রোটাকে তোমার ডেসডিমোনা বেশীদিন ভালোবাসবে না। পকেটে টাকা রাখো। নিগ্রো গাধাটাও বেশীদিন তাকে ভালোবাসবে না। একটা মিথ্যা আবেগের মুহূর্তে মেয়েটি মন দিয়ে ফেলেছে তাকে। টাকা রাখো পকেটে। দৈর্য ধরো। কিছুদিনের মধ্যেই বিচ্ছেদ শুরু হয়ে যাবে। টাকা রাখো। নিগ্রোর জাত মর্জি মত ভোল পাল্টায়। টাকা রাখো। মেয়েটির তো রুচিবোধ আছে। যখন কালো মোষটার দৈহিক সংস্পর্শে যাবে তখনই তার নিজের ভুলটি বুঝতে পারবে। তাই প্রচুর টাকা রাখো। নিজেকে যদি ধ্বংস করতেই হয় তা'হলে জলে ডুবে মরার চাইতে ভালো একটা কিছু করে মর। সুন্দরী ডেসডিমোনা নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি তোমার অঙ্কশায়িনী হবে। টাকা ঢালতে হবে।

রোডা : আমার যে আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। তুমি কি তাড়াতাড়ি পারবে ওকে আমার হাতে এনে দিতে?

ইয়াগো : বল কি হে? তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে— ঐ নিগ্রো বেটা আমাকে কেমন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তুমি তো জানোই, ওকে আমি ঘৃণা করি। আর প্রেমের যুদ্ধে তুমি হলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার ঘৃণা আর তোমার ঈর্ষা— দুটি মিলেছে এক জায়গায়। যাও টাকা রেডি রাখো। দেখবে আগামী দিনে খেলা কেমন জমে ওঠে। বিদায়।

রোডা : সকালে কোথায় দেখা হবে?

ইয়াগো : আমার বাসায়।

রোডা : ঠিক সময়ে আমি চলে আসবো।

ইয়াগো : যাও। শুভরাত্রি। টাকা তৈরী রেখো।

রোডা : সব জমি বিক্রি করে ফেলব [রোডারিগোর প্রস্থান]

ইয়াগো : আমি হলে, এভাবে টাকার থলি উপুর করে দিতুম না। এ ব্যাটার কাঁধে বন্দুক রেখে শিকারটা জমবে ভালোই। খেলা, শুধু খেলা। ঐ নিগ্রো ব্যাটাকে আমি ঘৃণা করি। শুনেছি আমার পদোন্নতি ঘটবে। ব্যাটা আমাকে কিন্তু বিশ্বাস করে। তবু রেহাই নেই ওর। আমি ওকে দেখতে পারি না। ব্যস্, এটাই আসল কথা। ওর স্ত্রীকে রেখে যাচ্ছে আমার জিম্মায়। রাত্রির অন্ধকারে এমন এক কদর্যতাকে জন্ম দেবো, যা দেখে শিউরে উঠবে সমস্ত পৃথিবী।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য । সাইপ্রাস । সমুদ্র বন্দর।

[সাইপ্রাস প্রশাসক মন্টিয়াগো, ক্যাশিও এবং সাইপ্রাসের একজন ভদ্রলোক।]

ক্যাশিও : ধন্যবাদ। রণক্ষেত্র সাইপ্রাসের বীর প্রশাসক! ধন্যবাদ।

মন্টি : ধন্যবাদ! সাইপ্রাস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। মহাবীর সেনাপতি ওথেলো কি আসেন নি?

ক্যাশিও : ভেনিস থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম একই সাথে। পথে প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় আমরা ছিটকে পড়লুম। অন্য দুটি জাহাজের কী যে হলো! ভগবান সকল আপদ থেকে ওদের রক্ষা করুন।

মন্টি : তিনি তো সুরক্ষিত জাহাজেই আছেন?

ক্যাশিও : হ্যাঁ, বেশ শক্ত-পোক্ত তাঁর জাহাজ। চালকও সুদক্ষ। একজন সেনাপতির জাহাজ চালানোর অভিজ্ঞতা ওর আছে। আমার বিশ্বাস তঁরা নিরাপদেই এসে পৌঁছবেন। [বাইরে কোলাহল] [দূতের প্রবেশ]
কিসের গোলমাল?

দূত : সমুদ্রের ধারে গোটা শহরটা ভেঙে পড়েছে। সেনাপতিকে দেখতে চায় সবাই। একটি জাহাজ এসেছে। তাই সকলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

ক্যাশিও : মনে হয় সেনাপতি এসেছেন। [নেপথ্যে তোপধ্বনি]

ভদ্র : তোপধ্বনি কার হচ্ছে! আমাদেরই জাহাজ।

ক্যাশিও : যাও তো। দেখে এসো, কে এলো?

দূত : আচ্ছা । [প্রস্থান]

মন্টি : আপনাদের জেনারেল কি বিবাহিত?

ক্যাশিও : হ্যাঁ, তিনি এমন এক সুন্দরীর হৃদয় জয় করেছেন, যার সৌন্দর্য বর্ণনা করার সাধ্য কোন কবিরও নেই। [দূতের প্রবেশ] কে এলো?

দূত : এসেছেন ইয়াগো। সেনাপতির দেহরক্ষী।

ক্যাশিও : তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এসেছেন। কিন্তু ওদের আগে তো আসার কথা সেনাপতি মশায়ের। সুন্দরী ডেসডিমোনার রূপ দেখে হয়ত ঝড়ও তার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

মন্টি : ডেসডিমোনা? তিনি কে?

ক্যাশিও : তিনিই সেই, যার কথা আমি বলেছি— আমাদের প্রিয় সেনাপতির ধর্মপত্নি, সাহসী ইয়াগোর তত্ত্বাবধানে যাকে রেখে আসা হয়েছিল। হে ভগবান ! ওথেলোকে রক্ষা করো। তোমার প্রবল নিঃশ্বাসে তার তরীর পাশ তুমি স্ফীত করে দাও। ডেসডিমোনার প্রেমের কবোষ্ণ হৃদয়ের দ্রুত নিঃশাস-প্রশ্বাস আমাদের অবসিত আত্মাকে যোগাক নতুন উত্তাপ আর সাইপ্রাসের সকল অভিবাসীর জন্য প্রদান করুক নিশ্চিন্ত আরাম!
[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া, রোডারিগো এবং ইয়াগোর প্রবেশ]
দেখুন, দেখুন, জাহাজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রত্নটি তীরে নেমেছেন। সাইপ্রাসের মাননীয় ব্যক্তিগণ! আপনারা বরণ করে নিন তাঁকে। মহোদয়া। আপনাকে অভিবাদন করি।

ডেসডি : ধন্যবাদ। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাশিও। আমার স্বামীর খবর কি আপনি জানেন?

ক্যাশিও : তিনি এখনো পৌঁছন নি। তবে শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন।

ডেসডি : ও! কিন্তু আপনারা এসে পড়লেন, অথচ ওনি এলেন না! আমার খুব ভয় করছে!

ক্যাশিও : সমুদ্র ও আকাশ একযোগে শত্রুতা করে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। [নেপথ্যে - আরেকটি জাহাজ, আরেকটি জাহাজ] ঐ শুনুন, 'আরেকটি জাহাজ' [নেপথ্যে তোপধ্বনি]

ভদ্রলোক : আমাদের দুর্গকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। মনে হয় ওরা আমাদেরই বন্ধু।

ক্যাশিও : আওয়াজ শুনে তাইতো মনে হয়। দেখা যাক কী খবর আসে।
[ভদ্রলোক বেরিয়ে গেল]
সুস্বাগতম ইয়াগো। সুস্বাগতম মহোদয়া। আপনাকে খুব নীরব দেখছি। [এমোশিয়াকে]

ইয়া : আসলে কিন্তু এত নীরব তিনি থাকেন না, যেমনটি দেখছেন। শয্যাকক্ষে ওর জিভের যে তাণ্ডব আমি সহ্য করি—

ডেসডি : কি যে বলেন আপনি! আমি নিজে সাক্ষী। উনি বলতে গেলে কথাই বলেন না।

ইয়া : আমি খুব ভাল করেই জানি। আপনার সামনে চুপচাপ, হাসিখুশী থাকেন। আসলে তখন তিনি মনে মনে কথার প্যাচ কষেন।

এমিলি : তুমি কখনো আমার প্রশংসা করবে না।

ইয়া : করার কিছু থাকলে তো!

ডেসডি : যদি আমাকে প্রশংসা করার জন্যে আপনাকে বলা হয়।

ইয়া : ম্যাডাম, আমাকে সে দায়িত্ব দেবেন না। দোষ ধরাই যে আমার কাজ

ডেসডি : তা'হলে আপনি একটি কষ্টিপাথর

ইয়া : হ্যাঁ, তা বলতে পারেন অবশ্যই—

ডেসডি : বড় নীরস কাঠখোট্টা আপনি। আপনি কি বলেন মিঃ ক্যাশিও, ঠিক বলিনি?

ক্যাশিও : ইনি প্রাণখুলে কথা বলছেন ম্যাডাম। ইনি তো পণ্ডিত বা কবি নন, এনি হলেন একজন সৈনিক।

ইয়া : [স্বাগত] এ্যাঁ? কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলছে! হাতখানাও ছুঁয়ে দিল! এই ছোট্ট অপরাধের জালটুকুতেই আমি ক্যাশিওর মত বড় পোকাটাকে ধরব। হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছ? খুব কর! [নেপথ্যে শিঙাধ্বনি]
[প্রকাশ্যে] সেনাপতি ওথেলো এসেছেন। আমি ওর শিঙাধ্বনিটি বিলক্ষণ চিনি!

ক্যাশিও : হ্যাঁ, ঠিক! আমাদের সেনাপতি এসেছেন।

ডেসডি : চলুন, চলুন, [এগিয়ে যায়]

ক্যাশিও : ওইতো আসছেন [ওথেলো এবং পরিচারকবৃন্দের প্রবেশ]
ওথেলো : সুন্দরী ডেসডিমোনা!
ডেসডি : প্রিয়তম আমার! আমার ওথেলো!
ওথেলো : আমার আগেই এসে পড়েছো! খুব ভাল হয়েছে। ঝড়ের পরে যদি এতো আনন্দ অপেক্ষা করে থাকে, তবে আসুক ঝড়, উঠুক ঢেউ পাহাড়প্রমাণ। হয়ত জীবনে এত আনন্দ আর আসবেনা কোনদিন।
ডেসডি : হায় ঈশ্বর! এমন যেন না হয়। যেন বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের প্রেম, আমাদের আনন্দ বেড়ে যায়।
ওথেলো : তাই হোক। হে করুণাময় ঈশ্বর। এ আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা নেই। এত আনন্দ আমার আশাতীত। এই হোক আমাদের পরম কাঙ্খিত পাওয়া [আলিঙ্গন]
ইয়াগো : [স্বগত] খুব মজে গেছে দুইজনে! রোশনাই নিবিয়ে দেব আমি। এটাই তো আমার কাজ।
ওথেলো : চলো দুর্গে চলে যাই। যুদ্ধ শেষ। তুর্কীরা ডুবে গেছে সমুদ্রের জলে। বন্ধুগণ, এই সাইপ্রাসে আপনারা পাবেন মধুর আত্মীয়তা, একদিন আমি যা পেয়েছি। ইয়াগো, জাহাজ থেকে মালপত্তর সব নামিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। চল ডেসডিমোনা, সাইপ্রাসে আবার আমাদের মিলন হোলো, মধুর মিলন।
[ইয়াগো আর রোডারিগো ছাড়া সকলের প্রস্থান]
ইয়াগো : [যারা যাচ্ছিল তদের একজনকে ডেকে] শোনো, আমার সঙ্গে বন্দরে দেখা করবে, যাও। এই যে রোডারিগো, এদিকে এসো। তুমি যদি বাপের ব্যাটা হয়ে থাকো, অবশ্য প্রেমে পড়লে নেহাৎ গোবেচারা ধরণের লোকও বীরপুরুষ হয়ে ওঠে,—
রোডা : কি বলবে?
ইয়াগো : শোনো। লেফট্যান্যান্ট ক্যাশিও আজ থাকবে দুর্গের পাহাড়ায়। একটা গুহ্যকথা কান দিয়ে শুনে নাও, ডেসডিমোনা তার সঙ্গে প্রেম করে!
[ফিস ফিস করে]
রোডা : ক্যাশিওর সঙ্গে? না, এ কি করে হয়?
ইয়াগো : তুমি কি বোঝ হে? চোখ আছে তোমার? দেখেছো? হুঁঃ, তুমি দেখনি ক্যাশিওর একেবারে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে হেসে ঢলে কথা বলছিল। বারবার ওর হাতের সঙ্গে হাত ছোঁয়াচ্ছিল, দেখনি?
রোডা : এতে খারাপের কি হল? এমন তো হয়েই থাকে।
ইয়াগো : এমন তো হয়েই থাকে? [ব্যঙ্গ করে] মাথামোটা কোথাকার! আরে, এ হল প্রেমের পূর্ব লক্ষণ। যত রকমের নষ্টামি, গোপন প্রেমের কেচ্ছাকেলেঙ্কারি সব কিছুর শুরুটা কিন্তু ওভাবেই হয়—
রোডা : কিন্তু ও কোন দুঃখে ক্যাশিওকে ভালোবাসবে? ওথেলোকে ও কত গভীরভাবে

ভালোবাসে তা তো দেখেই বোঝা যায়। [হতাশার ভাব]

ইয়াগো : ভালোবাসে, না কচু? ঐ কালো মোষটাকে ও মন দিয়ে ফেলেছিল এক দুর্বল মুহূর্তে। এর চটকদার রোমাঞ্চকর বীরত্বের কাহিনী শুনে শুনে সাময়িকভাবে একটু নরম হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বেশীদিন একই কাহিনী শুনতে কার ভালো লাগে? বল? এর তুলনায় ক্যাশিও কত মার্জিত, তাছাড়া জাতিগত ব্যাপারটাও তো আছে!

রোডা : তাতে আমার কি?

ইয়াগো : শোন, যা বলছি, ঠিক ঠিক করে যাবে। ভেনিস থেকে তোমাকে সাইপ্রাসে নিয়ে এসেছি কেন?

রোডা : কেন?

ইয়াগো : প্রেমের যুদ্ধে তোমাকে জয়ী করবো বলে। এখন ক্যাশিও তোমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। যে কোনো ভাবেই হোক, ওকে ডেসডিমোনার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আজ রাতে তুমি থাকবে দুর্গের পাহাড়ায়। তোমাকে সে দায়িত্ব দেবার ব্যবস্থা আমি করব। ক্যাশিও জানবে না। আমি থাকবো তোমার কাছাকাছি। ক্যাশিওকে রাগিয়ে তোলার চেষ্টা করো। এমন কিছু একটা করবে, যাতে সে ক্ষেপে যায়।

রোডা : তারপর?

ইয়াগো : সে খুব বদমেজাজী। রেগে গেলে, তোমাকে তরবারি দিয়ে কোপ মারবে। এমন রাগাবে যাতে সে তা করতে বাধ্য হয়।

রোডা : যদি আমাকে মেরে ফেলে?

ইয়াগো : না, না। আমি কাছাকাছি থাকবো। একটু হাত তুলবে তোমার উপর, আর অমনি, সারা সাইপ্রাস জুড়ে এমন শোরগোল তুলবো যে ওথেলো সরিয়ে দিতে বাধ্য হবে ওকে। আর তাহলে খুব সোজা অথচ সংক্ষিপ্ত পথে তুমি পৌঁছে যাবে সুন্দরী ডেসডিমোনার হৃদয়মন্দিরে।

রোডা : তুমি ওভাবে ঘটনাকে কাজে লাগাতে পারবে? তাহলে অবশ্যই আমি তা করব।

ইয়াগো : ঠিক আছে, যাও। দুর্গে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

রোডা : যাচ্ছি। বিদায় বন্ধু [প্রস্থান]

ইয়াগো : ঐ নিগ্রোর বাচ্চা জেনারেল হয়ে আমার জায়গাটাতে আরেক জনকে বসিয়েছে। এ আমি সহ্য করতে পারছি না। ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

[ওথেলোর ঘোষক ঘোষণা করছে। পিছে জনতা]

ঘোষক : মহামান্য সেনাধ্যক্ষ মহাবীর ওথেলো মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে, তুর্কীদের পরাজয়ে সকলে আনন্দ করুন। শুধু যুদ্ধ জয় নয়, আজ রাতে তার শুভ বিবাহের উৎসব। তাই সকলকে পান ভোজনে মেতে উঠতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত এ উৎসব চলবে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

সাইপ্রাসের দুর্গ

[ওথেলো, ডেসডিমোনা, ক্যাশিও এবং পরিচারকবৃন্দ]

ওথেলো : মাইকেল ক্যাশিও, রাতের পাহারা যেন নিচ্ছিদ্র থাকে, সেদিকে ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখবে তুমি। একটুও যেন ঢিলেঢালা না হয়। এখন যুদ্ধ নেই, কিন্তু আত্মহারা হলে বিপদ আছে।

ক্যাশিও : ইয়াগোকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি। তবু আমি নজর রাখবো—

ওথেলো : ইয়াগো খুব সৎ কর্মচারী। ওর ওপর বিশ্বস রাখা যায়। ঠিক আছে। শুভরাত্রি মাইকেল। কাল খুব সকালে দেখা করো। এসো প্রিয়তমা। শুরু হোক আমাদের মিলনরাত্রি। [ওথেলো, ডেসডিমোনা এবং পরিচারকদের প্রস্থান] [ইয়াগোর প্রবেশ]

ক্যাশিও : এসো ইয়াগো। রাত জেগে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পাহাড়া ঠিকমত চলছে কিনা।

ইয়াগো : ভালো কথা। কিন্তু এখন নয় লেফট্যান্যান্ট। এখনো দশটা বাজেনি। ডেসডিমোনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে জেনারেল মশায় আমাদের ছেড়ে গেলেন। আসলে রাত বেশী হয়নি। এখনো তিনি ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাননি। চঞ্চলতায় মেতে উঠেননি। তবে হ্যাঁ, বলতে হবে, বৌটিও খুব লাস্যময়ী।

ক্যাশিও : মহিলা খুব ভদ্র আর মনটাও খুব বড়।

ইয়াগো : জোর দিয়ে বলতে পারি ছেনালীপনায় কম যাবেন না একেবারে।

ক্যাশিও : অবশ্যই তাকে খুব প্রাণবন্ত মনে হয়।

ইয়াগো : কি চোখ! যেন আবেশে জড়িয়ে ধরে।

ক্যাশিও : যৌবনের আবেগ রয়েছে চোখে। তবু মনে হয় খুব বিনীত ও নম্র।

ইয়াগো : কথা বললেই মনটা চনমন করে ওঠে, তাই না?

ক্যাশিও : ওভাবে বলবে না, তিনি অতি পবিত্র।

ইয়াগো : আহাহা ! বাসরশয্যা তাদের সার্থক হোক। এসো লেফট্যান্যান্ট, কালো ওথেলোর স্বাস্থ্য পান করে আজকের রাতটাকে আমরা ধন্য করি।

ক্যাশিও : দোহাই ইয়াগো। আজ নয়। মদ খেলে মাথা ঠিক থাকে না আমার। তাঁর প্রতি সৌজন্য বশত: আমরা বরং অন্য কোন আমোদে লিপ্ত হতে পারি।

ইয়াগো : আরে এখানে তো সকলেই আমাদের বন্ধু। মাত্র এক পেয়ালা নেবে তুমি।

ক্যাশিও : এক পেয়ালা আগেই আমার হয়ে গেছে। আর জিনিসটা ছিল খুব কড়া। দেখ, তার ফল এখনই ফলতে শুরু করেছে একটু একটু।

ইয়াগো : আরে লেফট্যান্যান্ট! আজতো ফূর্তির রাত। কিছু হবে না। চলো। চলো,

ক্যাশিও : যাচ্ছি, কিন্তু বেশী দিও না। দোহাই তোমার।

ইয়াগো : [গান] তানা - না - না - না—
বড় ছোট, এই জীবনটা / তাই লুটে নাও মজা /
তানা - না - না- না— [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সাইপ্রাসের দুর্গ

[ইয়াগো এবং রোডারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : যাও, যাও, রোডারিগো। উত্তম সময়। ক্যাশিও ব্যাটার পেছনে লাগো।

রোডা : যাবো? যদি খুব জোরে মারে?

ইয়াগো : মারুক। আরে মার খেয়েই তো ভাগ্য খুলবে হে। যাও—

রোডা : আচ্ছা। [রোডারিগোর প্রস্থান]

[মন্টিয়াগোর প্রবেশ]

মন্টি : এই কি দেখছি মশাই। লেফট্যান্যান্ট মশাই যে, মদ খেয়ে একেবারে—

ইয়াগো : উনি এরকমই। একটু পেটে পড়লেই মাথা আর ঠিক থাকেনা।

মন্টি : তা এমন বেহেড মাদকাসক্ত লোককে লেফট্যান্যান্ট পদে বসানো তো উচিৎ হয়নি সেনাপতি মহাশয়ের। বলতে হবে এটা তার বদান্যতা।

ইয়াগো : অবশ্য ক্যাশিও আমার বন্ধু। যতটুকু পারি প্রকৃতিস্থ রাখার চেষ্টা করছি। দেখি ধীরে ধীরে তার নেশাটা ছাড়াতে পারি কিনা—
[নেপথ্যে — বাঁচাও! বাঁচাও!] কিন্তু শুনুন ত কিসের যেন কোলাহল।
[রোডারিগোকে তাড়া করতে করতে ক্যাশিওর প্রবেশ]

ক্যাশিও : শয়তান, বদমাশ!

মন্টি : কি হয়েছে লেফট্যান্যান্ট?

ক্যাশিও : ঐ গোলাম এসেছে আমাকে কর্তব্য শেখাতে। আজ তার একদিন কি আমার একদিন। মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব।

রোডা : আমাকে মারবেন?

ক্যাশিও : আবার কথা বলিস্, শয়তান? [মারে]

মন্টি : আরে করছেন কি, করছেন কি? লেফট্যান্যান্ট সাহেব শান্ত হোন। দোহাই আপনার সংযত হোন।

ক্যাশিও : ছাড়ুন আমাকে, নইলে আপনাকে—

মান্টি : আপনি মাতাল হয়েছেন।

ক্যাশিও : মাতাল? আমি? [মান্টিয়াগো এবং ক্যাশিও-র মধ্যে যুদ্ধ বাধে]

ইয়াগো : [রোডারিগোকে একান্তে] যাও! দূরে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর। [রোডারিগোর প্রস্থান] এই যে, লেফট্যান্যান্ট মশাই শান্ত হোন, শান্ত হোন। লেফট্যান্যান্ট ক্যাশিও, গভর্নর মন্টিয়াগো খুব ভাল পাহাড়া হচ্ছে মাইরি— [নেপথ্যে— বাঁচাও! বাঁচাও! ঘন্টাধ্বনি] আরে কে ঘন্টা বাজালো, কে কে? গোটা শহর জেগে উঠবে। ঈশ্বরের দোহাই, লেফট্যান্যান্ট, শান্ত হোন। পরে লজ্জা পেতে হবে।

[অস্ত্র নিয়ে ওথেলো এবং ভদ্রলোকদের প্রবেশ]

ওথেলো : কি হয়েছে এখানে?

মন্টি : হায়, রক্ত পড়ছে। আমাকে খুন করা হয়েছে ।

ওথেলো : যদি বাঁচতে চাও শান্ত হও।

ইয়াগো : শান্ত হোন ভদ্রমহোদয়গণ। লেফট্যান্যান্ট মশায়, মন্টিয়াগো মশায়, আপনারা স্থান কাল ভুলে গেছেন? শান্ত হোন। মহামান্য সেনাপতি মশাই এসেছেন। শুনুন, দোহাই আপনাদের।

ওথেলো : আরে — কেমন করে কিসের থেকে ঝগড়া শুরু হল? আমরা নিজেরাই তুর্কী হয়ে নিজেরাই নিজেদের বধ করছি? [অস্ত্র সংবরণ করে উভয়ে] ইয়াগো তুমি তো প্রকৃতিস্থ আছ। বলতো, কে আগে এই ঝগড়া শুরু করেছে? মাইকেল ক্যাশিও, কেমন করে, তুমি আত্মহারা হয়ে পড়লে?

ক্যাশিও : বলতে পারছি না। ক্ষমা করুন আমাকে—

ওথেলো : মিঃ মন্টিয়াগো। আপনার এত খ্যাতি, এত নাম ডাক, আর আপনি এমন অভদ্র আচরণ করছেন!

মন্টি : মাননীয় ওথেলো। আমি বিপজ্জনকভাবে আহত। কীভাবে এখানে মারামারি শুরু হোলো বলতে পারি না। আপনার কর্মচারী ইয়াগো হয়তো বলতে পারবেন।

ওথেলো : এই যুদ্ধের শহরে এত রাতে মানুষের শান্তি ভঙ্গ করার নাম বর্বরতা। ইয়াগো, কি হয়েছিল? কে শুরু করেছে এই ঝগড়া?

ইয়াগো : এ বিষয়ে কিছু বলতে মন চাইছে না, সেনাপতি সাহেব। মিঃ মন্টিয়াগো এবং আমি আলাপ করছিলাম। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনলাম বাইরে। কে একজন চীৎকার করে উঠলো, ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’ তার পিছে পিছে মাইকেল ক্যাশিও খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে এলো। লোকটিকে ও মারতে চাইছিল। মিঃ মন্টিয়াগো ওকে থামাতে চাইলেন। তারপর শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। ক্যাশিও ক্রুদ্ধ হয়ে আগের লোকটিকে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয় আগের লোকটি নিশ্চয়ই একটা অপরাধ করেছিল, তারপর মার খেয়ে পালিয়েছিল।

ওথেলো : হুঁ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি ইয়াহো, তুমি ক্যাশিওর অপরাধ কিছুটা হাল্কা

করতে চাইছ। ক্যাশিও, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু এখন থেকে তোমাকে আমি তোমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলাম। তুমি আর আমার কর্মচারী নও। [ডেসডিমোনার প্রবেশ] প্রিয়তমা জেগে উঠেছেন। তাই আরো কঠোর শাস্তি থেকে বেঁচে গেলে।

ডেসডি : কী হয়েছে?

ওথেলো : যাক্। সব ঠিক হয়েছে। চল ঘুমোতে যাই। [মন্টিয়াগোকে] আপনার ক্ষতের নিরাময়ের সব ব্যবস্থা করছি। এই, কারা আছো, ওঁকে শুশ্রূষার জন্য নিয়ে যাও। [পরিচারকগণ তাকে নিয়ে যায়] ইয়াগো। নগরের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্বে রইলে তুমি। চল ডেসডিমোনা। এই হল সৈনিকের জীবন। ঝগড়া বিবাদ তোমার ঘুমের দফা রফা করেছে। [সকলের প্রস্থান। ইয়াগো এবং ক্যাশিও রয়ে গেল।]

ইয়াগো : আরে লেফট্যান্যান্ট! আপনি আঘাত পেয়েছেন?

ক্যাশিও : হ্যাঁ, ক্ষত কোনদিন শুকোবে না।

ইয়াগো : হায় হায়! মা মেরি। এমন যেন না হয়।

ক্যাশিও : সম্মান, সম্ভ্রম,যশ,খ্যাতি সব খুইয়েছি। সব খুইয়েছি। কিছুই রইল না। হায় ইয়াগো।

ইয়াগো : আমি ভেবেছিলাম, হয়ত আপনি শারীরিক আঘাতের কথা বলছেন! মানহানির চেয়েও ওটা বড় জ্বালাময়। মান-সম্মান তো একটা ঠুনকো ব্যাপার। আপনার সম্মানের কোন হানি হয়নি, যদি অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে আপনি সম্মানের প্রশ্ন না টেনে আনেন। জেনারেলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আবার আপনি বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন।

ক্যাশিও : ওঃ। আমাদের জেনারেল এত ভাল লোক। তার বিশ্বাস আমি রাখতে পারলুম না। দায়িত্ব পালন করতে এসে আমি মদ খেয়েছি। মাতাল হয়েছি। ওঃ! আমি একটা মাতাল। একটা অপদার্থ। একটা নীচ, দায়িত্ববোধহীন!

ইয়াগো : যার পিছে পিছে তরোবারি হাতে আপনি দৌঁড়ে এসেছিলেন সে কে? কি করেছিলো?

ক্যাশিও : ঈশ্বর জানেন। কিছুই বলতে পারছি না।

ইয়াগো : বলছেন কি? কিছুই মনে নেই আপনার?

ক্যাশিও : আবছা আবছা মনে পড়ছে। একটা ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু কী নিয়ে? হায় ঈশ্বর! এ নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত, একটা প্ররোচনা! আমি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ইয়াগো : এখন কে বলবে, একটু আগে আপনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন?

ক্যাশিও : এই সর্বনাশ মাতলামি, আমাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

ইয়াগো : আপনি খু ব নীতিবাদী, তাই এমন বলছেন। যদিও ঘটনাটি আপনার বিপর্যয়ের

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যাশিও : আবার ওঁকে অনুরোধ করে দেখি কাজে ফিরে যেতে পারি কিনা? হায়। মদটা না খেলেই ভাল হত।

ইয়াগো : আচ্ছা, লেফট্যান্যান্ট ক্যাশিও। আপনি নিশ্চয়ই এটা মানবেন যে আমি আপনাকে ভালবাসি।

ক্যাশিও : অবশ্যই।

ইয়াগো : শুনুন, সেনাপতি মশায়ের স্ত্রীকে ধরতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সেনাপতি। ওঁর কথাতেই সেনাপতি মশায় ওঠেন, বসেন। ওকে গিয়ে অনুরোধ করুন, যাতে আপনার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে সেনাপতি মশায় আপনাকে কাজে ফিরিয়ে নেয়।

ক্যাশিও : ঠিক উপদেশ। ঠিক

ইয়াগো : শুভরাত্রি। আমাকে পাহাড়ার কাজ দেখতে হচ্ছে।

ক্যাশিও : শুভরাত্রি। ইয়াগো। [প্রস্থান]

ইয়াগো : কে বলবে আমি খলনায়কের ভূমিকায়? সুযোগ পেলেই উদারহস্তে বিলিয়ে যাই সৎ উপদেশ। ডেসডিমোনার কাছে ক্যাশিও যাবে কৃপাপ্রার্থী হয়ে, তাকেই আমি ঘুরিয়ে দেখাব প্রেমপ্রার্থী রূপে— মাথামোটা নিগ্রোটার মাথা যাবে ঘুরে— বাঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কি সুন্দর একটা উপায়-ই না উপস্থিত— [রোডারিগোর প্রবেশ] আরে রোডারিগো যে! কি খবর!

রোডা : আর থাকা চলবে না এখানে।

ইয়াগো : ধৈর্য যাদের নেই, তারাই দুর্ভাগা। যাও। যেখানে যাচ্ছিলে যাও [রোডারিগোর প্রস্থান]

রোডা : শুভরাত্রি।

ইয়াগো : দুটো কাজ করতে হবে। আমার স্ত্রীকে লাগাব ডেসডিমোনাকে বোঝাবার জন্যে যাতে সে ক্যাশিওর হয়ে ওর স্বামীকে অনুরোধ করে। ততক্ষণ আমি নিগ্রো বেটাকে নিয়ে দূরে সরে থাকব। তারপর ক্যাশিও যখন ডেসডিমোনার কাছে হাজির হবে দুঃখের কথা বলতে, ঠিক তখনই নিগ্রোটাকে নিয়ে ঢুকব ওর কোঠায়। হ্যাঁ। এটাই পথ। শুভস্য শিঘ্রম্। [প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। সাইপ্রাস। দুর্গের উদ্যান।

[ডেসডিমোনা, ক্যাশিও এবং এমিলিয়া]

ডেসডি : নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার জন্য যথাসাধ্য করব।

এমিলিয়া : হ্যাঁ, ম্যাডাম, এঁর জন্য কিছু একটা করুন। আমার স্বামীও এঁর জন্য খুব দুঃখিত— যেন দুঃখটা ওর নিজের।

ডেসডি : ও । খুব সদাশয় তিনি। চিন্তা করবেন না ক্যাশিও। আমার স্বামী আর আপনার মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল তা আবার উদ্ধার করব।
ক্যাশিও : আপনার খুব দয়া ম্যাডাম।
ডেসডি : ওকে বোঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমি।
ক্যাশিও : ধন্যবাদ, কিন্তু ম্যাডাম,
ডেসডি : ভাবনার কিছু নেই।
[ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ]
এমিলিয়া : স্যার এসেছেন, ম্যাডাম—
ক্যাশিও : তা'হলে আমি যাই—
ডেসডি : কেন থাকুন? এক্ষুনি বলব আপনার কথা।
ক্যাশিও : এখন নয় ম্যাডাম। ওঁর সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না।
ডেসডি : ঠিক আছে, আসুন তাহলে। [ক্যাশিওর প্রস্থান]
ইয়াগো : [ক্যাশিওকে যেতে দেখে] এ্যাঁ? না-না - এটা ভালো নয়
ওথেলো : কী বলছ তুমি?
ইয়াগো : না। কিছু না। মানে, কী বলেছি মনে নেই।
ওথেলো : আমার স্ত্রীর কাছ থেকে যে উঠে গেল, সে মনে হয় ক্যাশিও।
ইয়াগো : ক্যাশিও? না স্যার। ও ক্যাশিও হতেই পারে না। তাহ'লে এমন করে পালিয়ে যাবে কেন সে?
ওথেলো : হ্যাঁ, তাই। তবে কে সে?
ডেসডি : এসো, এসো। এতক্ষণ কথা হচ্ছিল লেফট্যান্যান্ট ক্যাশিওর সঙ্গে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়েছেন।
ওথেলো : হুঁ।
ডেসডি : ওগো, ওকে আবার কাজে ফিরিয়ে নাও না গো। একবার ভুল করে ফেলেছেন, আর করবেন না।
ওথেলো : ও কি এক্ষুণি বেরিয়ে গিয়েছে?
ডেসডি : হ্যাঁ। খুব অনুতপ্ত। প্লিজ ডাকিয়ে আন তাকে।
ওথেলো : এখন নয় ডেসডিমোনা। পরে—
ডেসডি : কখন? তাড়াতাড়ি ডাকবে তো?
ওথেলো : দেখা যাক। যত শীঘ্র সম্ভব—
ডেসডি : তাহ'লে কি আজ ডাকবে, সাপারে?
ওথেলো : না।
ডেসডি : তাহ'লে কাল দুপুরে, খাবার সময়?
ওথেলো : কাল বাড়ীতে খাবো না। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দুপুরে মিটিং আছে।
ডেসডি : তাহ'লে কাল রাতে? নইলে মঙ্গলবার সকালে অথবা রাতে। কিংবা বুধবার রাতে? বলনা গো, কবে? কখন? মানসিক দিক থেকে উনি একেবারে ভেঙে

পড়েছেন।

ওথেলো : ওর কথা নিয়ে আর বিরক্ত করো না। যেদিন ইচ্ছা হয় সেদিন আসুক। তোমার আবদার আমি রাখব—

ডেসডি : না, না। এতো ক্ষমা করা হল না। তুমি অন্তর থেকে না বললে আমি যে ভরসা পাব না কিছু বলতে—

ওথেলো : তুমি যা বলবে তাই হবে, ব্যস্। এখন চুপ কর। আমাকে একা থাকতে দাও।

ডেসডি : আচ্ছা, তাহ'লে যাই।

ওথেলো : যাও। তোমাকে এখানে আসতে হবে না, আমিই আসব— তোমার কাছে

ডেসডি : চলে এসো এমিলিয়া। যা ইচ্ছে হয় কর, আমার বলার কি আছে?
[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

ওথেলো : এই ওকালতি আমার ভাল লাগছে না। তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি, তাই— [স্বগত:]

ইয়াগো : একটা কথা বলব স্যার?

ওথেলো : কি?

ইয়াগো : বিয়ের আগে ম্যাডাম এবং আপনার মধ্যে যখন মন দেয়া নেয়া চলছিল, তখন কি ক্যাশিও আপনাদের গোপন কথা জানত?

ওথেলো : হ্যাঁ। সবই সে জানত। কেন?

ইয়াগো : না স্যার। এমনি। এই সাধারণ কৌতুহল আর কি—

ওথেলো : এ কৌতুহলের কারণ কি?

ইয়াগো : না, মানে আমি জানতুম না যে, ও আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠ—

ওথেলো : হুঁ— তা বটে। আমাদের দুজনের কাছেই ওর যাওয়া আসা ছিল।

ইয়াগো : ও । তাই।—

ওথেলো : তাই? 'তাই' বলতে কী বোঝাতে চাও তুমি? সে কি আরো কিছু —

ইয়াগো : স্যার? ওর বিষয়ে জানতে চাইছেন?

ওথেলো : হ্যাঁ। ভালো কিনা, তা বলো।

ইয়াগো : হ্যাঁ, স্যার। ভালোই তো মনে হয়।

ওথেলো : মনে হয়, মানে?

ইয়াগো : মনে হয়, মানে— না, কিছু না—

ওথেলো : কিছু গোপন করতে চাইছ মনে হয়। ক্যাশিও যখন এ ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল তখন তুমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিলে, 'ভালো নয়'। আবার যখন তোমাকে বললুম আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তুমি বললে, 'তাই তো'! এবং তোমার মুখমণ্ডলের কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সন্দেহের রেখা। মুখ বন্ধ করে রেখে সে সন্দেহকে তুমি চাপা দিয়ে রেখেছো। নিশ্চয়ই কোন গভীর সন্দেহ। বলো, বলো ইয়াগো। কী সেই সন্দেহ?

ইয়াগো : স্যার। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি—

ওথেলো : হ্যাঁ। তুমি সৎ। তুমি বিচক্ষণ, বিশ্বস্ত। তোমার কথার খুব মূল্য দেই আমি—

ইয়াগো : স্যার। মাইকেল ক্যাশিও স্যার। আমি এটা বিশ্বাস করতে পারলে খুশী হই যে, সে খুব ভালো।

ওথেলো : আমিও মনে করি, সে ভালো।

ইয়াগো : মানুষকে বাইরে থেকে দেখলে যেমন মনে হয়, তেমনি যদি সবাই থাকত। তাহলে কত ভাল হত স্যার!

ওথেলো : অবশ্যই। ভেতরে বাইরে এক থাকতে হবে।

ইয়াগো : ধরা যাক্ ক্যাশিও খুব ভালো মানুষ।

ওথেলো : তোমার এ কথার মধ্যে কিছু একটা রয়েছে, ইয়াগো এমন একটা কিছু, যা তুমি গোপন করতে চাইছ। বল। যা তুমি বলতে চাও— স্পষ্ট করে বলো। যতই অপ্রীতিকর হোক, নির্দ্বিধায় তা বলতে পারো।

ইয়াগো : মাফ করুন স্যার। আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আপনার আদেশ পালন করাই আমার কাজ, কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করতে বোধ হয় বাধ্য নই। অনেক ধারণা, অনেক চিন্তা আছে স্যার - যা কদর্য, এমনকি মিথ্যা হতে পারে। পৃথিবীতে এমন কোন রাজপ্রাসাদ আছে কি, যেখানে ষড়যন্ত্র নেই, সন্দেহ নেই? মানুষের অন্যায় আচরণগুলোর জন্যেই তো প্রতিদিন বিচারালয় বসে—

ওথেলো : তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করছ ইয়াগো। তুমি যাকে ভালোবাস, তার ক্ষতি হতে দেখেও তুমি তাকে সাবধান করবে না?

ইয়াগো : দোহাই স্যার, আমাকে কিছু বলার জন্য চাপ দেবেন না। আমার যা অনুমান, তা অত্যন্ত বাজে। আমার মনটা খুব নিকৃষ্ট, এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কোন জায়গায় সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমার মনটা ছোকছোক করে থাকে।—

ওথেলো : [ঈষৎ উত্তেজিত] কী বলতে চাও তুমি? স্পষ্ট করে বলো।

ইয়াগো : [ঢোক গিলে] স্যার। মানুষের সুনামটাই বড় সম্পদ স্যার। যদি কেউ আমার টাকা চুরি করে, আমি বলব কিছুই যায়নি আমার। যা আমার ছিল, তা এখন তার হয়েছে। কিন্তু—

ওথেলো : আরে ওসব কথা আমার জানা আছে।

ইয়াগো : কাউকে সন্দেহ করাটা মোটেই উচিৎ নয় স্যার। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে। কিন্তু ভেবে দেখুন স্যার, কেউ একজনকে ভালোবাসে এবং সে বিশ্বাস করে সে ভালোবাসে সেও তাকে ভালোবাসে, কিন্তু যদি সে জানতে পারে তার বিশ্বাসটা ঠিক নয়, সত্যি নয়।

ওথেলো : এ তো দুঃসহ।

ইয়াগো : হে ভগবান। এমন দুর্ভাগ্য যেন আমার শত্রুরও না হয়। কাউকে যেন সন্দেহের

শিকার না হতে হয়।

ওথেলো : কেন, কেন ও কথা বলছ? তুমি কি ভাবছ সন্দেহের কবলে পড়ব আমি? কোন সন্দেহকে আমি মনে ঠাঁই দেব না।

ইয়াগো : তাহ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারি স্যার। আমার একটা কর্তব্য আছে, সে কর্তব্যবোধ থেকেই বলছি স্যার— ম্যাডামকে একটু দেখে রাখবেন। এটা নেহাৎই আমার একটা ধারণা। এ অমূলকও হতে পারে স্যার। তবু, একটু সতর্ক থাকাটা উচিৎ স্যার। সকলেই লুকিয়ে চুরিয়ে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়। কি পুরুষ! কি নারী! করাটা দোষের নয়। জানাজানি হলেই কেলেঙ্কারী।

ওথেলো : এ তুমি কি বলছ? আমার স্ত্রী—

ইয়াগো : স্যার, ইনি কিন্তু ওনার বাবাকে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। আপনাকে গোপনে বিয়ে করে ফেললেন—

ওথেলো : কিন্তু আমাকে তো ভালো বেসেছিলেন—

ইয়াগো : তা ঠিক। কিন্তু দেখুন স্যার, ওর বাবার তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞ চোখে উনি ধুলো দিয়েছিলেন। বুড়ো মানুষটার মনে একটুও সন্দেহ জাগেনি ওর সম্পর্কে। তবে স্যার, আমি বোধ হয় সীমা ছাড়িয়ে ফেলছি, আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, কর্তব্যের দায়ে এ কথাগুলো বলে ফেললাম স্যার —

ওথেলো : একটা দিক সম্পর্কে আমি অন্ধ ছিলাম। তুমি আমাকে সতর্ক করে দিয়েছো। তোমাকে বরং ধন্যবাদ জানানো উচিৎ আমার—

ইয়াগো : স্যার, কথাটা শুনেই, আপনি যেন ভেঙে পড়লেন—

ওথেলো : না, না, একটুও না, একটুও না।

ইয়াগো : আপনাকে আঘাত দিয়েছি আমি।

ওথেলো : না, একটুও আহত হইনি। ডেসডিমোনা নিষ্পাপ।

ইয়াগো : আঃ তাই যেন হয়। আপনিও বেঁচে থাকুন এ কথা ভেবে।

ওথেলো : কিন্তু সবাই কেমন করে যেন বদলে যায়।

ইয়াগো : হ্যাঁ, এটাই তো কথা। স্যার ভরসা দিলে বলতে পারি,— চেহারা, শিক্ষাদীক্ষা, আভিজাত্য, জাত্যাভিমান— সবদিক থেকে পার্থক্য রয়েছে আপনাদের মধ্যে। হয়ত বিবাহের পরে, এ সম্পর্কে ম্যাডামের মনে অনুশোচনা জাগতে পারে।

ওথেলো : আচ্ছা। তুমি এসো। যদি আর কিছু জানতে পার, আমাকে জানিও। তোমার স্ত্রীকে বলো লক্ষ্য রাখতে। একটু একা থাকতে চাই, ইয়াগো।

ইয়াগো : আচ্ছা স্যার, চলি [প্রস্থানোদ্যত]

ওথেলো : কেন বিয়ে করলুম? ইয়াগো খুব সৎ। যতটুকু বলেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী জানে—

ইয়াগো : [ফিরে এসে] স্যার, আমার অনুরোধ, এনিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করবেন না। এটা ভুলে থাকুন। আর ক্যাশিওকে যতদিন দূরে রাখবেন ততই ভাল হবে।

ওর গতিবিধিটা লক্ষ্য রাখতে পারবো আমি। আর ম্যাডামকে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন না। শুধু লক্ষ্য রাখুন।

ওথেলো : আচ্ছা। এসো।

ইয়াগো : চলি স্যার। গুডবাই। [প্রস্থান]

ওথেলো : যদি এর ব্যাভিচারিতা প্রমাণিত হয় তাহলে জন্মের মত থামিয়ে দেব ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। যদিও তার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে মিশে আছে আমার বুকের স্পন্দন। —এ্যাঁ? আমি কালো? আদবকায়দা জানি না অভিজাত বংশের ফুলফুলে বাবুদের মত? আর অনেকগুলো বছর যে কাটালাম রক্তক্ষয়ী রণক্ষেত্রে? সেটা বুঝি কিছু নয়? এই প্রতিদান! আমার সরলতার সুযোগ নেয়া হচ্ছে? ওঃ, কেন বিয়ে করলাম? এদের চোখে যে আমি ছোটলোক! [ডেসডিমোনা ও এমিলির প্রবেশ] ওই তো আসছে। ভালোর ভান করবে। আমাকে পরিহাস করে। না, এ আমি বিশ্বাস করি না। না!

ডেসডি : কি হয়েছে? বলনাগো? অমন করে বসে আছ কেন? সাইপ্রাসের মাননীয় অতিথিরা এসে বসে আছেন, চল —

ওথেলো : ও, ভুলে গেছি।

ডেসডি : অমন করে কথা বলছ কেন? তুমি কি অসুস্থ?

ওথেলো : কপালের দিকটায় ব্যাথা করছে।

ডেসডি : হয়ত অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলে একদৃষ্টে। ব্যাথা কমে যাবে। শক্ত করে বেঁধে দিই কপালটা, সেরে যাবে। [রুমাল দিয়ে ডেসডিমোনা বেঁধে দিতে চায়। ওটা পড়ে যায়] থাকুক ব্যাথা। চল।

ওথেলো : রুমালটা খুব ছোট

ডেসডি : খুব দুর্বল হয়ে পড়েছো। ওগো কী করবো আমি? [ডেসডিমোনা ধরে নিয়ে যায় ওথেলোকে।] [এমিলিয়া রুমালটা তুলে নেয়]

এমিলিয়া : এতদিনে পেলুম রুমালটা। এটা নাকি ওর স্বামীর প্রথম স্মারক উপহার। আমার খামখেয়ালী স্বামী বারবার বলছে ওটাকে হাফিজ করতে। কিন্তু কিছুতেই ওটি হাতছাড়া করছিল না। ওর স্বামী নাকি দিব্যি করে বলেছে সবসময় ওটা নিজের সঙ্গে রাখতে। প্রায়ই ও এটাকে চুমু খায়, এর সঙ্গে কথা বলে। এর নক্সাটা খুব সুন্দর। নক্সাটা তুলে রাখব কাগজে। তারপর দেব আমার স্বামীকে। সে যে ছাই এটা দিয়ে কী করবে, সে-ই জানে। তার খেয়াল মেটাতে সাহায্য করাই তো আমার কাজ। [ইয়াগোর পুন: প্রবেশ]

ইয়াগো : আরে! কী করছ একা একা?

এমিলিয়া : আমাকে আর কোনদিন বকবে না বল। তোমাকে একটা জিনিস দেবো।

ইয়াগো : কী জিনিস? দামী? না সস্তা?

এমিলিয়া : বলতে পারি না—

ইয়াগো : হুঁ, মাথায় কিচ্ছু নেই।
এমিলিয়া : না গো দামী। বল, আমাকে কী দেবে, এই রুমালটার জন্য?
ইয়াগো : কোন রুমাল?
এমিলিয়া : এই দেখো। যা হাতিয়ে নেবার জন্য তুমি আমাকে অনেকদিন বলেছ।
ইয়াগো : হাতিয়েছো?
এমিলিয়া : না। ও ফেলে দিয়েছে ভুলে— সেই সুযোগে। দেখ, দেখ—
ইয়াগো : বাঃ লক্ষী মেয়ে। দাও, দিয়ে দাও ওটা।
এমিলিয়া : এটা দিয়ে তুমি কী করতে চাও, বল?
ইয়াগো : জেনে কি হবে তোমার? তোমার নাকি ওটা? [ছিনিয়ে নেয়]
এমিলিয়া : যদি কোন কাজে না লাগে, ফিরিয়ে দাও ওটা। বেচারী! ওটাকে কত ভালবাসে। না পেলে পাগল হয়ে যাবে।
ইয়াগো : কাউকে বলবে না। একটা কাজ আছে। যাও তোমার কাজে যাও।
[এমিলিয়ার প্রস্থান]
ক্যাশিওর ঘরে গিয়ে এটা ফেলে আসব। সন্দেহ জাগিয়ে দিতে একটা তুচ্ছ জিনিসই যথেষ্ট। এ দিয়ে অনেক কাজ হবে। [ওথেলোর পুন: প্রবেশ] ওই তো আসছে। পৃথিবীর কোন ওষুধ আর ওকে সুস্থ করতে পারবে না।
ওথেলো : আমার সঙ্গে প্রতারণা? প্রবঞ্চনা?
ইয়াগো : কী হলো স্যার? এখানো ওকথা ভাবছেন?
ওথেলো : অপদার্থ! দূর হও! মাথাটা বিগড়ে দিয়েছো। যাও। সন্দেহের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বরং প্রতারিত হওয়া অনেক ভাল।
ইয়াগো : কী হয়েছে স্যার?
ওথেলো : কোথায় গেল প্রেমাবেশের স্বর্গীয় মুহুর্তগুলি? তখন কিছু ভাবিনি, কোন সন্দেহ করিনি। গত রাতেও ভালো ঘুম হয়েছিল আমার। আহার বিহার করেছি, ফূর্তি করেছি। ওর ঠোঁটে তখন দেখিনি ক্যাশিওর চুম্বন।
ইয়াগো : আপনার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে, স্যার।
ওথেলো : ভাল হোতো, যদি কিছু না শুনতে পেতাম। এখন চিরদিনের মতো আমার শান্তি চলে গেছে। বিদায়, হে আনন্দ, বিদায় তোমাকে। বিদায়। ওথেলোর জীবনদীপ নিভে গেল। ওথেলো শেষ হয়ে গেল।
ইয়াগো : কী বলছেন, স্যার?
ওথেলো : শয়তান! ঠিক করে বল্, আমার স্ত্রী ব্যভিচারিনী? [গলা টিপে ধরে ইয়াগোর] ঠিক করে বল। প্রমাণ দে। প্রমাণ চাই আমি। না হ'লে কুকুরের মতা মারব তোকে! [গলা ছেড়ে দেয়]
ইয়াগো : আপনি স্যার এত রেগে গেছেন?
ওথেলো : প্রমাণ দেখাতে হবে। নয়তো চাক্ষুস দেখাতে হবে। কোন সন্দেহের ছিদ্র যাতে না থাকে। যদি তা না পারিস তাহ'লে মেরে ফেলব।

ইয়াগো : স্যার! আপনি স্যার— সত্যি মহান।

ওথেলো : ওর নামে অপবাদ ছড়িয়ে যদি আর এভাবে আমার কান ভারী করিস্, তাহ'লে নরকে পাঠাব তোকে!

ইয়াগো : স্যার। আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ঠিক আছে তাড়িয়ে দিন আমাকে। চলে যাব। আর কোনদিন কারো উপকার করতে যাবোনা স্যার। সত্য কথা বলে, সৎ থেকে অসৎ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব না স্যার। [যাবার ভান]

ওথেলো : থামো! সৎ তোমাকে হতেই হবে।

ইয়াগো : না স্যার। আমাকে চালাক হতে হবে। সততা হলো বোকামি। যে সততা বজায় রেখে কাজ করতে চায়, সেই মরে।

ওথেলো : তুমি আমাকে একটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেখাও যে ওর চরিত্র ভালো নয়। প্রমাণ, প্রমাণ, প্রমাণ চাই আমি।

ইয়াগো : এ কাজটা, স্যার, এ কাজটা আমি পছন্দ করছি না মোটেই। কিন্তু, যেহেতু অনেকটা জড়িয়ে পড়েছি আমি বিষয়টার সঙ্গে, নেহাতই বোকার মত, আমি, আমি চেষ্টা করব। স্যার, ক্যাশিওর সঙ্গে এর মধ্যে একদিন শুয়েছিলাম। যা বিশ্রী এক অভিজ্ঞতা হল না স্যার, কী বলব। বলতে আমার লজ্জা হয়, ঘেন্না হয়—

ওথেলো : কী হয়েছিল, বল না।

ইয়াগো : কী বলব স্যার। ঘুমের ঘোরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল, চুমু খেল। গভীর আবেশে সে আমাকে জ ড়িয়ে ধরল আর মৃদুস্বরে ম্যাডামের নাম ধরে ডাকতে লাগল। যেন সে তার প্রিয়তমাকে ডাকছে— 'ডেসডিমোনা! ডেসডিমোনা!'

ওথেলো : থামো!! [গর্জন করে]

ইয়াগো : এটা অবশ্য সত্যি ঘটনা নয়। স্বপ্নতো স্বপ্নই। কিন্তু স্বপ্নে নাকি বাস্তব জীবনের একটা অনুরণ চলতে থাকে। তবে স্যার, এটাকে আপনি তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন না।

ওথেলো : নেমকহারাম মাইকেল ক্যাশিও! তোর ঠোঁট আমি ছিঁড়ে ফেলব।

ইয়াগো : আচ্ছা স্যার। ম্যাডামের হাতে একটা লাল মত রুমাল দেখেছিলাম একদিন। ঠিক তেমনি একটা রুমাল ক্যাশিওর হাতে। অবশ্য রুমাল তো এক রকমের কতই আছে।

ওথেলো : একটি লাল রুমাল আমি ডেসডিমোনাকে দিয়েছিলাম। তা ঠিক। এটা ছিল আমার প্রণয়ের প্রথম নিবেদন।

ইয়াগো : ওটাই যে ঠিক আমি ক্যাশিওর হাতে দেখেছি, তা নাও হতে পারে। তবে ম্যাডামের হাতে যে রুমালটা আমি দেখেছিলাম, তাতে একটা নক্সা আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ঠিক তেমনি নক্সা দেখেছি ক্যাশিওর হাতের রুমালটাতে। সেটা দিয়ে ও তার দাড়িতে বোলাচ্ছিল।

ওথেলো : যদি ঠিক ওটাই হয়।

ইয়াগো : যদি ঠিক ওটাই হয়, তাহ'লে বলা যাবে আমাদের সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়।

ওথেলো : সন্দেহ, সন্দেহ, সন্দেহ। আর প্রেমের কোন স্থান নেই আমার মনে। আমি তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা চাই!

ইয়াগো : শান্ত হোন , স্যার—

ওথেলো : রক্ত! রক্ত! রক্ত চাই!

ইয়াগো : স্যার। মাথা ঠাণ্ডা করুন। ধীরে ধীরে আপনার মন থেকে প্রেম সম্পর্কে অমূলক সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

ওথেলো : না ইয়াগো। কখনো নয়। আর কখনো শান্ত হবে না আমার হৃদয়। তিন দিন, তিন দিনের মধ্যে আমি ক্যাশিওর মৃত্যু সংবাদ শুনতে চাই।

ইয়াগো : আপনার এ আদেশই যথেষ্ট স্যার। আমি ধরে নিতে পারি, আমার বন্ধু মরে গেছে। কিন্তু বেঁচে থাকুন আপনার স্ত্রী, আমাদের ম্যাডাম—

ওথেলো : মরুক সে! ধ্বংস হোক। শয়তানী। তাকে আমি খুন করব। এখন থেকে তুমি আমার লেফট্যান্যান্ট।

ইয়াগো : জয় হোক স্যার! আপনার জয় হোক! ধন্যবাদ আপনাকে। আজ থেকে আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো স্যার!

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডি : আমার রুমাল কোথায় রেখেছি, এমিলিয়া?

এমিলিয়া : বলতে পারছি না, ম্যাডাম।

ডেসডি : টাকা কড়ি হারালেও আমার এতো দুশ্চিন্তা হোতো না। আমার কর্তা কোনদিন আমাকে সন্দেহ করেনি, কিন্তু রুমালখানি হারিয়ে আমি তাকে তা করতে বাধ্য করলাম।

এমিলিয়া : তিনি কি আপনাকে সন্দেহ করছেন?

ডেসডি : তিনি? না। কিন্তু মনে হয় সারাক্ষণ তিনি কিছু একটা ভাবছেন। যেন তাঁর মনের সব আনন্দ, সব রস শুকিয়ে গেছে। [ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া : তিনি আসছেন।

ডেসডি : ক্যাশিওকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন যদি উনি আসেন তাহলে ওকে কাজে ফিরিয়ে নেবার কথা বলা যাবে। কেমন আছো তুমি?

ওথেলো : ভালো। সুচরিতে। [স্বগত] আঃ কি কঠিন এ অভিনয়! [প্রকাশ্যে] তুমি ভালো আছো ডেসডিমোনা?

ডেসডি : ভালো। ওগো, তুমি ভালো থাকলেই আমার ভালো।

ওথেলো : তোমার হাতখানি দাও। আমার হাতখানি ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তবে এ হাত

খুবই বিশ্বাসী, খুবই সরল।

ডেসডি : সত্য কথাই বলছো। এ হাতেই তো তুলে দিয়েছি আমার হৃদয়।

ওথেলো : আগের দিনে মানুষ হৃদয় তুলে দিত হাতে, আর এখন, এখন খালি হাত, হৃদয়হীন, শূণ্য।

ডেসডি : আমার কিন্তু সেরকম মনে হয় না। আচ্ছা, তুমি যে কথা দিয়েছিলে—

ওথেলো : কোন্ কথা?

ডেসডি : মিঃ ক্যাশিওকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। ওনি যাতে সরাসরি তোমার কাছেই ওর কথা বলেন।—

ওথেলো : আমার চোখে কিছু পড়েছে বোধ হয়। দেখি তোমার রুমালটা দাও তো!

ডেসডি : এই তো, নাও।

ওথেলো : এটা নয়, যেটা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম।

ডেসডি : ওটা এখন আনি নি।

ওথেলো : কেন আনোনি?

ডেসডি : খুঁজে পাচ্ছি না।

ওথেলো : খুব অন্যায়। ওটা হারানো তোমার উচিৎ হয়নি। ওটা ছিল মন্ত্রপূত। মৃত্যুর সময় মা ওটা আমাকে দিয়েছিলেন।

ডেসডি : তাই নাকি!

ওথেলো : হ্যাঁ। কখনো ওটা হাতছাড়া করবে না।

ডেসডি : হায়! কোনদিন যদি ওটা না দেখতাম।

ওথেলো : কেন? কী হয়েছে? বলো, বলো কী হয়েছে?

ডেসডি : তুমি এত বিচলিত হয়েছো কেন? ওগো, চুপ করে আছো কেন? বল না?

ওথেলো : ওটা কি হারিয়ে ফেলেছো?

ডেসডি : হায় ঈশ্বর! ওটা যেন ফিরে পাই!

ওথেলো : কী বলছ?

ডেসডি : ওটা যদি হারিয়ে যায়? ওগো যদি না পাই কোনদিন?

ওথেলো : কেমন করে হারালো?

ডেসডি : কোথায় রেখেছি, ভুলে গেছি। নিশ্চয়ই ওটা ঘরে আছে।

ওথেলো : তাহলে নিয়ে এসো, আমাকে দেখাও।

ডেসডি : আচ্ছা, দেখাব গো দেখাব। তোমার জিনিস নিশ্চয়ই তোমাকে দেখাব। এই, আমাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এসব কথা বলছ। মিঃ ক্যাশিওর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো?

ওথেলো : নিয়ে এসো রুমাল। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ডেসডি : শোনো, শোনো, ক্যাশিওর মত ভালো লোক তুমি পাবে না।

ওথেলো : আমার রুমাল!

জেসডি : ক্যাশিওকে কবে ফিরিয়ে নেবে বলনা গো।

ওথেলো : আমার রুমাল!

ডেসডি : উনি হলেন সেই মানুষ, যে সর্বদা তোমার উন্নতিতে খুশী থেকেছেন। তোমার বিপদের অংশীদার হয়েছেন।

ওথেলো : আমার রুমাল!

ডেসডি : ওকে ছাটাই করে ভুল করেছো তুমি—

ওথেলো : চুলোয় যাক !! [প্রস্থান]

এমিলিয়া : তিনি কি আপনাকে সন্দেহ করছেন?

ডেসডি : এমন তো তাকে কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই ওই রুমালখানিতে বিস্ময়কর কিছু আছে। হায় কপাল। ওটা কেন আমি হারিয়ে ফেললাম!

এমিলি : বছর দুয়েক না হতেই পুরুষদের চেনা যায়। ওদের স্বরূপ বেড়িয়ে পড়ে। [ক্যাশিও ও ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : এইতো, তিনি আছেন। একমাত্র তিনিই কিছু করতে পারেন। তঁকেই বলে দেখুন।

ডেসডি : ও, মিঃ ক্যাশিও! কি খবর?

ক্যাশিও : ম্যাডাম। আমাকে যেন আর ঝুলিয়ে না রাখা হয়।

ডেসডি : আমি দুঃখিত মিঃ ক্যাশিও। আমার অনুরোধ মনে হয় তিনি রাখবেন না।

ইয়াগো : কেন তিনি কি রাগ করেছেন?

এমিলি : একটু আগে এখান থেকে গিয়েছেন। মনে হয় খুব অস্বস্তি বোধ করছেন—

ইয়াগো : আরে এতো শান্ত মানুষ! যুদ্ধক্ষেত্রেও যাকে কোনদিন মাথা গরম করতে দেখিনি! আচ্ছা, আমি বলে দেখব—

ডেসডি : তাই করুন মিঃ ইয়াগো। [ইয়াগো চলে গেল] অবশ্যই রাজনৈতিক কোন ব্যাপার হবে। হয়ত ভেনিস থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে। দেখি আরেকবার বুঝিয়ে কোন ফল হয় কিনা। মিঃ ক্যাশিও, ততক্ষণ এখানে বসুন। যদি তাঁকে একটু ভালো দেখি তাহ'লে আপনার কথা বলব।

ক্যাশিও : ধন্যবাদ! ম্যাডাম!
[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান] দেখা যাক ভাগ্যর চাকা কেনদিকে ঘোরে।

চতুর্থ অঙ্ক

[প্রথম দৃশ্য ।। সাইপ্রাস ।। দুর্গের সম্মুখে ।।]

[ওথেলো এবং ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : ওটাকে আপনি কি বলবেন স্যার?

ওথেলো : কি ইয়াগো?

ইয়াগো : ঐ গোপনে চুমু খাওয়া?

ওথেলো : অনৈতিক।

ইয়াগো : আর স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া?

ওথেলো : এ তো ভীষণ গর্হিত অপরাধ। বাইরে ভালোমানুষী, আর গোপনে নারকীয় পাপ—

ইয়াগো : হ্যাঁ স্যার। গোপনে অপরাধ করে কত মানুষ ভালো সেজে আছে। আচ্ছা স্যার। আমি যদি আমার স্ত্রীকে একটি রুমাল দিই—

ওথেলো : হ্যাঁ বল—

ইয়াগো : তখন ওটা ওর জিনিস হয়ে গেল। এবং তখন ও যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দিতে পারে?—

ওথেলো : কী বলছ! সতীত্বটাও তো ওর নিজের। তাহ'লে কি ওটা ও দিয়ে দিতে পারে?

ইয়াগো : সতীত্ব তো স্যার, চোখে দেখা যায় না। কিন্তু রুমাল?

ওথেলো : ঈশ্বরের দোহাই। এসব কথা আমি ভুলে থাকতে চাই। তুমি এ কথা বল আর মাথার ভেতর হাজার শকুন যেন আমার মগজ খুবলে খেতে থাকে। ওর হাতে আমার রুমাল দেখেছো?

ইয়াগো : হ্যাঁ, স্যার!

ওথেলো : থাক, ওটা পুরোনো হয়ে গেছে।

ইয়াগো : আর আমি যদি দেখি ও আপনার নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে।

ওথেলো : কুৎসা? কি বলেছে সে?

ইয়াগো : তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে হয়ত অস্বীকার করবে।

ওথেলো : কী বলেছে?

ইয়াগো : আমার তা বলা উচিৎ হবে না স্যার—

ওথেলো : বল না।

ইয়াগো : সে নাকি আপনার শোবার ঘরেও যায়। আপনার শয্যায় নাকি শুয়েও থাকে—

ওথেলো : কী বলছ? ওর এত সাহস!

ইয়াগো : কী আর বলব স্যার। সে আর কহতব্য নয়। আপনার রুমালটিকে নিয়ে যা সব করে— চুমু খায়, মুখের ওপর, বুকের ওপর বোলায়— আর ডেসডিমোনার নাম ধরে ডাকে আর কথা বলে— যেন ডেসডিমোনা নিজে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে—

ওথেলো : চুপ কর!! [গর্জন করে] রুমাল, রুমাল, আমার রুমাল! কোথায় ওটা? বল, স্বীকার কর, কাকে দিয়েছো! বল আমার রুমাল কোথায় রেখেছো— [মুর্ছিত হয়]

ইয়াগো : হ্যাঁ, কাজ করছে। ওষুধে কাজ করছে। বোকা হাবাগুলো জালে আটকেছে। আর সতীসাধ্বী সুলোচনা সেই সঙ্গে গাল খেয়ে মরছে! আরে! লেফট্যান্যান্ট মশাই! [ক্যাশিওর প্রবেশ] কেমন আছেন লেফট্যান্যান্ট সাহেব।

ক্যাশিও : এমন করে পড়ে আছেন কেন, কি হয়েছে ওঁর?

ইয়াগো : অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। এ নিয়ে দু'বার। গতকাল একবার হয়েছিল।

ক্যাশিও : কপালের দুপাশটা একটু রগড়ে দিলে ভালো হবে। [দিতে চায়]

ইয়াগো : [বাধা দেয়] না, ওসব করতে হবে না। আপনা থেকেই জ্ঞান ফিরে আসবে। একটু পরেই মুখে গ্যাজলা উঠবে। তারপর পাগলের মত হাত পা ছুঁড়তে থাকবে। আরে নড়ে উঠলেন যেন। চলে যান, চলে যান। ওর জ্ঞান ফিরে এলে ভেতরে চলে যাবেন। তখন আসবেন। অবসর মত আলাপ-সালাপ করা যাবে। [ক্যাশিও বেড়িয়ে যায়] মাথায় লেগেছে স্যার?

ওথেলো : ইয়ার্কি করছ?

ইয়াগো : ইয়ার্কি করবো আপনার সাথে? এ আপনি কী বলছেন স্যার? স্যার, সাধারণ মানুষের মত ভাগ্যটারে মেনে নিন, স্যার।

ওথেলো : মেকী ভদ্রলোকগুলো সব জানোয়ার বিশেষ।

ইয়াগো : জনাকীর্ণ নগরীতে তেমনি জানোয়ারই বেশী স্যার।

ওথেলো : ওকি নিজের মুখে স্বীকার করেছে ওসব কথা?

ইয়াগো : স্যার ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টাকে ভাবুন। এই শহরে অনেক বিবাহিত পুরুষ আছেন, যারা দেখতে অনেকটা আপনার মত। তারা অনেকেই পরস্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। তারা কি তা কখনো স্বীকার করে? আপনার ব্যাপারটাতো অনেক ভালো। তাকে স্বাভাবিক বলে ভেবে নিতে কোন অসুবিধে নেই—

ওথেলো : তুমি খুবই বিচক্ষণ, ইয়াগো।

ইয়াগো : আপনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকুন। ওই ক্যাশিও ব্যাটা এখন আসবে। আপনি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন না, একটু আগে? তখন ঐ ব্যাটা এসেছিল। আপনি অসুস্থ— একথা বলে তাড়িয়ে দিয়েছি ব্যাটাকে। বলেছি, পরে আসতে। আপনি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনুন। তাহ'লে আপনি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারবেন অনেকটা। যান, সরে যান স্যার।[ওথেলো যায়] ক্যাশিও এলে আমি ওকে বিয়াংকার কথা জিজ্ঞাসা করব। এই মেয়েলোকটি বিবাহিতা, কিন্তু দেহ বিক্রি করে পেট চালায়। মেয়েলোকটি আবার ক্যাশিওকে ভালোবাসে। যখন সে এই বিয়াংকার কথা শুনবে, তখন সে না খুশী হয়ে পারবে না, খুশীতে একেবারে ফেটে পড়বে— [স্বগত] ওই তো সে এলো। সে হাসবে আর ওথেলো জ্বলবে তলে তলে। অশিক্ষিত মাথামোটা নিগ্রোটা ক্যাশিওর হাসির অন্য রকম অর্থ করবে— ডুববে দুটোই। [ক্যাশিওর প্রবেশ] কেমন আছেন লেফট্যান্যান্ট সাহেব?

ক্যাশিও : ওই পদবীটি ধরে আমাকে আর ডাকবেন না। ও ডাক শুনলে আমি মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করি।

ইয়াগো : ডেসডিমোনাকে ধরুন। অবশ্যই সে পদ আবার ফিরিয়ে পাবেন। আচ্ছা, এখন যদি আপনার প্রেমিকা বিয়াংকার ঘরে আসতেন, তাহ'লে কেমন তাড়াতাড়ি পা ফেলতেন!

ক্যাশিও : আরে সে আর বলতে! [হাসতে থাকে]

ওথেলো : দেখো, এখনই হাসতে শুরু করেছে!

ইয়াগো : বিয়াংকা আপনাকে যত ভালবাসে কোন নারী এত বেশী করে কোনো পুরুষকে ভালবাসে না।

ক্যাশিও : না, না, এত বেশী নয়, তবে মনে হয় আমাকে সে ভালবাসে।

ওথেলো : এখন সে মৃদুভাবে কিছু অস্বীকার করল।

ইয়াগো : শুনছেন, মিঃ ক্যাশিও?

ওথেলো : এযে তাকে কিছু কবুল করতে বলছে। বেশ বেশ চালিয়ে যাও।

ইয়াগো : সে বলছে তুমি নাকি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ। বিয়ে করবে?

ক্যাশিও : হা - হা - হা - হা - কী যে বলছ?

ওথেলো : জিতে গেছ ব্যাটা, জিতে গ্যাছ? এ্যাঁ?

ক্যাশিও : আমি বিয়ে করব তাকে! এমন একটা নষ্ট মেয়েমানুষকে! দোহাই তোমার, আমার বুদ্ধির ওপর কিছুটা ভরসা রাখ। হা - হা - হা - হা -

ওথেলো : তারাই হাসে, যারা জেতে—

ইয়াগো : চারদিকে তো রটেছে, আপনি তাকে বিয়ে করছেন—

ক্যাশিও : মানে? আচ্ছা, সত্যি কথাটা বলো দেখি?

ইয়াগো : হাঁঃ হাঁ, আমার চোখে সবই ধরা পড়ে—

ওথেলো : আমার ওপর টেক্কা দিয়েছো? এ্যাঁ? আচ্ছা—

ক্যাশিও : এটা তার মনগড়া কথা। এই মেয়েটি নিজেই রটাচ্ছে যে আমি তাকে বিয়ে করব।

ওথেলো : ইয়াগো আমাকে ইশারায় বলছে, এখন সে তার আসল কাহিনী শুরু করবে।

ইয়াগো : রুমালটি কি করেছো?

ক্যাশিও : বিয়াংকাকে দিয়ে দিয়েছি—

ইয়াগো : — কেন? কেন?

ক্যাশিও : সেদিন আমার ঘরে গিয়ে এমন আদিখ্যেতা শুরু করল না। কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না।

ইয়াগো : একটু জোরে বল। শুনতে পারছি না।

ক্যাশিও : আমার গলা জড়িয়ে ধরল, চুমু খেল, গায়ে গা ঘষতে লাগল। তাই—

ইয়াগো : আরে ঐ তো তোমার বিয়াংকা আসছে।

ক্যাশিও : এবার পেলে আর রক্ষা নেই, পালাই ভাই, পালাই। [পলায়ণ]

ইয়াগো : ক্যাশিওকে চলে যেতে দেখে বিয়াংকাও অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে পেলে অনেক কাজ হবে। এর হাতে যদি ওথেলো তার রুমালটা দেখতে পায়, আর বিয়াংকার মুখ থেকেই শুনতে পায় যে ক্যাশিও তাকে রুমালটা দিয়েছে তাহলেই কারবার ফতে। বারুদ তো তেতেই আছে। এবার একটু স্ফুলিঙ্গ। যাই বিয়াংকাকে ডেকে নিয়ে আসি—[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ওথেলো এবং ইয়াগো]

ওথেলো : কেটে কুচি কুচি করে ফেলবো, আমার সঙ্গে প্রতারণা!

ইয়াগো : অন্যায়। অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়।

ওথেলো : আমার কর্মচারীর সঙ্গে গোপন অভিসার!

ইয়াগো : এ তো আরো অন্যায়!

ওথেলো : আমাকে বিষ দাও ইয়াগো! আমি বিষ খাব। আমি আর মুখ দেখবো না তার। তার সৌন্দর্য আর আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না।

ইয়াগো : বিষ প্রয়োগেই কাজটা সেরে ফেলুন স্যার। তাকে বিছানার মধ্যেই মেরে ফেলুন। আপনার বিছানাটা পর্যন্ত কলুষিত করল!

ওথেলো : হ্যাঁ। তাই ভাল। উচিৎ সাজা।

ইয়াগো : আর ক্যাশিওর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। মাঝরাতের মধ্যেই তার খবর পাবেন।

ওথেলো : ভালো, চমৎকার! [শিঙ্গাধ্বনি] শিঙ্গাধ্বনি কিসের?

ইয়াগো : মনে হয় ভেনিসের কোন বার্তাবাহক—[লোডোভিকো, ডেসডিমোনা এবং পারিষদবর্গ] মি: লোডোভিকো এসেছেন ডিউকের কাছ থেকে। দেখুন আপনার স্ত্রীও এসেছেন।

লোডো : ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মহামান্য সেনাপতি!

ওথেলো : আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছি, মহোদয়।

লোডো : ভেনিসের ডিউক ও সেনেটরগণ আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। [একটি প্যাকেট দিলেন]

ওথেলো : তাদের অভিনন্দনের স্মারককে শতসহস্র চুম্বন। [প্যাকেট খুলে চিঠি পড়তে থাকে]

ডেসডি : ভালো আছেন মি: লোডোভিকো?

লোডো : ভালো!

ইয়াগো : হুজুর আপনাকে দেখে খুব খুশী হলুম।

লোডো : ধন্যবাদ। লেফট্যান্যান্ট ক্যাশিও কেমন আছেন?

ইয়াগো : আছেন একপ্রকার। মানে বেঁচে আছেন আর কি?

ডেসডি : আচ্ছা, ওথেলো এবং এর মধ্যে এখন ভাল সম্পর্ক নেই। তবে আপনি যখন এসেছেন, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওথেলো : এ কি সত্যি?

ডেসডি : কি গো?

ওথেলো : [পড়তে থাকে] 'এ অবশ্য আপনার ইচ্ছাকৃত নয়'—

লোডো : তিনি আমাদের কথা শুনছেন না। পত্রপাঠে ব্যস্ত আছেন। আচ্ছা, সেনাপতি

মশায় এবং ক্যাশিওর মধ্যে কি বিচ্ছেদ ঘটেছে?

ডেসডি : খুবই দুঃখের বিষয়। ওঁকে বোঝাতে খুব চেষ্টা করছি। মিঃ ক্যাশিওর জন্যে খুব খারাপ লাগে কিনা—

ওথেলো : আগুন! বারুদ!

ডেসডি : কীগো, কী হোলো!

ওথেলো : তোমার মাথায় কিছু আছে?

ডেসডি : তিনি খুব রেগে গেছেন!

লোডো : হয়ত বা চিঠির মধ্যে কিছু— তাঁকে ভেনিসে ফিরে যেতে বলা হয়েছে, তাঁর জায়গায় ক্যাশিওকে কাজ করতে বলা হয়েছে।

ডেসডি : এতো খুব ভালো কথা! আমি ভীষণ খুশী হয়েছি!

ওথেলো : হবেই তো!

ডেসডি : মানে? তুমি হওনি?

ওথেলো : আমি খুশী হয়েছি তোমাকে পাগল হতে দেখে।

ডেসডি : কী বলতে চাইছো তুমি? খুলে বল না—

ওথেলো : শয়তানী [আঘাত করে]

ডেসডি : শুধু শুধু আমাকে মারলে।

লোডো : একি করলেন সেনাপতি মশায়! ভেনিসে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। ওঁকে প্রবোধ দিন। উনি কাঁদছেন।

ওথেলো : শয়তানী! শয়তানী! ওর চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা থেকে একেকটি কুমীরের বাচ্চা জন্ম নিতো, যদি পৃথিবীর মাটির গর্ভধারণ ক্ষমতা থাকতো। যাও, দূর হও এখান থেকে!

ডেসডি : ঠিক আছে চলেই যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত]

লোডো : খুবই কোমল স্বভাবের মেয়ে। তাকে ডাকুন।

ওথেলো : গিন্নী! [ডেসডিমোনা দাঁড়ায়। এক পা এগোয়।] ওর সঙ্গে আপনার কোন কথা আছে?

লোডো : কার সঙ্গে?

ওথেলো : আপনি বলেছিলেন তাই ওকে ফিরিয়ে আনলুম। ও যাবে, আবার ফিরে আসবে, আবার ফিরে আসবে। কাঁদতে পারে— বুঝলেন— কাঁদতে পারে। বড় সুন্দর করে মেকী কান্নায় ভুলিয়ে দিতে পারে। যাও, যাও এখান থেকে। হ্যাঁ, মশাই। ভেনিসের আদেশ আমি মেনে নিচ্ছি। কালই ফিরে যাব ভেনিসে — যাও! [ডেসডিমোনার প্রস্থান] আমার জায়গায় বসবে ক্যাশিও! হুঁ! যাইহোক। আপনি সাইপ্রাসে এসেছেন, এ উপলক্ষে নৈশভোজে আজ আপনার আমন্ত্রণ রইলো। চল্লাম। [প্রস্থান]

লোডো : এই কি আমাদের সেই মহান সেনাপতি, যাকে আমাদের ভেনিসের সকল সেনেটর একবাক্যে বলেছেন 'সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ'। ধৈর্য, স্থৈর্য, বিচক্ষণতার জন্য যিনি

উচ্চপ্রশংসিত!

ইয়াগো : হেঁ, হেঁ, তিনি অনেক পাল্টে গেছেন।

লোডো : মহাশয় কোন গোলমাল হয়নি তো?

ইয়াগো : যা হবার কথা তাই হয়েছে। আমি হলে তো কবেই আত্মহত্যা করতুম!

লোডো : কিন্তু স্ত্রীকে মারলেন? এটা কেমন করে চলতে পারে?

ইয়াগো : এ শাস্তি তো কিছুই নয় স্যার। আমি জানি তাতে তো একে খুবই কম শাস্তি বলতে হবে।

লোডো : এই বুঝি তিনি করে থাকেন? নাকি ভেনিসের পত্র তাঁর মাথা গরম করে দিয়েছে?

ইয়াগো : দেখুন স্যার, অনেক ব্যাপার আছে। কিন্তু আমার কিছু বলা ঠিক হবে না। আপনি নিজেই দেখবেন সবকিছু।

লোডো : ওঃ! যেমন ভেবেছিলাম, তিনি তেমন নন।

তৃতীয় দৃশ্য

সাইপ্রাস ।। দুর্গের অভ্যন্তর ।।

[ওথেলো এবং এমিলিয়া]

ওথেলো : তুমি কিছুই দেখনি তাহলে?

এমিলি : না স্যার। এমন কিছু শুনিওনি, এমন কি সন্দেহ করার মত কারণও ঘটেনি।

ওথেলো : তুমি তাকে ক্যাশিওর সঙ্গে দেখেছিলে?

এমিলি : হ্যাঁ স্যার। কিন্তু দোষের কিছু দেখিনি। ওদের প্রতিটি কথা আমি শুনতে পেয়েছি।

ওথেলো : ওরা কখনও কানে কানে কথা বলেনি?

এমিলি : কখনও না স্যার।

ওথেলো : বাইরে পাঠায়নি তোমাকে, কোন কাজে?

এমিলি : কক্‌খনো না।

ওথেলো : ওর পাখা, দস্তানা কিংবা অন্যকিছু আনতে?

এমিলি : না!

ওথেলো : আশ্চর্য!

এমিলি : আমি দিব্যি করে বলতে পারি, উনি নিষ্পাপ। যদি অন্যরকম ধারণা আপনি করে থাকেন তাহ'লে তা মন থেকে দূর করে দিন, স্যার। আমি বলছি, উনি পবিত্র, পৃথিবীর যে কোন নারীর চেয়ে উনি পবিত্র।

ওথেলো : ওকে এখানে আসতে বলো। [এমিলিয়ার প্রস্থান] ওতো অনেক কথা বলল। কিন্তু ও সরল, নির্বোধ। হয়ত টের পায়নি। আমার উনি তো ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ। সব গোপন করে রেখে, সতীসাধ্বী সেজে, হাঁটু গেড়ে, ঈশ্বরের দিকে চেয়ে থাকবে। কি অভিনয়! হ্যাঁ, আমি নিজে তার সাক্ষী। [এমিলিয়া ডেসডিমোনাকে নিয়ে ফিরে আসে] এই যা হয়েছে ভুলে যাও। এদিকে এসো।

ডেসডি : কেন?

ওথেলো : দেখি তোমার চোখগুলো। আমার মুখের দিকে তাকাও।

ডেসডি : কেন?

ওথেলো : [এমিলিয়াকে] তোমার কাজ হলো বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। দরজাটা ভেজিয়ে দাও। কেউ এলে কাশবে, অথবা ডেকে জানান দেবে। যাও। [এমিলিয়ার প্রস্থান]

ডেসডি : আমি মিনতি করছি, যা বলার খুলে বল। আমি বুঝতে পারছি, ভেতরে একটা রাগকে তুমি পুষে রেখেছো। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করছ না। দিন দিন তোমার শরীরটা কী হয়েছে একবারে দেখছ?

ওথেলো : তুমি কে?

ডেসডি : কেন তোমার স্ত্রী, তোমার বিশ্বস্ত সহধর্মিনী, তোমার ডেসডিমোনা।

ওথেলো : মৃত্যু হোক তোমার! দেখতে দেবীর মত পবিত্র কিন্তু নরকের শয়তানও তোমাকে ছুঁতে ভয় পাবে। প্রতিজ্ঞা করে বল— তুমি নিষ্কলঙ্ক।

ডেসডি : ঈশ্বর জানেন আমি কি।

ওথেলো : ঈশ্বর জানেন তুমি কলঙ্কিনী। নরকের চাইতেও কলঙ্কিনী।

ডেসডি : আমি কলঙ্কিনী? কেন? কীভাবে? কে বলেছে?

ওথেলো : আঃ! যাও, যাও, যাও!

ডেসডি : হায়! কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম। কাঁদছ কেন? হয়ত, তুমি ভাবছ, আমার বাবা তোমাকে ভেনিসে ফিরিয়ে নেবার জন্য দাবী করেছেন। এর জন্য আমাকে দায়ী করতে পার না। তিনি তোমার যেমন শত্রু, তেমনি আমারও—

ওথেলো : এটা যদি আমার বিরক্তির কারণ হোতো, তাহ'লে আমার মুখে এত চুনকালি লাগতোনা। সময়ের বিদ্রূপের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু এ আমি! আজ আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও। রূপবতী শয়তানী! হ্যাঁ, নরকের বিষন্নতা নামিয়ে আন মুখে।

ডেসডি : আমাকে ভুল বুঝেছো তুমি। তুমি কি মনে করনা, আমি পবিত্র?

ওথেলো : হ্যাঁ, পবিত্র! অবশ্যই পবিত্র! পচা জঞ্জালের ওপর যে মাছিরা বসে থাকে আর বাতাস লাগলেই ভন্ ভন্ করে উড়তে থাকে, তাদের মত পবিত্র। একটা সুন্দর ফুলের মত মুখ নিয়ে তোমার মত মেয়ের যদি জন্ম না হ'ত তাহলেই ভাল হ'ত।

ডেসডি : হায়! অজান্তে কি অপরাধ না জানি করে ফেলেছি!

ওথেলো : যদি ও মুখখানা একটি সাদা কাগজ হোতো তাহ'লে তাতে লেখা হত 'দেহপসারিনী!' কী অপরাধ করেছি! যদি আমি বলতুম, কী তোমার অপরাধ, তাহ'লে স্বর্গের দেবতাদের মুখমণ্ডলও বিবর্ণ হয়ে যেত, চাঁদ ডুবে যেত অন্ধকারে। যে নির্মল বাতাস সকলের গায়ে বুলিয়ে দেয় মমতার হাত, সেও লজ্জায় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে ঢুকে যেত পাতালের গর্তে। কী করেছি! ব্যভিচারিনী, ভ্রষ্টা মেয়েছেলে!

ডেসডি : হায় ঈশ্বর! কী বলছ এসব?

ওথেলো : তুমি ভ্রষ্টা নও?

ডেসডি : না, যদি ঈশ্বর সত্য হয়ে থাকেন। তার দেওয়া এই দেহকে শুধু আমার পতি ছাড়া আর কারো ভোগ্য করার মত কদর্য ইচ্ছা আমার কখনো জাগেনি। আমি ভ্রষ্টা নই।

ওথেলো : তুমি দুশ্চরিত্রা নও?

ডেসডি : না, তাহলে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না।

ওথেলো : এ কি সম্ভব?

ডেসডি : হে ভগবান! দয়া কর!

ওথেলো : তোমাকে করুণা করতে আমি ডাক ছেড়ে বলছি। তোমাকে ভেনিসের সেই ধূর্ত বেশ্যাটির মত মনে হয়— যার ঘর ছিল সেন্ট পিটারের বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে— নরকের ফটকটা যে সর্বদা খুলে রাখত। [এমিলিয়ার প্রবেশ] ও তুমি এসেছো। আমাদের কথা শেষ হয়েছে। এই রইল তোমার বকশিস্। দরজা বন্ধ করে দাও। [প্রস্থান]

এমিলি : হায় ভগবান। ভদ্রলোক কি ভাবছেন? কেমন আছেন ম্যাডাম? কেমন আছেন আপনি?

ডেসডি : আমার ঘুম পাচ্ছে—

এমিলি : ম্যাডাম, সেনাপতির কী হয়েছে?

ডেসডি : কার?

এমিলি : আমার মনিব, আপনার স্বামী?

ডেসডি : আমার কোন স্বামী নেই, কেউ নেই, কেউ নেই— [কান্নাকে আটকে রাখে] এমিলিয়া, দিদি আমার, আজ রাতে আমার বিছানায় বাসরশয্যার চাদরখানি বিছিয়ে দিও। তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাকে দেহদান করব। আমি ভ্রষ্টা হব। [কাঁদে]

এমিলি : একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই! [প্রস্থান]

ডেসডি : যা করেছে ঠিকই করেছে। আমার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহারই করা হয়েছে। যে বিরাট অপরাধ আমি করেছি, সে তুলনায় খুব অল্প শাস্তিই প্রদান করা হয়েছে। [এমিলিয়া ইয়াগোকে নিয়ে এল]

ইয়াগো : কেন ডেকেছেন ম্যাডাম? কি হয়েছিল?

ডেসডি : বলতে পারি না। তিনি আমাকে বকেছেন। ছোট শিশুর মত আমাকে তিনি গালি দিয়েছেন।

ইয়াগো : কি হয়েছিল?

এমিলি : সাহেব ম্যাডামকে দুশ্চরিত্রা বলেছেন।

ডেসডি : আমি কি তাই ইয়াগো?

ইয়াগো : কি ম্যাডাম?

ডেসডি : এই যে এমিলিয়া বলল আমাকে উনি যা বলেছেন—

এমিলি : দেহপসারিনী বলেছেন—
ইয়াগো : কেন? কেন?
ডেসডি : জানিনা।
ইয়াগো : কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। আজকের দিনটা বোধ হয় ভালো নয় আপনার জন্যে।
এমিলি : এর জন্যই কি তিনি অনেক ভালো ভালো বিয়ের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন? নিজের পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ত্যাগ করেছেন? খারাপ মেয়েমানুষ আখ্যা পাবার জন্যে? একথা বললে কে না কাঁদবে শুনি?
ইয়াগো : না না, এর জন্য স্যারের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। কিভাবে এসব চিন্তা ওর মাথায় ঢুকল?
ডেসডি : ঈশ্বর জানেন—
এমিলি : আমি জোর গলায় বলতে পারি, এ হ'ল এমন এক শয়তানের কাজ, অন্যের ক্ষতি করেই যে নিজের মতলব হাসিল করে—
ইয়াগো : ধেৎ! এমন লোক আছে নাকি!
ডেসডি : এমন লোক যদি থাকেও, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন।
এমিলি : তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হোক, নরকে পচে মরুক সে। কোন্ বদমায়েস আমাদের সেনাপতিকে বিগড়ে দিয়েছে? পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত তাকে ন্যাংটো করে চাবুক মারতে মারতে হাঁটিয়ে নেয়া হোক।
ইয়াগো : আহা, অমন অশ্লীলভাবে কথা বলছ কেন? ভদ্রতা রেখে কথা বল।
এমিলি : রাখ তোমার ভদ্রতা। কোন শয়তান যদি অকারণে এভাবে আমার নামে বদনাম দিত তাহ'লে আমি তার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে ছাড়তুম।
ইয়াগো : ধেৎ! মাথায় কিচ্ছু নেই!
ডেসডি : হায় ভগবান! কিন্তু মিঃ ইয়াগো, ওঁর মন পেতে আমাকে কী করতে হবে বলুন ত—
ইয়াগো : এ নিয়ে বেশী ভাববেন না। মেজাজ খারাপ থাকায় হয়ত তিনি এসব কথা বলে ফেলেছেন।
ডেসডি : হায় ঈশ্বর! তাই যেন হয়।
ইয়াগো : এছাড়া আর কিছুই নয়। [নেপথ্যে শিঙ্গা বাজে] ঐ বাজনাগুলো আপনাকে আকুল হয়ে ডাকছে। খাবারের টেবিলে ভেনিসের বার্তাবহ সম্মানিত অতিথিরা বসে আছেন। যান, যান, কাঁদবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

[ডেসডিমোনা এবং এমিলিয়ার প্রস্থান]

[রোডারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : কেমন আছ হে রোডারিগো!
রোডা : আমার প্রতি তুমি মোটেই সুবিচার করছ না হে।
ইয়াগো : কি হলো আবার?
রোডা : প্রতিদিন তুমি একটা না একটা ছল করে ভুলিয়ে রাখ। আমার আশা পূরণের

বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তোমার নেই। বুঝলে, বেশীদিন আমি সহ্য করব না। আমাকে নিয়ে তুমি যা করেছো, সব আমি ফাঁস করে দেবো।।

ইয়াগো : আমার কথা শুনবে?

রোডা : অনেক, অনেক শুনেছি। কথায় আর কাজে মিল নেই তোমার।

ইয়াগো : অকারণে দোষারোপ করছ ভাই।

রোডা : অকারণে? তোমার কথায় টাকা ঢালতে ঢালতে আমি ফতুর হতে চলেছি। যত অলঙ্কার ডেসডিমোনাকে দেবে বলে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছো সেগুলি দিয়ে একজন ধর্মযাজকেরও মন ভেজানো যায়। তুমি আমাকে বলেছ, সেগুলো পেয়ে ও খুশী হয়েছে এবং শীঘ্রই আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু কিছুই হ'ল না।

ইয়াগো : যাও, যাও, যা করেছি ভালো করেছি।

রোডা : ভালো করেছো! আমিও ছেড়ে দেবো না বাছা। মনে রেখো।

ইয়া : ঠিক আছে, যা পার , কর।

রোডা : এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমি সরাসরি দেখা করব ডেসডিমোনার সাথে। যদি সে আমার দেওয়া গয়নাপত্র ফেরৎ দেয়, তাহলে আমি কোনদিন তাকে আর চাইব না এবং অবৈধ প্রস্তাব করার জন্য ক্ষমা চাইব। যদি তা না হয়, তাহ'লে জেনে রাখ, যা দিয়েছি, সব তোমার থেকে উসুল করে নেব।

ইয়াগো : অনেক বলেছ, এবার থামো।

রোডা : না কিছুই বলা হয়নি। তুমি কিছু করছ না আমার জন্য— তার প্রতিবাদ জানালুম মাত্র। পরিণাম কি হতে পারে ভেবে রেখো।

ইয়াগো : বাঃ, বাঃ! এইতো মরদের মত কথা। বেশ হাত মেলাও বন্ধু। আমি কিন্তু তোমার জন্যে খুব ঝুঁকি নিয়েই এগোচ্ছি।

রোডা : তার কোন লক্ষণ দেখছি না।

ইয়াগো : তা মানি। তোমার সন্দেহ অকারণ নয়, অযৌক্তিকও নয়। রোডারিগো, আজ যে সাহস, যে বুদ্ধি, যে পৌরুষ দেখালে তার কিছু প্রমাণ রাখো আজ রাতে। একটা কাজের মত কাজ। যদি করতে পার কালই দেখবে সুন্দরী ডেসডিমোনা, তোমার শয়নকক্ষে। যদি তা না হয়, আমাকে মেরে ফেলো।

রোডা : ঠিক আছে। কি করতে হবে?

ইয়াগো : শোনো, ভেনিস থেকে আদেশ এসেছে, ক্যাশিওকে বসানো হবে ওথেলোর জায়গায়।

রোডা : সত্যি? তাহলে তো ওথেলো ফিরে যাবে ভেনিসে, ডেসডিমোনাকে নিয়ে—

ইয়াগো : আরে না, সে যাবে সুদূর মৌরাটানিয়ায়, তোমার সুন্দরী স্বপ্নের রানী ডেসডিমোনাকে নিয়ে। যদি কোন দুর্ঘটনায় সে এখান থেকে যেতে বাধ্য হয় তাহ'লে অবশ্য অন্য কথা। সেক্ষেত্রে ক্যাশিওকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রোডা : সরিয়ে দেয়া? কী ভাবে?

ইয়াগো : মাথাটা ফাটিয়ে দিলে কী হয়?

রোডা : কাজটা কি আমাকেই করতে হবে?

ইয়াগো : হ্যাঁ। যদি করতে পার স্বপ্ন তোমার সফল হবে। আজ রাতে ও যাবে গণিকালয়ে। বিয়াংকার ঘরে ফূর্তি করতে। ফিরবে বারোটা-একটায়, ফেরার পথেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমি থাকবো কাছাকাছি। মার খেয়ে যখন পালাতে চাইবে তখন, পড়বে আমার হতে। চল, চল, সব বুঝিয়ে বলছি।

রোডা : ঠিক আছে— [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ওথেলো, ডেসডিমোনা, লোডাভিকো, এমিলিয়া এবং পরিচারিকাবৃন্দ]

লোডা : আর বেশীক্ষণ রাত জেগে থাকবেন না, স্যার।

ওথে : কিছুক্ষণ হাঁটলে ভালো হবে।

লোডা : তাহলে চলি ম্যাডাম। শুভরাত্রি। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ডেসডি : ধন্যবাদ, আবার আসবেন। [লোডাভিকোর প্রস্থান]

ওথে : ডেসডিমোনা?

ডেসডি : আজ্ঞে!

ওথে : তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি একটু পড়ে আসছি। এমিলিয়াকে বিদায় করে দিও। অবশ্যই দেবে।

ডেস : দেব।

ওথে : মনে থাকে যেন। [ওথেলো এবং পরিচারিকাবৃন্দের প্রস্থান]

এমিলি : এখন কেমন মনে হচ্ছে? তাকে অনেক শান্ত দেখাচ্ছে।

ডেসডি : বলেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছেন। আমাকে বলেছেন শুয়ে পড়তে আর তোমাকে ছুটি দিয়ে দিতে।

এমিলি : ছুটি দিয়ে দিতে!

ডেসডি : ওঁর আদেশ, এমিলিয়া। (আমাকে) রাতের পোষাকটা দিয়ে তুমি বাড়ী চলে যাও। কোনভাবে ওঁকে চটানো উচিৎ হবে না।

এমিলি : যদি কোনদিন ওঁকে না দেখতুম তাহ'লে ভাল হোতো।

ডেসডি : আমিও। যখন এঁর জেদ, ওঁর গোয়র্তুমি, ওঁর ভ্রূকুটি আমি লক্ষ্য করি, বিশ্বাস করো, এ সবের মধ্যেও প্রেমের সকাতর হাতছানি, দেখতে পাই।

এমিলি : বিছানায় যে চাদরগুলো পেতে দিতে বলেছিলেন, সেগুলো পেতে দিয়েছি।

ডেসডি : কত নির্বোধ ভাবনা মাথায় আসে! এমিলিয়া, আমি মরলে, ওই চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে দিও।

এমিলি : ছিঃ! এসব কি বলছেন ম্যাডাম।

ডেসডি : আমার মায়ের এক পরিচারিকা ছিলো। বারবারি। (সে) প্রেমে পড়েছিল। প্রেমিক তাকে ছেড়ে চলে যায়। সে একটি গান গাইত — 'উইলোর গান'। একটি প্রাচীন লোকগাথা। তাতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেত তার ভাগ্যহত জীবনের কথা। ঐ গানটি গাইতে গাইতেই সে মরেছিল। আজ সারা রাত এ গান আমার মনের ভেতর গুমড়ে মরবে। সারা রাত হতভাগিনী বারবারির মত আমি গাইব ওই গান। লক্ষ্মীটি এখন এসো।

এমিলি : আপনার ঘুমের পোষাক কি এনে দেবো?

ডেসডি : না, এখানেই আমার পোষাক খুলে দিয়ে যাও, লোডাভিকো যথার্থ ভদ্রলোক, তাই না?

এমিলি : খুব ভালো, আর সুন্দর!

ডেসডি : কি সুন্দর কথা বলে!

এমিলি : ভেনিসের যে কোন নারী ওঁর ঠোঁটের একটু ছোঁয়া পেতে খালি পায়ে হেঁটে যাবে প্যালেস্তাইন পর্যন্ত, এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

ডেসডি : [গাইছে] শিকামের গাছের ছায়ায়, বিরহিনী বসেছিল একা,
আর গাইছিল, গাইছিল, সবুজ উইলোর গান।
গাও উইলো, গাও উইলো, গাও উইলো।।
তোমরা কেউ ওকে দোষী করো না; ওর মনের ব্যাথা আমি বুঝি।—
গাও উইলো, গাও উইলো, গাও উইলো।।
কেউ এলো বোধ হয়?

এমিলি : কেউ নয় বাতাস।

ডেসডি : আমার প্রেমিককে আমি বলেছি মিছে। তখন কী গান গেয়েছিল সে?
গাও উইলো, গাও উইলো, গাও উইলো।
তাহলে এসো এমিলিয়া। কে যেন কাঁদছে?

এমিলি : না, কেউ না।

ডেসডি : আমার চোখটাতে জ্বালা করছে। ওই লোকগুলো কী বলছে, আমি জানি। কিন্তু এমিলি, দিদি আমার, বলত, ওভাবে কী কোন নারী তার স্বামীকে প্রতারণা করতে পারে?

এমিলি : ও প্রশ্ন আর করবেন না—

ডেসডি : গোটা পৃথিবীটা যদি তোমার পায়ের কাছে এনে দেয়া হয়, তুমি কি এমন করবে?

এমিলি : আপনি পারবেন?

ডেসডি : না। এই স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে তা আমি পারবো না।

এমিলি : আমিও তা পারবো না, এমনকি অন্ধকারেও না।

ডেসডি : গোটা পৃথিবীর বিনিময়েও না?

এমিলি : এই ছোট্ট অপরাধটুকুর জন্য এ দাম খুব বেশী ম্যাডাম। পৃথিবীটা খুব বড়।

ডেসডি : খুব সুন্দর বলেছো। মনে হয় না পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে।

এমিলি : আছে হয়ত। কিন্তু আমার মনে হয়, এ জন্য ওদের স্বামীরাই দায়ী। হয়ত তাদের স্বামীরা ঘরের সম্পদ নিয়ে ঢেলেছে পরস্ত্রীর পায়ে। হয়ত বা মিথ্যে সন্দেহে কেড়ে নিয়েছে স্ত্রীদের স্বাভাবিক চলাফেরার স্বাধীনতা। হয়ত বা মেরেছে। দুনিয়ার স্বামীদের আমি জাগিয়ে দিতে চাই, তাদের স্ত্রীদেরও আছে তাদেরই মত বোধশক্তি। আমাদের কি আবেগ নেই, ইচ্ছে নেই ঠিক তাদের মতো? যে অপরাধ আমরা করি, সে অপরাধ করতে ওরাই আমাদের প্রলোভন দেখায়।

ডেসডি : শুভরাত্রি বোন, শুভরাত্রি। হে ঈশ্বর, প্রতিশোধ নিতে আমি যেন খারাপ হয়ে না যাই, যেন খারাপকে ভালো করে তুলি।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য । সাইপ্রাস । রাস্তা।

[ইয়াগো ও রোডারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো : এখানে এই খামের আড়ালে দাঁড়াও। সোজা এ পথ দিয়েই সে আসবে। তলোয়ারটি খুলে রাখ। এসো কোন ভয় নেই। আমি আছি, এর ওপর সব কিছু নির্ভর করছে, বুঝলে? একটুও ঘাবড়াবে না।

রোডা : কাছাকাছি থেকো। যদি ফসকে যায়?

ইয়াগো : এই তো। এখানে আছি। সাহস রাখো। তৈরী হয়ে থাকো। [সরে যায়]

রোডা : এ কাজে আমার বেশী আগ্রহ নেই। তবু, ইয়াগো যা বলল তাতে— ওইতো একটি লোক। এইবার এককোপে সাবার করব।

ইয়াগো : বেটাকে পাঠিয়েছি ভাল। এখন সে খুব তেতে আছে। যদি সে ক্যাশিওকে মারতে পারে, অথবা ক্যাশিও ওকে, কিংবা দুটোই দুটোকে— লাভ সবটাতেই। যদি রোডারিগো বেঁচে থাকে, তাহ'লে সে আমার বাপদশা ঘটিয়ে ছাড়বে। ডেসডিমোনাকে উপহার দেবার নাম করে যে সব গয়না আমি হাতিয়েছি, সেগুলো ফিরে পাওয়ার জন্যে আমাকে চাপ দেবে; আর যদি ক্যাশিও বেঁচে থাকে তাহ'লে সে ক্রমাগত উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে থাকবে, তার তুলনায় আমাকে ক্রমশই খাটো দেখাবে। তাছাড়া, নিগ্রো বেটা যদি সামনাসামনি সব কথা খোলাখুলি বলে দেয়, তাহলেই নিশ্চিত– আমার মরণ। হতে পারে না। দুটোর মধ্যে একটিও না। না, তাদের মরতেই হবে। ওইতো, সে আসছে।
[ক্যাশিওর প্রবেশ]

রোডা : তার হাঁটাচলা আমার জানা আছে। এইতো সে। বদমাস। মর্! মর্! ক্যাশিওকে আক্রমণ করে]

ক্যাশিও : আমাকে আক্রমণ করেছিস! শয়তান, তোকে বিলক্ষণ চিনি। আয় দেখে যা, মজা দেখে যা। [রোডারিগোকে ছোরা দিয়ে আঘাত করে]

রোডা : ওঃ! গেলাম! [ইয়াগো পেছন থেকে ক্যাশিওকে ছুরিবিদ্ধ করে]

ক্যাশিও : বাঁচাও! বাঁচাও! আহ্! জন্মের মত অচল হয়ে গেলাম। [ক্যাশিও পড়ে যায়। কিছুদূরে ওথেলো প্রবেশ করে।]

ওথেলো: ক্যাশিওর কণ্ঠ! ইয়াগো তার কথা রেখেছে।

রোডা : হায়। আমি গেলাম।

ওথে : তুমিও?

ক্যাশিও : বাঁচাও! বাঁচাও! আলো! ডাক্তার!

ওথেলো: হ্যাঁ, সেই। হে সাহসী ইয়াগো। তুমি সৎ, কর্তব্যপরায়ণ। বন্ধুর ক্ষতি তুমি সইতে পারনি, তুমি মহৎ। তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছো, বন্ধু। আর দুশ্চরিত্রা স্বৈরিনী! দ্যাখ, তোর গোপন প্রেমিকটি মরে গেছে। এখন তোর পালা। আসছি। আমি আসছি। আমার চোখ থেকে তোর সৌন্দর্যের মায়াজাল সরে গেছে। এখন তোর শয্যা কলঙ্কিত হবে তোর কলুষিত শরীরের রক্তে। [প্রস্থান]

[লোডাফিকো এবং মন্টিয়াগো কিছুটা দূরে]

ক্যাশিও : কে? কে? পাহাড়াদার? - খুন! খুন!

মন্টি : মনে হয় দুর্ঘটনা। কণ্ঠস্বর বড় বিপন্ন।

ক্যাশিও : বাঁচাও!

লোডা : শুনুন!

রোডা : হতভাগা শয়তান!

লোডা : দুজনে গোঙাচ্ছে। বড় ভয়ঙ্কর রাত্রি। মনে হয় মারামারি হয়েছে। আরো লোকজন না এনে কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। [প্রস্থান]

রোডা : চলে গেলো। তাহ'লে রক্ত যেতে যেতেই মরে যাবো।

[আলো হাতে ইয়াগো]

লোডা : শুনুন ।

মন্টি : আরে ও তো ওথেলোর দেহরক্ষী।

লোডা : হ্যাঁ, ঠিক সেই। খুব সাহসী।

ইয়াগো : কে ওখানে? মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতড়াচ্ছে, কারা ওরা?

লোডো : জানি না।

ক্যাশিও : এই যে শুনুন। ঈশ্বরের দোহাই। বাঁচান আমাকে।

ইয়াগো : কি হয়েছে? কে তুমি? আহা, অমন করে- কাতড়াচ্ছ?

ক্যাশিও : ইয়াগো? ভাই, আমি মরে যাবো। বাঁচাও আমাকে।

ইয়াগো : আরে লেফট্যান্যান্ট! কোন্ বদমায়েশ আপনার এমন দশা করেছে?

ক্যাশিও : মনে হয়, তাদের একটি ওখানে পড়ে আছে-

ইয়াগো : আপনারা কে? এদিকে আসুন, একটু ধরুন।

[লোডাফিকো, মন্টিয়াগো ক্যাশিওকে ধরে]

রোডা : বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!
ক্যাশিও : ওইতো, ও-ই মেরেছে।
ইয়াগো : খুনি! বদমাস! শয়তান! [রোডারিগোকে ছুরিকাঘাত করে]
রোডা : হায়রে বিশ্বাসঘাতক ইয়াগো। হায়রে নিষ্ঠুর, অমানুষ।
ইয়াগো : অন্ধকারের মধ্যে মানুষ খুন করা! অন্য ডাকাতগুলো কোথায়? এই শহরটা কি মরে গেছে? এ্যাঁ? উঠুন, জাগুন, খুন হয়েছে, খুন! আপনারা কারা? আপনারা কি ভদ্রলোক, না শয়তান?
লোডো : দেখেই বুঝে নিন,
ইয়াগো : আরে স্যার !! আপনারা!! স্যার, আপনাদের সাহায্য চাই স্যার। ঐতো আমার বন্ধু ক্যাশিও পড়ে আছে।
মন্টি : ক্যাশিও!
ইয়াগো : কোথায় লেগেছে ভাই?
ক্যাশিও : এই, এখানটায় [পিঠের কাছে দেখায়]
লোডো: এ অবস্থায় তোমাকে দেখবো ভাবিনি ক্যাশিও। আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। ওখানে কে?
ইয়াগো : দেখি তো। আলোটা নিয়ে আসুন। আরে রোডারিগো!
লোডো : ভেনিসের সেই রোডারিগো!
ইয়াগো : হ্যাঁ স্যার, আপনি ওকে চেনেন?
লোডো : হ্যাঁ চিনি।
ইয়াগো : আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা। এমন একটা বিশ্রী পরিবেশে এসে পড়লেন।
লোডো : আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি।
ইয়াগো : ক্যাশিও, ভাই, তুমি কেমন আছো? এই কারা আছো, ওকে নিয়ে যাও ডাক্তারের কাছে। ক্যাশিও, তোমার কি কারো সঙ্গে শত্রুতা ছিলো?
ক্যাশিও : না, ভাই। দুনিয়াতে কারো ক্ষতি আমি করিনি।
[ক্যাশিও এবং রোডারিগোর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়]
[এমিলিয়ার প্রবেশ]
এমিলি : হায়, হায়, কি হোলো, ওগো কি হোলো?
ইয়াগো : ক্যাশিওকে আক্রমণ করেছিল রোডারিগো আর তার দলবল। ক্যাশিওর অবস্থা আশঙ্কাজনক, রোধহয় বাঁচবে না। রোডারিগো মরে গেছে।
এমিলি : হায়! মিঃ ক্যাশিও খুবই ভালো লোক ছিলেন!
ইয়াগো : আরে গণিকালয়ে গেলে এভাবেই মরতে হয়। নিশ্চয়ই বাজে ব্যাপার হবে। প্রেম টেমের ব্যাপার তো! দেখি ওকে বাঁচানো যায় কিনা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ডেসডিমোনা তার শয্যায়। আলো হাতে ওথেলোর প্রবেশ।]

ওথে : ওইতো, ওইতো ঘুমিয়ে আছে। সর্বনাশী, কুহকিনী, ঘুমিয়ে আছে। নক্ষত্রগণ তোমরা

সাক্ষী। আমি তার রক্তপাত ঘটাবো না। তুষারশুভ্র তার মসৃণ কোমল ত্বকের ওপর একটুও আঁচড় দেবো না। তবু তাকে মারবো। তাকে মারবো আমি। না হয়, অনেক পুরুষ পুড়ে মরবে মোহময়ী শিখায়। নিভিয়ে দাও আলো, নিভিয়ে দাও। যদি তোমাকে নিভিয়ে দিই, ওগো প্রজ্বলন্ত শিখা, আমি আবার তোমাকে জ্বালাতে পারি, হয়ত অনুতাপে। কিন্তু একবার নিভিয়ে ফেলতে দাও, তোমার ছলনাময়ী সৌন্দর্যকে। আমি জানি না, কোথায় সেই প্রোমিথিও উত্তাপ, যেখান থেকে আরেকবার জ্বলে উঠতে পারে তোমার নির্বাপিত শিখা। যখন আমি তুলে নেব তোমার গোলাপ, আর তাকে দিতে পারব না সজীব পেলবতা। শুকিয়ে যাবে। তোমার বৃক্ষেই তার গন্ধ নিতে দাও। [চুম্বন] আর! কী হৃদয় জুড়ানো নিঃশ্বাস! যেন ন্যায়ের অসিকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ভেঙে ফেলবে। আরেকবার, আরো একবার। যখন তুমি থাকবে না, যখন তোমার প্রাণ আমি কেড়ে নেবো, যেন তখনো ভালোবাসি তোমাকে। তোমাকে ভালোবাসি। আরেকবার। শেষ বিদায়ের চুম্বন। এত মধুর, কখনো কি এত ভয়ঙ্করী হয়েছিল! আমি কাঁদব, বড় নিষ্ঠুর এ কান্না। হৃদয় নিঙ্‌ড়ানো। ভালোবাসা ব্যাথা দেয়, যাকে সে ভলোবাসে। জেগে গেছে।

ডেসডি : কে? ওথেলো? প্রিয় আমার, তুমি এসেছো?

ওথে : হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডেসডিমোন।

ডেসডি : ঘুমোবে না? এসো।

ওথে : রাতের প্রার্থনা সেরে নিয়েছো, ডেসডিমোনা?

ডেসডি : হ্যাঁগো।

ওথে : যদি তোমার মনে হয় এমন কোন অপরাধ করেছো, অথচ অনুতাপ করোনি। তাহ'লে তা সেরে নাও।

ডেসডি : কী বলছ তুমি?

ওথে : সেরে ফেল। তাড়াতাড়ি কর। আমি হাঁটছি। তোমাকে অপ্রস্তুত রেখে আমি বধ করব না। না, ঈশ্বর করুন— তোমার আত্মাকে আমি মারতে চাই না।

ডেসডি : হত্যা করবে?

ওথে : হ্যাঁ, তাই করব।

ডেসডি : ঈশ্বরের দোহাই, ক্ষমা কর।

ওথে : করলাম। অন্তর থেকে ক্ষমা করলাম।

ডেসডি : নিশ্চয়ই মারবে না আমাকে?

ওথে : হু।

ডেসডি : ভয় করছে আমার। তোমার চোখ দুটো ঘুড়ছে। কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তোমাকে! কোন দোষ ত করিনি। তবু ভয় করছে আমার।

ওথে : তোমার পাপের কথা ভেবে দেখ একবার।

ডেসডি : তোমাকে ভালোবাসি, এছাড়া কিছুই জানি না আমি।
ওথে : এ জন্যেই তোমাকে মরতে হবে।
ডেসডি : ভাবা যায় না একথা। হায় তুমি কেন ঠোঁট কামড়ে ধরেছ। এক জান্তব আবেগ তোমার সারা দেহখানি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এ যেন এক ধ্বংসের সংকেত। তবু, তবু ভাবি— এ পাশব আক্রোশ আমার দিকে ধাবিত নয়।
ওথে : চুপ! শান্ত হও।
ডেসডি : শান্ত হব। কিন্তু—
ওথে : যে রুমাল তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি তা ক্যাশিওকে দিয়েছো।
ডেসডি : দেই নি। বুকে হাত রেখে বলছি। তাকে ডেকে পাঠাও, তাকে জিজ্ঞাসা কর।
ওথে : সোনামনি । ভেবে দেখ। ভেবে দেখ, কি অন্যায় তুমি করেছ। তুমি এখন মৃত্যুশয্যায়।
ডেসডি : আমি মরব না।
ওথে : মরবে। একটু পরেই। যে পাপ করেছো, অকপটে তা স্বীকার কর। ঈশ্বরের নাম নিয়েও যদি তুমি অস্বীকার কর, তবু আমি তা বিশ্বাস করব না। উপযুক্ত প্রমাণ আমার হাতে। তোমাকে মরতেই হবে।
ডেসডি : হায় ঈশ্বর! করুণা কর!
ওথে : আমিও বলি, ঈশ্বর তোমাকে করুণা করুন।
ডেসডি : এবং তোমাকেও। ওগো, জীবনে কখনো তোমার সাথে আমি মিথ্যাচার করিনি। ক্যাশিওকে প্রেম নিবেদন করিনি কখনো। ওকে কিছু দেই নি আমি।
ওথে : আমার রুমাল। তার হাতে আমার রুমাল দেখেছি আমি। মিথ্যাবাদিনী আমার হৃদয়টাকে পাষাণ করে ফেলেছিস! আমি দেখেছি রুমাল!
ডেসডি : তাহ'লে সে বোধ হয় সেটা কুড়িয়ে পেয়েছে কোথাও। আমি দেই নি। ওকে এখানে ডেকে আন, ও বলুক—
ওথে : বলেছে।
ডেসডি : কী বলেছে?
ওথে : সে ওটা ব্যবহার করেছে। ভোগ করেছে তোমার হৃদয়কে।
ডেসডি : সত্যি?
ওথে : হ্যাঁ।
ডেসডি : ওকথা ও বলেনি, বলতে পারে না।
ওথে : ওর কথা চিরদিনের জন্য থামিয়ে দেয়া হয়েছে। ইয়াগো তার দায়িত্ব পালণ করেছে।
ডেসডি : কী বললে? তাকে হত্যা করা হয়েছে?
ওথে : হ্যাঁ। আমার প্রতিহিংসার আগুন থেকে নিস্তার ছিলো না তার।
ডেসডি : ওঃ। সে প্রতারিতে হয়েছে। কোন দোষ ছিলো না তার। হায় একি হোলো।

ওথে : চুপ্ কর্! কলঙ্কিনী। আমার সামনে, আমার সামনে তার জন্য শোক করা হচ্ছে।

ডেসডি : আমাকে তাড়িয়ে দাও। ত্যাগ করো। তবু মেরো না আমাকে।

ওথে : চুপ্ স্বৈরিনী!

ডেসডি : আমাকে কাল মার। অন্তত: আজকের রাতটি বাঁচতে দাও।

ওথে : না।

ডেসডি : আর কিছুক্ষণ সময় চাই।

ওথে : সময় চলে গেছে।

ডেসডি : শেষ প্রার্থনাটুকু করতে দাও।

ওথে : দেরী হয়ে গেছে [গলা টিপে ধরে]

ডেসডি : ওগো, ওগো, কী করছ তুমি, ওগো—

এমিলি : [নেপথ্যে] স্যার, স্যার, কি হল স্যার?

ওথে : আঃ, কে চীৎকার করছে! মরে নি? এখনো মরেনি? আমি নিষ্ঠুর, কিন্তু দয়ালু। বেশীক্ষণ কষ্ট দেব না। তাই, তাই—

এমিলি: [নেপথ্যে] কি হোলো স্যার? শুনতে পাচ্ছেন?

ওথে : কে ডাকে ?

এমিলি : [নেপথ্যে] একটা কথা ছিল স্যার?

ওথে : [স্বগত] ও, এমিলিয়া? দেখা যায়, মরে গেছে। মরে গিয়ে যেন ক্যাশিওর মৃত্যুর কথা বলছে। চীৎকারটা খুব বেশী হয়েছিল। হাঃ—আর নড়ছে না। ওকি সতী ছিল? মনে হয় আবার নড়ে উঠছে। না।

এমিলি : স্যার [বাইরে থেকে]

ওথে : [স্বগত] সে আসবে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে। আমার স্ত্রী। কিসের স্ত্রী! না, না, আমার কোন স্ত্রী ছিলো না। ওঃ অসহ্য! কী দুঃসহ সময়! মনে হয়, বিরাট একটা গ্রহণ লাগবে। ভয়ার্তা পৃথিবী এই করাল রাহুগ্রাস দেখে স্তব্ধ হয়ে যাবে।

এমিলি : আপনাকে একটা কথা বলব স্যার। দয়া করে দরজা খুলুন। দরজা খুলুন, স্যার।

ওথে : আরে, ভুলেই গিয়েছিলাম। এসো এমিলিয়া। [আস্তে ধীরে ধীরে। পর্দাটা টেনে দেয়] তুমি কোথায়? [দরজা খোলে] [এমিলিয়ার প্রবেশ] এখন এসেছ কেন?

এমিলি : শুনেছেন খুন হয়ে গেছে।

ওথে : কী, খুন হয়ে গেছে?

এমিলি : হ্যাঁ।

ওথে : চাঁদেরই দোষ। আজকের রাতটাতে চাঁদ খুব কাছে চলে এসেছে। পাগল করে দিয়েছে সবাইকে।

এমিলি : ভেনিসের ছেলে রোডারিগোকে খুন করে ফেলেছে ক্যাশিও।

ওথে : রোডারেগো মারা গেছে? আর ক্যাশিও?

এমিলি : ক্যাশিও মরেনি।
ওথে : ক্যাশিও মরেনি?
এমিলি : না
ওথে : কাজটাতে খুঁত ছিল তাহলে। প্রতিহিংসা, বড় শক্ত।
ডেসডি : হায়, অকারণ, অযথা এ হত্যা।
এমিলি : স্যার, এ কার চীৎকার?
ওথে : কার? কোথায়?
এমিলি : বাইরে। মনে হয় ম্যাডামের কণ্ঠস্বর। বাঁচাও, বাঁচাও! ম্যাডাম, আবার বলুন। ডেসডিমোনা, দিদি আমার। লক্ষ্মী দিদি আমার।
ডেসডি : আমি নির্দোষ। তবু মরছি।
এমিলি : হায় কে এ কাজ করল?
ডেসডি : কেউ না। আমি নিজে। বিদায়। [মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে]
ওথে : কেমন করে মরল?
এমিলি : হায় কে বলতে পারে?
ওথে : তুমি নিজের কানে শুনেছো। আমি মারিনি।
এমিলি : হ্যাঁ, উনি তো তাই বললেন।
ওথে : মিথ্যাবাদিনী সে। আমি-ই মেরেছি।
এমিলি : আপনি মেরেছেন! আমার ম্যাডাম স্বর্গের দূত, তিনি মহিয়সী। তাকে আপনি মেরেছেন? বেইমান! আপনি কালো, কিন্তু আপনি বাইরে যত কালো, তার চেয়েও অনেক বেশী কালো, নরকের দৈত্যের মত কালো।
ওথে : সে চরিত্রহীনা, কুলটা।
এমিলি : মিথ্যা কথা। আপনি শয়তান।
ওথে : এই নারী জলের মত ছলনাময়ী। মরিচিকা।
এমিলি : আপনি আগুনের মত নৃশংস। তাই বলতে পারছেন, ও ছলনাময়ী। জেনে রাখুন, ও ছিল স্বর্গের মত পবিত্র।
ওথে : ক্যাশিও ওকে ভোগ করেছিল। তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা কর। নরকের যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে আমি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। তারপর এই চরম ব্যবস্থা আমি নিয়েছি। তোমার স্বামী সব জনে।
এমিলি : আমার স্বামী?
ওথে : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার স্বামী।
এমিলি : আমার ম্যাডাম, বিবাহের পবিত্র শর্ত লঙ্ঘন করেছেন?
ওথে : হ্যাঁ। ক্যাশিওর সঙ্গে ওর অবৈধ সম্পর্ক। যদি ও পবিত্র থাকত তাহ'লে সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়েও আমি ওকে ত্যাগ করতে পারতুম না।
এমিলি : আমার স্বামী!

ওথে : আঃ ! বারবার এক প্রশ্ন কেন করছ ? তোমার স্বামীই আমাকে সব বলেছে।

এমিলি : হায় ! প্রেমের ওপর প্রভুত্ব করছে খলতা ! আমার স্বামী বলেছে, ডেসডিমোনা চরিত্রহীনা !

ওথে : হ্যাঁ, সে। তোমার স্বামী। শুনেছ ? আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তোমার স্বামী—সৎ, বিশ্বস্ত, ইয়াগো।

এমিলি : যদি সে একথা বলে থাকে, তবে তার ঘৃণিত আত্মা পচে মরুক নরকের অন্ধকারে। সবচেয়ে জঘন্য একটা বর্বর পশুকে আমার ম্যাডাম, মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল।

ওথে : কী বললে ?

এমিলি : আপনি জঘন্য ! আপনি নীচ ! আপনি তার যোগ্য ছিলেন না। কাজ দিয়েই তা প্রমাণ করেছেন।

ওথে : চুপ কর। তোমার পক্ষে ভালো হবে আর একটিও কথা না বলা।

এমিলি : কী করবেন আপনি ? আমার কণ্ঠ রোধ করার শক্তি আপনার নেই। আপনার তলোয়ারকে আমি ভয় করি না। নিষ্ঠুর ! নির্বোধ ! গোঁয়ার ! কত বড় পাপ আপনি করেছেন তা আমি বুঝিয়ে দেবো। কে আছ, শোনো ! নিগ্রো পশুটা খুন করেছে ডেসডিমোনাকে, খুন, খুন !
[মনটানো, ইয়াগো এবং অন্যান্যরা প্রবেশ করে]

মন : কী হোলো সেনাপতি মশায় ?

এমিলি : ও, তুমি ইয়াগো, এসেছো ? ভালোই করেছো তুমি ! লোকে যাতে খুনের জন্য তোমাকেই দায়ী করে !

লোডা : কি হয়েছে ?

এমিলি : এই খুনীর কথা মিথ্যা প্রমাণ করো, যদি তুমি মানুষ হও। ও বলছে, তুমি ওকে বলেছো, ওর স্ত্রীর চরিত্র খারাপ ছিল। তুমি নিশ্চয়ই বলনি ? বল, তুমি বলেছো ?

ইয়াগো : আমার যা মনে হয়েছিল, তাই বলেছিলাম। এর বেশী কিছু নয়। স্যার নিজের চোখে যা দেখেছেন, তা তো মিথ্যে হতে পারে না।

এমিলি : তুমি বলেছো, মিঃ ক্যাশিওর সঙ্গে ওর গোপন প্রেম ছিল ?

ইয়াগে : হ্যাঁ গিন্নী, ক্যাশিওর সঙ্গে। আর কথা বাড়িয়ো না। যাও, বাড়ী যাও।

এমিলি : না, যাব না। গলা ফাটিয়ে আমি বলব, ম্যাডাম খুন হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

সকলে : হায় ঈশ্বর !

এমিলি : তোমার কথাই এই খুনের জন্য দায়ী।

ওথে : ভদ্রমহোদয়গণ, কোন সন্দেহ নেই, আমার স্ত্রী খুন হয়েছে। এ কথা সত্য।

লোডো : এক ভয়ঙ্কর সত্য।

মন : নির্মম, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা !

এমিলি : খলতা, খলতা, খলতা ! আমি মনে করি ঈর্ষা থেকে এই নিষ্ঠুর কর্ম করানো হয়েছে।

ইয়াগো : তুমি পাগল হয়েছো ? যাও, বাড়ী যাও।

এমিলি : ভদ্রমহোদয়গণ, একে আমি মানতে বাধ্য, কিন্তু এখন নয়। ইয়াগো, হয়ত আর

কোনদিন তোমার বাড়ীতে আমি ফিরে যাব না।

ওথে : ও - ও - ও! [ডেসডিমোনার পাশে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে]

এমিলি : না, এখানে নয়। নীচে। মেঝেতে লুটিয়ে কাঁদুন। আপনি হত্যা করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও নির্মল ফুলটিকে।

ওথে : [উঠে] না, সে ছিলো দ্বিচারিনী। তাই চিরদিনের মতো তার শ্বাসরোধ করে দিয়েছি।

লোডো : হায়, হায়। এমন ভুল আপনি করলেন!

ওথে : শুনুন। ইয়াগো জানে— গোপনে ও ক্যাশিওর প্রেমে লিপ্ত ছিল। ক্যাশিও তা স্বীকার করেছে। ওদের গোপন প্রেম এতদুর গড়িয়েছিল যে, আমি যে রুমাল ওকে প্রথম প্রেমের চিহ্ন হিসেবে দিয়েছিলাম, সেই রুমাল, ও তাকে দিয়েছিল। ও রুমাল আমার বাবা দিয়েছিলেন মাকে। এ রুমাল আমি দিয়েছি ওকে। আর ও দিয়েছে ক্যাশিওকে। ক্যাশিওর হাতে ওটা আমি দেখেছি।

এমিলি : হে ঈশ্বর! হে করুণাময় ঈশ্বর!

ইয়াগো : চুপ কর।

এমিলি : চুপ করব না। ঝড়ের বেগে সব বাধা ভেঙে আমি কথা বলব। স্বর্গ, নরক, দেবতা, দানব, সাধু ও পাপাত্মা— সকলে ধিক্কার দেবে আমাকে, তবু বলব।

ইয়াগো : আঃ! মাথা ঠাণ্ডা কর। বাড়ী যাও।

এমিলি : না, যাব না। [ইয়াগো তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত]

লোডা : ছিঃ! স্ত্রীলোকের ওপর অস্ত্র তুলছ! [আটকায়]

এমিলি : হায়রে বোকা নির্বোধ নিগ্রো! ও রুমাল আমি একদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তারপর তা দিয়েছিলাম আমার স্বামীর হাতে। কারণ, সে প্রায়ই ওটা নিয়ে দিতে বলত। সে আমাকে বলত ওটা চুরি করে নিতে—

ইয়াগো : দুশ্চরিত্রা! বেশ্যা! মিথ্যা কথা বলছিস্ তুই?

এমিলি : মিথ্যা নয়। তুমি এটা নিয়ে এত বড় সর্বনাশ ঘটালে! হায়রে নির্বোধ বেটাছেলে! এমন বোকার হাতে পড়লে সতী সাধ্বী নারীর কি গতি হবে!
[ওথেলো ছুটে যায় ইয়াগোর দিকে। মনটানো এবং অন্যরা তাকে আটকায়। ইয়াগো খুন করে এমিলিয়াকে, তারপর পালায়।]

ওথেলো: আকাশে কি কোনো শিলা নেই? তবে বজ্রপাত হচ্ছে না কেন? এমন খল কি পৃথিবীতে জন্মেছে কখনো?

লোডো : এই মহিলা পড়ে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ঐ শয়তান তাকে খুন করে পালিয়েছে।

মনটি : তাই নাকি? [মন্টিয়াগো এবং অন্যরা ইয়াগোকে ধরতে যায়।]

এমিলি : হ্যাঁ। হ্যাঁ! আঃ! আমাকে শুইয়ে দিন ডেসডিমোনার পাশে।
[লোডাভিকো তাকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে ছুটে যায়]

ওথে : আমার শৌর্য, বীর্য, সুনাম সব গেল। তাহ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি। সব দেব শেষ করে। আরেকটি অস্ত্র আছে আমার ঘরে। স্পেনে তৈরী। এই তো

পেয়েছি। হে নরকের পিশাচেরা! আমাকে চাবুক মারো। এই পবিত্র মৃত্যুর পাশ থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও। বারুদের ভীষণ বিস্ফোরণে ঝলসে নাও আমাকে। তারপর ধুয়ে দিয়ো তরল আগুনে। হায় ডেসডিমোনা। তুমি মরে গেছো ডেসডিমোনা। [ফুঁপিয়ে কাঁদে।]

[লোডাভিকো, মন্টিয়াগো এবং ক্যাশিও অন্যরা আসে। ক্যাশিও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইয়াগোকে বন্দী করে আনা হয়েছে।]

লোডা : খল, শয়তানটাকে নিয়ে এসো এদিকে।

ওথে : শয়তান তোকে প্রাণে মারবো না। [ইয়াগোকে আঘাত করে]

লোডো : ওর হাত থেকে অস্ত্রটা সরিয়ে রাখ।

ইয়াগো : রক্ত পড়ছে ঠিকই, তবে মরব না।

ওথে : তোকে মারবো না। কারণ মরে যাওয়া অনেক ভালো; অনেক ভালো। ক্যাশিও

ক্যাশিও : স্যার, আমার প্রিয় সেনাপতি।

ওথে : আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে বরখাস্ত করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইয়াগোর চক্রান্তে তোমাকে মেরে ফেলার জন্য ওকেই দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

ক্যাশিও : আমি নির্দোষ ছিলাম, স্যার।

ওথে : তুমি কেমন করে আমার রুমালটি পেয়েছিলে?

ক্যাশিও : স্যার। একদিন ওটি আমার ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। ইয়াগো একটু আগে স্বীকার করেছে , ওই রুমাল সে ই আমার ঘরে ফেলে রেখেছিল।

ওথে : হায়! হায়! আমি কি নির্বোধ! কি নির্বোধ!

ক্যাশিও : এইতো রোডারিগোর চিঠি। ওর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল। এটি পড়লেই সব জানতে পারবেন।

ওথে : দেখতে হবে না। যা জানার সব জেনে গেছি। এ পৃথিবীতে আর আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ক্যাশিও! ভাই আমার! বিদায় [নিজেকে খুন করে]

ক্যাশিও : স্যার! প্রিয় সেনাপতি আমার! বীর ওথেলো! তুমি ভুল করেছো। তবু তুমি মহান। তোমার জীবন দিয়ে তুমি প্রায়শ্চিত্ত করে গেলে তোমার আত্মঘাতী ভুলের, যে ভুলের জন্য দায়ী ছিল ঐ শয়তান।

লোডো : হ্যাঁ। এই শয়তান! সব নষ্টের মূল। একে আটকে রাখ। সরা জীবন অনুতাপে দগ্ধ হোক সে কারাগারের দমঠাসা অন্ধকারে। নিয়ে যাও একে। আর ক্যাশিও, তুমি আজ থেকে সাইপ্রাসের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করলে। বীর ওথেলোর স্থলাভিষিক্ত হলে তুমি।

লেখক : কমল রায়চৌধুরী, ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যকার।

রিচ অরলফ এর রচনা সূত্রে রচিত

অয়দিপাউস রেক্স

এক ট্র্যাজিক হিরো

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি : রাজা অয়দিপাউস (থেবাই- এর রাজা), তাইরেসিয়াস (অন্ধগণক), ক্রেয়ন (রাজার শ্যালক ও পরামর্শদাতা), ইয়কাস্থে (থেবাই -এর রানি), ঘোষক

[প্রাচীন গ্রীস। সকাল। রাজা অয়দিপাউসের প্রাসাদের অভ্যন্তর। একটি বা দুটি থাম ও খিলান দেওয়া একটি কক্ষ । কক্ষের ভিতর প্রাচীন গ্রীসে ব্যবহৃত একটি চেয়ারে বসে আছেন রাজা অয়দিপাউস। দূরে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়]

ঘোষক : এখন সকাল চারটে। নাগরিকেরা ভালো থাকুন। এগারোটায় বিস্তৃত খবর। আর হ্যাঁ বাইরে খাবার কথা যাঁরা ভাবছেন, তাদের বলি- চলে আসুন 'হাকুবার হাম্মা হাউজে' তুলে নিন এক প্লেট 'বাবাগুনুস'*। প্লেটোর কথা মতো 'একান্তই আদর্শ'। (ক্রেয়ন এবং অন্ধ তাইরেসিয়াস প্রবেশ করেন। তাইরেসিয়াস -এর হাতে একটি ছড়ি)

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস।

অয়দিপাউস : ক্রেয়ন, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, স্বাগত হে তাইরেসিয়াস মহান গণক। অবশেষে তোমরা ফিরলে। আমার মন বড়ই উতলা হয়ে উঠেছে। যাত্রাশেষে তোমরা কি বার্তা নিয়ে ফেরো। তার অপেক্ষায় চিত্ত আমার চঞ্চল।

তাইরেসিয়াস : যদি কোন শুভ সংবাদের জন্য তুমি উদগ্রীব হয়ে থাকো, তবে বৃথাই তোমার অপেক্ষা। সামনের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু অন্ধকার, নিকষ অন্ধকারই দেখছি।

অয়দিপাউস : ক্রেয়ন, এই কি সত্য?

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস, যতক্ষণ সমস্ত তথ্যপ্রমাণ আমাদের কাছে না এসে পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আমাদের সংযত থাকা উচিত।

অয়দিপাউস : কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাদের প্রিয় থেবাই নগরীতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। থেবাই- এর নাগরিকদের বদ্ধমূল ধারণা প্রাক্তন রাজার হত্যাকারীকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত থেবাই থেকে প্লেগ নির্মূল হবে না। নতুন রাজা হিসেবে আমি তাদের কথা দিয়েছি যে, তথ্য উদ্‌ঘাটন আমি করবোই। তাছাড়া সাম্প্রতিক জন সমীক্ষায় দেখা গেছে আমার

জনপ্রিয়তা দ্রুত কমতে শুরু করেছে।

ক্রেয়ন : এটা সত্য। কিন্তু—

অয়দিপাউস : এখন আর কোনো 'কিন্তু' নয়। আমি ক্রেয়ন কমিশন তৈরি করেছি 'সত্য তথ্য জানার জন্য।' আমি আদেশ করছি, যা জেনেছ তা প্রকাশ করো।

ক্রেয়ন : বেশ! আমরা প্রথমে ডেলফি'র সেই দৈবজ্ঞদের কাছে গেলাম, যদি তারা আমাদের কিছু বলেন।

অয়দিপাউস : সেই দৈবজ্ঞরা কতটা সাহায্য করলেন?

তাইরেসিয়াস : দৈবজ্ঞদের তো তুমি জানো। ওদের কাছ থেকে প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর পাওয়া যায় না।

ক্রেয়ন : তারা শুধু বলল, প্রাক্তন রাজা লাইউস তাঁর নিজের পুত্র সন্তানের হাতেই খুন হয়েছেন।

অয়দিপাউস : অদ্ভুত প্রলাপ। লাইউসের কোনো সন্তানই ছিল না।

ক্রেয়ন : আমরা আবিস্কার করেছি লাইউসের পুত্র সন্তান ছিল। অনেকদিন আগেই তার শিশু বয়সে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। জনগণের অনুমান সেই শিশু জঙ্গলেই প্রাণ হারিয়েছে।

অয়দিপাউস : হতভাগ্য শিশু, আমি তার ব্যথা অনুভব করতে পারছি। এ যেন আমারই বেদনা।

তাইরেসিয়াস : অদ্ভুত। তোমার মুখ থেকেই এই কথা বের হলো।

ক্রেয়ন : অনুসন্ধানে আমরা জেনেছি সেই শিশুকে একজন মেষ পালক উদ্ধার করেছিল।

অয়দিপাউস : এতো শুভ সংবাদ।

ক্রেয়ন : শিশুটি বেড়ে উঠেছিল ঠিক তোমারই উচ্চতায়। শরীরের ওজনও ছিল তোমারই মতো এবং বর্ণনা অনুযায়ী সে দেখতে ছিল অবিকল তোমারই মতো।

অয়দিপাউস : কাকতালীয় ঘটনা।

ক্রেয়ন : তোমায় কীভাবে বলি। অয়দিপাউস তুমি জানো আমি কতটা তোমার গুণগ্রাহী। থেবাই নগরে যখন তুমি প্রথম এলে, নাগরিকদের আমিই উৎসাহ দিয়েছিলাম তোমাকে রাজা নির্বাচন করতে এবং তুমি জানো তোমাকে রাজা নির্বাচিত করার সময় আমরা কেউই তোমার পূর্ব জীবনের পরিচয় জানতে চাইনি।

অয়দিপাউস : আমি খুবই ধার্মিক জীবন কাটিয়েছি।

ক্রেয়ন : আমি জানি তোমার পূর্ণ জীবন ছিল একান্তই পবিত্র। কিন্তু দীর্ঘ এই পবিত্র

ধার্মিক জীবনে তুমি কি কখনও কাউকে হত্যা করোনি?

অয়দিপাউস : আইনগতভাবে বুঝে শুনে যাকে হত্যা করা বলে, জোর গলায় বলতে পারি আমি কখনও তা করিনি।

ক্রেয়ন : থেবাই নগরে আসার পথে তুমি কি কাউকে হত্যা করেছিলে?

অয়দিপাউস : আমাকে স্মরণ করতে দাও। করিন্থ ত্যাগ করে বাইরের দুনিয়ায় ভাগ্য অন্বেষণের সিদ্ধান্ত নিই আমি। এই ভেবেই থেবাই-এর পথে বেরিয়ে পড়ি। পথে আমি কবি স্যাফোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার ধারণা ছিল তার প্রতি আমি অনুরক্ত। এখন অবশ্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। যাই হোক, এর পর আমি দ্রুত থেবাই-এর দিকে চলতে শুরু করি। ফো কি শহরের উপকণ্ঠে এসে আমি একদল উন্মত্ত যাত্রীর সাক্ষাৎ পাই। ওই যাত্রীদের একজন আমাকে খুব নোংরা কথা বলতে শুরু করে। আমি ওই যাত্রীদের সকলকে হত্যা করি। এছাড়া কখনও অমি কাউকে হত্যা করিনি।

তাইরেসিয়াস : সেই যাত্রী কি নোংরা কথা বলেছিল?

অয়দিপাউস : সে আমাকে মাতৃস্তন্যপায়ী শিশু বলে ব্যঙ্গ করেছিল।

তাইরেসিয়াস : এইজন্য তুমি তাকে হত্যা করলে?

অয়দিপাউস : কি করব? ও আমার ভেড়াগুলো নিয়ে নিয়েছিল। ওগুলো ছিল আমার খুব প্রিয়।

ক্রেয়ন : তোমায় কীভাবে বলবো অয়দিপাউস। আমরা শুনেছি লাইউসের মৃত্যু হয়েছিল ফো কি শহরেই। শুধু তাই নয়, লাইউসের সকল সহযাত্রীরাও ওই ফো কি শহরেই নিহত হয়েছিল।

অয়দিপাউস : তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সেই হত্যাকারী ভাবছো না? আমি কোনো রাজাকে হত্যা করিনি।

ক্রেয়ন : লাইউস একজন তীর্থযাত্রী হিসাবে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

অয়দিপাউস : তার মানে—

তাইরেসিয়াস : একজন পর্যটকের মতোই তার পোশাক ছিল।

অয়দিপাউস : তাহলে এমনটি হতেই পারে। আমি— আমি ....

তাইরেসিয়াস : এখন শুধু জুতো খোলার অপেক্ষা—

অয়দিপাউস : কিন্তু তাইরেসিয়াস, তুমি বলেছিলে লাইউসের মৃত্যু হবে তার পুত্রের হাতে। কিন্তু সেই লোকটিকে তো এর আগে আমি চোখেই দেখিনি। (ক্রেয়ন চুপ করে থাক)

তাইরেসিয়াস : প্রাত:কালেই এই রকম একটা সংবাদ সত্যিই খুব দুঃখজনক।

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস আমরা জেনেছি পরিবাস এবং মেরোপ তোমার সত্যিকারের বাবা-মা-নন। তুমি একজন অনাথ।

অয়দিপাউস : সে বিষয়ে পরে অনুসন্ধান করা যাবে।

ক্রেয়ন : (অয়দিপাউসের পায়ের দিকে তাকিয়ে) আমরা এও জেনেছি যে লাইউসের সন্তানের বামপায়ের নিচে অলিভপাতার মতো একটা জন্মদাগ আছে।

অয়দিপাউস : সেই শিশুকে খুঁজতে গোটা গ্রিস জুড়ে অনুসন্ধান করতে হবে। রাজ্যের প্রান্তসীমার থেকে কাজ শুরু করাই শ্রেয়।

ক্রেয়ন : আমার মনে হয় আমাদের এখান থেকেই শুরু করা উচিত।

অয়দিপাউস : পায়ের জুতো খোলা আমার কাছে খুবই অস্বস্তিকর। জুতোর ফিতেগুলো লাগাতে এত সময় নষ্ট হয়।

ক্রেয়ন : নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারলে জনতা তোমার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে।

অয়দিপাউস : তারা সত্যিই ক্রুদ্ধ হবে?

তাইরেসিয়াস : পৃথিবীতো সমতল নয়— (অয়দিপাউস জুতো খোলে। ক্রেয়নকে পা দেখায় দেখা যায় তার পায়ের তলায় জন্মদাগ। সেটি অলিভ পাতার মতোই দেখতে)

অয়দিপাউস : তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো। আমার পায়ের তলায় অমন কোনো দাগ নেই।

ক্রেয়ন : মনে হচ্ছে এটা অলিভ পাতা।

অয়দিপাউস : তাইরেসিয়াস—

তাইরেসিয়াস : আমি কিছুই দেখছি না।

অয়দিপাউস : আমি তাইরেসিয়াসের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস স্বীকার করে নাও, এটা অলিভ পাতা।

অয়দিপাউস : আমার তো মনে হচ্ছে একটা কাঁচা বেগুন, আর তার উপর লাল রঙের কিছু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্রেয়ন : এটা অলিভ পাতা।

অয়দিপাউস : ঠিক আছে, আমি মেনে নিলাম এটা অলিভ পাতা। আমি লাইউসের সন্তান এবং আমি আমার পিতাকেই হত্যা করেছি। খুবই খারাপ কাজ করেছি আমি। এখন এই প্রসঙ্গটা বন্ধ করা যাক।

ক্রেয়ন : আমি দুঃখিত। রাজা, তুমি জনতার কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ সে কথা ভেবে আমি চুপ করে থাকতে পারি না।

অয়দিপাউস : আমার আর আমার বাড়ীর লোকেদের পক্ষে এর থেকে খারাপ আর কি হতে পারে। আমি এক রাজাকে হত্যা করেছি এবং জনতার কাছে শপথ করেছি সেই হত্যাকারীকে আমি মৃত্যুদন্ড দেব। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর। (কিছু ভাবে) একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

তাইরেসিয়াস : এইবার সেই নোংরা আলোচনাটা আসবে।

অয়দিপাউস : আমি যদি লাইউসের সন্তান হই এবং লাইউস যদি ইয়কাস্তেকে বিয়ে করে থাকেন, তাহলে আমার স্ত্রী এখন কে? তার মানে লাইউসের পূর্বতন কোনো স্ত্রী ছিলেন!

ক্রেয়ন : বলতে ভয় হচ্ছে। তবু বলতেই হবে— লাইউসের দ্বিতীয় কোনো স্ত্রীর ছিল না ।

অয়দিপাউস : তার মানে লাইউসের অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল?

ক্রেয়ন : কখনই না।

অয়দিপাউস : তবে কি তিনি বীর্য ঋণ দিতেন!

ক্রেয়ন : না।

অয়দিপাউস : তার মানে তুমি বলতে চাইছো আমার স্ত্রী আসলে আমার ...

তাইরেসিয়াস : নির্ভূল লক্ষ্যভেদ।

অয়দিপাউস : ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমি আমার মাকেই বিবাহ করেছি। আশ্চর্যের নয়! আমি কি প্রাতঃরাশ করি সেটা রানি আগে থাকতেই জানতেন। হায় ঈশ্বর! আমি আমার পিতাকে হত্যা করে মাতাকে বিবাহ করেছি।

তাইরেসিয়াস : এর থেকে খারাপও হতে পারতো। তুমি তোমার মাতাকে হত্যা করে পিতাকে বিবাহ করতে পারতে এবং তেমনটি ঘটলে সত্যিই বিপদ হতো।

অয়দিপাউস : ব্যাপারটা কে কে জেনেছে?

ক্রেয়ন : চিন্তিত হয়ো না। শুধু ক্রেয়ন কমিশনের সদস্যরা এবং এরা প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত।

ঘোষক : শুনুন— শুনুন-রাজার সঙ্গে তার মার এক অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ বেলা এগারোটায়।

অয়দিপাউস : ওঃ কি অভিশপ্ত দিন ।হায়! কি কদর্য জীবন। অন্তরাত্মা থেকে এই নোংরা কাজের দাগ কি করে মুছবো আমি? একটাই উপায়। আমি এই মুহূর্তে চোখ দুটো উপড়ে ফেলি (অয়দিপাউস চেষ্টা করে। ক্রেয়ন তাকে নিরস্ত্র করে)।

ক্রেয়ন : এমনটি করো না অয়দিপাউস।

অয়দিপাউস : আমাকে ছেড়ে দাও।

তাইরেসিয়াস : কক্ষনো এমনটি করো না। এ কাজে তুমি হয়ত এক মুহূর্তের তৃপ্তি পাবে, তবে গায়ের পোশাকটা সোজা না বাঁকা সেই অস্বস্তিটা সারাজীবন তোমায় ভোগ করতে হবে।

অয়দিপাউস : ঠিক আছে, আর উপদেশ দিতে হবে না। ক্রেয়ন, আমার প্রিয়তমা পত্নী কি এ খবরটা জেনেছে?

ক্রেয়ন : এখনও জানে না।

অয়দিপাউস : এই খবর আমি কি করে তার কাছে দেব? এই সংবাদে তো তার হৃদয় ভেঙে যাবে। ওই সুন্দর মুখে অশ্রু যে একেবারে মানায় না। এমনতর শোকের পক্ষে তাঁর মন খুবই নমনীয়।(নেপথ্যে ইয়েকাস্থের গলা শোনা যায়)

ইয়েকাস্থে : অয়দিপাউস -আমার সোনামণি রাজা— তুমি কোথায়—

ক্রেয়ন : ওই রানি আসছেন।

অয়দিপাউস : এখানে— এক্ষুনি তার না এলেই কি চলছিল না ! (রানি ইয়েকাস্থে ঘরে আসেন। তাঁকে দেখেই অয়দিপাউসের থেকে বয়সে বড় বলে বোঝা যায়। তাঁর কথা বলার অভ্যাসে একটু পুরানো ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়)

ইয়েকাস্থে : অয়দি—আমার সোনা—(হঠাৎ থেমে যায়) আমি কি গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম। (অয়দিপাউস এবং ক্রেয়ন একসঙ্গে দুটি ভিন্ন কথা বলে ওঠেন)

অয়দিপাউস : হ্যাঁ।

ক্রেয়ন : না। (রানি ইয়েকাস্থে থমকে দাঁড়ান) আমরা তো চলে যাচ্ছি। তাই না তাইরেসিয়াস।

তাইরেসিয়াস : হ্যাঁ। আমার তো এখন সারেঙ্গী বাজাবার সময় হয়ে গেছে।

ইয়েকাস্থে : মিথ্যে বলছেন কেন?

তাইরেসিয়াস : না সত্যি। (ক্রেয়ন ও তাইরেসিয়াস চলে যায়)

ইয়েকাস্থে : আমি জানতাম না তোমরা আলোচনা করছিলে।

অয়দিপাউস : আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা।

ইয়েকাস্থে : আমাদের প্রথম যেদিন দেখা হল, সেদিনের সেই সুখস্পর্শের আনন্দঘন মুহূর্তের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

অয়দিপাউস : ইয়েকাস্থে এক ভয়াবহ সংবাদ তোমাকে আমি দেব। যতটা খারাপ তুমি ভাবছো। তারচেয়েও ঢের বেশি খারাপ খবর।

ইয়েকাস্থে : কাল যে মাংসের পিঠেটা বানিয়েছিলাম, সেটা তোমার ভালো লাগেনি না?

অয়দিপাউস : বিষয়টা এটা নয়।

ইয়েকাস্থে : বাঁচালে। আমার খুব ভয় ছিল। মাংসটায় আমি একটু বেশি সুগন্ধী পাতা দিয়ে ফেলেছিলাম।

অয়দিপাউস : কি করে বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

ইয়েকাস্থে : আমার পোশাকটা একটু ছোটো হয়ে গেছে না? আমার বয়সি মহিলার পক্ষে একটু বেমানান!

অয়দিপাউস : তোমার পোশাকটা বেশ মানানসই।
ইয়েকাস্থে : তবে কি আমার অজান্তেই আমি গহনা বা সুগন্ধীর দোকানে কোনো সমস্যা তৈরি করেছি?
অয়দিপাউস : না সব কিছু ঠিক আছে। ইয়েকাস্থে— আমি এই মুহূর্তে ক্রেয়ন কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনটা জানতে পেরেছি।
ইয়েকাস্থে : এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে। রাজা লাইউস - এর হত্যাকারী কে সেটা জেনে, তার হাতে হেমলকের বাটী তুলে দাও। এদেশের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কি করতে পারো তুমি?
অয়াদি : আমি এমনটা করতে পারি না।
ইয়েকাস্থে : কেন পারো না!
অয়দিপাউস : আমার প্রিয়তমে রানি ইয়েকাস্থে—
ইয়েকাস্থে : অয়দিপাউস আমার সোনামনি রাজা—
অয়দিপাউস : ইয়েকাস্থে তোমার প্রাক্তন স্বামীর হত্যাকারী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।
ইয়েকাস্থে : তুমি লাইউসকে হত্যা করেছ!
অয়দিপাউস : হ্যাঁ— আমি।
ইয়েকাস্থে : ওঃ কি ভয়ানক। হঠাৎ মনে হলো আমি কি যেন উপড়ে নিয়েছি।
অয়দিপাউস : না, তোমার চোখ উপড়ে নিও না।
ইয়েকাস্থে : না, আমার মনে হলো একটা মুরগির ছানার পালক ছাড়িয়ে নিলাম। তুমি কি ভেবেছো কথাটা কীভাবে ঘুরিয়ে জনতার কাছে বলবে, যাতে তারা তোমায় ঘৃণা করে।
অয়দিপাউস : তুমি আমায় ঘৃণা করছো না!
ইয়েকাস্থে : না।
অয়দিপাউস : কিন্তু আমি তোমার প্রথম স্বামীকে হত্যা করেছি।
ইয়েকাস্থে : সেই কাজের জন্য এখন আমি তোমায় ঘৃণা করব, যা বিয়ের পরদিন থেকেই আমি নিজেই চেয়েছি।
অয়দিপাউস : আমার ধারণা ছিল তুমি ওকে ভালোবাস।
ইয়েকাস্থে : (তাচ্ছিল্যভরে) ভালোবাসা—
অয়দিপাউস : তুমি লাইউসকে ভালোবাসতে না?
ইয়েকাস্থে : কাকে ভালোবাসব? লোকটা বেজায় জোরে নাক ডাকত। মুখে দুর্গন্ধ, এবং আমাকে দিয়ে যেসব কাজ করাতোও—
অয়দিপাউস : বিছানায়?
ইয়েকাস্থে : না রান্নাঘরে, ধরো, অমি একটা গোটা মুরগির রোস্ট বানিয়েছি, ও তাতে কাসুন্দি আর ভাজা লংকা দিয়ে এমন একটা উৎকট স্বাদ তৈরি করতে

বলবে। লোকটা একেবারেই তেমন পদের নয়।

অয়দিপাউস : কিন্তু আমি যখন তোমায় প্রথম দেখি, তখন তুমি কাঁদছিলে।

ইয়েকাস্থে : সে তো আমায় সংবাদ জগতের লোকেরা জোর করেছিল। আমি তখন নদীর ধারে সূর্যস্নান করার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

অয়দিপাউস : আমি এটা জানতাম না।

ইয়েকাস্থে : তাহলে প্রিয়তমে দেখছো, আমার কাছে এটা কোনো খারাপ খবর নয়।

অয়দিপাউস : কিন্তু আমি তো এখনও তোমায় পুরোটা বলিনি, এই সংবাদটা এতই দুঃসহ, এতটাই কদর্য নোংরা যে তোমার সামনে আমি কি করে তা জিভে আনবো সেটা ভেবেই ভয়ে লজ্জায় আমি মুখ তুলে তাকাতে পারছি না।

ইয়েকাস্থে : তাহলে তুমি মিনিট পনেরো অপেক্ষা করো, ততক্ষণে আমি আমার নাচের তালিমটা শেষ করে আসি। (যেতে চায়। অয়দিপাউস তাকে বাধা দেয়)

অয়দিপাউস : ইয়েকাস্থে তোমার মনে আছে তাইরেসিয়াসের ভবিষ্যৎবাণীর কথা- তোমার স্বামী তোমার সন্তানের হাতে মারা যাবে।

ইয়েকাস্থে : হ্যাঁ মনে আছে। আরও মনে আছে সে বলেছিল ইলিয়াড কখনও একটা জনপ্রিয় উপন্যাস হয়ে উঠবে না।

অয়দিপাউস : ইয়েকাস্থে আমি তোমায় বলতে পারছি না- বিষয়টা এতই লজ্জার।

ইয়েকাস্থে : লক্ষ্মী সোনা- এত লজ্জার কি আছে?

অয়দিপাউস : এমন বলো না। তোমার এই আদরের ডাকে আমার ভিতরের সব কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

ইয়েকাস্থে : কেন?

অয়দিপাউস : কারণ দৈবের নিষ্ঠুর পরিহাসে তুমি তোমার সন্তানকেই বিবাহ করেছ।

ইয়েকাস্থে : তো?

অয়দিপাউস : তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমি কি বলছি? আমি তোমার সন্তান।

ইয়েকাস্থে : তো, এমন কিছু বলো যা আমি জানি না।

অয়দিপাউস : তুমি জান, আমি তোমার পুত্র।

ইয়েকাস্থে : যেদিন তুমি প্রথম শহরে এলে, সেদিন থেকেই জানি, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝেছিলাম। আর তোমার ওই হাসি। দাঁড়াও, দাঁড়াও তোমার কপালের ডানদিকে সেই কাটা দাগটা। (ইয়েকাস্থে অয়দিপাউসের চুলে বিলি কেটে তার কপালটা দেখতে যায়)

অয়দিপাউস : থামো।

ইয়েকাস্থে : চুলগুলো ঠিক করে একটু ভদ্রস্থ করে দিই। সবসময় নিজেকে এমন অগোছালো করে রাখো।

অয়দিপাউস : তুমি যদি জানতেই যে আমি তোমার সন্তান, তবে আমায় তা বলোনি কেন?

ইয়েকাস্থে : তেমন প্রয়োজনীয় মনে হয়নি, তাই।

অয়দিপাউস : তুমি আমাকে বিয়ে করলে—

ইয়েকাস্থে : তুমি চেয়েছিলে।

অয়দিপাউস : আমি —জানি। কিন্তু—

ইয়েকাস্থে : আমি তো শুধু প্রণয়ই চেয়েছিলাম। তুমিই জোর করলে। বললে— 'আমাকে বিয়ে করো ইয়েকাস্থে, তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেলেই আমি হব পৃথিবীর সব চাইতে সুখীপুরুষ' কোন মা সন্তানের এমন আবদার অগ্রাহ্য করতে পারে।

অয়দিপাউস : কিন্তু আমি আমার পিতাকে হত্যা করেছি।

ইয়েকাস্থে : তো, ওতো কখনই তোমাকে পছন্দ করত না।

অয়দিপাউস : সত্যি পছন্দ করতো না?

ইয়েকাস্থে : যেদিন ও তাইরেসিয়াসের ভবিষ্যৎবাণী শুনলো যে তুমি ওকে হত্যা করবে, সেদিন থেকেই ও তোমায় নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছে। আমি বলেছিলাম—'আমরা কি একটু অপেক্ষা করে দেখতে পারি না। হয়তো ও তোমাকে সামান্য আহত করলো।'

অয়দিপাউস : আজ আমার জীবনের চরম বিপর্যয়ের দিন।

ইয়েকাস্থে : দেখ তোমার যদি আর নতুন কিছু বলার না থাকে তবে আমি নাচের তালিম নিতে চললাম। পরের সপ্তাহে নৌকা নাচের মহড়া শুরু হবে। তার আগেই আমাকে নৌকার মতো সরু চেহারা বানাতে হবে।

অয়দিপাউস : তোমার কি মনে হয় না আমাদের অনেক অনেক বিষয়ে আলোচনা করা দরকার?

ইয়েকাস্থে : কি রকম?

অয়দিপাউস : এরপর নিশ্চয়ই আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে পারি না।

ইয়েকাস্থে : কেন নয়?

অয়দিপাউস : তুমি আমার মা, তাই।

ইয়েকাস্থে : তাতে একসঙ্গে থাকার অসুবিধা কি?

অয়দিপাউস : কেউই নিজের মাকে বিয়ে করতে পারে না।

ইয়েকাস্থে : আমার কোনো বন্ধুই তো এমনতর ভাবে না।

অয়দিপাউস : কিন্তু—

ইয়েকাস্থে : বরং আমি শুনেছি বেশিরভাগ পুরুষ সেইসব মহিলাদের বিয়ে করে, যাকে মায়ের মতো মনে হয়। সুতরাং নকলের কি প্রয়োজন, যখন তুমি আসলটাই পেয়ে যাচ্ছো?

অয়দিপাউস : কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে পারি না।

ইয়েকাস্থে : সে তো এখন প্রায় করোই না।

অয়দিপাউস : কখনোই করবো না।

ইয়েকাস্থে : তাহলে নিশ্চয় ট্রয়ের ওই বারবণিতা হেলেনের কাছে যাবে।

অয়দিপাউস : না।

ইয়েকাস্তে : তাহলে কার কাছে যাবে?

অয়দিপাউস : আমি তেমনই একজন নারীকে চাই, যার সঙ্গে আমার কোনো পূর্ব সম্পর্ক নেই।

ইয়েকাস্থে : তো, পরিবারের মধ্যে এমন কোনো নারীর খোঁজ পাচ্ছ না?

অয়দিপাউস : তোমার এই অবুঝপনা কি একটু বন্ধ করবে? মনে রেখো আমি একজন সরকারি প্রতিনিধি এবং গোটা দেশের কাছে আদর্শ স্থানীয় একজন।

ইয়েকাস্থে : তো? ঈশ্বরের কীর্তিকলাপ দেখো, মহান যীউয়ুস তো তার বৈমাত্রেয় বোনেদের শয্যাসঙ্গীনি করেছিলেন। ঈশ্বর যদি তাঁর নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, তো তুমি কেন পারবে না।

অয়দিপাউস : কারণ তুমি নিছক আত্মীয় নও, তুমি আমার মা।

ইয়েকাস্থে : প্রত্যেকটা বিষয়কে তুমি এতটাই জটিল করে ফেলো, (দর্শকরা গুঞ্জন করে উঠলে, তাদের দিকে ফিরেই বলবেন) সেনাবাহিনীর কৌতুকগুলো কিন্তু এর থেকেও মারাত্মক। একটু ধৈর্য্যশীল হ'ন।

অয়দিপাউস : প্রাকৃতিক নিয়মকে কেউ অস্বীকার করে চলতে পারে না।

ইয়েকাস্থে : আমি জানি অয়দিপাউস— আমার সোনামণি, তুমি খুবই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছো। কিন্তু আমি তোমায় বলছি এটা খুবই স্বাস্থ্যকর বিবাহ।

অয়দিপাউস : এটা কিছুতেই স্বাস্থ্যকর হতে পারে না।

ইয়েকাস্থে : তোমার কি মনে হয় আমাদের একজন কাউন্সেলর -এর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিৎ?

অয়দিপাউস : না।

ইয়েকাস্থে : তবে তুমি কি করতে চাও?

অয়দিপাউস : মা- আমি বিবাহ বিচ্ছেদ চাই।

ইয়েকাস্থে : (হিস্টিরিয়া রোগীর মতো) আমি কখনও ভাবিনি আমার নিজের ছেলের কাছ থেকে আমায় এমনটি শুনতে হবে।

অয়দিপাউস : কি অভিশপ্ত এ দিন। আমি নিশ্চিত সফোক্লেস যদি এ কাহিনি জানতে পারে তাহলে বিষয়টাকে নিয়ে এক্ষুনি তথ্যভিত্তিক একটি ট্র্যাজেডি নাটক তৈরী করে ফেলবেন।

ইয়েকাস্থে : সোনামণি— আমার এমন আশ্চর্য প্রশংসনীয় সম্পর্কটাকে নষ্ট করো

না।

অয়দিপাউস : আমায় কিছু করতেই হবে । নইলে জনগণ যখন আমার পরিবারের এই কেলেঙ্কারির কথা জানবে—

ইয়েকাস্থে : তো তোমার পরিষদদের ডাকো—

অয়দিপাউস : ক্রেয়ন— তাইরেসিয়াস— (ক্রেয়ন ও তাইরেসিয়াসের প্রবেশ)

ক্রেয়ন : আদেশ করুন প্রভু—

অয়দিপাউস : কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

তাইরেসিয়াস : আমাদের মনে পড়ে গেল , আমি বাইরের অফিসঘরে কিছু ফেলে এসেছিলাম, তাই—

অয়দিপাউস : তোমরা কি আমার ওপর গোপনে নজরদারি করছ?

ক্রেয়ন : আমরা দুজনেই আমাদের সর্বস্ব দিয়ে তোমার ভজনা করি। আমাদের সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত ভাবনা মনে ঠাঁই দিও না রাজা।

ঘোষক : —শুনুন—শুনুন—ইয়েকাস্থে রাজা অয়দিপাউসকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে অস্বীকার করেছেন। বিস্তৃত খবর বেলা এগারোটায় , সঙ্গে থাকছে অর্দ্ধঘন্টা ব্যাপী গ্রাম্য কৌতূক।

তাইরেসিয়াস : এই সকালে আমাদের প্রথমেই খোঁজা উচিৎ কে খবরটা ফাঁস করল।

অয়দিপাউস : আমি যদি বলি তোমাদের দুজনেরই কেউ (ক্রুদ্ধ হয়ে)।

ক্রেয়ন : আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম রাজা।

অয়দিপাউস : কি সে ব্যস্ততা?

ক্রেয়ন : এই সমস্যার ব্যাপারে একটা প্রাথমিক জনসমীক্ষা।

অয়দিপাউস : তো কি জানতে পারলে?

ক্রেয়ন : জনতা একটু বিভ্রমে পড়ে গেছে, শতকরা ৮৫ ভাগ লোক বলছে— 'যদি দুজন নারী-পুরুষ দুজনকে ভালোবাসে তবে বিবাহ হলো কি হলো না তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়'।

ইয়েকাস্থে : বুদ্ধিমান জনতা।

ক্রেয়ন : তবে শতকরা ৫৪ ভাগ লোক বলছে যদি দুজন নারী-পুরুষ সমাজ নির্ধারিত অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তবে তাদের অলিভ তেলে ফুটিয়ে মারা উচিৎ।

ইয়েকাস্থে : অলিভ তেলে পুড়িয়ে মারবে—নির্বোধ নাকি?

অয়দিপাউস : যেহেতু আমি জানতাম না রানি ইয়েকাস্থে আমার মা, সেহেতু এই সম্পর্ককে সমাজ নির্ধারিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক বলা যায় না- নিশ্চয়?

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস বাস্তবটা বোঝো।

অয়দিপাউস : এবং রাজনীতি থেকে অবসর নাও! কখনই নয়।

তাইরেসিয়াস : তুমি একটা যুদ্ধ শুরু করে দাও না। জনগণকে বোকা বানাতে অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মতো কোনো বিকল্পই নেই।

অয়দিপাউস : নিজের প্রতি জনসমর্থনের জোয়ার বজায় রাখতে আমি কিছুতেই যুদ্ধ শুরু করতে পারি না।

তাইরেসিয়াস : কোনো উদ্ধারকার্য এর নামে অন্য দেশ আক্রমণ কর।

অয়দিপাউস : না। — আহঃ — আমি এখন কি করি?

ক্রেয়ন : আমার জনসমীক্ষা বলছে বিবাহ বিচ্ছেদ তেমন একটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। ব্যক্তিগত সমস্যার সময় বিচ্ছেদ পারিবারিক জোটের ভাঁড়ারে সমস্যা তৈরি করবে।

ইয়েকাস্থে : এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। ঈশ্বর নিশ্চয় পুষ্পবৃষ্টি করবেন।

অয়দিপাউস : আমার মনে হয় জনগণের কাছে আমার পাপ স্বীকারের একটাই পন্থা আছে।

তাইরেসিয়াস : তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না—

অয়দিপাউস : যদি আমার চোখ দুটো উপড়ে ফেলি— ?

ইয়েকাস্থে : (ব্যাঙ্গ করে) আহা চোখ উপড়ে ফেলবে, তারপর মাঝ রাত্তিরে আমায় বলবে— আমার হাত ধরে একটু কল ঘরে নিয়ে যাবে— কচি খোকা একটা।

অয়দিপাউস : আমি স্থির, এমনটিই আমার করা উচিত। আর তাহলেই জনগণ আমাকে ক্ষমা করবে।

ইয়েকাস্থে : ক্রেয়ন, তাইরেসিয়াস তোমাদের কি মনে হয়? নিষ্ঠা ভরে 'আমি দুঃখিত' বলাটাই যথেষ্ট নয়?

অয়দিপাউস : না নয় । তুমি তোমার চুলের সোনালি কাঁটা দুটো দাও। (ইয়েকাস্থের চুলের কাঁটা খুলে নেয়)

ক্রেয়ন : অয়দিপাউস— এমনটি করো না।

অয়দিপাউস : ক্রেয়ন তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে বাধা দিও না।

তাইরেসিয়াস : অয়দিপাউস— মুর্খ তুমি (অয়দিপাউসকে বাধা দিতে যায়)

অয়দিপাউস : সরে যাও। নইলে আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

তাইরেসিয়াস : কি করবে তুমি? অন্ধকে বধির করবে।

অয়দিপাউস : চুপ করো। স্থির হয়ে দাঁড়াও। (হাতের কাঁটা তুলে ধরে) আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। এইক্ষণ থেকে আমি অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করছি। (কাঁটাদুটো দ্রুত চোখের দিকে নিয়ে আসে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে থেমে যায়) অথবা এমনটিও হতে পারে,আমি এই কাঁটা দুটো দিয়ে আমার পুরুষাঙ্গটাকে নষ্ট করে দিতে পারি। এই অঙ্গটার জন্যই তো এত দুর্ঘটনা। পুরুষাঙ্গ বিসর্জন দেব।

ইয়েকাস্থে : অয়দিপাউস এমনটি করো না।

অয়দিপাউস : আমি নিজেকে নিজের সমস্ত পাপ কাজের জন্য দায়ী করছি। এই মুহূর্ত থেকে আমি একজন পুরুষত্বহীন খোজা। (কাঁটাদুটো তলপেটের কাছে নিয়ে এসে থেমে যায়) অথবা আমি আমার হাত কেটে ফেলতে পারি, পাপ স্বীকৃতির দৃশ্যমান প্রতীকি হিসাবে তাই হবে যথার্থ প্রদর্শন। জনগণ তো সত্যি সত্যি জানতে পারবে না আমি লিঙ্গহীন হলাম কিনা। কিন্তু যদি আমি আমার হাতটা, বাম হাতটা অথবা বামহাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা কেটে ফেলি, না মানে আমরা তো প্রতীকি প্রায়শ্চিত্ত'র কথাই ভাবছিলাম।

ইয়েকাস্থে : তার থেকে ওদের কিছু অর্থ দান করো না।

তাইরেসিয়াস : অথবা ঠোঁট কামড়ে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করো।

অয়দিপাউস : আমি ভাবতে পারছি না।

ক্রেয়ন : বিষয়টা নিয়ে আমি যতই ভাবছি, ততই অবাক হচ্ছি। আচ্ছা আমরা এত ভয় পাচ্ছি কেন? জনতার মতি চঞ্চলা নদীর মতো। আজ হয়তো তোমাকে তারা জ্বলন্ত পোড়াতে চাইছে, কিন্তু এক সপ্তাহ বাদে হয়ত এরাই ঈশ্বরের কেচ্ছা কাহিনি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

অয়দিপাউস : তবুও—

ক্রেয়ন : যেটা প্রয়োজন তা হলো একটা জনমোহিনী বক্তৃতা এবং হৃদয়গ্রাহী সংবেদনশীল ব্যাখ্যা।

অয়দিপাউস : কিন্তু এমন একটা অপকর্মের তুমি কি করে সংবেদনশীল ব্যাখ্যা দেবে।

ক্রেয়ন : তুমি তো জেনেশুনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তোমার মাকে বিয়ে করোনি।

ইয়েকাস্থে : না, না তেমনটা জানলে ও খুবই লজ্জা পেত।

অয়দিপাউস : ইয়কাস্থে—

তাইরেসিয়াস : আমি ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি।

অয়দিপাউস : কি দেখছ তুমি?

তাইরেসিয়াস : এবারের অলিম্পিক তেমন জমবে না।

অয়দিপাউস : আমি কি করতে পারি? ঈশ্বরেরা যদি আমাকে পথ দেখাতেন।

ক্রেয়ন : তাঁরাই তো পথ দেখাচ্ছেন।

অয়দিপাউস : কি বলছ?

ক্রেয়ন : একটু মন দিয়ে আমার কথা শোন।

অয়দিপাউস : বল।

ক্রেয়ন : তাইরেসিয়াস তোমার জন্মের সময়ে তোমার ভাগ্য গণনা করেছিল। তুমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছ সেই ভবিষ্যত গণনাকে নিষ্ফল করতে।

অয়দিপাউস : হ্যাঁ।

ক্রেয়ন : হায়রে হতভাগ্য মানুষ। তোমার সমস্ত চেষ্টাই বিফলে গেছে কারণ পৃথিবীতে মরণশীল মানুষের উপরেও আছে এমন শক্তি যাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা যায় না।

অয়দিপাউস : আমি বুঝেছি। যতই তুমি ভবিষ্যতবাণীকে নিষ্ফল করার চেষ্টা করো শেষ অবধি ভাগ্যকে তোমার মানতেই হবে।

ক্রেয়ন : একদম খাঁটি কথা।

অয়দিপাউস : আমি আমার কাজের সমস্ত দায় মেনে নেবো। কিন্তু কাউকেই দায়ী করব না। কারণ এ তো দৈবের বিধান।

তাইরেসিয়াস : এর থেকে ভালো রাজনৈতিক যুক্তি আর কি হতে পারে।

ক্রেয়ন : আমরা বলব তুমি তোমার চক্ষু উৎপাটন করতে চেয়েছিলে, কিন্তু ব্যক্তিগত ইচ্ছার থেকেও জনগণের প্রতি দায়ের গুরুত্ব অনুভব করেই তুমি তোমার আপন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়েছ।

অয়দিপাউস : এটাই মঙ্গলজনক।

তাইরেসিয়াস : 'অয়দিপাউস রেক্স— এক ট্রাজিক হিরো'।

অয়দিপাউস : এরকম একটা নামকরণ খুবই জবরদস্ত হবে।

ক্রেয়ন : তাহলে এক্ষুণি আমরা তোমার ভাষণ প্রস্তুতির কাজ শুরু করি?

অয়দিপাউস : ভাষণটা যেন খুবই আবেগপ্রবণ হয়।

ক্রেয়ন : আবেগপ্রবণ এবং হৃদয়গ্রাহী।

ইয়েকাস্থে : ভাষণে আমাদের সম্পর্কে কি বলা হবে? বিশেষ করে আমার সম্পর্কে?

অয়দিপাউস : হ্যাঁ, ঠিক কি বলা হবে— (ইয়কাস্থে অয়দিপাউসের দিকে তাকায়। অয়দিপাউস চোখ নামিয়ে নেয়)

ইয়েকাস্থে : তোমাদের যদি আমাকে বোঝা বলে মনে হয়, তবে আমি চলে যাচ্ছি। ইয়েকাস্থে যেতে চায়)

অয়দিপাউস : ভাষণে যেন বলা থাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মহতী নারীকে বিবাহের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারব না।

ইয়েকাস্থে : তুমি সত্যিই এমনটি ভাব?

অয়দিপাউস : আমি তোমায় ভালোবাসি ইয়েকাস্থে। আর কে না জানে প্রকৃত ভালোবাসা মায়ের মতোই দুর্বোধ্য।

ইয়েকাস্থে : ওহ্ আদি-আমার সোনামণি-আমার হিরো—

অয়দিপাউস : ইয়েকাস্থে— আমার সবচাইতে প্রিয়—(অয়দিপাউস ইয়কাস্থেকে জড়িয়ে ধরে। ইয়েকাস্থে অয়দিপাউসের মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়)

ঘোষক : — শুনুন—শুনুন—। শেষ অবধি জয় হলো ভালোবাসার। যখন আমি বলছি তখন আমি সত্যিই বোঝাতে চাইছি— 'ভালোবাসাই সবার উপরে।'

(মঞ্চের আলো নিভে যায়)

লেখক : কুন্তল মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

হারায়ে খুঁজি

অপূর্ব দে

চরিত্র ঃ অনন্ত, উপল, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, সুকুমারী দেবী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, গুর্মুখ রায়, বিনোদিনী, অমৃতলাল বসু, রামকৃষ্ণ, ন্যাপা বোস, রোগ সাহেব, কুসুমকুমারী ও ক্ষেত্রমণি

[একটা পেশাদারী পুরণো মঞ্চের আদল মঞ্চ জুড়ে। ব্যাক স্টেজের পর্দার মাঝখান দিয়ে চরিত্ররা যাতায়াত করতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকবে। সামনে উঁ চু পাটাতন। পাটাতনের সামনে সিঁড়ি। পাটাতনের সামনের কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। যাতে চরিত্ররা পাটাতন ও সামনের সমতল অংশে যাতায়াত করতে পারে। পুরণো দিনের দুটো কাঠের চেয়ার টেবিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পাটাতনের এক কোনে পুরণো দিনের একটা আয়না ও ইজি চেয়ার আছে। ব্যাক স্টেজের উপরে দীনবন্ধু মিত্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুকুমারী দেবী, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী দেবী, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখের ছবি থাকবে। মাঝে থাকবে রামকৃষ্ণের ছবি। প্রথম উইংসের ডান দিকে পুরণো টিকিট ঘর, হাউসফুল বোর্ড টাঙানো। বাঁদিকে পুরণো নাটকের পোষ্টারের কোলাজ। 'সেতু', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'প্রফুল্ল', 'নীলদর্পণ', 'সাহেব বিবি গোলাম','আলিবাবা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'টিনের তলোয়ার', 'বিবর', 'কল্লোল', 'নহবত' ইত্যাদি]

[পেশাদারী থিয়েটারের আবহের মধ্যে পর্দা খোলে। সময় সন্ধ্যা। বেল বাজে। ভিতর থেকে নাচ ও গানের শব্দ ভেসে আসে—

" নেচে নেচে চল্ মা শ্যামা, দু'জনে তোর সঙ্গে যাব।
দেখব রাঙা চরণ দু'টি, বাজবে নূপুর শুনতে পাব।।
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাকব শ্যামা অভয়ারে।
'ওমা' বলে যাব চলে, 'মা' বলে মা প্রাণ জুড়াব।।"

যুবক উপল প্রথম উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মঞ্চের দিকে। গান শেষ হলে নিজের মনেই বলে ওঠে—]

উপল : সন্ধ্যায় আজ জ্বলে না আলো। বাজে না ঐকতান, যায় না শোনা গানের মধুর সুর, ওঠে না আওয়াজ নট-নটীর সংলাপে

[নেপথ্যে শোনা যায় সিরাজের কণ্ঠস্বর]

'তাহলে এস ভাইসব আর একবার চেষ্টা করে দেখি। পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনক কীরিটে আবার যা পরিয়ে দিতে পারি কিনা। [ছুরিকাঘাত] ওঃ তুমি! মহম্মদী বেগ, তুমি! .... আঃ, দিলে না। শেষ চেষ্টা ওরা করতে দিলে না। বাঁচতে দিলে না আমাকে। কাউকে অভিশাপ দেব না। সুখে থাক ভাই সব, বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক।' [হাততালির শব্দ; 'এনকোর', 'এনকোর' ধ্বনি।]

'হাউসপুল' বোর্ড নেই। নেই দর্শকের হাসাহাসি, হাততালি। ওঠে না 'এনকোর', 'এনকোর' ধ্বনি, কী যন্ত্রণায় মরেছে দেওয়ালে মাথা ঠুকে। [মোবাইল বের করে ছবি তুলতে যায়। হঠাৎ তার চোখে আলো এসে পড়ে। আপ স্টেজের মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করে বৃদ্ধ অনন্ত। গাল ভর্তি সাদা দাড়ি, মাথাও সম্পূর্ণ সাদা। গায়ে পুরণো দিনের চাদর। হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ।]

উপল : কে? কে আপনি? ওভাবে টর্চ মারছেন কেন?

অনন্ত : তুমি ভয় পেয়েছ ছোকরা?

উপল : না, না, কিসের ভয়? কিন্তু আপনি কে?

অনন্ত : আমি কে? তা কি ছাই নিজেই জানি? শুধু এইটুকু জানি— আমি অনন্ত।

উপল : আপনি কি এখানেই থাকেন?

অনন্ত : আর কোথাও যে আমার ঠাঁই নেই।

উপল : কতদিন আছেন এখানে?

অনন্ত : অনন্তকাল ধরে। বাপ-ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার আমল থেকে। তুমি কে হে ছোকরা?

উপল : আমার নাম উপল। অকটু-আধটু নাটক-ফাটক করি।

অনন্ত : [রেগে গিয়ে] তোমার বাবা, কাকা ভালো আছে? .... নাটক-ফাটক আবার কী? নাটক করি বলতে লজ্জা হয়? এই বদ অভ্যাস আগে ত্যাগ করবে — তারপর নাটক করবে।

উপল : সরি, এখন থেকে চেষ্টা করবো।

অনন্ত : মহাশয়ের এখানে আসার কারণ?

উপল : গবেষণার কাজে .....

অনন্ত : গবেষণার বিষয়?

উপল : পেশাদারি থিয়েটার বলতে পারেন

অনন্ত : বুঝেছি। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে? কার আন্ডারে?

উপল : সে রকম কিছু নয়। ধরা বাঁধা ছকে নয়। মনের তাগিদে। নাটকের প্রতি ভালোবাসায়।

অনন্ত : তাই বলো। স্বঘোষিত গবেষক।

উপল : আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন?

অনন্ত : পারি .... কিন্তু করবো না।

উপল : কেন এরকম বলছেন?

অনন্ত : ইতিহাসকে বুকে নিয়ে আছি আমি। সারা দেহে নানা ক্ষত চিহ্ন। [চাদর খুলে দেখায়] ভীষণ অনাদরে পড়ে আছি আমি। নীরবে অশ্রু ফেলছি। একবার তাকাও ওধারে। রাস্তার ওপরে রঙ্গনা। বাঁদিকে বিজন। ডানদিকে সারকারিনা। একটু এগোলেই দেখবে বিশ্বরূপা, শ্রীরঙ্গম। ওদিকে স্টার। এদিকে মিনার্ভা।

মানিকতলার খাল পাড়ে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ। একে একে নিভেছে দেউটি। আর ঐ পাশে বেশ্যাপাড়া। যেখান থেকে উঠে এসেছে একের পর এক অভিনেত্রী। নাচে, গানে, অভিনয়ে মঞ্চগুলি কাঁপিয়ে দিয়েছিল। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] সে সব আজ ইতিহাস।

উপল : বিশ্বাস করুন— হাতিবাগানের থিয়েটার আমাকে ভাবায়।

অনন্ত : হাসালে ছোকরা! বেশ্যাপাড়ার থিয়েটার তোমাকে ভাবায়? বোসো, বোসো— অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো। [দু'জনে দু'টো রস্ট্রামে বসে] সিগারেট আছে? দামি সিগারেট? অনেকদিন খাওয়া হয় না।

উপল : আমি বিড়ি, সিগারেট কিছু খাই না।

অনন্ত : [কোমর থেকে একটা পোড়া বিড়ি বার করে ধরায়] মাটির ভাড়ে চা আর লিলি বিস্কুট। সঙ্গে লাল-নীল সুতোর বিড়ি। এ নিয়েই ছিল দর্শকের জেল্লা। [দীনবন্ধুর উপর টর্চের আলো ফেলে] এনাকে চেনো?

উপল : নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। 'নীলদর্পণ' নাটকের স্রষ্টা। ব্রিটিশ বিরোধী নাটক।

অনন্ত : ওসব কেতাবী বুলি ছাড়ো ছোকরা। .... দাঁড়াও, তোমাকে একটা গান শোনাই—
'নীলকরের কী অত্যাচার
এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার।
ও নীলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিকো নিস্তার,
বেচলে ভিটে না খায় মিটে, কিসে মিটে সন্দ্যভার।।
ও জোর করে বিচ ছড়ায় আগে, ছাড়ায় কর্ম আর,
হোলোনা ধান, গেল না মান, প্রাণ বাঁচান হোলো ভার।
ও সুদে সুদে বোবা সোদা তিন পুরুষের ধার,
বেচলে পাটা, না খেয়া লেঠা, কতো বেটা গঙ্গা পার।
হুড়ুর হো, হুড়োর হো হুড়োর হো হো হো।।

উপল : খুব ভালো লাগলো। কোন নাটকের গান? নীলদর্পণের?

অনন্ত : না গো না! এ হলো পুস্তিকার গান। 'নীলদর্পণ' লেখার চার বছর আগে লেখা হয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

উপল : কী নামে?

অনন্ত : 'বাপরে বাপ! নীলকরের কী অত্যাচার'। লেখকের নাম পাওয়া যায় না।

উপল : আপনি অনেক জানেন দেখছি।

অনন্ত : জানতে হয়, জানতে হয়, নাহলে পিছিয়ে পড়তে হয়। ওই যে ৩৬৫ নং আপার চিৎপুর। ওখানেই ছিল মধুসূদন সান্যালের বাড়ি। বাড়ির সামনে একটা বড়ো ঘড়ি লাগানো ছিল। 'ঘড়িওয়ালা বাড়ি' বললে সবাই চিনতো। সেই বাড়িতেই গড়ে ওঠে ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭২ সাল, ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার। সন্ধ্যা ছ'টা। 'নীলদর্পণ নাটকের প্রথম শো—

[তিনটি ঘন্টা পড়ে। মিউজিক শুরু হয়। পাটাতনের উপর নীলদর্পণের দৃশ্য দেখা যায়। রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির দুই হাত ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে।]

রোগ : ডিয়ার, ডিয়ার— আইস, আইস—

ক্ষেত্র : ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসির সঙ্গে মোরে বাড়ি পাটয়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না— [হাত ধরে টানেন] ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ : তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।

ক্ষেত্র : মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে— মুই পোয়াতি।

রোগ : তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না [কাপড় ধরে টানে]

ক্ষেত্র : ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও— [রোগের হাতে নখের আঁচড় দেয়]

রোগ : ইনফোরন্যাল বিচ্ [হাতে বেত নিয়ে] এইবার তোর ছিনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র : মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই— ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ি জোড়া মরা মর‍্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো করবো, তোর মা, বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়িয়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্ না, মোর প্রাণ বার কর‍্যে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ : চুপ রাও হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা। [পেটে ঘুষি মেরে চুল ধরে টানে]

ক্ষেত্র : কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো। [কান্নায় ভেঙে পড়েন।]

[এই অংশটি যখন চলবে, তখন উপলকে দেখা যাবে ভিডিও করতে।]

অনন্ত : বলো হে ছোকরা— নারীর প্রতি এই অত্যাচার কি কমেছে?

উপল : না, বরং বেড়েছে।

অনন্ত : আর প্রতিবাদ? ...... চুপ করে আছো কেন? প্রতিবাদের কণ্ঠ কি আজ জোরালো? [উপল মাথা নীচু করে থাকে] অথচ পরাধীন ভারতে খোদ কলকাতার বুকে এ নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এক টাকা আট আনার টিকিট কেটে লোকে নাটক দেখেছিল।

উপল : পেশাদারি থিয়েটারের জয়যাত্রা ‘নীলদর্পণ’ থেকেই শুরু।

অনন্ত : ঠিক বলেছো। এই থিয়েটার প্রথম থেকেই প্রতিবাদী। লাল মুখোদের লাল চোখকে তারা রেয়াত করেনি। ...... রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশচন্দ্র কর। অমন রোগ সাহেব আর হলো না। একেবারে ষোলআনা নিখুঁত রোগ সাহেব।

উপল : শুনেছি, ওনার অভিনয় দেখে বিদ্যাসাগর মশাই চটিজুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

অনন্ত : ঠিকই শুনেছো ......

উপল : ক্ষেত্রমনি চরিত্রে কে অভিনয় করতেন?

অনন্ত : আরেক দিকপাল অভিনেতা—কাপ্তেন বেল। আসল নাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, প্যান্টোমাইম অভিনয়ে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন ঃ

'যেরা হাসকে বলো, ও মুন্নাজান, জান পিয়ারে,
তোমার নাম ফুলকুমারী, তোমায় না দেখলে মরি,
তবে কেন রাধা পিয়ারী, নজ্‌রা মার রে।।'

[অনন্ত উপরের অংশ নেচে, গেয়ে অভিনয় করে দেখায়। উপল ভিডিও করে। অভিনয় শেষে হাততালি দেয়]

উপল : দারুণ দাদু, দারুণ। ভীষণ ভালো লাগলো। তোমার তুলনা নেই।

অনন্ত : দুর্গাদাস করের নাম শুনেছো? ডাক্তার দুর্গাদাস কর।

উপল : না।

অনন্ত : যাঁর ছেলে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। তাঁর নামেই আর.জি. কর মেডিক্যাল হাসপাতাল।

উপল : ওহো! আবছা! এবার বুঝেছি।

অনন্ত : কিছুই বোঝনি। 'নীলদর্পণ' নাটকের সঙ্গে এই বাপ-ব্যাটার সম্পর্ক কী? বলতে পারো?

উপল : আজ্ঞে না।

অনন্ত : দুর্গাদাস তখন ঢাকায় সরকারী ডাক্তার। আর দীনবন্ধু ঢাকার ডাকঘরের ইন্সপেক্টর। 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়েছিল ঢাকার একটি ছাপাখানায়। রোজ রাত ন'টা-দশটায় দীনবন্ধু চলে আসতেন দুর্গাদাসের বাড়িতে। দরজা বন্ধ করে দু'জনে মিলে 'নীলদর্পণ'-এর প্রুফ দেখতেন।

উপল : আর ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর?

অনন্ত : ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নাম জানে না এমন বাঙালি নেই। কিন্তু অভিনেতা রাধাগোবিন্দ করের নাম ক'জন বাঙালি জানে?

উপল : কী বলছেন!

অনন্ত : ঠিকই বলছি। ১৮৭৩-এর ২৯সে মার্চ। গিরিশের ন্যাশনাল থিয়েটার 'নীলদর্পন-এর অভিনয় করে। সেদিন সৈরিন্ধ্রির ভূমিকায় অভিনয় করেন ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। ডাকনাম গোবি। তাঁর অভিনয় দেখে দর্শক আনন্দিত ও অবাক হয়েছিল। একটা দরকারি কথা তোমাকে বলি ছোকরা .... অভিনয় হয়েছিল টাউন হলে। নেটিভ হাসপাতালের জন্যে সাহায্য রজনী। থিয়েটারে সাহায্য রজনী সেই প্রথম।

উপল : আপনার কথা যত শুনছি তত অবাক হচ্ছি।

অনন্ত : এখনও অবাক হওয়াক অনেক বাকি আছে ছোকরা ..... [অর্ধেন্দুর উপর টর্চের আলো ফেলেন] অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। নটচূড়ামনি। 'নীলদর্পণ'-এ একাই চারটি চরিত্রে অভিনয় করেন। উড্ সাহেব তার মধ্যে অন্যতম। সাহেব চরিত্রে তাঁর

তুলনা ছিল না। মিঃ রডা, মিঃ ড্রেক, মিঃ হে, হলওয়েল সাহেব, মেজর আডমস্ - সব চরিত্রেই তিনি পাক্কা সাহেব— মুস্তাফি সাহেব।

[আলো ও আবহের পরিবর্তন হয়। পাটাতনের মাঝে এসে দাঁড়ায় মুস্তাফি সাহেব। ছেঁড়া কোট প্যান্ট, টাই পরা, মাথায় সাহেবী টুপি। প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে রুমালের অর্ধাংশ বের হয়ে আছে। গলায় বেহালা ঝোলানো। হাতে বেতের ছাতা অথবা লাঠি। মুখে সিগারেট।]

অর্ধেন্দু : হামি মুস্তাফি সাহেব আচি। টোমাডের বন্ডু লোক আছি।

[টুপি খুলে মাথা নিচু করে দর্শকদের কুর্নিশ জানায়। অনন্ত যা বলে তা করে দেখায়। অর্ধেন্দুর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উপল ভিডিও করতে থাকে]

অনন্ত : সাহেবেরা যেমন পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। পাও গা নাচায়, বাঁ হাত দিয়ে পকেট থেকে রুমাল তুলে নেয়। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। শূন্যে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। প্রেমিককে জড়িয়ে গালে চুমু খায় .....

অর্ধেন্দু : দেবকার্সন সাহেব। এক ইংলিশ অ্যাক্টর আচে। বহুৎ ফান্টা, বাঙালি লোক কো ঠাট্টা করতে হ্যায়। 'দেবকার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা' নামে আমাদের বিদ্রূপ করলো :

' I am a very Bangalee Baboo
I keep my shop at Radha Bazar
I live in Calcutta eat my Dal Vat
And smoke my Hooka.'

সাচ্চা জবান দিলাম হামি। বেহালা বাজিয়ে গান ধরে। এ সময় আরও দু'জন সাহেবকে সঙ্গ দিলে ভালো হয়।

' হাম বড়া সাব হ্যায় দুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাঠ
Mr. Mustafee name হামারা
চাট্গাঁও মেরা আছে বিলাই—
....
Coat পিনি Pantaloon পিনি
পিনি মোর Trousers
Every Two years New Suits পিনি
Direct from Chandy Bazar
I am a gentleman.'

[দর্শকদের দিকে হাত নাড়াতে নাড়াতে বিদায় নেয়। আলো স্বাভাবিক হয়]

উপল : সাহেবিয়ানাকে ভীষণ ব্যঙ্গ করেছেন।

অনন্ত : শুধু কি তাই ? তাই পরাধীন জাতির অপমানের যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন ফিরিঙ্গিদের। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থিয়েটারকেই তাঁরা হাতিয়ার করেছিলেন। আপোসের রাস্তায় হাঁটেন নি।

উপল : এখন প্রতিনিয়ত বলা হয়, এড্‌জাস্ট করো, কম্‌প্রোমাইজ করো।

অন্তত : ওসব করলে মই বেয়ে উঁচুতে উঠতে পারবে। কিন্তু মনে রেখো ছোকরা, মইটা একদিন সরে যেতে পারে। কিংবা সাপের মুখে পড়তে পারো। সেদিন তুমি চিৎপটাং .... ছাড়ো এসব কথা। শোনো, মুস্তাফি সাহেবের কথা। ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা বাংলা উত্তাল। সে বছর ৭ই সেপ্টেম্বর। মিনার্ভ রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয় গিরিশের ‘সিরাজদ্দৌলা, সিরাজের ভূমিকায় গিরিশপুত্র দানীবাবু। অর্ধেন্দু দানশা ফকির চরিত্রে। চরিত্রটি মোটেই সুবিধের নয়। সিরাজকে সে-ই ধরিয়ে দেয়। .... একদিন অর্ধেন্দু অভিনয় করছেন— যেখানে দানশা ফকির কোম্পানীর লোকেদের পথের সন্ধান দিচ্ছে। এমন সময় একজন মুসলমান দর্শক খেপে গিয়ে অর্ধেন্দুকে মারতে উদ্যত। অন্যান্য দর্শকরা তাকে ধরে ফেলে। একে দেশাত্মবোধক নাটক, তারমধ্যে দর্শকের এরূপ প্রতিক্রিয়া। ‘সিরাজদ্দৌল্লা’ রাজরোষে পতিত হয়। মিনার্ভা বাধ্য হয় নাটকটি বন্ধ করে দিতে।

[উপল উঠে দাঁড়ায়] উঠছো না কি ব্রাদার? ভালো লাগছে না? এসব গল্পকথা মনে হচ্ছে?

উপল : না, না । আপনার কথাগুলি ভীষণ বাস্তব, সত্য ..... ভাবছিলাম, আপনার একটা ছবি তুলবো, তাই ......।

অনন্ত : রসো, রসো। এই হয়েছে তোমাদের এক গ্যারাকল। কিছু দেখলে না, বুঝলে না, জানলে না, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক, ক্লিক। আর ফেসবুকে চালান। ক'টা লাইক পড়লো— তার জন্যে হেদিয়ে থাকা।

উপল : বাব্বা! আপনি ফেসবুক, লাইক, ওয়াটস্‌অ্যাপ .... সব খবরই রাখেন দেখছি।

অনন্ত : আপডেট না হলে ব্যাকডেট করে দেবে যে ছোকরা .... [হঠাৎ গলা চড়িয়ে অভিনয় করে ওঠেন] ‘সাবধান, ভ্রমে, স্বপ্নেও স্বাধীন হতে অভিলাষ কর না— যদি কর প্রকাশ কর না। আমার নির্ম্মাতারা বিশ্বদর্পহারী— ভুবনবিজয়ী- বজ্রবিদ্যুৎপাণি - যদি প্রহারিত সারমেয়ের ন্যায়, যদি ক্রীতদাসের বেশে আমার নিকট আসিতে চাও, আইস, আপত্তি নাই। কিন্তু বিদ্রোহীভাবে - অস্ত্রহাতে আমার নিকট আসিতে কদাচ সাহস করিও না। নিমেষ মধ্যে তোমাদের সন্তপ্ত রক্ত শীতল হইবে, এক রমনীয় মাঠ তোমাদিগের মৃতদেহে আচ্ছাদিত হবে’। ভয় পেলে? দেকলাম, মুখস্ত আছে কিনা?

উপল : কোন্‌ নাটকের সংলাপ?

অনন্ত : শরৎ-সরোজিনী। উপেন্দ্রনাথ দাসের। আরেক বিদ্রোহী নাট্যকার। নাটকের মঞ্চে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়েছিল। শরৎ-সরোজিনী নাটকের কথা উঠলেই মনে পড়ে যায় .... [সুকুমারীদেবীর উপর টর্চের আলো ফেলেন। আলো ও আবহ পরিবর্তিত হয়। পাটাতনের উপর সুকুমারীদেবীকে দেখা যায়। উপল ভিডিও শুরু করে।]

সুকুমারী: 'আমি সখের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রী-পুরুষে এক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে।'

আমি গোলাপ। গোলাপ সুন্দরী। স্টার অফ নেটিভ স্টেজ। আমি গণিকা মায়ের সন্তান গো। হুগলি জিলার মাহেশে আমার জন্ম। বাবু শরৎ চন্দ্র ঘোষ গো। মস্ত বড়লোক। বেঙ্গল থিয়েটারের মালিক গো। শ্যামা, জগত্তারিনী, এলোকেশী আর আমাকে নিয়ে এলো- অন্ধকার থেকে আলোতে। গোলাপ তখন কুঁড়ি। গোলাপ পাপড়ি মেললো ন্যাশনাল থেটারে।বাবু উপেন দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে। সেখানে আমি সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে ফাটিয়ে দিলাম গো। লোকে আমাকে সুকুমারী বলেই ডাকতে লাগলো। আমার কপাল গেল খুলে। ছিলাম গোলাপ, হলাম সুকুমারী। [ইজি চেয়ারে বসে]

অনন্ত : 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে বৈজ্ঞানিক চরিত্রে অভিনয় করতেন— গোষ্ঠবিহারী দত্ত। উপেন্দ্রনাথ দাস এক কাণ্ড করে বসলেন। গোষ্ঠবিহারীর সঙ্গে সুকুমারীর বিয়ে দিলেন। একেই বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ! রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে সুকুমারী চলে গেলেন সংসার রঙ্গমঞ্চে ......

সুকুমারী: কপালে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কী! সুখ কপালে বেশিদিন টিকলো না গো। উনি চলে গেলেন বিদেশে। জাহাজের কাজ নিয়ে। আমি পড়লুম মহাবিপদে। আমার কোল আলো করে তখন এসেছে আমার খুকু। দু'জনার পেট। কেমন করে খাওয়া-পরা চলে! তাই চলে এলাম আবার রঙ্গমঞ্চে .... । [গান ধরে]

'প্রেম আসে, আসে যায় প্রেমিক ভ্রমর?
অনাদর নাহি করে, সমাদর যারে তারে।
মধু খায়, সুখে বসে বুকের উপর।
বোঝা দায় কে তোমার আপন পর।
নারীর যৌবন সম, গরব তোমায়
যতদিন মধু রবে, আদরের ধন পাবে
অবহেলে বিলাইলে, মান আপনার।
না বুঝিলে ছলনা এ কুটিল ধরার।
বিচিত্র চরিত্রে মুগ্ধ, অন্তর আমার
খেলিয়ে পবন মনে, সুমধুর আবাহনে,
পরাগ ছড়ায়ে মোরে ডেক নাক আর -
অনুমাত্র পড়ে আছি ধরে এ সংসার।'

[ফুঁপিয়ে কেঁদে বিদায়। আলো স্বাভাবিক হয়।]

অনন্ত : মঞ্চে বেশ্যাদের উপস্থিতি— পাবলিক ভালোভাবে নেয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো সমাজ-সংস্কারককেও একটা ধাক্কা দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, 'মাইকেল ব্যাপারটাকে

সমর্থন করেছিলো। .... অথচ সুকুমারী, বিনোদিনী, তারাসুন্দরীরা থিয়েটারকে ভালোবেসে, মঞ্চকে পবিত্রতম স্থান মনে করে— জীবন, যৌবনকে সমর্পন করেছেন। অথচ তাঁদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায় বঞ্চনার, আবার মহাগৌরবেরও। মুনাফাভিত্তিক সমাজের লাঞ্ছনা সয়েছেন নাট্যকাররা। কিন্তু মুখ বুজে থাকেননি। নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। সমাজের কদর্য চেহারা তুলে ধরেছেন। বিদ্রোহে ভাষা জুগিয়েছেন।

উপল : এক মিনিট। [কাঁদের ব্যাগ থেকে সবুজ মলাটের 'টিনের তলোয়ার' বই বের করে। ভূমিকাংশ পড়ে সোনায় অনন্তকে। উৎপল দত্তের গলা আনতে পারলে ভালো হয়] 'বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলোকে— যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোন নিয়ম মানেন নাই। সমাজও যাঁহাদের দিয়েছিল অপমান ও লাঞ্ছনা যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে 'টিনের তলোয়ার' নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয় বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি। যাঁহারা বহু পত্র-পত্রিকা, বহু বাচস্পতি-শিরোমণি, বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, যাঁহারা অপাঙক্তেয় ছোটলোকের আশীর্বাদধন্য, যাঁহারা ভালোবাসার বিশাল আলিঙ্গন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া বেপরোয়া, বাঁধনহারা। যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ, যাঁহাদের মদ্যসিক্ত অঙ্গুলি স্পর্শে ছিল বিশ্বকর্মার যাদু, যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র। [এই অংশটুকু অফ্ ভয়েসেও করা যেতে পারে।]

অনন্ত : উৎপল দত্ত। টিনের তলোয়ার।

উপল : আপনার কথার সঙ্গে বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছি।

অনন্ত : পাবেই তো। ওই নাটকের বসুন্ধরা মানে আঙুরের এবং ময়নার সংগ্রাম-সাধনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে সুকুমারী-বিনোদিনীদের সংগ্রাম-সাধনা। এঁরা দেহকে ব্যবসার কাজে লাগায়নি। লাগিয়েছে থিয়েটারের কাজে।

উপল : বীরকেষ্ট দাঁ-রা আজও আছে। তারা থিয়েটারকে কিনে নিতে চায়। তাদের অঙুলি হেলনে চালাতে চায় থিয়েটারকে।

অনন্ত : প্রিয়নাথরাও তো আছে। যারা লড়াই করে। লড়াই করে হারে। আবার লড়াই করে। লড়াইয়ের মধ্যেই বেঁচে থাকে।

উপল : কিন্তু বেনীমাধব? তারা থিয়েটারকে বেঁচে দিচ্ছে কার স্বার্থে?

অনন্ত : থিয়েটারের স্বার্থে। একবুক স্বপ্ন নিয়ে থিয়েটারে এসেছিল। বাঁচতে চেয়েছিল থিয়েটার নিয়ে। তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। গিরিশ ঘোষ, শিশির ভাদুড়ি, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত..... [টর্চের আলো ফেলে গিরিশের উপর। আলো ও আবহের পরিবর্তন হয়। মঞ্চে প্রবেশ করে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে।

উপল ভিডিও করতে থাকে।]

[নেপথ্যে শোনা যায় অমৃতলাল বসুর গলা]

অমৃত : 'মদে মত্ত পদ টলে
নিমে দত্ত রঙ্গ স্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।'

গিরিশ : অমৃত, আমি মাতাল। মদ খেলে আমি মাতাল গিরিশ। না খেলে আমি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। বঙ্গের সেক্সপীয়র। বঙ্গের গ্যারিক। ফাদার অফ্ দি নেটিভ স্টেজ। পারবে তুমি আমার মতো নিমচাঁদ করতে? কেউ পারবে? .... শোন অমৃত, তামাক আমি ঢের খেয়েছি। ঝাড়ে বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক? গাজা, মদ, আফিং, চরস, ভাং - কোনটা বাকি আছে? সব নেশা করে দেখেছি। গাজায় ভয়ানক উইল পাওয়ার আছে। আফিং-রে মতো ছোটলোক নেশা আর নেই। যাই বলো, সব নেশার রাজা মদ। [ঢক ঢক করে মদ খায়।] এ সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়। নাট্যশালা তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ..... বুকে বড়ো জ্বালা। জ্বালা বেড়েই চলেছে। রাতে ঘুম হয় না। কে ডাকছো অমন করে? উইংস-এর আড়াল থেকে? যোগেশ এসেছো? তোমার তো বাবা একটাই সংলাপ .... 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আহা,.. হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল ....কি করব? গেল তো কি করব? .. গেল যাক্। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।' (কান্না) করুণাময় তুমি তো এসেছো? হাহাকার করছো কেন বাবা? আমরা নাকি থিয়েটারওয়ালা? আমাদের থেকে মুটে মজুরও ভালো। তারা স্ত্রী-পুরুষে রোজগার করে। ব্যামো হলে হাসপাতালে যায়। ভিক্ষে করে। আমরা তা পারবো না। আমরা থিয়েটারওয়ালা। ভদ্দরলোক। আমাদের জাত যাবে। নিন্দে হবে। বউ বাচ্চা নিয়ে উপোস করে থাকবো,.... আহার নেই, বস্ত্র নেই, ঘরে ঘরে কাঙালীর পল্টন। আহা কি সুখের সমাজ! ছি: .....

[নেপথ্যে বিনোদিনীর গলা শোনা যায়]

বিনোদ :

' আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী।
পতিতা, আমার আত্মীয় নাই
সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই
এই পৃথিবীতে আমার বলিতে
এমন কেহই নাই।'

গিরিশ : কে? বিনোদ না? বিনোদই তো। বিনোদ, তুমি আমার সজীব প্রতিমা বিনোদ, তিল তিল করে আমি তোমায় গড়ে তুলেছি বিনোদ। আমিই তোমাকে 'ফ্লাওয়ার অফ্ দি নেটিভ স্টেজ' করেছি। বিনোদ, তোমাকে 'প্রাইমাডোনা (Primadona) অফ্ দি বেঙ্গলি স্টেজ, 'মুন অফ্ দি স্টার কোম্পানি' কে করেছে বিনোদ? আমি, আমি করেছি বিনোজ। আমি.... [ফ্রিজ]

[অন্য একটি আলোর বৃত্তে বিনোদিনীকে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে দেখা যায়।]

বিনোদ : 'যাবত জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না।
ভালোবেসে এই হল, ভালোবেসে কী লাঞ্ছনা।
আমি ভালোবাসি যারে— সে কভু ভাবে না মোরে -
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই যন্ত্রণা।'

[গুর্মুখ রায় প্রবেশ করে]

গুর্মুখ : গান থামালে কেন পিয়ারী? আগে গান হোক— কথা পরে হোবে বিনোদবিবি।

বিনোদ : 'ভালোবাসা ভুলে যাব - মনেরে বুঝাইব—
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালো না বাসে।'

[চোখে জল আসে]

গুর্মুখ : বাঃ বহুত খুশ হলাম। জান বিবিজান, ভালোবাসার গান হামার বহুত্ পসন্দ্ আচে। হামি ভালোবাসার গান চাই। আওর .....

বিনোদ : আওর?

গুর্মুখ : ভালোবাসাভি চাই বিনোদ। [একটা গোলাপ ফুল দেয়]

বিনোদ : আর আমার থিয়েটার?

গুর্মুখ : হোবে, জরুর হোবে। হামার জবান একটাই। থিয়েটার হোবে। তোমার নামেই হোবে। বিনোদিনী থিয়েটার। ইয়ানে- বি থিয়েটার।

বিনোদ : আমায় ধোঁকা দিচ্ছ না তো?

গুর্মুখ : [হাত ধরে] না, পিয়ারী না, দেখো তুমি কতো জলদি জলদি হামি থিয়েটার বানাই।

বিনোদ : সাচ্ বলছো?

গুর্মুখ : দুনিয়া উল্টে যাবে, লেকিন হামার কথার খিলাপ হোবে না।
[উভয়ে ফ্রিজ হয়ে যায়।]

গিরিশ : 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক লিখে ফেলেছি বিনোদ। দু একদিনের মধ্যেই রিহার্সাল শুরু করবো। আমি দক্ষ। তোমাকে সতীর ভুমিকায় নামতে হবে বিনোদ। অমৃত করবে মহাদেব। দারুন জমে যাবে বিনোদ। একদিকে চলবে রিহার্সাল, আর একদিকে তৈরী হবে বিনোদিনী থিয়েটার। [ফ্রিজ]

বিনোদ : আমার নামে একটা থিয়েটার হবে, হৈ হৈ করে অভিনয় করবো। কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসবে। টিকিট কাটবে লাইন দিয়ে। ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ লাগছে।

গুর্মুখ : লেকিন, তুমিও সাথ সাথ বোলো— তুমিও হামার হোবে?

বিনোদ : নাও গুর্মুখ, নাও আমাকে। গুর্মুখ, আমি তোমার। তুমি আমাকে দাসী করো। জন্মেই যে আমি বিনোদিনী দাসী।

গুর্মুখ : না বিনোদবিবি, তুমি দাসী কেন হোবে। তুমি হোবে হামার পিয়ারী, হামার কলিজা।

বিনোদ : বিনোদিনী থিয়েটার আমার চাই গুর্মুখ। আমি নিজে ঝুড়ি করে মাটি ফেলবো।

রাত জেগে কাজ করবো। গড়ে তুলবো বিনোদিনী থিয়েটার। লোকে বলবে— ওই দেখো বিনোদিনী থিয়েটার। সেটাই আমার গৌরব, আমার অহঙ্কার।
[চোখে জল]

গুর্মুখ : একি পিয়ারী? তোমার আঁখি মে অশ্রু কিউ?

বিনোদ : [আঁচল দিয়ে চোখ মুছে] না, ও কিছু না। এ আমার আনন্দের অশ্রু। আমার নামে থিয়েটার হবে। ওই আনন্দেই ....
[সেই অংশের আলো নেভে]

গিরিশ : কিন্তু হলো কোথায়? ওরা হোতে দিল না। দাশু নিয়োগী, অমৃতলাল, অমৃত মিত্ররা ষড়যন্ত্র করলো। আমিও সেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার, নিন্দার ভাগীদার।
[নেপথ্যে বিনোদিনীর গলা শোনা যায়।]

বিনোদ : 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনাই যে উহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন অসৎ ব্যবহার করিবেন। তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অতিশয় মনোকষ্ট হইয়াছিলো। যদিও এ সম্বন্ধে আর কখনও কাহাকেও কোনো কথা বলি নাই।'

গিরিশ : আমি জানি বিনোদ, আমি জানি। সত্যিই আমরা ছলনা করেছিলাম। কী অদ্ভুত কথা! পতিতার নামে থিয়েটার হলে নাকি থিয়েটার মার খাবে? ভদ্দর লোকেরা থিয়েটার দেখতে আসবে না। .... কেন আসবে না? কেন আসবে না? ওই বাবুর দল বেশ্যাপল্লীতে যায় না? ওদের সঙ্গে নাচন কোদন করে না? যত দোষ হলো থিয়েটারের? ...... আরে বাবা, নালার জল গঙ্গায় পড়লে গঙ্গাজল হয়ে যায়। সাধুসঙ্গে কুচরিত্ররাও সন্ন্যাসিনী হয়। ..... এই শালা বারফট্টায়ের দল আমায়ে বলে— লোকটা বেশ্যা নিয়ে থিয়েটার করে। বেশ করি শালা। তোর বাপের কি? ..... সুকুমারী, বিনোদ, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, গুলফন হরি এরা আমার সাজানো বাগানের ফুল। সব দিক থেকেই বিউটিফুল।
[সলজ্জ হাসি, মদ খায়]

[অন্য একটি আলোর বৃত্তে অমৃতলাল বসুকে দেখা যায়, এক হাতে মাথায় বিয়ারের বোতল ধরে, আর এক হাত কোমরে দিয়ে কোমার দুলিয়ে নাচ ও গান করছে।]

অমৃত :
' আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার।
বিয়ার ফুরায় পুন আনায় বিয়ার।
তিনশক্র বধ তবু চাগে না চিয়ার ।
....
প্রভাতে ধরেছি গ্লাস্ সন্ধ্য হয়ে গেছে।
দ্বিযামা ত্রিযামা পুন উষা দেখা দেছে।
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।

আমার স্মরণে গোল 'কাল' কিম্বা আজ
উঠি উঠি বাধা পড়ে— "আর এক পাত্র"।
গুরু যাদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র। [ঢেকুর তোলে]

গিরিশ : রসরাজ অমৃতলালা বসু। কী চাও ভায়া? কেন এসেছো এখানে?

অমৃত : চলুন গুরুদেব। বিনির বাড়িতে ঘুরে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয়নি।

গিরিশ : কোন মুখে যাবে অমৃত? আমরা কি বিনোদকে মনে রেখেছি? স্টার তৈরীর কর্মযজ্ঞে ওর আহুতিকে স্মরণে রেখেছি? যদি রাখতাম, তাহলে বিনোদ আড়ালে চলে যেত না? একেবারে আড়ালে চলে গেল।

অমৃত : গুরুদেব, নাট্যলোক - বিচিত্রলোক। এখানে অনেক খেলা চলে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছো। কখন পড়ে যাবে? দেবা ন জান্তি। দেবতাও জানে না।

গিরিশ : চেয়ে দেখো অমৃত — গোটা শহরে আলোর রোশনাই। এমন আলো পেলে, অমৃত, নাট্যশালায় আগুন জ্বেলে দিতাম।

অমৃত : আপনি তো এমনিতেই আগুন জ্বালিয়েছেন গুরুদেব, 'রাবনবধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'নল দময়ন্তী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'ম্যাকবেথ', যা ধরেছেন তাতেই সোনা ফলিয়েছেন।

গিরিশ : তুমিও ভায়া কম কিসে? তোমার 'ব্যাপিকা বিদায়', 'চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে', 'বিবাহ বিভ্রাট', 'খাসদখল' দর্শকের মন দখল করে নিয়েছিল।

অমৃত : সে আপনারই আশীর্বাদ গুরুদেব।

গিরিশ : আশীর্বাদ - টাশীর্বাদ কিছুই নয় অমৃত। ইউ আর জিনিয়াস। সেই কবিতাটা একবার শোনাও।

অমৃত : গুরুদেব কোন কবিতা?

গিরিশ : যে কবিতার প্রথম অক্ষরগুলি বসালে - হয়ে যায় শ্রী-অ-মৃ-ত-লা-ল-ব-সু ।

অমৃত : ওহো! শুনুন তাহলে—

'শ্রীশ্রী হরিপদে যেবা করয়ে স্মরণ
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন।।
মৃত্যুর ভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত।।
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ।।
বন্দি ঈশ্বর-চরণ খোঁজে মোক্ষ পথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত।।

গিরিশ : চমৎকার! কে লিখতে পারবে এমন পয়ার? ভুল যদি না করি— তোমার বয়স তখন মাত্র তেরো।

অমৃত : ঠিক।

গিরিশ : তোমার রসবোধের তুলনা নেই অমৃত। লোকে বলে তোমার মুখ থেকে অমৃত ঝরে। দু' একটা শোনাও ভায়া। মনটা বড্ড খিচ হয়ে আছে।

অমৃত : যথা আজ্ঞা গুরুদেব। আপনি তো জানেন আমার বাড়ির ঠিকানা। নয় বাই ২ নম্বর, রামচন্দ্র মৈত্র লেন।

গিরিশ : হ্যাঁ। কতবার গিয়েছি। থিয়েটার নিয়ে আডাডা দিয়েছি। মুড়ি আর কুমড়ি খেয়েছি। তোমার অমৃত-মদিরা পান করে — বাড়ি ফিরেছি।

অমৃত : একদিন এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি নাকি এ্যাক্টর। ঘরে ঢুকেই হাঁপাতে লাগলেন। আমি জানতে চাইলাম— হাঁপাচ্ছেন কেন?

: বাইরে চৈত্রের প্রখর রোদ। তারমধ্যে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে। শ্যামবাজার মোড় থেকে শোভাবাজার মোড়।

: কী কারণে?

: আপনার বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

: সে কি মশাই? আমার বাড়ির ঠিকানা অনেকেই বিলক্ষণ জানেন!

: আমার দুর্ভাগ্য! কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ বলতে পারলো না। কলকাতা কেন, ইহলোকে বুঝি এই ঠিকানা নেই। তারপর আপনার নাম বলতেই কাজ হল। রসরাজ অমৃতলালের বাড়িটা কোথায়? দেখলাম অনেকেই চেনেন বাড়িটা।

: আমার বাড়ির ঠিকানা কী বলেছেন?

: কেন? নয় নম্বর মৈত্রের লেন।

: আপনি থিয়েটারের এ্যাক্টর তো, তাই অর্ধেক মুখস্থ করেছেন। বাকি অর্ধেক প্রম্পটারের হাতে! আমার ঠিকানা নয় বাই দুই, রামচন্দ্র মৈত্র লেন।

গিরিশ : দারুণ বলেছো ভায়া। তোমার মতো হিউমারিস্ট সচরাচর মেলে না।
[অমৃত গিরিশের দিকে মুখ করে নত হয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে। এই অংশের আলো নেভে]

অনন্ত : গুরু-শিষ্য দু'জনেই 'মঞ্চজীবী নাট্যকার'। কথাটা আমার নয়। রসরাজের।

উপল : অর্থ কী?

অনন্ত : মঞ্চের প্রয়োজনে দু'জনে কলম ধরেছিলেন। তাই মঞ্চজীবী নাট্যকার।

উপল : ওহো।

অনন্ত : আজকাল চোরের উপর বাটপারি বেশ চলছে।

উপল : তা যা বলেছেন।

অনন্ত : এ নামেই অমৃতলালের একটি প্রহসন আছে। ১৮৭৬-এর জানুয়ারী মাস। কলকাতায় এলেন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্। ভবানীপুরের প্রতিষ্ঠিত উকিল- জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাড়ির মহিলাদের দিয়ে যুবরাজকে আপ্যায়ণ করালেন।

উপল : জানি, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রতিবাদ করেছিলেন। লিখেছিলেন—'জগদানন্দ ও যুবরাজ, 'হনুমান চরিত' নাটক।

অনন্ত : 'চোরের উপর বাটপারি' এই ঘটনাকে নিয়ে লেখা। উপেন-অমৃত দু'জনেরই জেল হয়েছিল। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাটক লিখে জেলে গেছেন। তোমাদের আমলে ক'জন আছেন? এক উৎপল দত্ত ছাড়া? মঞ্চে এঁরা সত্যিই আগুন জ্বালিয়েছিলেন। উফ্! কী মারকাটারি নাটক লিখেছে এঁরা। থিয়েটারে কোনও অলীক কুনাট্য নয়; বাস্তবকে তুলে ধরতে হবে— এই বোধ থিয়েটার পাড়া জন্ম দিয়েছিল।

উপল : ঠিকই বলেছেন — নাটক মানে দু-এক ঘন্টার এনজয়মেন্ট নয়। নাটক মানে কিছু বার্তা, কিছু শিক্ষা। যা সহজেই দর্শককে ভাবতে শেখায়।

অনন্ত : [রামকৃষ্ণের উপর আলো ফেললেন টর্চের] ঠাকুর বলেছেন, নাটকে লোকশিক্ষা হয়।

উপল : উনি তো স্টারে এসেছিলেন। 'চৈতন্যলীলা' দেখতে।

অনন্ত : ১৮৮৪-র ২১শে সেপ্টেম্বর। থিয়েটার পাড়ার এক উজ্জ্বল দিন। দক্ষিণেশ্বর থেকে ছুটে এলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ—

[একটা আলোর বৃত্তে রামকৃষ্ণকে দেখা যায়। আলোতে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করতে পারলে ভালো হয়। নেপথ্যে শোনা যায় সংস্কৃত শ্লোক —]

' অসতো মা সৎ গময় / তমসো মা জ্যোতির্গময় / মৃত্যুর্মা অমৃতং গময়'।

[বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসেন রামকৃষ্ণ, উপল ভিডিও তুলতে থাকে]

রামকৃষ্ণ: আহা! কিসুন্দর জায়গাটি! খুব আনন্দ হচ্ছে! এতজনকে একঠাঁয় দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে! মানুষই তো ভগবান ..... ওরা আমায় আসতে দিচ্ছিল না। বললে— বেশ্যা অভিনয় করবে, চৈতন্য, নিমাই সাজবে, সে অভিনয় দেখে কী করবে? ..... আমি ওদের বলেছি— বেশ্যা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলোই বা। আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো। ওরে শোলার আতা দেখলে সত্যিকারের আতা মনে হয়।

[ফ্রিজ হয়ে যায়, অন্য একটি আলোর বৃত্তে চৈতন্যরূপী বিনোদিনীকে দেখা যায়।]

বিনোদ :
কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননী!
কেঁদো না নিমাই বলে!
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলই পারে।
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে
কৃষ্ণ নাহি পাবে .... (গান ধরে)

' হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়!
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা- প্রাণসভা রাখো পায় ! (প্রস্থান)

রামকৃষ্ণ: হরি গুরু, গুরু হরি। আহা! আসল নকল এক দেখলাম গো, আসল নকল এক দেখলাম।

[গিরিশের প্রবেশ]

গিরিশ : কেমন দেখলে ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ : ও তুই? বড্ড ভালো লিখেছিস। বা: বা: বেশ লিখেছিস।

গিরিশ : আর চৈতন্যের অভিনয়?
রামকৃষ্ণ : বড়ো ভালো রে। আমি যে ওর মধ্যে আসল মহাপ্রভুরই লীলা দেখলাম।
গিরিশ : আজ বাংলার রঙ্গভূমি আপনার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হলো।
রামকৃষ্ণ : সবই মা আনন্দময়ীর লীলা! [বিনোদিনীর প্রবেশ]
আয় মা, আয় কাছে আয়। আরও কাছে আয়।
বিনোদ : ঠাকুর আমার যে পাপের পাহাড় জমে গেছে।
রামকৃষ্ণ : ওরে পাপের পাহাড় হচ্ছে তুলোর পাহাড়। মায়ের নাম করে ফুঁ দিয়ে দে—সব উড়ে যাবে। তুই তো চৈতন্য! তোর অভিনয় বড্ড ভালো লেগেছে রে।
বিনোদ : সে আমার সৌভাগ্য ঠাকুর।
গিরিশ : ঠাকুরকে প্রণাম কর বিনোদ।
রামকৃষ্ণ : বল মা, আমার সঙ্গে বল— হরি গুরু, গুরু হরি।
বিনোদ : হরি গুরু, গুরু হরি। [গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করে]
রামকৃষ্ণ : মা, তোর চৈতন্য হোক।
বিনোদ : ঠাকুর, এই অধমজনের প্রতি তোমার কী করুণা! হে পাতকীতারণ, পতিতপাবন আমায় তোমার চরণে স্থান দাও। [পুনরায় প্রণাম করে]
রামকৃষ্ণ : জয় মা, জয় মা ভবতারিনী।
বিনোদ : এ আমার পরম পাওনা। ঠাকুর আমার মাথায় হাত রেখেছেন। পাপীতাপীকে দয়া করেছেন। জগৎ আমাকে ঘৃণা করলেও আর দুঃখ নেই । পরমারাধ্য ঠাকুর আমায় কৃপা করেছেন। [প্রস্থান]
গিরিশ : ঠাকুর, আমার মনের বাঁক যাবে?
রামকৃষ্ণ : যাবে রে শালা, তুই শুধু লিখে যা।
গিরিশ : লিখেই যাচ্ছি খালি, কোনও ধারণা নেই।
রামকৃষ্ণ : নারে না, তোর ধারণা আছে। ভক্তি ভিতরে না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় রে?
গিরিশ : খালি মনে হয়— কেন করছি থিয়েটার? কেন?
রামকৃষ্ণ : করে যা, করে যা। থামিস নে, থেটারে লোকশিক্ষা হয়। ওরে জমি পাট করলে যা রুইবি, তাই জন্মাবে। চাষ করে যা। ঠিক ফল পাবি। জয় মা করালবদনা।
গিরিশ : আমি মদ, গাঁজা খাই। বেশ্যা নিয়ে থাকি। পাপী মানুষ আমি।
রামকৃষ্ণ : যে শালা সব সময় পাপ পার করে, সে শালাই পাপী হয়ে যায়।
গিরিশ : আমি যেখানে বসি, সে মাটি অশুদ্ধ।
রামকৃষ্ণ : সে কি রে! অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু একটু করে আলো হয় রে?
গিরিশ : আমি এত তত্ত্ব কথা বুঝি না।

রামকৃষ্ণ : দূর শালা। তোকে তত্ত্বকথা বোঝাতে আমার বয়েই গেছে। দেখিস নে, আমি খাই-দাই আর মায়ের নাম করি । জয় মা। জয় মা তারা । তুইও যা করছিস তাই করে যা। শুধু সকালে বিকালে একটু মাকে ডাকিস।

গিরিশ : দূর! আমার কোন সকাল - বিকাল নেই, কখন খাই, কখন শুই— তারই কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। রাত হলেই থিয়েটার আমাকে ডাকে, এ যেন নিশির ডাক।

রামকৃষ্ণ : বেশ বলেছিস, খাসা বলেছিস। শোন গিরিশ, সংসারে যে যাই বলুক, তুই থেটার ছাড়িস নে। তুই যে থেটারওয়ালা গিরিশ, থেটারওয়ালা।
[এই অংশের আলো নেভে, আলো স্বাভাবিক হয়]

অনন্ত : গর্বের থিয়েটার পাড়ার সব আলো নিভে গেল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের দরজাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। জুট মিলের লক্ আউটের মতো। প্রমোটারের বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল প্রাচীন থিয়েটারের দুর্গগুলি। শেষ হয়ে গেল গিরিশ যুগ, শিশির যুগ।

উপল : যদি কিছু মনে না করেন — একটা কথা বলি।

অনন্ত : বলে যাও ছোকরা। বলার হক আছে তোমার [আর একটা পোড়া বিড়ি ধরায়]

উপল : পেশাদারি থিয়েটারে খারাপ থিয়েটারও হচ্ছিল। দর্শক টানতে পারছিল না। দর্শক আকর্ষণের জন্য নানা গিফ্‌ট চালু হলো। অথচ হল গুলির অবস্থা খারাপ। আলো নেই, পাখা নেই, ভাঙা সিট, ছেঁড়া উইংস্, পর্দা, ইঁদুর-বাদুর গুরে বেড়ায়। তার উপর ক্যাবারে ডান্স শুরু হলো।

অনন্ত : কোন নাটকে? কোন হলে? বলতে পারবে?

উপল : জানি না। তবে মিস্ শেফালি প্রথম ক্যাবারে ডান্সার।

অনন্ত : সেটা অনেক পরের ঘটনা। তার আগে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীহারবালা, প্রভা দেবীরা এলেন। প্লেগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা সব এলোমেলো করে দিল। পেশাদারি থিয়েটারেরও চরম দুর্যোগ । দর্শক কমে গেল। তবু থিয়েটার থেমে গেল না। রঙমহলে 'বাংলার প্রতাপ', মিনার্ভায় 'কালো টাকা', কালিকা থিয়েটারে 'দ্বীপান্তর', স্টারে 'কালিন্দী', শ্রীরঙ্গমে 'তখত-এ-তাউস' নাটকগুলি চলছিল। সে আর এক ইতিহাস। আজ থাক। অন্যদিন হবে ক্ষণ।

উপল : মিস্ শেফালি এলেন কোন নাটকে?

অনন্ত : 'চৌরঙ্গী' নাটকে। বিশ্বরূপা থিয়েটারে। ১৯৫৬তে গড়ে ওঠে বিশ্বরূপা। তারশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা', কিরণ মৈত্রের সূত্রধরে 'সেতু' যুগান্তকারী সাফল্য পেল।

উপল : 'সেতু' নাটকেই তো ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল।

অনন্ত : 'সেতু' বাংলার থিয়েটারে একটা মাইল স্টোন। পরিচালনা নরেশ মিত্র। নায়ক অসিতবরণ, এ নাটকেই পেশাদারি মঞ্চে এলেন তৃপ্তি মিত্র। মঞ্চ নির্মল গুহরায়,

সঙ্গীত পরিচালনা ভি. বালসারা। সব ঢাকা পড়ে গেল তাপস সেনের আলোর কাছে। ট্রেন দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখার জন্য দর্শক ঘুরে ফিরে আসতো।

উপল : সত্যি, পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল রঙিন দিনের কথা - একদিনে জানা সম্ভব নয়।

অনন্ত : একদিনে? বল কি ছোকরা? এক বছরেও না। এক যুগের ব্যাপার। আর পতনের কারণ বিশ্লেষণ করা— অত সহজ নয়। এ কি শুধু হাসি খেলা / প্রমোদের মেলা/ শুধু মিছে কথা ছলনা।

উপল : না, না, একটা শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা মিশেছিল। তাই দর্শকও এই থিয়েটারে মজেছিল

অনন্ত : মিনার্ভা পেতে শোভা সেনকে খোয়াতে হয়েছিল বাড়ির দলিল। রঙ্গনা পেতে কেয়া চক্রবর্তীকে হারাতে হয়েছিল সমস্ত অলংকার। মিনার্ভা পর্বে উৎপল ছাড়লো সাউথ পয়েন্টের চাকরি। রঙ্গনা পর্বে কেয়া ছাড়লো স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপনা।

উপল : থিয়েটারের জন্য তাঁদের এই অবদান চিরস্মরণীয়। এঁদের ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না।

অনন্ত : উদ্দেশ্য ছিল সব কিছু নিয়ে ঝাঁপানো। শিশির ভাদুড়িও অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল - থিয়েটারে নিজেকে উজাড় করে দিতে। নাট্যকার হবার তীব্র বাসনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও অধ্যাপনার চাকরি ছেড়েছিল।

উপল : 'আলিবাবা'র নাট্যকার?

অনন্ত : বেশ বলেছো ছোকরা। আ-লি-বা-বা'র নাট্যকার ! আলিবাবা একটানা সাতশো নয় রজনী চলেছিল। সে সময়ের বিরল রেকর্ড। প্রথম অভিনয় ১৮৯৭-এর ২০ নভেম্বর। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে, তাঁরইপরিচালনায়, নিজে হুসেন চরিত্রে অভিনয় করতেন। সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছিল— ন্যাপা বোসের আবদালা আর কুসুমকুমারীর মর্জিনা। ক্লাসিক কানায় কানায় পূর্ণ। যাকে বলে বাদুর ঝুলতে লাগলো। যুবকরা চললো, বৃদ্ধেরা চললো, বাড়ির কর্ত্রী, কন্যা, বধূ নিয়ে, ঘোড়ার গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে ছুটলো— আবদালা মর্জিনার নাচ দেখতে..... কোচমান ঘোড়ার রশি হাতে পা-দানি ঠুকতে ঠুকতে গান ধরলেন— ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল।

[শেষের সংলাপগুলি বলতে বলতে যেখান দিয়ে এসেছিল, সেখান দিয়েই প্রস্থান করে। ঝলমলে আলোয়, পোশাকে ন্যাপা বোস (নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু) ও কুসুমকুমারী নাচ ও গান আরম্ভ করে। উপল ভিডিও তুলতে শুরু করে।]

ন্যাপা : 'মার ঝাড়ু মার
ঝাড়ু মেরে ঝেটিয়ে বিদেয় কর।
যত আছে নোংরা সবই

ঠ্যাংরা মেরে ঘর থেকে দূর কর।
ঘরের ফিরিয়ে দে না হাল
না না না না মর্জিনা, না না না না মর্জিনা,
তার চেয়ে তুই বল .... কি
ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল
ছিঃ ছিঃ এত্তা জঞ্জাল ।.....   [বেল বাজে]

[এই অংশের আলো নেভে। উপলের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা দেয়। মোবাইলের উপর টাচ্ করে কি যেন খুঁজে চলেছে।]

উপল : এ কি? ভিডিও ওঠেনি, ভিডিও শর্টগুলি গেল কোথায়? এমন দুর্লভ দৃশ্য, চমৎকার সিনগুলি হারিয়ে গেল! কোথায় পাবো এগুলি [আবার দ্রুত আঙুল দিয়ে ভিডিওগুলি খুঁজতে থাকে, না পেয়ে হতাশ হয়।] দাদু, অনন্ত দাদু, কোথায় গেলেন আপনি? একবার দেখা দিন, একটুও ভিডিও হয়নি। সব অন্ধকার। পুরো মোবাইলটাই অন্ধকার। যেন এক অদৃশ্য শক্তি পুরোটা ডিলিট করে দিয়েছে। ওফ! [কান্নায় ভেঙে পড়ে। নেপথ্যে শোনা যায় অনন্তর কণ্ঠ]

অনন্ত : ‘ রঙ্গমঞ্চে একে একে নিয়ে গেল যবে
দীপশিখা, রিক্ত হল সভাতল,
আঁধারের মসী অবলেপে স্বপ্নচ্ছবি
মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হলো
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনি সংকেতে।’

উপল : [সম্বিত ফিরে পায়।] তবে কি - দিন আসে, দিন যায়। তারই ফাঁকে ঢুকে পড়ে ইতিহাস! অনন্তদাদু কি সেভাবেই ঢুকে পড়েছিলো আমার অন্তরে? যাকে হাত বাড়ালে স্পর্শ করা যায় না। টের পাওয়া যায় জ্ঞানের বৈভব! এক অদ্ভূত ভালো লাগার আলো জ্বালিয়ে গেলেন তিনি। সেই আলোয় খানিকটা হলেও চিনলাম অতীতকে। আমার প্রিয় শহর পুরণো কলকাতাকে। তার অহঙ্কারের পেশাদারি থিয়েটারকে। যাকে ঘিরে কত মানুষের পাওয়া - না পাওয়ার স্মৃতি। কত বেগ-আবেগের টানাপোড়েন। কত আলো-আঁধারের খেলা। কত আনন্দ-উৎসবের মেলা। আজ তার কোন চিহ্ন নেই। আভিজাত্যের ঝাড়বাতি আর বর্ণময় রঙমশাল আজ শুধুই স্মৃতির প্রদীপ, হারায়ে খুঁজে চলা।

[মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে .... গানের মিউজিকের সাথে সাথে পর্দা পড়ে ধীরে ধীরে।]

লেখক : অধ্যাপক ড. অপূর্ব দে, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ।

পথভোলা এক পথিক

শিবংকর চক্রবর্তী

চরিত্র : সুজাতা, স্বাধীন, বিমলানন্দ, প্রিয়তোষ, সুধাকর, রুনু কাস্ত্রো।

(অন্ধকার মঞ্চে নেপথ্যে আবহ সঙ্গীত, 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি ....'। ধীরে ধীরে মঞ্চের পর্দা ওঠে। একটা ড্রয়িং কাম বেড রুম। বসার চেয়ার, টেবিল, ছোট্ট একটা শোবার খাট। আসা যাওয়ার দরজা। খুব ভালো হয় দোতলায় ওঠার একটা সিঁড়ির আভাস মঞ্চে রাখতে পারলে। সময়টা সকাল ৯টা বা ১০টা। ঘরে সুজাতা এবং স্বাধীন ঘরটাকে সাজাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুজাতা ফুলদানীতে ফুল সাজাচ্ছে। হঠাৎ স্বাধীন —)

স্বাধীন : মা, বাবার ছবিটা উপরে নিয়ে যাই—
(আলো প্রিয়তোষের ছবির উপর পড়ে)

সুজাতা : হঠাৎ? বাবার ছবিটা কি দোষ করলো? তাছাড়া দোতলায় কি তোর বাবার কোনও ছবি নেই?

স্বাধীন : থাকলেও— এ ঘরে এখন যিনি থাকবেন তিনি তো —

সুজাতা : তিনি না চাইলেও ছবিটা ওখানেই থাকবে। কারণ যিনি আসছেন তিনি এ বাড়ির পেয়িং গেস্ট— আর ছবিটা যার তিনি এ বাড়ির মালিক— তোমার বাবা।

স্বাধীন : বাবা ইয়েস্ বাবা— যে সে বাবা নয়— বাবা আমার কর্ণেল প্রিয়তোষ দত্তগুপ্ত।
(ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে)
(নেপথ্যে কলিং বেল বেজে ওঠে)

স্বাধীন : দাদু —

সুজাতা : আমাদের নতুন অতিথিও হতে পারেন। যা দরজাটা খুলে দেখ। (স্বাধীন বাইরে দরজার দিকে যায় - খোলে)

নেপথ্যে একজন : অনুমতি করলে ঘরের ভিতরে যাই।

স্বাধীন : (নেপথ্য থেকেই) আপনি কে?

নেপথ্যের মানুষটি : আমি বিমল— বিমলানন্দ সাউ— আমাকে—

স্বাধীন : আপনিই - আসুন - আসুন আঙ্কেল।
(একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ ক্র্যাচে ভর করে মঞ্চে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে একটা ট্রলিব্যাগ)

বিমল : আঙ্কেল মানে তোমাদের বাংলায় কাকা হয়— মামাও। আমি যখন এখন বাংলাতে তখন বাংলাতেই কথা চালাচালি হোক্। বলো আমি মামা না কাকা?

সুজাতা : আপনি এতো ভালো বাংলা বলেন?

বিমল : Upper Studyর সবটাই তো এই বাংলায়—যাদবপুর Universityতে, থাকতাম কলেজ স্ট্রিটের একটা মেসে। কিন্তু তুমি তো বল্লে না আমি কাকা না মামা (স্বাধীনকে)

স্বাধীন : তোমাকে দেখে তো আমার ভালোই লাগছে। তো, তো তুমি আমার মামা।
বিমল : খারাপ হলে কি কাকা হতাম। হাঃ হাঃ হাঃ
সুজাতা : ওর এই এক দোষ— কাউকে পছন্দ হলেই যে হয় মামা—নয় দাদু।
বিমল : বাস্তবে এই মুহূর্তে এ দুটোই এর কাছে অপ্রাপ্য— তাই না?
সুজাতা : আমি আমার বাবার একমাত্র মেয়ে— আর আমার বাবা গত হয়েছেন—হ্যাঁ — দশ বছর প্রায় হলো।
বিমল : So- আমি মামা— হ্যাঁ - আমাকে তোমার মামাই হতে হলো।
স্বাধীন : Thank you মামা।
সুজাতা : কিন্তু মি. সাউ- আপনার মালপত্র?
বিমল : আমার এই ব্যাগে।
সুজাতা : শুধু মাত্র এই একটা ব্যাগ?
বিমল : ম্যাডাম—
সুজাতা : আমার ছেলের আপনি যদি মামা হন - তাহলে আমি তো আর ম্যাডাম থাকতে পারি না।
বিমল : দিদি - আমি হাত পা ঝাড়া মামুষ— এখানে এসেছি একটা লেখার কাজে- ক'দিনই বা লাগবে— দু'মাস- তিন মাস- তার জন্যে অনেক কিছু—
সুজাতা : সেই দু-তিন মাসের জন্যেও তো কিছু জিনিষ লাগবেই।
বিমল : এখানকার বাজারে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। না পেলে আপনাদের কাছ থেকে নেবো। কি ভাগ্নে- দেবে না- যদি দরকার হয় একটা গামছা— কি দুটো লুঙ্গি?
স্বাধীন : কি বলছেন মামা —
বিমল : ছিঃ মামাকে কেউ আপনি বলে না।
সুজাতা : দিদিকেও না—
স্বাধীন : হো-ও-ও—এখন আমরা সবাই তুমি— মা তুমি- মামা তুমি-
বিমল : হাঃ হাঃ হাঃ (স্বাধীনকে জড়িয়ে ধরতে চায়— টাল সামলাতে পারে না ক্র্যাচে ভড় দিয়ে কোনও রকমে একটা চেয়ার বা খাটে বসে পড়ে)
সুজাতা : দাদা — তোমার লাগেনি তো?
বিমল : না - না-। খোঁড়া মানুষ- মাঝে মাঝে টাল সামলাতে পারি না। আসলে কি জানো দিদি — যারা জন্মান্ধ— বা জন্ম থেকেই বোবা, কালা— বা খোঁড়া— তারা ঠিক নিজেদের শরীরের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। কিন্তু যে মানুষটা জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর নিজের দু'পায়ে সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে— সে যদি হঠাৎ একদিন—। অসুবিধে তো হবেই— তাই না?
সুজাতা : কিন্তু—
বিমল : আবার কিন্তু কি? Facebook-এ তোমার সাথে আলাপের পর তোমার সব খবরই তো আমার জানা, এ যে স্বাধীন সে তো দেখেই বুঝেছি। আর ঐ যে

ছবিতে — The great Soldier- উনিই তো এ বাড়ির মালিক কর্ণেল প্রিয়তোষ দত্তগুপ্ত—তাই তো?

স্বাধীন : তুমি কি করে জানলে?

বিমল : তোমার মামা বলে। নিজের ভগ্নিপতিকে চিনে নিতে পারবো না?

সুজাতা : শুধু ছবিতে চেনার তো দরকার নেই। একেবারে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

স্বাধীন : বাবাকে ফোন করবে? করো - করো- শুধু নিজে কথা বলে কেটে দেবে না কিন্তু— আমিও কথা বলবো—

বিমল : শুধু তুমি কেন স্বাধীন— আমিও কথা বলবো।
(সুজাতা ইতিমধ্যেই মোবাইলে প্রিয়তোষকে ধরার চেষ্টা করছে— একবার- দুবার— হঠাৎ পেয়ে যায়। আলো ছোট হয়ে শুধু সুজাতার উপর)

সুজাতা : এই শোনত— (অন্য জোন-এ প্রিয়তোষ— মিলিটারি পোষাকে)

প্রিয় : বলো সু—

সুজাতা : ধ্যাৎ—বলছি না— সু মানে জুতো— আমি কি তোমার —

প্রিয় : তুমি আমার — সুচরিতা—সুমিতা— সুজাতা-

সুজাতা : বাবা ! কাব্যের ঠেলায় অন্ধকার।

প্রিয় : এই প্রায় অন্ধকার মিলিটারি বেস্ ক্যাম্পে— এই হাই অল্টিচ্যুডে— আকাশ ভেঙে নেমে আসা মেঘ আর বরফ কুচির ঠাণ্ডায়– তুমিই তো আমার একমাত্র উষ্ণতা সু— আমার কবিতা।

সুজাতা : বুঝেছি এবার একটু কাজের কথা শোনত —

প্রিয় : কাজ নিয়েই তো এই বিজনে— তোমাদের ছেড়ে— আবার তোমার সাথেও কাজ? কেন প্রিয়ে?

স্বাধীন : (প্রায় মোবাইলটা কেড়ে নেয়) এতো কি কথা তোমার? কাজের কথা সেরে মোবাইলটা আমাকে দাও—

সুজাতা : শোননা স্বাধীন পাগলের মতো করছে– এখুনি ওকে তোমাকে ধরাতে হবে।

প্রিয় : ধরিয়ে দাও—

সুজাতা : দাঁড়াও আগে কাজের কথাটা হোক—

প্রিয় : আবার সেই কাজের কথা। হায় প্রিয়ে—

সুজাতা : ধ্যুৎ-। শোন না — তিনি এসেছেন—

প্রিয় : তিনি— কে তিনি?

সুজাতা : আমাদের paying Guest- যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। বিখ্যাত মারাঠি সাহিত্যিক বিমলানন্দ সাউ।

প্রিয় : আউ— Nice! তো তাকে দাও— একটু বাক্যালাপ সেরে নেই—

সুজাতা : ঠিক আছে ধরো— (বিমলকে ইঙ্গিত করে মোবাইলটা ধরিয়ে দেয়)

বিমল : হ্যালো—

প্রিয় : Why হ্যালো— আমি তো আমার বৌ-এর কথায় আগেই হেলে আছি। আপনিও হেলবেন। সুজাতা মানুষকে এমন আঁকড়াতে পারে না— আপনিও কিছুতেই পার পাবেন না।

বিমল : পেতে চাইও তো না। আমি ঝাড়া হাত পা'র মানুষ। এখানে এমন একটা সংসার- দিদি-ভাগ্নে-জামাইবাবু— এই সামান্য সময় এর মধ্যেই তো মনে হচ্ছে আমি ভালোবাসার জালে বন্দী হতে চলেছি।

প্রিয় : খুব ভালো— খুব ভালো । যে ক'দিন আমাদের সাথে থাকবেন —ভালো থাকুন— আমার সংসারের মানুষগুলোকে ভালো রাখুন। জানেন তো - আমরা সৈনিক। দেশের সমস্ত মানুষকে ভালো রাখার জন্যে জীবনকে বাজী রেখে আমরা লড়ে যাচ্ছি। প্রচণ্ড শীতে—ঘন বর্ষায়— অসহ্য গরমে। আমিও চাইবো—আপনিও ভালো রাখবেন আমার পরিবারকে।

বিমল : চেষ্টা করবো— আজ থেকে তো এটা আমারও পরিবার।

প্রিয় : Thank you.

স্বাধীন : ছাড়বেন না— ছাড়বেন না— আমি কথা বলবো।

বিমল : নিশ্চয়ই বলবে। জামাইবাবু- ভাগ্নে কথা বলবে— নিন্ ধরুন।

স্বাধীন : (ফোনটা ধরেই) বা-পী—

প্রিয় : Yes - my child-

স্বাধীন : তোমাকে অনেক দিন দেখি না বাপী।

প্রিয় : তোমার আমায় তো চার দেওয়ালের মধ্যে দেখা হওয়ার কথা নয়— আমাদের তো দেখা হবে সীমান্তে— তুমি আমি পাশাপাশি হাতিয়ার নিয়ে পাহারা দেবো — রক্ষা করবো দেশকে—তোমার আমার দেশমাতৃকাকে।

স্বাধীন : কবে— কতো দিন পরে?

প্রিয় : সব কিছুরই তো প্রস্তুতি দরকার। তুমি তৈরী হও। নিজেকে প্রস্তুত করো। তোমাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে আমাদের Indian Army ।

স্বাধীন : আমি নিজেকে তৈরী করছি বাবা।

প্রিয় : হ্যাঁ নিজেকে তৈরী করো—ভুলে যেয়োনা—

স্বাধীন : না—ভুলিনি - কখনো ভুলিনি— I am the son - the only son of my beloved hero - my father কর্ণেল প্রিয়তোষ দত্তগুপ্ত।
(কথা বলতে বলতে স্বাধীন বাবার ছবিটার সামনে চলে যায়। মিলিটারি কায়দায় স্যালুট করে। নেপথ্যে আবহে বেজে ওঠে— সারে জাঁবা সে আচ্ছা—হিন্দুস্থা হামারার সুর। আলো নেভে। আলো জ্বলে মঞ্চে সুধাকর ও সুজাতা-)

সুধাকর : কোথায় তিনি?

সুজাতা : বাথরুমে ফ্রেশ হতে গেছেন

সুধাকর : মালপত্র—?

সুজাতা : শুধু ঐ ট্রলি ব্যাগটা।

সুজাতা : খোঁড়া মানুষ— বিয়ে থা করেননি— পাখীর উপর গবেষণা করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুব বেশি লাগেজ নিয়ে চলা কি ওঁর পক্ষে সম্ভব?

সুধাকর : দেখো মা— আমি রক্তের সম্পর্কে তোমার আত্মীয় নই— কিন্তু আমাদের বয়সে এখনও আমরা পাড়া-ঘর— এই সব conceptগুলো মনের মধ্যে রাখি। আর রাখি বলেই— প্রিয় আমার প্রিয়জন— তার বৌ-ছেলে আমার আত্মীয়।

সুজাতা : সে তো আমি জানি কাকা।

সুধাকর : জানলেও মানো না— মানলে ঐ লোকটাকে আমার অমতে তুমি paying guest করে নিজের ঘরে ঢোকাতে না।

সুজাতা : বেশিদিন তো নয়। দু'তিন মাস। উনি ভারতীয় পাখীদের নিয়ে গবেষণা করছেন। আমাদের এই বাংলায় এসে উনি শালিক, চড়াই, ঘুঘুর মতো প্রায় হারিয়ে যাওয়া পাখীদের নিয়ে একটা থিসিস্ লিখতে চান। তার জন্য গ্রাম বাংলার যে কোনও জায়গায় ওনার কিছু দিনের জন্যে একটা shelter দরকার— এটা শুনে—

সুধাকর : শুনে নয়— জেনে - আর সেই জানাটা কোত্থেকে? তোমাদের বহুমূল্য Facebook থেকে - তাই তো? কিন্তু মা সুজাতা— শুধুমাত্র face দেখে কি সব বোঝা যায়? একটা মানুষের সবকিছু?

সুজাতা : বেশি কিছু বোঝার কি কোনও দরকার আছে কাকা?

সুধাকর : আছে - আছে - বিশেষত: যাকে তুমি তোমার সাথে একই ছাদের তলায় শুতে দিচ্ছো - তাঁর সব খোঁজ খবর না জেনে—

সুজাতা : মাত্র তো দুটো বা তিনটে মাস—

সুধাকর : এক রাত হলেও আমি বলবো এটা হঠকারিতা।

সুজাতা : একটা মানুষ ভালো কিছু করতে চান— তাকে সাহায্য করা—তাছাড়া আমার পক্ষে তো ভালোই— আমার স্বাধীনের একটা সঙ্গী তো বটে।

সুধাকর : সেই সঙ্গীর মুখটাই তো দেখলাম না। না দেখে কিছু বলা—
(সেই মুহূর্তে ক্র্যাচে ভর করে মঞ্চে ঢোকে বিমল, সঙ্গে স্বাধীন)

স্বাধীন : এসো - এসো - ও দারুন - এবার তুমি সব চিনে গেছো। (সুধাকরকে দেখে) এই যে— এই আমার দাদু - সুধাকর দাদু— আমার মায়ের গার্জেন।

বিমল : নমস্কার - আমি বিমল- বিমলানন্দ সাউ।

সুধাকর : মুম্বাই-এর বাসিন্দা?

বিমল : মুম্বাইটা আমার স্থায়ী ঠিকানা। তবে সেখানে থাকা হয় কোথায়? লেখালেখির কাজে সারা বছরই তো—

সুধাকর : আপনি কি জন্ম থেকেই —

বিমল : না — ২০০৬ সালের ১১ই জুলাই মুম্বাই-এর লোকাল ট্রেনে পর পর বিস্ফোরণ।

মনে আছে?

সুধাকর : আছে। আসামীদের ৫জনের ফাঁসি হয়েছে - ৭জনের যাবজ্জীবন। কাগজে পড়েছি। তবে এখনও অনেককে নাকি ধরাই যায়নি।

বিমল : ঐদিন সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা। আমি তখন মাতুঙ্গা স্টেশনে লোক্যাল ট্রেনে ভি.টি তে আসবো বলে—

স্বাধীন : ব্যস্ ব্লাস্ট?

বিমল : ১৮৮জন মারা গিয়েছেন। আমি আমার হাঁটার ক্ষমতাটাকে জামিন রেখে নিজের মৃত্যুটাকে আটকাতে পেরেছি। পেরেছি বলেই এখনও কাজ করে যাচ্ছি।

সুধাকর : Sorry -আমার ভাবনায় হোধহয় কিছু ভুল ছিল। কিছু মনে করো না বাবা বিমল— আমরা প্রাচীন লোক। প্রিয়জনের অল্প বিপদেই আমাদের বুকের ভিতর কু'গায়। ঠিক আছে তুমি থাকো— মনের সুখে কাজ করো। রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরির সময় কোনও রকম সমস্যা হলে—

বিমল : শুধু রাস্তা কেন? আসার সময় দেখলাম বিশাল বিশাল আম বাগান- কতো পাখী—

স্বাধীন : তুমি জানো— আমাদের গ্রামের আমের জগৎজোড়া নাম।

বিমল : তাই?

সুজাতা : আমের সিজনে এলে দেখতে পেতে গ্রামের চেহারাটাই পাল্টে যায়।

সুধাকর : বাগানে বাগানে ইলেকট্রিকের আলো। সারা রাত আম পারা— তাকে প্যাকিং করা—সে এক উৎসব— একেবারে অকাল দেওয়ালী।

বিমল : এখন তো সবে অক্টোবর— আম মানে তো গরমকাল— ততদিন আমার লাগবেনা— তার আগেই—।

সুজাতা : তুমি চলে যাবে তাই তো?

বিমল : কাজ যার রক্তে—।

স্বাধীন : তোমাকে ছাড়লে তো তুমি যাবে। তুমি আমার মামা— একমাত্র মামা। তোমাকে আমি ছাড়বোই না।

বিমল : (স্বাধীনের কাছে গিয়ে) আমার স্বাধীন যদি চায় আমি সারা জীবন তার পাশে পরাধীন হয়েও থাকবো।

স্বাধীন : প্রমিস্ (হাত বাড়িয়ে দেয়)

বিমল : প্রমিস্ (হাত চেপে ধরে)।

সুধাকর : ঠিক আছে, মামা ভাগ্নে যখন মিল হয়ে গেছে তখন এই বুড়ো দাদু —

সুজাতা : একটু চা না খেয়ে—

সুধাকর : এই অবেলায়? ক'টা বাজে খেয়াল আছে? একটা দশ— এই সময়ে চা? তোমার কাকীমা জানতে পারলে—। চলি হে— বিমলবাবু - ভালো থেকো— ভালো রেখো— কেমন? (চলে যায়)।

সুজাতা : ওরে স্বাধীন—যা - যা স্নানটা করে আয়। মামা ভাগ্নেকে একসাথে খাবারটা দিই।

দাদা তুমি dinning-এ গিয়ে খাবে তো? নাকি—

বিমল : আমি বলবো দিদি— তুমি বলবে দাদা? হয়? date of birth?

সুজাতা : কার?

বিমল : সুজাতা দত্তগুপ্ত'র—

সুজাতা : দাঁড়াও— উঁ — ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮০—

বিমল : fine - আমি 24th April, 1978 - so আমি দু'বছরের বড় - অতএব—

সুজাতা : অতএব আমি সুজাতা — তুমি দাদা—

বিমল : yes -তুমি নও তুই— দাদা কি কখনো বোনকে আপনি, তুমি করে?

সুজাতা : দাদা— (একটু sentimental কি?)

বিমল : মি: স্বাধীন দত্তগুপ্ত—

স্বাধীন : yes - মামা (মিলিটারি কায়দায়)

বিমল : Go immediately to Bathroom - quick- আমার যে খুব ক্ষিধে পেয়েছে ভাগ্নে। (হেসে ওঠে)

স্বাধীন : All right (মিলিটারি কায়দায় মুভ্ করে) মা তুমি ভাত বারো— আমি যাবো আর আসবো। (স্বাধীন মার্চিং-এর ভঙ্গিতে left - right করতে করতে চলে যায়)

সুজাতা : (স্বাধীনের হাব ভাব দেখে হেসে ফেলে তারপর) দাদা — আমি খাবারটা রেডি করি?

বিমল : না - না- ভাগ্নে আগে আসুক।

সুজাতা : দাদা, আমি তোমার জন্যে একটা স্পেশাল রান্না করেছি। মুখী কচুর দম। ম্যারিনেট করে রেডি করা আছে— শুধু প্রেসার কুকারে চারটে সিটি দিয়ে নামাবো।

বিমল : এই জন্যে বলে নিজের ঘরে আসা। মুখী কচুর দম্—জীবনেও নাম শুনিনি— খাওয়া তো দূরের কথা— কিন্তু কচু— মুখ চুলকোবে নাতো?

সুজাতা : পাগল— তোমার বোন রেঁধেছে না—

বিমল : OK - কিন্তু একটা কেজো কথা বলি সুজাতা— online-এ বারবার বলেছি- আমার মাসিক খরচ কতো— আর কোন এ্যাকাউন্টে দেবো— কিন্তু—

সুজাতা : এখন তো আর ও সব কথা উঠেই না দাদা— ভাই এসেছে বিবাহিত বোনের ঘরে। খাওয়ার জন্যে পয়সা চাইবো? হয়— তোমার ভগ্নিপতি কি বলবে? ছাড়ো তো তাড়াতাড়ি চলো— ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন খাবারই ভালো লাগবে না।

বিমল : কেন আইস ক্রিম— ?

সুজাতা : চোপ্— যতো বাজে কথা—

বিমল : রেডি কর্ আমি ভাগ্নেকে নিয়ে যাচ্ছি—

সুজাতা : দেরী করবে না কিন্তু (চলে যায়)

(বিমল এদিক এদিক তাকায়। দ্রুত ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বার করে। রিং করে)

বিমল : Yes - Nine - stop - zero speaking - shelter OK, No problem -
(নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে)
(আলো জ্বলে— স্কুলের পোষাকে স্বাধীন মঞ্চে ঢোকে)

স্বাধীন : মামা - ও মামা - কোথায় গেলে গো - ও মামা—

বিমল : (নেপথ্যে) বাথ রুমে— যাচ্ছি —।

স্বাধীন : দরজা খুলে রেখে বাথরুমে? তুমি তো মায়ের থেকেও বেখেয়ালী গো মামা—।
(ক্র্যাচে ভর দিয়ে বিমল এসে ঢোকে)

বিমল : ভাই বোন এক রকম না হলে তারা ভাই বোন হয় কি করে ভাগ্নে? বলো হঠাৎ এ অভাজনকে এতো ডাকাডাকি কেন?

স্বাধীন : ভয়ংকর সমস্য— কিন্তু সে সমস্যার সমাধান তুমিও করতে পারবে না— মা-ও পারবে না— বাপী থাকলে হয়তো পারতো।

বিমল : সমস্যাটা সম্বন্ধে একটু আঁচ কি আমি পেতে পারি ভান্‌জে?

স্বাধীন : পেতেই পারো— কিন্তু সমাধানটা তোমার হাতে নেই।

বিমল : নেই? আমার হাতে নেই? তুমি একশো ভাগ Confident?

স্বাধীন : Yes -

বিমল : O.K, Just শোনার জন্যে একটু শোনা আমার প্রিয় স্বাধীনের সমস্যাটা— শোনাবে কি?

স্বাধীন : সমস্যাটা আমার- কিন্তু সমাধানটা আমার হাতে নেই—তাই বাপী যখন নেই– মাকে বা তোমাকে সমস্যাটা তো শোনাতেই হবে।

বিমল : মা-এর আগে মামাই শুনুক না সমস্যাটা।

স্বাধীন : স্কুলে আবৃত্তি কম্‌পিটিশান— সবাইকে পারটিসিপেট করতেই হবে। ফাইভ থেকে এইট্— এইট্ থেকে টুয়েল্‌ভ।

বিমল : তুমি তো সেভেন— তোমার কবিতাটা কি?

স্বাধীন : প্রশ্ন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বিমল : "আমি যে দেখেছি তরুন বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে—কি যন্ত্রণায়......"

স্বাধীন : (উল্লাসে ফেটে পড়ে) জানো - জানো - তুমি সব জানো— কবিতাটা আমাকে শিখিয়ে দাও।

বিমল : কবিতা কি কাউকে শেখানো যায়? কবিতা অনুভবের ব্যাপার। কবিতা মানে প্রতিটি শব্দ— প্রতিটি লাইনকেস্পর্শ করা - তাকে নিজের অন্তরের অন্ত:স্থলে প্রতিষ্ঠিত করে তার ভাবকে নিজের চেতনার সাথে যুক্ত করা।

স্বাধীন : এতো কঠিন কথা আমি বুঝতে পারছি না— বুঝতে চাইও না—আগামী সোমবার আমাদের কমপিটিশান। তার আগে আমি যাতে কবিতাটা ঠিক ঠিক বলতে পারি— প্রাইজ পাই— সে ব্যবস্থাটা তোমাকে করে দিতে হবে।

বিমল : প্রাইজ দেয় তো বিচারকরা— তাদের মর্জি মতো। প্রাইজ পাবে কিনা সে তো

আমি বলতে পারবো না— তবে কবিতাটা তোমাকে তোমার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই গেঁথে দিতে পারবো।

স্বাধীন : এতো শক্ত কথা কেন বলো মামা?

বিমল : সে প্রশ্নটা তো আমি নিজেকেও প্রতি মুহুর্তে করি স্বাধীন
"যাহারা তোমার বিষাইয়েছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো
তুমি কি বেসেছো ভালো?"

স্বাধীন : মামা—

বিমল : যাও— ব্যাগ রেখে— জামা কাপড় পাল্টে - চলে এসো- আমি তোমাকে কবিতাটা আমার মতো করে শোনাবো।

স্বাধীন : তোমার শোনানোটাই আমি নকল করে স্কুলে শোনাবো।

বিমল : না - নকল করবে না— নিজের থেকে বুঝবে— রবিঠাকুর যে প্রশ্ন আমাদের সবার জন্যে রেখে গেছেন তার উত্তরটা তো আমাদের খুঁজতে হবে— তোমাকে — আমাকে— যাও - পোষাকটা পাল্টে কিছু খেয়ে এসো যাও—

স্বাধীন : তারপর কবিতাটা হবে তো?

বিমল : হবে - হবে -তুমি বলা মানে তো আমার কাছে আদেশ— Order - যাও - যাও - মামা। কতক্ষণ পেটে কিছু পড়েনি— যাও লক্ষ্মী সোনা।
(আদর করে এগিয়ে দেয়। স্বাধীন ওর দিকে তাকিয়ে ভিতরে চলে যায়।)
(আলো ছোট হয়ে - শুধুমাত্র বিমল-এর উপর)

বিমল : যাহারা তোমার বিষাইয়েছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো
তুমি কি বেসেছো ভালো?

(বিমলের মোবাইটা বেজে ওঠে। বিমল ধরে)

বিমল : Yes - 9 stop zero- speaking - what? Next week~ Impossible - sorry impossible -
(নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে) (আলো জ্বলে- মঞ্চে সুজাতা - সুধাকর)

সুধাকর : তুমি যাই বলো মা— আমার মনের ভিতর খচ্ খচানিটা কিছুতেই যাচ্ছে না। লোকটা যেন অতি ভাল মানুষ, এই ভাল মানুষটা ওর মুখোশ নয় তো মা —

সুজাতা : কি যে বলেন কাকা, মানুষটা দেখছি তো এক মাসের বেশী হয়ে গেল— সারাদিন নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকে। সকালে - বিকালে বেড়োয়— ডট্ পেন- ডাইরী- ক্যামেরা আর ওর প্রিয় বায়নাকুলারটা গলায় ঝুলিয়ে। কি

দ্যাখে - কি বা করে জানি না। মাঝ রাত পর্যন্ত সেই সব নিয়েই লেখালেখি করে। নিজের কাজে এতো মগ্ন থাকে যে মাঝে মাঝেই রাতে খেতে আসে না। খাবারটা ওর ঘরে রেখে আসি আমি। আমাকে দেখে অপরাধীর মতো হাসে। কোনোও কোনো দিন তখনই খেয়ে নেয়—কোনোও কোনোও দিন সকাল হয়ে যায় খাবার মুখে ওঠে না। একে নিয়ে আমি কি সন্দেহ করবো বলুন কাকা ?

সুধাকর : ভয় করে গো মা— ভয় করে। বার বার মনে হয়— বড় বেশী ভালো হওয়াটা যেন ভালো নয়। আচ্ছা- ওর নাম পরিচয় সব তোমার কাছে বলেছে তো ?

সুজাতা : কি যে বলেন কাকা।

সুধাকর : ওর পরিচয় যেটুকু তোমার জানা আমাকে একটা কাগজে লিখে দেবে ?

সুজাতা : কেন কাকা ?

সুধাকর : একটু খোঁজ খবর। না - না - ওকে আমি সন্দেহ করছি না— তোমাকেও না। কিন্তু সুযোগ থাকলে কাজে না লাগানোটা বোকামী।

সুজাতা : সুযোগ — কিসের সুযোগ ?

সুধাকর : তোমার কাকীমার ভাইপো— ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে তোমার কাকীমার কোলে পিঠেই মানুষ। সে হৈমীকে মা বলেই জানে। কপালগুণে সে এখন কাষ্টমস্-এর বড় পোষ্টে মুম্বাইতে আছে। কাল রাতেও তোমার কাকীমাকে ফোন করেছিল। আমি এই সমস্যাটার কথা বলতেই সে বলেছে খুঁজে দেখবে।

সুজাতা : কি খুঁজে দেখবে ?

সুধাকর : বিমলানন্দ সাউ— লেখক - তাঁর ভারত জোড়া খ্যাতি - ঐ মুম্বাই শহরে তার ঠিকানাটা পেলে তাতে খুঁজে পাওয়া কি খুব কঠিন মা ? অন্তত: একজন কাষ্টমস্ অফিসারের পক্ষে ?

সুজাতা : কাকা—

(সেই মুহুর্তে ক্রাচে ভর দিয়ে মঞ্চে ঢোকে বিমল। তার হাতে একটা ডাইরী - বুক পকেটে পেন - গলা থেকে ঝুলছে বাইনোকুলার - ক্যামেরা)

বিমল : কাকাবাবু ? কতক্ষণ—

সুধাকর : এই তো বাবা কিছুক্ষণ— তা তোমার পাখী দেখা হলো- ?

বিমল : হ্যাঁ - কাজটা প্রায় গুটিয়ে এনেছি। এবার ফটোগুলোকে ল্যাপটপে ফেলে দেখে নেওয়া। তারপর দু'এক দিনের জন্যে কোলকাতায় গিয়ে ওগুলোর প্রিন্ট আউট বার করা- আর

সুধাকর : আর ?

বিমল : আর আমার লেখাটা শেষ করা। National Geography Net-Work-এর Newyork ব্রাঞ্চ থেকে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আসলে advanceটা নিয়ে ফেলেছি তো। উপায় তো নেই। খোঁড়া মানুষ। রোজগার বলতে তো শুধু এই লেখালেখি। পয়সা না পেলে খাবো কি ?

সুজাতা : কেন তোমার বোন কি মরে গেছে?

বিমল : বালাই ষাট— অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনাও পাপ। আসলে কি জানিস্ সুজাতা- সবাই চায় স্বাবলম্বী হতে— সবাই চায় স্বাধীনতা।

সুধাকর : ঠিক, ঠিক - তুমি শুধু ভালো লেখক নও— কথাতেও তুমি বেশ পোক্ত। ঠিক আছে— তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আমি চলি—

সুজাতা : আপনি একবার উপরে আসবেন কাকা —

সুধাকর : কেন?

সুজাতা : জানেন তো মানুষটা আমি খুঁত খুঁতে - তাই

সুধাকর : তাই স্বাধীনের project এর Paperগুলো একবার দেখতে বলছো— দাও - দাও - একবার নেড়ে চেড়ে দেখি। হ্যা - সে যুগের Physics এর শিক্ষক - এখনকার ছেলের Scienceএর Project কতোটা কি করতে পারবো জানি না —তাও একটু চোখ বোলাতে ক্ষতি কি— চলো—
(সুজাতা - সুধাকর ভিতরে চলে যায়। বিমল নিজের হাতের সব কিছু ঠিক ঠিক জায়গায় রাখে। খাটে বসে ক্রাচটাকে পাশে রেখে ল্যাপটপ্ খোলে-। মঞ্চে ঢোকে রুনু কাস্ত্রো)

রুনু : Yes Mr. Nine - Stop - Zero -

বিমল : কে?

রুনু : তোমার প্রিয় কমরেড রুনু কাস্ত্রো।

বিমল : তুমি হঠাৎ?

রুনু : হঠাৎ? এখনও বলবে হঠাৎ? ক'ত দিন হলো?

বিমল : সব কিছু বুঝে - সব কিছু ভেবে - তবেই একটা কাজে হাত দেওয়া উচিত। দুম করে হঠাৎ কিছু করে বসাটা হটকারিতা এবং সেটা আত্মহত্যার মতোই বোকামি।

রুনু : তার মানে? এ ভাবেই চলবে— মাসের পর মাস— শুধুমাত্র সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করে?

বিমল : যে কোন ভালো কিছুর জন্যেই অপক্ষো করতে হয়। সময়টাকে ধরতে না পারলে—

রুনু : সময় - সময় (উত্তেজিত) সময় এর অপেক্ষা করতে গিয়েই আমাদের সমস্ত কাজ - সমস্ত আন্দোলন আজ এমন একটা খাদের সামনে দাঁড়িয়েছে যে আর এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি—হামাগুড়ি দিচ্ছি। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। আমাদের সামনে উঁচু পাঁচিলটাকে ভেঙে গুড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথটা তো আমাদের কুঁজে বার করতেই হবে কমরেড।

বিমল : তার জন্যে আমাদের সময় চাই— হ্যাঁ — অপেক্ষা করতে হবে।

রুনু : কতো দিন — কতো কাল?

বিমল : জানি না– শুধু জানি সময় এখনও আসেনি।

রুনু : তোমার হিসেবে। কারণ খোঁড়া হয়ে তুমি বেশ শাঁসে জলে দিন কাটাচ্ছো। আর আমি? আজ হাটের আটচালায়, কাল গাঁয়ের নাটমন্দিরের চাতালে— এভাবে আর কতো দিন— কতো মাস— বলো? বলো মি:—
(সেই মুহুর্তে সুধাকর - মঞ্চে দোতলা থেকে নেমে)

সুধাকর : বিমল —

বিমল : কাকাবাবু— আলাপ করিয়ে দিই— এ

রুনু : আমি রুনু— রুনু ঘোষ ।

বিমল : পাশের গ্রাম জো-গাছার মানুষ। আমার সঙ্গে আলাপ গাঁয়ের পথেই। বামপন্থী মানুষ। ওর সাথে একটু কথাবার্তা — মানে এখন আপনাদের এই পশ্চিমবঙ্গের—

সুধাকর : কি নাম বল্লে? রুনু— রুনু ঘোষ— চৌগাছার রুনু?—বামপন্থী— না মনে পড়ছে না। আসলে বয়েস বাড়ছে তো। ঠিক আছে তোমরা আলোচনা চালিয়ে যাও— আমি চলি (চলে যান)।

রুনু : কিছু বুঝলে?

বিমল : সময়টা কমে আসছে।

রুনু : আমরা সন্দেহের আওতায় চলে আসছি—

বিমল : তাহলে?

রুনু : আর দেরী করাটা ঠিক হবে না।

বিমল : কিন্তু—

রুনু : No কিন্তু— Next বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার কালীপূজো, ভাইফোঁটা— মানুষ মেতে থাকবে উৎসবে— আর সেই সময়, ঠিক সেই সময়—

বিমল : বেশ Central থেকে মিশনটার Confirmation -

রুনু : কেন hesitate করছো—Central কম্যান্ড সব দায়িত্বটাই আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। So আগামী শানিবার- ভাইফোঁটার দিন সন্ধ্যে—The Zero hour - O.K ?

বিমল : (সময় নিয়ে) O.K - As you please.
(নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে)
(অন্ধকারে মোবাইলের রিং টোন। আলো জ্বলে। ছোট্ট আলোয় সুজাতা— কানে মোবাইল। অন্য Zone-এ প্রিয়তোষ— হাতে মোবাইল)

প্রিয়তোষ : সু - সু - দারুন খবর— মজার খবর—

সুজাতা : তোমর প্রমোশনটা হয়েছে?

প্রিয় : একটু আগে খবর পেলাম।

সুজাতা : দারুন - দারুন - মানে এখন তুমি আর শুধু কর্ণেল নও—

প্রিয়ব্রত : অবশ্যই নই— কিন্তু আসল মজার খবর এটা নয়।

সুজাতা : তাহলে?

প্রিয়ব্রত : প্রমোশনের সাথেই transfer -
সুজাতা : তাই? কোথায়?
প্রিয়ব্রত : বলতো কোথায়?
সুজাতা : বারে আমি কি করে বলবো?
প্রিয়ব্রত : গেস্ করো— গেস্ করো—
সুজাতা : কোথায় আবার দেবে—হয় নাগাল্যাণ্ড - অরুণাচল প্রদেশ নয়তো (গলাটা কাঁপে) কাশ্মীর—
প্রিয়ব্রত : হা: হা: হা: ভুল - ভুল । আমার নতুন Posting Fort William - কোলকাতা।
সুজাতা : সত্যি? (উল্লাসে) কবে আসবে গো কবে?
প্রিয়ব্রত : আমাকে হেড কোয়ার্টার থেকে Stand release করে দিয়েছে। immediately আমাকে Fort William-এ report করতে হবে। তোমাকে খবরটা দিয়েই এবার বাঁধাছাদা শুরু করবো— কাল সকালে আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট, তার পর ট্রেন।
সুজাতা : বাড়ি আসবে না?
প্রিয়ব্রত : Join করেই ছুটি পাবো— অন্তত: এক সপ্তাহ তো বটেই। অতএব প্রিয়তমে আগামী সপ্তাহেই তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে— হচ্ছেই—।
(নেপথ্যে আবহে আনন্দের সুর— আলো এসে পড়ে পূর্ণ মঞ্চে। সুজাতার আলো নিভে যায়। দেখা যায় বিমল খাটে বসে সামনে ল্যাপ্‌টপ)
স্বাধীন : মামা—ও মামা— (ছুটতে ছুটতে ঢোকে) বাবার প্রমোশন হয়েছে— বাবা এখন আর কর্ণেল নয়— লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল।
বিমল : (উজ্জ্বল মুখে) তাই—?
স্বাধীন : শুধু তাই নয় - বাবা আসছে—
বিমল : সত্যি ? কবে?
স্বাধীন : আগামী সপ্তাহে—
বিমল : (একটু থেমে) আগামী সপ্তাহে—
স্বাধীন : তোমার আনন্দ হচ্ছে না— ও মামা তোমার আনন্দ হচ্ছে না?
বিমল : (নিজেকে পাল্টে) বারে আনন্দ হবে না কেন? খুব, খুব আনন্দ হচ্ছে— স্বাধীনের বাবা আসছেন— আমার ভগ্নিপতি আসছে— আমার আনন্দ হবে না? খুব— খুব আনন্দ হচ্ছে। (স্বাধীনকে জড়িয়ে ধরে। নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে)
(মঞ্চে মধ্যরাতের স্বল্প আলো। মঞ্চে একা বিমল ল্যাপ্‌টপ নিয়ে কাজ করছে। হঠাৎ দরজায় মৃদু শব্দ। বিমল কাজ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়ায়। আবার দরজায় মৃদু আওয়াজ। বিমল ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে। ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়— তারপর ক্র্যাচে ভর করে দরজার কাছে গিয়ে বলে)

বিমল : Who is there~
নেপথ্যে: আমি রুনু—
বিমল : প্রমাণ ?
রুনু : Nine - Stop - Zero (বিমল দরজা খোলে)
বিমল : এত রাতে হঠাৎ ?
রুনু : হঠাৎ! সত্যি শাঁসে জলে থেকে সব ভুলে মেরে দিয়েছো। কাল Zero day- প্রোগ্রামটা করে ফেলতে হবে তো?
বিমল : কাল?
রুনু : আমাদের আগের মিটিং-এ সেই রকমই সিদ্ধান্ত হয়েছিল।
বিমল : আচ্ছা কাস্ত্রো আমরা আমাদের কাজটা আর ক'টা দিন পিছিয়ে দিতে পারি না?
রুনু : লাভ? যে কোন মুহূর্তে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। এভাবে আর কতো দিন টানবো। আর কেনই বা টানবো?
বিমল : অন্তত: একটা দিন।
রুনু : কিন্তু কেন?
বিমল : ভেবে দেখো কাস্ত্রো- কাল এই বাংলায় ভাইফোঁটা– একটা সামাজিক উৎসব-
রুনু : সেই জন্যেই তো আমরা এই দিনটা বেছে নিলাম। সবাই জানে কাল ভাইফোঁটা থানার দারোগা থেকে মিলিটারি সবাই কাল অন্য মেজাজে থাকবে — সেই সুযোগে—
বিমল : কিন্তু ভাবো— কাল পথে কতো মানুষ থাকবে? এ কাজটা কাল করলে কতো ভাই তার বোনকে হারাবে— কতো বোন তার ভাইকে—।
রুনু : সেভাবে ভাবতে গেলে ঐ ভাই এবং বোনেদের সবারই সংসারে বাবা- মা- বৌ - ছেলে - মেয়ে কেউ না কেউ থাকবেই।
বিমল : তাহলে বলো এমন একটা দিনে—
রুনু : মি: Nine - দান্তেওয়ারাতে মাওবাদীরা যে মিলিটারি কন্‌ভয়টা উড়িয়ে দিয়েছিল— সেই কন্‌ভয়ের ৪৭জন মিলিটারি সবার বাড়িতেই মা-ভাই-বোন
- স্ত্রী ছিল। ঝাড়খণ্ডের পাহাড় ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রাম মন পথেলে ভারতীয় মিলিটারীরা উমেশ কুমারের ফেমিলির সবাইকে SLR দিয়ে —
বিমল : আ: Stop - please stop
রুনু : Sorry, এই action-এর পূর্ণ দায়িত্বে আছো তুমি। আমি তোমার সহযোগী। আমার তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করার কোনও অধিকার নেই। তবু বলবো— আমার সিকিউরিটির কথাটাও তোমাকে ভাবতে হবে— কারণ তুমিই লীডার।
বিমল : তোমার সিকিউরিটি?
রুনু : তোমার এই পাতানো বোনের family-র so called গার্জেন— সুধাকরবাবু— চৌগাছা গ্রামে গিয়ে তত্ব তল্লাস শুরু করেছেন— রুনু ঘোষ কোথায় থাকে— কোন বাড়িতে থাকে।

বিমল : বলো কি?

রুনু : ইচ্ছে করলেই ওনার তত্ব-তল্লাস আমি একটা দানা এর কপালে ভরেই শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু বড় একটা কাজের আগে ছোট্ট একটা ক্যাচাল করে সব কিছু কেঁচিয়ে দিতে মন চাইলো না।

বিমল : সঠিক সিদ্ধান্ত—

রুনু : এবার তুমিও একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নাও।

বিমল : কি সিদ্ধান্ত?

রুনু : কাল সন্ধ্যেতেই কাজটা করা হবে— এবং করবো আমরা দু'জনে একসাথে।

বিমল : আর একটা দিন— please - কাস্ত্রো—।

রুনু : কি ব্যাপার বলতো— এ বাড়ির মাছ-ভাত খেয়ে পাতি বাঙালী বুদ্ধ হয়ে গেলে নাকি?

বিমল : না— যে পরিবারকে হারিয়ে এ পথে এসেছিলাম— সেই পরিবার আবার ফিরে পেয়ে— ভাবতে বসেছি— আমরা যা করছি সেটা কি ঠিক? আমাদের বিশ্লেষণে কোনও ভুল থেকে যাচ্ছেনা তো?

রুনু : পাতি সংশোধনবাদীর মতো কথা বলো না কমরেড। এই মিশানে তুমিই লীডার। তুমি তো জানো একাজটা ঠিক মতো করতে পারলে Party-তে তোমার Position অনেক উপরে উঠে যাবে। তোমার সাথে আমারও– So -

বিমল : Yes- So - being the leader of this mission আমি তোমকে বলছি— কাল আমরা এই কাজটা করছি না।

রুনু : Why?

বিমল : অকারণ কিছু নীরিহ মানুষকে শেষ করে দিলেই আমার দেশ মুক্ত হবে এই ভাবনার সাথে আমি একমত নই।

রুনু : আর দেশের সরকার—তারা যে অকারণে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে শেষ করে দিচ্ছে— সেটা ভাববে না?

বিমল : সেটা ঝাড়খণ্ডে, M.Pতে— ছত্রিশগড়ে— এই বাংলাতে নয়।

রুনু : ওদিকে আমরা কোনঠাসা- রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার পথে - এখানে কিছু action ঘটিয়ে প্রশাসনের মুখটাকে আমরা ঘোরাতে চাই। তুমি তো কাউন্সিলের সে মিটিং-এ ছিলে— এতো তোমারই প্রস্তাব। সারা দেশে আমাদের কাজকে ছড়িয়ে দিতে পারলে— রাষ্ট্রশাক্তিও ছড়িয়ে যাবে — আমাদের মুক্তাঞ্চল আবার আমরা ফিরে পাবো।

বিমল : নিজেদের জায়গা ফিরে পেতে কিছু নিরীহ মানুষ খুন করবো?

রুনু : তুমি কি চাইছো?

বিমল : সেটাই তো ভাবছি। আমি এখন একটা কিছু করতে চাই যাতে আমাদের mission-টা successful হয়— অথচ নিরীহ মানুষও না মরে।

রুনু : তার মানে তুমি আরো সময় চাইছো?

বিমল : ভাবতে।
রুনু : ভাবতে— না—
বিমল : না?
রুনু : ঐ সুজাতা মাগীটাকে চাটতে।
বিমল : কাস্ত্রো —(একটা ক্র্যাচ তুলে ধরে)
রুনু : (দ্রুত পকেট থেকে revolver বের করে) খামোশ— দরকার হলে তোমাকে খতম করতে আমার একটুও হাত কাঁপবে না— আমি আমার আদর্শকে বুঝি— আমার নেতৃত্বের নির্দেশকে মান্য করি।
বিমল : আমিও নিরস্ত্র নই—
রুনু : সে সুযোগ তোমাকে আমি দেবো না।
বিমল : কি চাও তুমি— ?
রুনু : তোমার ব্যাগের ভিতরে রাখা প্যাকেটটা।
বিমল : কাস্ত্রো—
রুনু : তুমি দেবে — না আমি—
বিমল : দাঁড়াও (ব্যাগের দিকে এগুতে যায়)
রুনু : উঁ হু— Don't move- কাজটা আমাকেই করতে দাও। তোমার মুরোদ আমার জানা হয়ে গেছে। আসলে কি জানো কমরেড— আদর্শ আর আবেগ এক জিনিষ নয়। আবেগ জিনিষটা অদ্ভুত। একটু ভালো কথা— একটু গায়ে মাথায় আদর আবেগ ক্ষতম। কিন্তু আদর্শ থেকে যায় মনে - অন্তরে - না মরা পর্যন্ত। (ট্রলি ব্যাগের কাছে যায়। ব্যাগ খুলে বড় প্যাকেট বার করে আনে)
রুনু : চলি — কাল সন্ধ্যেটাই আমাদের Zero - hour -. পারলে তার আগেই এখান থেকে ফুটে যেয়ো। তুমি আমার কমাণ্ডার — একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কাজটা ঠিক মতো মিটে গেলে হাই কমাণ্ডের কাছে কাজটা আমি একা করেছি এটা বলে তোমার মৃত্যুর কারণ হবো না।
বিমল : কিন্তু ওর Device - ? তুমি তো কিছুই জানো না।
রুনু : জেনে নেবো— বুঝে নেবো। না পারলে explotion-এ নিজেই শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু মরার আগে পর্যন্ত নিজের মতাদর্শকে ছাড়বো না। না— কিছুতেই না। Good by - কমরেড—। (রুনু চলে যায়)
বিমল : রুনু শুনে যাও— রুনু— (নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে)
(আলো জ্বলে —মঞ্চে সুজাতা— তার পরনে সুন্দর শাড়ী— পাশে স্বাধীন—সেও পাঞ্জাবী - পাতলুন পড়ে। দুজনে মিলে ভাইফোঁটার আয়োজন করছে। মঞ্চে সুন্দর আসন পাতছে — পিতলের থালায় ধান-দুর্বা রেখে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে)
স্বাধীন : মা— মিষ্টিগুলো—
সুজাতা : ধুর পাগোল— মিষ্টিগুলো আগেই সাজিয়ে দিলে হবে? ওটা suspense - ফোঁটা দেওয়ার পর—

স্বাধীন : ঐ পাঞ্জাবী - পাতলুনটাও ?

সুজাতা : অবশ্যই - ওটা তো Gift - ফোঁটা দিয়ে প্রণাম করে তারপর মিষ্টির থালা - আর উপহার - বুঝলি রে বোকা।

স্বাধীন : আমাকেও একটা বোন জোগাড় করে দাও না মা— আমি ফোঁটা নেবো। (সুজাতা থমকায় - মনের মধ্যে কি একটা ভালো সুর বেজে ওঠে - ? তারও একটা মেয়ে হবে— স্বাধীনের একটা বোন হবে। আলো প্রিয়তোষের ছবিতে জোড়ালো হয়। নেপথ্যে প্রিয়ব্রত - 'সু - সু - আমার কি ইচ্ছে জানো– আমার বেশ অনেক ছেলে মেয়ে হবে - ঘরময় ছুটোছুটি - একটা আমার ঘাড়ে– একটা তোমার কোলে। হা: হা: হা:)

সুজাতা : পাগোল—।

স্বাধীন : মা - ও মা - আমাকে পাগোল বলছো কেন ?

সুজাতা : (স্বাভাবিক হয়) বলছি এই জন্যই যে তোর বোন জোগাড় করতে হবে কেন ? তোর কাকার মেয়ে রিম্পিতো আছে।

স্বাধীন : সে তো নেই, মুম্বাই-এ।

সুজাতা : আর একটু বড় হ'— সোজা চলে যাবি মুম্বাই-এ— ফোঁটা নিতে।

স্বাধীন : কবে— কতো দিন পরে - ?

সুজাতা : সেটা তোর মামাকে জিজ্ঞেস কর। সে তো মুম্বাই-এ ই থাকে। তবে কি জানিস বাবা— এই ভাইফোঁটার দিনে ভাইকে পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার। কতো মেয়েরই তো কত ভাই থাকে — তারা কি বোনের কাছে আসে— ফোঁটা নিতে? আমিই তো দেখ না— এতো বছর পর প্রথম আজ আমি ফোঁটা দিচ্ছি— আমার ভাইকে। (চিৎকার করে) কি গো— দাদা— তোমার হলো ?

বিমল : যাচ্ছি— যা - চ্ছি— খোঁড়া মানুষ একটু সময় দেবে তো (ক্র্যাচে ভর করে মঞ্চে ঢোকে। একদম নতুন পোষাকে। হাতে একটা প্যাকেট)

স্বাধীন : আরে - ব্বা— মামা— !

বিমল : বোনের কাছে জীবনে প্রথম ফোঁটা নেবো। আমাদের মারাঠীদের মধ্যে তো ভাইফোঁটা নেই— আছে রাখী- আমরা বলি রক্ষা বন্ধন। ভাইফোঁটার এমন একটা অনুষ্ঠান— একটু সাজু গুজু করবো না - হা: হা: হা: হা:

সুজাতা : ঠিক আছে - ঠিক আছে - আর বক্তিমে মারতে হবে না তো— এই আসনটায় বসো।

বিমল : (ক্র্যাচ ছেড়ে আসনটায় বসতে যায় । টলে যায় -)

স্বাধীন : মা-মা— (এগিয়ে ধরতে যায়)

বিমল : না - একদম ধরতে চেষ্টা করবে না- । একটু কষ্ট নিশ্চয়ই হবে— কিন্তু সেটা আমি মেনে নেবো– আমার বোন আমাকে ফোঁটা দেবে- আজ যে ভাই ফোঁটা। (বসে - তারপর হাতের প্যাকেটটা সুজাতার দিকে তুলে ধরে) ছোট্ট উপহার— আমার বোনের জন্যে—

স্বাধীন : ও মামা— ওটা ফোঁটা দেওয়ার পর দিতে হয়—

বিমল : এতো কিছু কি আমি জানি ভাঞ্জে?

সুজাতা : ঠিক আছ - ঠিক আছে - দাদা - বোনের সম্পর্কে অতো কিছু জানার দরকার নেই। দাও— (প্যাকেটটা নেয় - খুলে দেখে - একটা লাল পেড়ে শাড়ী) আ: দারুন - আমি আজই পড়বো।

স্বাধীন : সে - না হয় পড়লে— আগে ফোঁটাটা দাও—

সুজাতা : হ্যা - হ্যা - (ফোঁটা দেওয়ার থালাটা তুলে নেয়)

স্বাধীন : শাঁখটা আমি বাজাবো— (স্বাধীন শাঁখ টা তুলে নেয় । সুজাতা প্রদীপ জ্বেলে ফোঁটা দিতে শুরু করে। নেপথ্যে আবহে শাঁখের আওয়াজ— আলো নেভে)

(টিম টিমে আলোয় বিমলের ঘর। বিমল খাটে আধ শোয়া। সুজাতা ঢোকে)

সুজাতা : দাদা — আলো জ্বালাওনি?

বিমল : এখনও তো অন্ধকার নামেনি ?

সুজাতা : বোনের খরচ বাঁচাচ্ছে?

বিমল : না - না - আসলে—

সুজাতা : আসলে এখনও তুমি আমাকে নিজের বোন বলে ভাবতে পারছো না। তাই না?

বিমল : না - না - কি জানিস্ সুজাতা সবার কপালে তো সুখ সয় না।

সুজাতা : কিসে তোমার এতো ভয় দাদা?

বিমল : জানি না— শুধু একটাই জানি— তুই আমার বোন— আমি তোর দাদা - আর এই সত্যিটাকে সঙ্গে নিয়েই আমি বাঁচতে - বা - মরতে চাই - । একটা অনুরোধ করবো?

সুজাতা : আদেশ বলো —

বিমল : আমি খামখেয়ালী - বাউণ্ডুলে মানুষ— হঠাৎ যদি কোনও দিন হারিয়ে যাই— হঠাৎ যদি কোনও দিন শুনতে পাস্ তোর এই দাদা আর নেই—

সুজাতা : দাদা —

বিমল : টেবিলের উপর একটা ডাইরি রইল। বলতে পারিস্ আমার আত্মজীবনী। আমি হঠাৎ কোথাও হারিয়ে গেলে পড়ে দেখিস্— পারলে তোর দাদাকে ক্ষমা করিস্।

সুজাতা : এমনভাবে কেন বলছো— কি হয়েছে তোমার?

বিমল : কি হয়েছে - সেটা যদি আমি নিজেই জানতাম—
(হঠাৎ স্বাধীন এসে ঢোকে)

স্বাধীন : ও মা - মা গো - এই মাত্র বাপী মোবাইলে আমাকে ধরেছিল। খড়গপুর থেকে বাপীর ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। একটু পরেই এখান দিয়ে যাবে। চলো না - চলো না মা - আমরা রেল লাইন ধরে গিয়ে দাঁড়াই। বাপীকে একবার দেখি।

সুজাতা : তুই কি পাগোল? অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন অমৃতসর মেল— কতো জোরে এখান দিয়ে যায় জানিস্ না?

স্বাধীন : আমি মোবাইলে বাবাকে জানিয়ে দিচ্ছি— আমরা রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো— একবার য়েন দরজার সামনে বাপী আসে—

সুজাতা : কেন এতো অধৈর্য্য হচ্ছিস— তোর বাপী আসবে তো। দুদিনের মধ্যেই আসবে।

স্বাধীন : না - বাপীকে আজই আমি দেখবো। হ্যা দেখবো— মামা - ও মামা - চলো না আমরা রেল লাইনের ধারে যাই— বাপী আসছে - একবার একটু দেখা—। ও মামা—

বিমল : এ্যাঁ কি বল্লে — কি বল্লে তোমরা?

সুজাতা : শুনতে পেলে না? ঘুম পাচ্ছে নাকি দাদা?

বিমল : ঘুমকে আমি ঘেন্না করি - কি বল্লে— এই মাত্র?

স্বাধীন : কি আবার বলবো। বাবা অমৃতসর মেলে আসছে— ট্রেন খড়গপুর ছেড়েছে— একটু পরেই এখান দিয়ে পাস্ করবে।

বিমল : তোমরা যে বলেছিলে প্রিয়বাবু আগামী সপ্তাহে আসবেন?

স্বাধীন : সে তো বাড়িতে। আজ বাপী অমৃতসর মেলে ফিরছে— সোজা যাবে Fort William-এ

(নেপথ্যে আবহে একটা দ্রুতগামী ট্রেন যাওয়ার শব্দ। সেই শব্দকে ছাপিয়ে প্রচণ্ড জোরে বিস্ফোরণের শব্দ- অনেক মানুষের আর্ত চিৎকার)

বিমল : Oh, শীট্—। আলোটা জ্বালো - সুজাতা please আলোটা জ্বেলে দাও—

(২/৩ বার সুজাতা দ্রুত ঘরের আলো জ্বালে। বিমল দ্রুত ক্র্যাচ দুটো ছুঁড়ে ফেলে - লাফ দিয়ে নেমে ব্যাগ থেকে টর্চ আর একটা লাল পতাকা বার করে নিয়ে ছুটে বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে)

স্বাধীন : মামা—

সুজাতা : দাদা —

বিমল : দায় মেটাতে যাচ্ছি রে। মামা - দাদার দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি। আমি চললাম

(দ্রুত বেড়িয়ে যায়। স্বাধীন এগিয়ে গিয়ে ক্র্যাচ দুটো তুলে নেয়)

স্বাধীন : মা —

সুজাতা : জানি না- জানি না - আমি কিচ্ছু বুঝে উঠতে পারছি না রে।

(কান্নায় ভেঙে পড়ে সুজাতা— নেপথ্যে আবহ। আলো নেভে)

(আলো জ্বালে। চিৎকার করতে করতে মঞ্চে ঢোকে সুধাকর)

সুধাকর : বৌমা - বৌমা - স্বাধীন -

সুজাতা : কি হয়েছে কাকা?

সুধাকর : ঐ লোকটা বিমলানন্দ সাউ নয়। (হাঁপাচ্ছে)

সুজাতা : কি বলছেন কাকা?

সুধাকর : একটু আগে হৈমীর ভাইপো মুম্বাই থেকে ফোনে জানিয়েছে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত লেখক বিমলানন্দ সাউ গত ২০০৬ সালের ১১ই জুলাই মুম্বাই-এর বোম ব্লাস্টে মারা যান মাতুঙ্গা রেল ষ্টেশানে।

সুজাতা : তাহলে ঐ মানুষটা যাকে এতোদিন নিজের দাদার মতো ভেবেছি— সে কে?

সুধাকর : জানি না - শুধু জানি — তোমার paying guest-এর সবটাই সন্দেহজনক। এমনকি ওর সাথে দেখা করতে আসা রুনু ঘোষ সে লোকটাও ভুয়ো— পাশের চৌগাছা গ্রামে রুনু ঘোষ বলে কেউ নেই, ছিল না।

সুজাতা : তাহলে?

সুধাকর : আমরা একটা ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি। জানি না এর শেষ কোথায়— আর এর শেষে পৌঁছাতে আমাদের কতো ক্ষতিকে সামাল দিতে হবে।

সুজাতা : কাকা—

সুধাকর : আমি তখনই বলেছিলাম। face দেখে সব কিছু বোঝা যায় না। Facebook খুলেও না।

সুজাতা : কাকা (নেপথ্যে আবহে একটা দ্রুতগামী ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। সেই শব্দকে ছাপিয়ে প্রচণ্ড একটা বিস্ফেরণের শব্দ- অনেক মানুষের আর্ত চিৎকার) কা- কা (কান্নায় ভেঙে পড়ে। নেপথ্য আবহে বিষাদের সুর)
(নেপথ্যে প্রিয়তোষ—)

প্রিয়তোষ: সুজাতা - সুজাতা - স্বাধীন - স্বাধীন—

স্বাধীন : বাপী - আমার বাপী - বা পী-ই—ই—
(ছুটে দরজার দিকে যায়— মঞ্চে ঢোকে প্রিয়তোষ)

প্রিয়তোষ: স্বাধীন - My child - (জড়িয়ে ধরে। নেপথ্যে আবহ)

সুজাতা : (আনন্দিত) তুমি! তোমার তো —

প্রিয় : সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ট্রেনটা ছুটছে— আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাবে। হঠাৎ যদি তোমাকে বা স্বাধীনকে একটু চোখের দেখাও দেখতে পাই— চোখ আমার জানালা দিয়ে বাইরে। হঠাৎই প্রচণ্ড জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেনটা। আমাদের গ্রামের মধ্যেই। নেমে পড়লাম— কাঁধে ব্যাগ। একটু এগিয়ে ড্রাইভারের মুখে শুনলাম - একটা লোক লাল টর্চের আলো জ্বেলে ট্রেনটা থামাতে চেয়েছিল। ট্রেনটা থেমেছে- কিন্তু সেই লোকটাকে বাঁচানো যায়নি। মারা যাওয়ার আগে সে মানুষটা বলে গেছে লাইনে explosive আছে। আর এগোলে ট্রেনটা উড়ে যাবে। So এখন R.P.F আসছে— G.R.P আসবে— Explosive হ্যাণ্ডেল করার forceকে ডাকবে। প্রচুর সময়ের ব্যাপার। তার মানে আজ আর আমাব Fort William-এ report করার কোন সুযোগ নেই। So —

সুজাতা : লোকটাকে তুমি দেখেছো?

প্রিয় : দেখবো না কেন?— একদম পাতি মধ্যবিত্ত একটি মানুষ। গায়ে নীল রঙের পাঞ্জাবী - পরনে পাতলুন।

সুজাতা : দা - দা— (হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে)

স্বাধীন : মামা — মামা কেন গেল ওখানে— বলো না — বলো না মা?

সুজাতা : দাদা বলেছিল - ওর কিছু হয়ে গেলে - ওর ডাইরীর শেষ পাতাগুলো পড়তে (সুজাতা টেবিলের কাছে যায়— ডাইরীটা তুলে নেয়। আলো ছোট হয়। সুজাতা পড়তে শুরু করে ডাইরী খুলে)

সুজাতা : (ডাইরী পড়ছে) সুজাতা, স্বাধীন প্রথমেই তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি— যদিও আমি জানি যে - যে অন্যায় আমি করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য
(আলো সুজাতা থেকে সরে এবার বিমলের উপর— সে বলতে শুরু করে)

বিমল : আমি বিমলানন্দ সাউ নই— আমার নাম উমেশ কুমার। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের মনপথল গ্রামে। আমাদের যে জগৎটা— ঐ মধ্যপ্রদেশ - ঝাড়খণ্ড - উত্তরাখণ্ড— তার বেশীর ভাগ অংশ জুড়েই বনাঞ্চল - আর আকরিক ভর্তি পাহাড়-টিলা। সেই সব জায়গা জুড়ে আজ হাঙরের হানা। বেনিয়ারা সেখানে ব্যস্ত জঙ্গলের সমস্ত সম্পদকে হজম করতে— মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা সব আকরিককে নিজেদের কব্জায় নিতে।আর সেখানেই আমাদের লড়াই ওদের সাথে। এই বনাঞ্চল - এই পাথুড়ে জমিতে যাদের বাস - তারা ওদের চোখে ক্রীতদাস। ওদের খীদমত্ খাটাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করা মানেই— সে কমিউনিষ্ট— উগ্রপন্থী। আর আমার দাদা, আমার দাদা ওদের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করার অপরাধে—আমার পরিবারের সবাই— আমার মা-দাদা-বৌদি এমনকি আমার ছোট্ট ভাইঝিটাও শেষ হয়ে যায় মিলিটারির গুলিতে। (নেপথে আবহ) আমি তখন কোলকাতায়- যখন খবরটা পেলাম, তখন সব শেষ। প্রতিহিংসা আমাকে বাধ্য করলো আমার সব কাজ ছেড়ে শুধু পরিবারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। তাই আজ আমি উগ্রপন্থী। নিজের পরিবার হারিয়ে প্রতিশোধ নিতে একদিন হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলাম— আজ আবার নিজের পরিবার নতুন করে ফিরে পেয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছি— আমাদের পথটা কি ভুল? এভাবে কি মুক্তি আসবে? দেশের - সমস্ত মানুষের - নাকি শুধুমাত্র নিরীহ মানুষের রক্তই ঝড়বে? জানি না—। শুধু জানি স্বাধীনের বাবা যে দেশটায় স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে সীমান্তে লড়ছে—আমরা সেই দেশটাকেই আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্নেই হাতিয়ার তুলে নিয়েছি। সুজাতা,স্বাধীন আমাকে ভুল বুঝো না- আমাদের পথটা হয়তো ভুল— কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের আদর্শের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে কোনও ভুল নেই— কিছু মাত্র না—।
(নেপথ্যে আবহ। সুজাতা ডাইরীটা বন্ধ করে। একটা মুহূর্তের নীরবতা। তারপর হঠাৎই-)

সুজাতা : দা - দা— (হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। স্বাধীন-প্রিয়তোষ - সুধাকর - সবাই ওর দিকে তাকায়— নেপথ্য আবহ সঙ্গে নিয়ে অনুরণিত হয় বিমলের শেষ কথাগুলো— "আমাকে ভুল বুঝো না— আমাদের পথটা হয়তো ভুল কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে - আমাদের আদর্শের মধ্যে - আমাদের স্বপ্নের মধ্যে কোনও ভুল নেই - না - নেই—

(off voice-এর কথা আর নেপথ্য আবহের মধ্যেই ধীরে ধীরে নেমে আসবে পর্দা)

লেখক : শিবংকর চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের বলিষ্ঠ নাট্যকার।

আশ্চর্য মানুষ

গল্প - বিনোদ ঘোষাল

নাট্যরূপ - মৈনাক সেনগুপ্ত

(চরিত্র - সুখেন, বিপাশা, অসীম, তমোঘ্ন, ছলিমুল্লা)

সুখেনের ঘর, সেখানে যত রাজ্যের পুরনো জিনিস। কলের গান, হুঁকো, হাত পাখা ইত্যাদি ইত্যাদি। সুখেনের সহকর্মী অসীম এসেছে সুখেনের বাড়িতে। ঘরে সুখেনের স্ত্রী বিপাশাও আছে।

অসীম - এটা বাড়ি না মিউজিয়াম সুখেনদা?

বিপাশা - আপনিই দেখুন- কুঁজো, হুঁকো, হাতপাখা। বাটি-গেলাস কাঁসার। বাথরুমেও কী বলে যেন-

সুখেন (কুণ্ঠিত হয়ে) - গাড়ু।

অসীম - হা হা হা, সুখেনদার অফিসের টেবিলে এখনও একটা কালো ঢাউস টেলিফোন। এ যে আঙুল ঘুরিয়ে ডায়াল করতে হয়। নিজের পয়সায় কিনে এনেছে। (বিপাশা সুখেনের দিকে তাকায়)

সুখেন - মানে বাড়িতে যেটা ছিল, তুমি তো ব্যবহার করতে দিলে না, ফেলে দিয়েছিলে।

বিপাশা - তাই তোমায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে তোমার এই পাগলামির কথা গোটা পৃথিবীতে জানাতে হবে।

অসীম - এক একজন মানুষের এক এক রকম খেয়াল।

বিপাশা - আপনার কাছে যেটা খেয়াল মনে হচ্ছে, আমাদের কাছে ওটা অদ্ভুত বাতিক গ্রস্ততা। আজ একুশ বছর এই রকম একজন ফসিলকে নিয়ে ঘর করছি। Sorry, কিছু মনে করবেন না। আপনার সামনে অনেক কথা বলে ফেললাম।

অসীম - না, না, বৌদি ঠিক আছে। অফিসে সুখেনদাকে নিয়ে কেউ কেউ ঠাট্টা তামাশা করে বটে, তবে আমরা ওনাকে ভালইবাসি।

বিপাশা - হ্যাঁ, আপনাদের হয়ত ওনাকে নিয়ে ভাল Time pass হয়।

অসীম - ছি , ছি , কী যে বলেন বৌদি।

বিপাশা - ভুল কিছু বলছি কি না। আপনার দাদাকেই জিজ্ঞেস করুন। উনি নিজেই বলেন ছোটবেলা থেকেই ওনার বন্ধুরা এসব নিয়ে ওনার পিছনে লাগত।

সুখেন - চা খাবে?

অসীম - না থাক। আমি ওনার মাইনেটা দিতে এসেছি।

বিপাশা - মাইনেটা ! দিতে ! আপনি কেন?

অসীম - দাদা শেষ ক'দিন অফিস যাননি ত, সেকশন থেকে আমাকে বলল বাড়িতে পৌঁছে দিতে। উনি তো আবার মোবাইলও ব্যবহার করেন না। তাই Service Book থেকে ঠিকানা নিয়ে সরাসরি বাড়িতেই চলে এলাম।

বিপাশা - ঠিক বুঝতে পারছি না। উনি তো রোজ-ই অফিস গেছেন।

সুখেন - তোমার আবার এত ঝক্কি পোয়ানোর কী দরকার ছিল! চা খাবে? কাঁসার গ্লাসে চা খেতে দারুণ লাগে, খেয়েছ কখনো?

বিপাশা - তুমি এই ক'দিন অফিস যাওনি কেন?

সুখেন - আসলে হঠাৎ করে খোঁজ পেলাম এক জায়গায় সস্তায় কিছু পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে!

বিপাশা - আর তুমি অফিস কামাই করে ....

অসীম - বউদি একটু চা হবে?

বিপাশা - (একটু সামলে নিয়ে) হুম দিচ্ছি।

সুখেন - কাঁসার গ্লাসে।

বিপাশা - পারব না।

(বিপাশা ভেতরে ঢুকে যায়)

অসীম - (চারদিক দেখতে দেখতে) সুখেন দা?

সুখেন - হুম অসীম বলো।

অসীম - এটা কোন সাল?

সুখেন - (একটু ভেবে)- ২০১৮। বোধহয়। ঠিক বললাম?

অসীম - অথচ আপনার ঘরটাকে দেখে মনে হয় এখনও ১৯৫৮-এ আটকে আছেন।

সুখেন - বিয়ের পর তোমার বৌদিও মোটামুটি এইরকমই একটা কী বলছিল। সালটা অবশ্য অন্য একটা কিছু...... ঠিক মনে পড়ছে না।

অসীম - তারপর?

সুখেন - তারপর আর কী? আমার প্রথম কৈশোর থেকে জমানো সব জিনিস পড়ে রইল এই ঘরে। আর আমাকে টেনে নিয়ে গেল হালফ্যাশানের আসবাব সাজানো দোতলার একটা ঘরে। ওয়াহিদা রহমানের কোনো সিনেমা দেখেছ? মীনা কুমারী? নন্দা?

অসীম - ওয়াহিদাকে চিনি।

সুখেন - তোমার বৌদির মধ্যেও এইরকম একটা Old world dream ছিল। ঐ একবারই মেয়ে দেখতে গেছিলাম। কীরকম যেন সাধনা, গীতাবালী ধরনের ব্যাপার স্যাপার। একবারেই 'হ্যাঁ' বলে দিলাম।

অসীম - বৌদিও ওসব পুরনো দিনের সিনেমা দেখতে ভালবাসেন বুঝি?

সুখেন - প্রথম প্রথম ঐ নায়িকাদের কথা বলার চেষ্টা করেছি। বললেই কেমন যেন মুখ চোখ করত। তাই পরে আর বলতে সাহস পেতাম না।

অসীম - সত্যিই সুখেন দা। সবাই আপনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। আপনি এত সিরিয়াস, এফিসিয়েন্ট একজন স্টাফ, অথচ কেউ সেসব দিকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনার এই বাতিক নিয়ে পিছনে লাগে।

সুখেন - আমি তো কোথাও কোনো কাজে ফাঁকি দিই না অসীম। না বাড়িতে, না অফিসে।

আমার শখ বা বাতিক যা-ই বলো সে তো কারুর কোনো ক্ষতি করছে না।

অসীম - আসলে মানুষ তো নিজের আশেপাশে নিজের প্রতিবিম্ব দেখারই প্রত্যাশা করে।

সুখেন - অনেকটাই তো ভেঙেছি। সবটা বদলে নিলে একটা গোটা মানুষ যে আর একটুও নিজের মত থাকে না। ওয়াহিদা , মীনাকুমারী, নার্গিসের একটা আশ্চর্য জগত আছে জানো অসীম।

অসীম - কিন্তু আপনি যখন বড় হচ্ছেন তখন জীনাত, রেখা , পুনম, রতি পেরিয়ে মাধুরী -জুহির যুগ। তাদের সিনেমা দেখতেন না?

সুখেন - বন্ধুরা দু-একবার জোর করে নিয়ে গেছিল।

অসীম - তারপর?

সুখেন - সাদা-কালো সেপিয়ার মধ্যে একটা আশ্চর্য মায়া আছে, রহস্য।

অসীম - অতীত আঁকড়ে এমনভাবে বেঁচে থাকা যায় সুখেনদা?

সুখেন - আমাদের বয়সী অনেক মানুষের থেকে আমি কম্পিউটারটা ভাল চালাতে জানি।

অসীম - পেশার জায়গায়, চাকরির জায়গায় আপনার দক্ষতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। সেই আপনার মত মানুষ-ই যখন ক'দিন অফিসে আসছেন না দেখলাম সত্যি বলতে কি একটু চিন্তাই হচ্ছিল।

সুখেন - ঐ অফিসের কাজের ফাঁকে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা জায়গার সন্ধান পেলাম। তারা নাকি পুরনো জিনিস বিক্রি করে।

অসীম - এই ক'দিনে অনেক জিনিস কিনে ফেললেন বুঝি?

সুখেন - না, ক'দিন ধরে রোজ সেখানে গিয়ে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম।

অসীম - কী?

সুখেন - একটা জিনিসও তেমন পুরনো নয়। ওরা নতুনকে পুরনো বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

অসীম - বিক্রেতারা তো সাধারণত উল্টোটা করে।

সুখেন - সব খরিদ্দার যে একরকম হয় না অসীম। পুরোনো জিনিসের সঙ্গে বাস করতে করতে আমি চোখ দিয়ে ছুঁলেই বুঝতে পারি কোন জিনিসটা কতদিনের, অভ্যেস হয়ে গেছে।

(বিপাশা চা নিয়ে ঢোকে)

বিপাশা - আমার এতদিনেও অভ্যেস হয়নি। একটা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সঙ্গে থাকা যে কত কষ্টকর সে কেবল আমি-ই জানি।

সুখেন - (বিপাশাকে)- কাঁসার গ্লাসে দিল না?

বিপাশা - আজকালকার দিনে কোনো ভদ্রলোক কাঁসার গ্লাসে চা খায় না।

সুখেন - (একটু থতমত খেয়ে) না, মানে ও তো অসীম।

(অসীম হেসে ফেলে)

বিপাশা (অসীমকে)- দেখুন দেখুন আপনিই দেখুন কাকে নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে।

অসীম - (চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে) - আজ তাহলে আসি বৌদি?

বিপাশা - একটা request করব ভাই?
অসীম - একশোবার। বলুন না। (বিপাশা অসীমকে ডাকে।)
বিপাশা (নীচু গলায়) আপনার ফোন নাম্বারটা দেবেন ভাই, মাঝে মাঝে আপনার কাছে - লোকটা যে কি করে, বড় চিন্তা হয়। একটু খোঁজ নিতাম।
বিপাশা - (উঁচু গলায়) একবার আমাদের বাড়ির অন্য ঘরগুলো একটু দেখে যাবেন?
(অসীম কিছু বুঝতে পারে না)
বিপাশা - না, মানে, অফিসে বা নিজের বাড়িতে গিয়ে তো নিশ্চয়ই বলবেন, আপনি কিছু অন্তত একজন মানুষ দেখে এলেন?
অসীম - না, না, এরকম কেন ভাবছেন?
বিপাশা - বলবেন, বলাটাই স্বাভাবিক, বাকি ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখলেই বুঝবেন আমরা এই বাড়ির বাকি দুই বাসিন্দা স্বাভাবিক, আপনাদের মতোই।
সুখেন - আমি তো নিজের মতো।
বিপাশা - প্রথম প্রথম সারা বাড়িটা জুড়ে এসব আবর্জনা ছড়ানো ছিল, ছেলে একটু বড় হওয়ার পরে আপনার দাদার সব জিনিস নিয়ে এসে এই ঘরে জমা করেছি।
সুখেন - আমিও তখন থেকে এই ঘরেই আছি।
অসীম - কাল অফিসে যাবেন তো?
সুখেন - যাব গত ক'দিন ঐ চেয়ারটার সাথে দেখা হয়নি।
বিপাশা - কোন চেয়ার ?
(অসীম চুপ করে থাকে)
বিপাশা - কী হল?
অসীম - আসলে সুখেনদা একটা বহু পুরানো কাঠের চেয়ারে বসেন। আমাদের সবারই হালফ্যাশনের ছিপছিপে চেয়ার। খালি সুখেনদার ---
বিপাশা - আপনাদের Boss কিছু বলেন না?
অসীম - আসলে সুখেনদা এত sincerely কাজ করেন যে স্যার ওনার এই ছোট ছোট খামখেয়ালীগুলো allow করেন।
সুখেন - বাড়ির কোনো কাজেও কিন্তু আমি ফাঁকি দিই না (বিপাশা কিছু বলতে যায়)
অসীম - অনেক দেরী হয়ে গেল। আজ আসছি বৌদি।
(অসীম উত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে যায়)।
বিপাশা আবার কিছু বলতে যায়। সুখেনও দরজার কাছে যায়)
সুখেন - (জোরে)- কাল অফিসে দেখা হচ্ছে অসীম।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(সুখেনের ঘর। সন্ধ্যেবেলা, সুখেন, বিপাশা, তমোঘ্ন)

তমোঘ্ন - বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল?

সুখেন - তোমার এই মাসের টিউশন ফিস, হাত ঘরচা, সব তো আমি তোমার মা-র কাছে দিয়ে রেখেছি।

তমোঘ্ন - না না সে সব কিছু নয়।

সুখেন - কোথাও বেড়াতে যাবে? বন্ধুদের সঙ্গে?

তমোঘ্ন - তাও নয়?

সুখেন - (একটু অবাক হয়ে) তা-হলে?

বিপাশা - আসলে গুড্ডুর বন্ধু বান্ধবেরা মাঝে মধ্যে আসে তো, একসঙ্গে পড়াশুনো করে।

সুখেন - সে তো ভাল কথা।

বিপাশা - কলেজ থেকে ফেরার পথে দুপুরের দিকে।

সুখেন - হুম।

বিপাশা - তুমি তো তখন থাকো না, তোমার ঘরে ওরা বসতেই পারে।

সুখেন - নিচের তলায় এই একটা ঘর-ই তো কেবল আমার নিজের। বাকি পুরা বাড়িটাই তো তোমাদের।

বিপাশা - দুপুরবেলাটা আমি একটু বিশ্রাম নিই। অতগুলো ছেলেমেয়ে মিলে হৈচৈ করলে তো আর ঘুমানো যায় না।

সুখেন - এই যে বললে ওরা পড়াশুনা করতে আসে(বিপাশা তাকায়)

সুখেন - না, না, সে চাইলে আমার ঘরে বসতেই পারে।

তমোঘ্ন - কোথায় বসব! সারা ঘরে টাঁই করে জঞ্জাল রাখা, মেঝেতে পা ফেলার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই।

সুখেন - কী করতে বলিস?

বিপাশা - বহুদিন ধরে যে কথাটা বলে আসছি। ঘরটা খালি কর। (সুখেন চুপ করে থাকে)

তমোঘ্ন - (চারপাশের জিনিসপত্রগুলো দেখিয়ে) এগুলোর কেমন দাম তোমার কোনো ধারণা আছে মা?

বিপাশা - ওসব কাবাড়িওয়ালা ডেকে আনবি?

তমোঘ্ন - কাবাড়িওয়ালা! Bullshit তুমি একটুও বদলালে না মা। একটু updated হও। OLX জানো? QUIRA?

বিপাশা - সেগুলো আবার কী?

তমোঘ্ন - জিনিসপত্র কেনাবেচার জায়গা?

বিপাশা - (খুব উৎসাহ নিয়) নতুন কোনো mall?

তমোঘ্ন - (কিছু একটা বলতে গিয়ে সামলে নেয়)- Internet এ কেনাবেচার জায়গা। বাবার এই সমস্ত জিনিস পত্রের ছবি তুলে post করে দিলে খদ্দের এসে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে।

বিপাশা - এসব আবার কিনবে কে?

তমোঘ্ন - সেদিন তিতির এসে বাবার ঘরে উঁকি দিয়েছিল।

বিপাশা - তিতির মানে ঐ ছোট্ট চুল, চশমা পড়া মেয়েটা?

তমোঘ্ন - (একটু বিরক্ত হয়ে)- হ্যাঁ, ওর বাবার বিশাল ব্যবসা। তিতিরও অনেক কিছুর খোঁজখবর রাখে। বলেছিল OLX-এ post করলে এগুলোর ভাল দাম পাওয়ার চান্স আছে।

বিপাশা - বাহ্। তাই নাকি? (সুখেনকে) তোমার কানে কিছু ঢুকল? মাথায়?

সুখেন - সব কিছু বিক্রি করা যায় না।

বিপাশা - আরে, গুড্ডু তো বলছে ভাল দাম পাওয়া যাবে।

সুখেন - ধরো কেউ তোমাকে গুড্ডুর জন্য অনেক অনেক দাম দিতে রাজি হল; তুমি ওকে বিক্রি করে দেবে?

বিপাশা - তোমার কি মাথাটা পুরোই গেছে? ------ কার সঙ্গে কিসের তুলনা করছ?

সুখেন - গুড্ডু! গুড্ডু তোমার স্বপ্ন, আমারও। আর এই আমার চারপাশে ছড়ানো ছিটানো জিনিসগুলো শুধু আমার অতীত নয়, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। সব টাকা দিয়ে এগুলোর দাম হয় না।

বিপাশা - তুমি এসব হাবিজাবি জিনিস তো টাকা দিয়েই কিনে এনেছ।

সুখেন - কিছু মানুষ টাকার বিনিময়ে এসব জিনিস আমায় দিয়ে দিয়েছে। তারা হয়তো এর দাম বোঝে নি।

তমোঘ্ন - তার মানে। তুমি এগুলো বিক্রি করবে না?

সুখেন - তমোঘ্ন দত্তের বাবা, কিংবা বিপাশা দত্তের স্বামী ছাড়াও আমার একটা পরিচয় আছে। আমাকে সেটুকু নিয়ে থাকতে দাও। আমি তো তোমাদের পৃথিবীতে উঁকিঝুঁকি মারি না। আমার দুনিয়াটা নিয়ে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন?

(সুখেন উঠে কলের গানে একটা পুরনো রেকর্ড চাপিয়ে হাতল ঘোরায় গানটা বেজে ওঠে। বিপাশা ও তমোঘ্ন চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

(সুখেন দুপুরবেলা তার পুরনো কাঠের চেয়ারে বসে বাঁধানো 'প্রবাসী' পত্রিকা পড়ছে। দরজায় মৃদু টোকা। সুখেন একবার দরজার দিকে তাকায় আবার বই-এ মন বসায়। আবার টোকা শোনা যায়। এবার একটু জোরে। সুখেন ওঠে। দরজা খুলে। প্রবেশ করে এক বৃদ্ধ। রোগা, মাঝারি উচ্চতা। পরনে মলিন পাঞ্জাবী ও গোড়ালির ওপর পাজামা। মাথায় জালি টুপি, চোখে সুরমা, কাঁধে বড় নীল রঙের ঝোলা।)

সুখেন - দরজায় bell ছিল তো।

ছলিমুল্লা- ও, চোখে পড়েনি। স্লামালিকুম, ছলিমুল্লা শেখ।

সুখেন - হুম, নমস্কার।

ছলিমুল্লা- বাড়িতে কেউ নেই?

সুখেন - (খানিকটা অন্যমনস্কভাবে) - না । ছেলে বন্ধুর বাড়ীতে আর ও বোধহয় shopping এ। (খানিকটা ধাতস্থ হয়ে) কেন বলুন তো?

ছলিমুল্লা- ডাকাতি, ছিনতাই করতে একটা তাগদ লাগে। উমর ও।

সুখেন - হঠাৎ আপনি এসে দরজার কড়া নাড়লেন।

ছলিমুল্লা- পুরানা কিছু খরিদ করবেন বাবু? পুরানা জিনিস। খরিদ করবেন ?

সুখেন - কী পুরানা চিজ?

ছলিমুল্লা - বহোত জিনিস আছে বাবু। দেখবেন?

সুখেন - (সামান্য যেন উত্তেজিত) অনেকরকম পুরানো জিনিস!

ছলিমুল্লা- হ্যাঁ, অনেককিছু আছে বাবু। সাচ্চা সমজদার ঠিক বুঝে নিবে। বলুন কী দিখাবো?

সুখেন - (এখন বেশ উত্তেজিত)- যা যা আছে দেখান।

ছলিমুল্লা- জরুর। জরুর দিখাবো বাবু। দিখাতেই তো আসা।

(ছলিমুল্লা নিজের ঝুলি খোলে)

ছলিমুল্লা- তামাক টানার পাইপ বাবু। ঠিক এইরকম চিজ আপনি আজ হাজার ঢুঁন্ডলেও পাবেন না।

(সুখেন পাইপটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে)

ছলিমুল্লা- ছড়ি। রূপা দিয়ে বাঁধানো। রাজা-বাদশারা এসব নিয়ে হাঁটত।

সুখেন - আহা।

ছলিমুল্লা- পিকদানি, পিতলের । মোরাদাবাদি কাজ আছে বাবু। এখন আর এসব কাজ কেউ করে না। মানুষের হাতে ওয়াক্ত কোথায়?

সুখেন - আছে, সময় করে খুঁজতে পারলেই সময় পাওয়া যায়।

ক্যায়া বাত, ক্যায়া বাত, কোথায় ?

ছলিমুল্লা- বাবু কি শরাব খান?

সুখেন - কাঁচের গ্লাসে খেতে ভাল লাগে না।

ছলিমুল্লা- (একটা পানপাত্র বের করে)- এতে আগের যুগের আদমিরা শরাব খেত।

(সুখেন পানপাত্রটা নাড়াচাড়া করে গন্ধ শোঁকে)

সুখেন - এইসব জিনিসও এভাবে বিক্রি হয় নাকি?

ছলিমুল্লা- আজকের দুনিয়াতে শৌখিন আদমি অনেক কমে গেছে ঠিক-ই তবু আসে তো, আর আপনাদের মত ইনসানরাই আমার রোজি রুটি।

সুখেন - আপনার নাম তো ছলিমুল্লা বললেন, তাই না?

ছলিমুল্লা - জী জনাব।

সুখেন - বাড়ী কোথায় আপনার?

ছলিমুল্লা - আল্লাপাকের দোয়ায় গোটা দুনিয়াটাই আমার ঘর আছে বাবু।

সুখেন - আর নিজের লোক? আত্মীয়-স্বজন?

ছলিমুল্লা - (মৃদু হেসে) খুদাকা হর এক বান্দা মেরা আপনা আদমি হ্যায় হুজুর।

সুখেন - (একটা স্ফটিকের আতরদানি হাতে তুলে নিয়ে) এটার দাম কত হবে ভাই?

ছলিমুল্লা - (মৃদু হেসে) এর কোন কিমত হয় না হুজুর। এ তো আলাদিনের যাদু চিরাগ।

সুখেন - ঠিকই বলছেন, তবু। একটা দাম তো বলুন, যদি আমার সাধ্যে কুলোয় তাহলে কিনে নেব।

আমি কুছু বলব না সাহিব। কিমৎ ওহি যো আপ সোচে। হম কোই চিজ কা নহি, কিমৎ কা সংদা করতা হ্যায়। ইসকা কোই বুলাবা কিমৎ নহি হোতা।

সুখেন - (একটু ভেবে) মানে কী বলব? আচ্ছা যদি আমি আপনাকে আড়াইশো, না, না, তিনশ টাকা দিই?

ছলিমুল্লা - জী জনাব।

সুখেন - তিনশো টাকার এই স্ফটিকের আতরদানিটা আপনি আমায় দিয়ে দেবেন।

ছলিমুল্লা - হুজুর, ইয়ে চিজ তো আপ হি কে হ্যায়। মেরা কাম যা, স্রিফ ইয়ে আপ তক পৌছানা। আপভি মুনাসিব হ্যায় কে, ইসকা কোই কিমৎ নহি হোতা। ম্যায় ইসকা কিমৎ নহি লে রহা হুঁ, বস, আপনা ইয়ে পাপী পেটকে লিয়ে কুছ পয়সা লে রহা হুঁ।

(সুখেন তিনশ টাকা দেয় ছলিমুল্লাকে, ছলিমুল্লা তাকে আতরদানিটা দেয়, সুখেন আতরদানিটা খোলার চেষ্টা করে।)

ছলিমুল্লা - খোলিয়ে মত বাবু। ইয়ে কিসিকি সামনে কভি মত খোলিয়ে। ইসকো অন্দর যো খোঁয়াব হ্যায় না, ওই সারাকে সারা নিকল যায়েগা। জিন্দেগী মে ভি কভি অকেলা হোনা জরুরী হ্যায় জনাব।

(ছলিমুল্লা টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। সুখেন সপাটে দরজাটা বন্ধ করে ।

চতুর্থ দৃশ্য

সুখেন বিছানা থেকে উঠে হাল্কা আলো জ্বালে, গভীর রাত । সুখেন বার বার দেখে দরজা-জানলাগুলো বন্ধ আছে কী না। বিভিন্ন আওয়াজ করে কারুর সাড়া না পেয়ে নিশ্চিত হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে লুকোনো জায়গা থেকে আতরদানিটা বের করে। সেটার ঢাকনা খোলার সাথে সাথে সারা ঘর যেন উজ্জ্বল আলোয় ভরে ওঠে।

সুখেন - রোজ রাতে আমি এই সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করি। একলা হওয়ার জন্য। এই শূন্য আতরের শিশিটা খুললেই আমার মনে হয় আমার চারপাশ যেন জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে। অসংখ্য নাম না জানা ফুল হয়ে যাচ্ছে আমার প্রতিটি রোমকূপ। নেশা হয়ে যাচ্ছে আমার ছলিমুল্লা। দুটো হাত বাড়িয়ে আমার একলা রাতের এই মুহূর্তটাকে স্পর্শ করার নেশা, আচ্ছা ছলিমুল্লা, যখন এই আতরদানিটা ভর্তি ছিল, তখন এর ঘ্রাণ ঐ পশ্চিম আকাশের মিটমিটে তারাটার কাছেও পৌঁছে যেত? জানো ছলিমুল্লা, এই আতরদানিটা খুললেই না আমার নিজেকে সম্রাট শাহজাহান মনে হয়- মনে হয় আমার দুচোখে স্বপ্ন মাখিয়ে যমুনা বয়ে যাচ্ছে- ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। এমন জিনিস তুমি কোথায় পেলে? আমাকে বলবে? ছলিমুল্লা ও ছলিমুল্লা।

(বাইরে থেকে বিপাশার গলার আওয়াজ পাওয়া যায়)

বিপাশা - রাতবিরেতে কী চিৎকার- চেঁচামেচি শুরু করলে আবার! এই বয়সে নতুন

করে নেশা করা শুরু করলে নাকি! নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও দেবে না দেখছি!
(সুখেন তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে)

(পঞ্চম দৃশ্য)

সুখেন - (ল্যান্ডফোনে) - কী তোমার ফিরতে দেরি হবে? বোনের বাড়ি হয়ে আসবে? তমোঘ্ন বন্ধুর বাড়িতে আছে? ঠিক আছে। আমি খাবার গরম করে খেয়ে নেব। (দরজার মৃদু দুটো টোকা পড়ে, সুখেন দ্রুত দরজা খুলে দেয়। ছলিমুল্লা প্রবেশ করে। কাঁধে সেই নীল ঝোলা।

ছলিমুল্লা - (মৃদু হেসে) - সব খয়রিয়ৎ হ্যায় না বাবু?

সুখেন - এই ক'দিন খালি তোমার কথাই ভাবছিলাম। কিছু মনে করবেন না, তুমি বলে ফেললাম।

ছলিমুল্লা - "আপনি"র চাইতে "তুমি" আপন।

সুখেন - এতদিন কোথায় ছিলে ছলিমুল্লা?

ছলিমুল্লা - আমি তো পুরা দুনিয়াতেই থাকি বাবু। যখন বুঝলাম আপনি আমাকে ইয়াদ করছেন। সিধা চলে এলাম। ইবার কি দিব বলুন।

সুখেন - কী আছে তোমার?

ছলিমুল্লা - আমার তো কুচু নাই জনাব। কুচু না।

সুখেন - তাহলে?

ছলিমুল্লা - যা আছে। সব আল্লা------র

সুখেন - বেশ।

(ছলিমুল্লা নিজের ঝোলা থেকে একটা গড়গড়ি বের করে। তার রূপোর আলঝোলা)

সুখেন - (স্বতস্ফূর্তভাবে) আহা! কিন্তু?

ছলিমুল্লা - লেকিন ক্যায়া?

সুখেন - এর যোগ্য তামাক এই পৃথিবীতে কোথায় পাব?

ছলিমুল্লা - ম্যায় হুঁ না সাহাব।

(একটা মোড়ক থেকে তামাক বের করে দেয়। ধীরে ধীরে গড়গড়াটা সাজাতে থাকে)

সুখেন- এমন একটা গড়গড়ায় তামাক খাওয়ার ইচ্ছে আমার বহুদিনের।

ছলিমুল্লা - মিলা নহি কাঁহি?

সুখেন - নাহ। কলকাতায় যতগুলো নিলামের দোকান আছে সবগুলোতে খোঁজ নিয়েছিলাম। কোথাও অমন জিনিস পাইনি।

ছলিমুল্লা - (গড়গড়াটা সাজাতে সাজাতে) - গওর সে দিখ লিজিয়ে জনাব। (ছলিমুল্লা গড়গড়াটা সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে। দরজা খোলাই থাকে, সুখেন মন দিয়ে গড়গড়াটা টানতে থাকে চোখ বন্ধ করে। সে খেয়ালও করে না কখন বিপাশা এসে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে)

বিপাশা - এটা কি?

সুখেন - কিছু না
বিপাশা - কিছু না মানে?
সুখেন - মানে ঐ সিগারেটের মতই ।
বিপাশা - আমাকে যা হোক বোঝাও। আমার বাপ ছেলে সবাই সিগারেট খায়। এমন অদ্ভুত আদিখ্যেতা করতে কাউকে দেখিনি।
(সুখেন তাড়াতাড়ি গড়গড়াটা পিছনে লুকিয়ে রাখে)
বিপাশা - তোমার ঠিক কী হয়েছে বলো তো?
সুখেন - আমার ! কই কিছু না তো।
বিপাশা - ঠিক করে বলো। আমাকে লুকোনোর চেষ্ট করবে না।
সুখেন - না, না, সত্যিই কিছু হয়নি।
বিপাশা - সব ঠিক আছে, সব? শরীর টরীর?
সুখেন - ঠিকই আছে বোধহয়। অন্তত আমি তো তেমন কিছু টের পাই না।
বিপাশা - তুমি আর কোনকালে কী টের পেয়েছ?
সুখেন - মানে, আমি তো ঐ আমার মতই, কারোর কোনো অসুবিধে ....।
বিপাশা - অফিস যাচ্ছ এখন?
সুখেন - হ্যাঁ। যাচ্ছি তো। যাচ্ছি । রোজই যাচ্ছি।
বিপাশা - সত্যি করে বলো।
সুখেন - তোমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করো।
বিপাশা - তুমি অফিস যাচ্ছ কী যাচ্ছ না। তমোঘ্ন কী করে জানবে।
সুখেন - গত তিনদিন ধরে , আমি অফিস থেকে বেরোবার পরে, ও রোজ আমার পিছু পিছু দেখে এসেছে।
বিপাশা - তুমি মানে ....
সুখেন - তোমরা ভাব আমি কিছুই ---------যাক গে।
বিপাশা - তমোঘ্নকে একটা জুতো কিনে দিও। সব বুঝেই গেছ যখন।
সুখেন - হুম। ওর হাঁটার অভ্যেস নেই। বুঝতে পারি।
বিপাশা - Bus এ, মেট্রোতে গেলেই পারো।
সুখেন - কলকাতার অনেক রাস্তার দু-পাশে কত পুরনো বাড়ি- আমি তুমি কখনও চোখ মেলে দেখছি বিপাশা? তার প্রতিটা ইটের গায়ে ইতিহাসের গল্প। প্রতিটি শ্যাওলায় অতীতের গন্ধ। আমি দেখতে দেখতে ঘ্রাণ নিতে নিতে কখনও অফিসে পৌঁছে যাই। হাঁটার কষ্ট আমাকে ছুঁতেই পারে না, খুব interesting।
বিপাশা - Disgusting.
সুখেন - depends.
(সুখেন কিছু একটা ভেবে গড়গড়াটা সামনে নিয়ে এসে টান দিতে থাকে। বিপাশা কিছু বলে যায়। সুখেনের কাছে সেগুলো অর্থহীন শব্দরাশি মনে হয়)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিপাশা - তোর বাবাকে দেখেছিস?

তমোঘ্ন - নতুন করে আর কি দেখব। বাবা তো বরাবরই একইরকম।

বিপাশা - তুই ভাল করে খেয়াল করিস নি, বদল একটা ঘটেছে এবং সেটা একটু আধটু নয়।

তমোঘ্ন - একটু clear করবে?

বিপাশা - তোর বাবা আমাদের একদম গুরুত্ব দিচ্ছে না। বেশ ক'দিন ধরে লক্ষ্য করেছি।

তমোঘ্ন - তুমি-ই বা কবে বাবাকে পাত্তা দিয়েছ?

বিপাশা - তুই দিয়েছিস?

তমোঘ্ন - তাহলে changeটা কোথায় দেখলে?

বিপাশা - তুই তো দেখছি বুদ্ধিটাও বাপের মতই পেয়েছিস! আমি ঠিক উল্টো কথাটা বলতে চাইছি।

তমোঘ্ন - বলে ফ্যালো।

বিপাশা - আমি আমার dutyতে ফাঁকি দিই নি কখনও । কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই বুঝেছিলাম এই মানুষটার সঙ্গে থাকা যায় না।

তমোঘ্ন - ছেড়ে দিলেই পারতে।

বিপাশা - দুম করে ওরকম ছেড়ে দেওয়া যায় না । লোকটা তো খারাপ নয়। কেবল ওর সঙ্গে আমি মানিয়ে নিতে পারিনি। তাই নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলাম একটু একটু করে।

তমোঘ্ন - তোমার কোনও দোষ নেই মা। বাবার সঙ্গে just মানানো যায় না। বাবার কলিগস্, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কেউ কোনোদিন বাবার সঙ্গে মানাতে পেরেছে? বাবা একজন লিভিং ফসিল। যত আদ্যিকালের ধারণা, মাথার মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। He is completely an odd man out. শুধু আমরা নই। কেউ বাবাকে গুরুত্ব দেয় না। কেউ না।

বিপাশা - তোর বাবা পুরনো জিনিসপত্র নিয়ে থাকত ঠিকই, দিনরাত সেগুলো নাড়াচাড়াও করত -তবু ওর চোখদুটো আগে অন্যরকম ছিল।

তমোঘ্ন - কী রকম?

বিপাশা - কিছু একটা চাইত আমাদের কাছে , মানুষের কাছে, মনে মনে হয়তো চাইত আমরা ওর পাশে বসি, দু'টো কথা বলি।

তমোঘ্ন - কোন্ বিষয়টা নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলা যায় বলো তো?

বিপাশা - খুঁজে পাই নি বলেই তো বলে উঠতে পারি নি এতদিনে।

তমোঘ্ন - তাহলে? আজ? হঠাৎ?

বিপাশা - তোর বাবার চোখদুটো আর আমাদের খুঁজছে না। যেন অন্য কিছুর সন্ধানে রয়েছে।

তমোঘ্ন - তোমার মাথাটাও একদম গেছে মা।

বিপাশা - কোনোদিন বোধহয় বাবার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখিস নি। একবার নজর

করে দেখিস।

তমোঘ্ন - (খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে)- বেশ। বলছ যখন দেখব।

বিপাশা - আমার ভুল হতে পারে। অসীমবাবুরও ভুল হবে?

তমোঘ্ন - কে অসীম?

বিপাশা - সেই যে তোর বাবার কলিগ, একদিন এসেছিলেন।

তমোঘ্ন - তার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হল?

বিপাশা - ফোন করেছিলাম।
(তমোঘ্ন অবাক হয়ে তাকায়)

বিপাশা - আগের দিন নাম্বারটা নিয়ে রেখেছিলাম। ঠিকঠাক অফিস যাচ্ছে কিনা, অফিস করছে কী না, সেসব খোঁজ নেওয়ার জন্য।

তমোঘ্ন - আমাকে বাবার পিছনে পিছনে পাঠিয়েও তোমার শান্তি হয়নি।

বিপাশা - না, মানে তোর পক্ষে তো আর অফিসের ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। অফিসের ভেতরে কী করছে পুরো সময় অফিসে থাকছে কী না সেসব খবর নেওয়ার জন্য।

তমোঘ্ন - কী খবর পেলে?

বিপাশা - তোর বাবা নাকি, অফিসেও ইদানিং কারোর সঙ্গে কথা বলে না। কেউ বললে কখনও কখনও দায়সারাভাবে উত্তর দেয়। নিজের কাজটুকুতে নাকি ফাঁকি দেয় না। কিন্তু তার বাইরে, চারপাশে কে চলাফেরা করছে, কথা বলছে, এমনকী তোর বাবাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করছে কোনো কিছুর দিকে নজর করে না। ক'দিন আগেও মাঝ মাঝে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরির চেষ্টা করত। আর এ কথাটা আমার চেয়ে ভাল করে আর কে-ই বা জানে!
(এই কথার মাঝেই সুখেন ঘরে ঢোকে, তমোঘ্ন বিপাশাকে যেন দেখতেই পায় না, সেভাবে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে।

(সপ্তম দৃশ্য)

সুখেন - ক'দিন ধরেই তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল ছলিমুল্লা।

(ছলিমুল্লা মিটিমিটি হেসে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে। সুখেনও বসে পড়ে তার মুখোমুখি)।

সুখেন - আমি যখন বাড়িতে একা থাকি, তখনই তুমি আসো দেখেছি। কী করে টের পাও বলো তো, বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই?
(ছলিমুল্লা এবার জোরে হেসে ওঠে)।

সুখেন - তোমাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি। তুমি কখনও নিজের সম্পর্কে কিচ্ছু বলো না। কেন ছলিমুল্লা?

ছলিমুল্লা- আমাদের নিজেদের কি কিছু আছে জনাব যে বলব? আমরা সবাই বান্দা আছি খুদা কা বান্দা। সমঝ লিজিয়ে আপন ওহ গিনেচুনে খুসকিস্‌মত বালো মে সে এক হ্যায়, জো খুদাকে বহোত নজদীগ পহুঁচ রহে হ্যায়।

(সুখেন পরমসুখে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকে)

ছলিমুল্লা- ইয়ে আপ ক্যা কর রহে হ্যায় জনাব?

সুখেন - খুশবু, সুগন্ধ। আমায় ঘিরে ফেলছে ছলিমুল্লা, তুমি পাচ্ছনা!

(ছলিমুল্লা মৃদু হাসে)

সুখেন - তোমার দেওয়া সেই আতরের শিশিটি যেন ভর্তি হয়ে উঠেছে। আমি এক অদ্ভূত ভাললাগায় ডুবে যাচ্ছি। জানো ছলিমুল্লা, সেই ছোটবেলায় মা চলে যাওয়ার পরে আর কেউ কোনোদিন আমার সাথে এ নিয়ে কথা বলে নি।

ছলিমুল্লা- আজ আপনাকে এক বহুত কিমতি চিজ দিতে এসেছি হুজুর।

সুখেন - তোমার সব জিনিসই তো কিমতি ছলিমুল্লা। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারি না, এই সব জিনিস তুমি কোত্থেকে পাও? কে দেয় তোমায়? আর এত কম দামেই বা তুমি বিক্রি করো কি করে?

ছলিমুল্লা- সব সওয়ালের জবাব আমি-ও জানি না হুজুর। এটুকু বুঝি, আল্লাহতালা আপনার মত কিছু ফেরেস্তার জন্য আমাকে দিয়ে এসব নজরানা পাঠান।

সুখেন - আমার মত মানুষ আরও আছে ছলিমুল্লা? আমার মত পাগল!

ছলিমুল্লা- কিউ থাকবে না জনাব, জরুর আছে।

সুখেন - তুমি তাদের সবাইকে চেনো?

ছলিমুল্লা- জরুর। অ্যাইসে ফরিস্তোকো ঢুঁন্ড নিকলনা হি তো মেরা কাম হ্যায়।

সুখেন - আজ কি এনেছ। আমায় দেখাও ছলিমুল্লা।

ছলিমুল্লা- এক অনোখা দুনিয়া লায়ে হ্যায় হুজুর। ইয়ে দুনিয়া স্রিফ আপহি কা হোগা। স্রিফ আপকা।

সুখেন - (খুব উত্তেজিত হয়ে)- কী এনেছ? দেখাও, দেখাও।

(ছলিমুল্লা তার ঝোলা থেকে ধীরে সুস্থে একটা অনেক কালের পুরণো বিবর্ণ গ্লোব বের করে সুখেনের মুখের সামনে বোঁ করে ঘুরিয়ে দেয়। সুখেন ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে দেয়।)

ছলিমুল্লা- ক্যায়া হুয়া জনাব?

সুখেন - (চোখ বন্ধ করেই) জঙ্গলের গন্ধ পাচ্ছি। সমুদ্রের নোনা বাতাস, বরফের হিমেল স্পর্শ, বসন্তের উতল হাওয়া-সব সব অনুভব করতে পারছি ছলিমুল্লা। গোটা পৃথিবীর একলা হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছি।

ছলিমুল্লা- গওর সে দেখিয়ে জনাব, ইয়ে দুনিয়া তব কা হ্যায় জব পাকিস্তান নহি থা, বাংলাদেশ ভি নহি, ওহ এক মুলুক থা না জনাব রাশিয়া - ওহ ভি জিন্দা থা।

(সুখেন চোখ বন্ধ করেই হাত বাড়িয়ে গ্লোবটা স্পর্শ করে)

ছলিমুল্লা- কব সে ইয়ে ঘুম রহা হ্যায় জনাব।

ইয়ে দুনিয়া ঘুম রহা হ্যায়, বহোত কুছ বদল গয়া, স্রিফ রহা গয়া হ্যায় - ইনসান। ঘুম রহা হ্যায় তো সব সাহি সলামৎ, থাম গয়ে তো কুছ ভি নহী।

সুখেন - তুমি কে ছলিমুল্লা? তুমি আসলে কে? কেমন করে বলো এমনসব কথা? ভাবোই

বা কী করে?

ছলিমুল্লা- বোলা হ্যায় না হুজুর, হম কুছ নহী। কুছ ভি নহী। এক অনপড় আম আদমি। গুস্তাকি মাফ জনাব।

(সুখেন পাঁচশ টাকা দেয় ছলিমুল্লাকে। ছলিমুল্লা চলে যায়।)

(সুখেন গ্লোবটা ঘোরাতে থাকে।)

(অষ্টম দৃশ্য)

(সুখেন নিজের ঘরে বসে, তার হাতে আতরের শিশি। বিপাশাও তমোঘ্ন প্রবেশ করে।)

বিপাশা - একটা কথা বলব?

সুখেন - হু

বিপাশা - তোমার একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।

সুখেন - কেন?

বিপাশা - আমার মনে হচ্ছে তোমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে।

সুখেন - কি প্রবলেম?

তমোঘ্ন - কিছু মনে কোরো না বাবা, আমাদের মনে হচ্ছে তোমাকে একটা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার।

সুখেন - (হেসে) ধুর পাগল, আমি ঠিক আছি। একদম ঠিক ।

তমোঘ্ন - না বাবা, তুমি ঠিক নেই, আজকের দিনে একটা মানুষ টিভি, ল্যাপটপ, কম্পুটার এমন কি মোবাইল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারেনা। বেঁচে থাকলেও সুস্থ থাকা সম্ভব নয়।

সুখেন - আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। বলছি তো আমি ঠিক আছি।

বিপাশা - একটু শোনো আমাদের কথা। আজকাল মানুষের অনেক রকম মনের অসুখ হচ্ছে।

সুখেন - আমার কোনো অ-সু-খ নেই।

তমোঘ্ন - তোমার ঘরের ঐসব আবর্জনাগুলো তবে কী? দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছ!

সুখেন - আমি যখন অফিসে থাকি তখন ঐসব ঘাঁটাঘাটি করিস বুঝি?

তমোঘ্ন - এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না বাবা। কোথা থেকে পাচ্ছ এইসব?

সুখেন - দিয়ে যাচ্ছে একজন?

তমোঘ্ন - কে লোকটা? কোথায় থাকে?

সুখেন - জানি না।

বিপাশা - তুমি সত্যিই একটা পাগল।

সুখেন - হয়ত। হয়ত নয়।

(সুখেন বহু বহু পুরণো একটি গানের কলি গুনগুন করতে থাকে)

বিপাশা - অসহ্য।

(বিপাশা ও তমোঘ্ন বেরিয়ে যায়। সুখেনের গানের গলা ধীরে ধীরে চড়তে থাকে।)

(নবম দৃশ্য)

ছলিমুল্লা- পুরানা দুনিয়া ক্যায়সা লাগা জনাব?

সুখেন - পুরনো কেন বলছ? আমার কাছে তো এটা নতুন।

ছলিমুল্লা- হা হা হা। বিলকুল, বিলকুল সহি কহা আপনে। এক বাত পুঁছু?

সুখেন - হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ছলিমুল্লা- আভি আপ খুশ হ্যায় তো?

সুখেন - তুমি আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছ ছলিমুল্লা। আমি জানি না তুমি আসলে কে? অনেকবার জানতে চেয়েছি তোমার কাছে। এখন আর জানতে চাই না। বুঝতে পেরেছি। তুমি বলবে না।
কিন্তু একটা কথা, তুমি আমাকে বাঁচতে শিখিয়ে দিয়েছ।

ছলিমুল্লা- অ্যায়সে মৎ বলিয়ে হুজুর। ম্যয় কুছ ভি নহী হুঁ। সব ওহ উপরওয়ালা - কি মর্জি। লেকিন আপ আমাকে ইজাজৎ দিতে হবে জনাব। আজ আমি আপনার জন্য আখরি নজরানা নিয়ে এসেছি।

সুখেন - মানে! আজকের পর তুমি আর আসবে না! না, না ছলিমুল্লা, এমন কোরো না, তুমি না এলে আমি আবার একা হয়ে যাব। একদম একা। জীবনে প্রথমবার আমি একজন বন্ধু পেয়েছিলাম। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি যে মরে যাব ছলিমুল্লা। এতদিনে একটু একটু করে বুঝছিলাম বেঁচে থাকা কাকে বলে। এমন করতে পারো না তুমি ।

ছলিমুল্লা- আমরা কেউ কোনোদিন কারুর কাছে ছিলাম না হুজুর। আর আজ আপনাকে আমি যা চিজ দিয়ে যাব, তারপর আমাকে আপনার জরুরত ভি পড়বে না।

সুখেন - কী এমন জিনিস ছলিমুল্লা?
(ছলিমুল্লা তার ঝোলা থেকে একটা কাঠের ল্যাম্প বের করে। চকচকে পালিশ জাফরি কাটা।)

সুখেন - বাহ্ অপূর্ব।

ছলিমুল্লা- আজ রাতে এটা জ্বালাবেন হুজুর। জরুর জ্বালাবেন। ।

সুখেন - নিশ্চয়ই । নিশ্চয়ই জ্বালব। কী হবে তারপর?

ছলিমুল্লা- কুদরতি।

সুখেন - তোমার কথা আমি সব সময় বুঝে উঠতে পারি না ছলিমুল্লা।

ছলিমুল্লা- আমিও সব সময় বুঝে উঠতে পারি না জনাব। কোত্থেকে আমার জুবানে এইসব লব্জ এসে যায়। আজ আমি কোনো কীমৎ নেব না হুজুর। আজ মেরা ইয়ে ঝুলা ভি বিলকুল খালি হো গয়া। ইয়ে ভি আপ হি রাখ লিজিয়ে।
(ছলিমুল্লা নিজের সেই ঝোলাটা সুখেনের দিকে বাড়িয়ে দেয়)

সুখেন - আজ শেষ দিনেও তুমি বলবে না, তুমি কে?

ছলিমুল্লা- আপনার সোচ কি বলে?

সুখেন - আমার মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি একটা স্বপ্ন। আসলে নেই। সত্যি নও।

ছলিমুল্লা- খোয়াব। হা হা হা। আল্লাহ কসম হুজুর আমি নিজেও জানি না আমি কে?
(একটু থেমে) আমার কাম শেষ। আব মেরা সব কুছ আপ কে হাওয়ালে।

সুখেন - এবার আমি কী করব তুমি বলে দাও ছলিমুল্লা।

ছলিমুল্লা- (নরম হেসে) সে আপনি নিজেই বুঝে যাবেন হুজুর।
(ছলিমুল্লা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় । সুখেন সেদিকে তাকিয়ে থাকে)

(দশম দৃশ্য)

আশেপাশের বাড়ির আলোগুলো এক এক করে নিভে গেল।

সুখেন - (মৃদু গলায়) - সবাই শুয়ে পড়েছে, বাড়িতে, আশেপাশে, মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীটাকে কেউ আলতো ঘুমে জড়িয়ে রেখেছে।

সুখেন - আজকের অন্ধকারটাও যেন অন্যরকম। চাপা। একা, যেন দমবন্ধ কারা। চাঁদ নেই। তারারা বোধ হয় ছুটি নিয়েছে। (সুখেন নিজের আলোটা নিভিয়ে অন্ধকার করে দেয়। সবগুলো জিনিস খোলে। আশ্চর্য, ঘরের মেঝে, দেওয়াল সর্বত্র যেন একটা নীল মায়াময় আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ল্যাম্পের খাঁচাটা ঘুরছে। ঘরময় ছড়িয়ে পড়া আলোর গোলকগুলোও যেন ঘুরতে থাকে। অদ্ভুত এক মায়াময় পরিবেশ)

সুখেন - (আবিষ্ট কণ্ঠে) - কী দেখছি আমি! আমার ঘরে আকাশ নেমে এসেছে। (আলোর গোলক গুলো দেখিয়ে। চিনতে পারছি ওদের। দেখা, না দেখা গ্রহ , নক্ষত্র। ঐ তো ছায়াপথ।

(আলোগুলো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে । সুখেন দাঁড়িয়েই)

(একাদশ দৃশ্য)

বিপাশা - (জানলায় দাঁড়িয়ে)- তমু, দ্যাখ দ্যাখ ঐ লোকটা তোর বাবা না?

তমোঘ্ন - ঐ যে নীল ঝোলা পিঠে হেঁটে যাচ্ছে?

বিপাশা - হ্যাঁ।

তমোঘ্ন - কোথায় যাচ্ছে ? এই সাত সকালে?

বিপাশা - জানি না।

তমোঘ্ন - ডেকে আনি?

বিপাশা - লাভ হবে না । দ্যাখ কী রকম শান্তভাবে হেঁটে যাচ্ছে জীবনে প্রথমবার মাথা উঁচু করে হাঁটছে। ওকে যেতে দে।

লেখক : মৈনাক সেনগুপ্ত, জনপ্রিয় নাট্যকার, পশ্চিমবঙ্গ।

কালকের লুকুল্লুস

(ব্রেখ্‌টের রেডিও নাটকের ছায়া অনুসরণে)

অনুপ কুমার রায়

[নামটায় খট্‌কা লাগছে? কালকের কথা আজ কে বলতে পারে? আজন্মকাল শুনে আসছি অভিসম্পাতের কথা। দলিত, লাঞ্ছিত হতে হতে নিরুপায় মানুষ অভিসম্পাত দিয়ে থাকে, তেমন যদি এটাও সত্যি হয়ে যায় .....] ঝড় বাজের শব্দ

ঘোষক ১ : (মঞ্চের সামনে ডানপ্রান্তে) ঐ শুনুন উচ্ছাস, উল্লাস... লাকাল্লেস- লাকাল্লেস লাকাল্লেস নেপথ্যে)।

(মানুষেরা) কী বলিস, কী বলিস - এই ছিলি এই নেই হয়ে গেলি আব্বুলিস্—

ঘোষক ১: কাল যারা গরাদের ফাঁকে চিবুক রেখে ভোরের আকাশের দিকে তাকাতো সূর্যটা উঠবে কখন, কাল যারা দুপুর পেরিয়ে গেলেও এক থালা গরম ভাতের আশায় হা পিত্যেশ করে বসে থাকতো- তারাই আজ জ্যামুক্ত তীরের মতো বেরিয়ে এসেছে মন্দির মসজিদ, গীর্জা থেকে খোলা রাস্তায়, গাইছে একটাই গান, (মানুষেরা নেপথ্যে) চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায় .....

ঘোষক ১: আকাশের গ্রামোফোনে বাজছে গান আর নিপীড়কদের সৌধ টলায়মান। মানুষ নিচ্ছে সত্যিকারের শ্বাস- আর ছড়িয়ে দিচ্ছে পরিহাস-

নেপথ্যে- হা হা হা - হো হো হো -সবই ছিল এতদিন মুখোশ আজ দেখি লাকাল্লেস হয়ে গেছে জনতার পাপোশ-

ঘোষক ২ : (মঞ্চের সামনে বাঁ প্রান্তে) - বড়ই দুঃসংবাদ- অসম্ভব- তবু সত্যি— শত্রুকূলের ত্রাস, আমাদের,আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, জনতার ত্রাতা- সবকা বিকাশের উদ্গাতা, বিশ্ব জননেতা, মহান লুকুল্লুস প্রয়াত (কান্না। এটা আরো অনেকজনের কান্নার সঙ্গে মিশে যায়।) ঐ যে কাতারে কাতারে মানুষ নেমে এসেছে ময়দানে, প্রিয়জনকে শোক জ্ঞাপনে আপনারাও আসুন আমার সঙ্গে এ শোকজ্ঞাপনে আপনারাও আসুন আমার সঙ্গে এ শোকতরঙ্গে-
(ক্ষণবিরতি) দেখুন দেখুন কান্নার সুনামী বইছে এখানে, তনু বুকে পাথর রেখেও বলে যেতে হবে আমাকে - শববাহকেরা প্রস্তুত। ঐ - ঐ বলিষ্ঠ কাঁধে চলেছেন যিনি আমাদের নয়নমণি-

নেপথ্যে- শববাহকের গান।। শক্ত করে ধরো ওঁকে - তুলে ধরো, তুলে ধরো, শিরোপরে আমাদেরই (সার্চিং টিউন) প্রাণ পুরুষ - লুকুল্লুস, লুকুল্লুস (কফিনসহ UR দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যায় UL দিয়ে—)

ঘোষক ১ : ক্রীতদাস আর স্তাবকের দল গাইছে শোকগাথা, অন্যদিকে না মানুষের ঢল বলছে অন্যকথা—

নেপথ্যে : লম্বা চওড়া মিথ্যেগুলো সত্যি কথার মোড়কে দাওয়াই বলে খাইয়ে দিতে।
(মানুষেরা) বিষভর্তি আড়কে (১) হাসি। বিপক্ষ নেই, নিজের মধ্যেই গোলটা দিত সহজে। মরল । কিসের কামড়ানিতে ছাড়পোকা ডাঁশ মশাতেও? (হাসি ২)

ঘোষক ১ : হাঁড়িচাচা লুকুল্লুসের কবরই হলো স্থান আসছে ওরা এদিকেতেই গাইছে শোকের গান।

শববাহকেরা : এতদিন যিনি করেছেন শাসন, করেছিলেন নিজ আসন।
আজ তিনি নেই ভাবতে পারে কি জনসাধারণ।
হয়ে গেছে ভুল বিলকুল তিনি ছিলেন হৃদয়ের ফুল
টিটকিরি দেয়, হেসে কুটপাট যত বেইমান কূল—
জীবনে মরণে রয়ে যাবে নাম লুকুল্লুস লুকুল্লুস—

[মঞ্চের বাঁদিক দিয়ে শববাহকেরা প্রবেশ করে মাঝ মঞ্চে, কফিন রাখে। একটা ফেস্টুন খোলে, তাতে লেখা " চিরনিদ্রায় শায়িত মহান লুকুল্লুস" । ফেস্টুনটা টান টান করে ধরে থাকে তারা, কফিনটা আর দেখা যায় না (সার্চিং টিউন চলবে) অন্ধকার হয়ে বাঁদিকে সামনে ঘোষক ২কে দেখা যায়।]

ঘোষক ২ : এবার শুরু হোক প্রার্থনা। আমাদের কামনা, তিনি যে স্বর্গপথে যাত্রা করেছেন সেই পথ হোক কুসুম-কোমল
(মাঝ মঞ্চে আর কফিন নেই। একা লুকুল্লুস-)

লুকুল্লুস : থামো! কুসুম- কোমল! আমি বলে দাঁড়িয়ে আছি কাঁকুড়ে মাটিতে একা! বাতেলা দিয়েই যাচ্ছে, যেমন দিত বেঁচে থাকার দিনগুলোতে! ওহে বোকা পাঁঠা, এখন কেটে পড়তো দেখি না হলে তলোয়ারের এক কোপে -একি তলোয়ার কোথায় আমার? সেই হীরে মণিমুক্ত খচিত পোশাকটাই বা কই যা দেখে তামাম লোকের মাথা ঘুরে যেত? আহা-হা, হো হো — বেশি বাতেলাবাজি করলে না তোর স্যাটা ভেঙে দেব!

ঘোষক-২ : (ঘাবড়ে যায়) । আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি কিছু মনে করবেন না। এতদিন যে চাপ সহ্য করে এসেছেন আমাদের নয়নমণি, তার রিএকশনে হতেই পারে এমনি। যাক আবার ফিরে যাই আমাদের শোক বার্তায়—

লুকু : খবরদার! একটা কথাও শুনি না যেন আর। যা দূর হ এখান থেকে! আমাকে রুখু-শুকু ফাঁকা মাঠে টেনে এনে কান্নার গাওনা হচ্ছে। যা ভাগ!
(বিরসবদনে ঘোষকের প্রস্থান)
কিন্তু কী বলব? এতদিন সৈন্যশান্ত্রী ঘেরা, হাততালি আর জযধ্বনির মধ্যে হেঁটে এসেছি- সকলের করতালির মধ্য দিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে উঠেছি-এখন কার উদ্দেশ্যে কি বিষয়ে বলব আমি? হে ঈশ্বর, দেখেও দেখো না তুমি? এটা কি অবিচার নয়, কোথাও কেউ নেই, পরিত্যক্ত শ্মশানভূমি। নিশ্চয় ভুল হয়ে গেছে কোথাও, আমার তো এখানে আসার কথা নয়, কোথায় এনেছ আমায় ? দেশসেবার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে আমাকে ঠাঁই দাও অন্য কোথাও!

পূণ্যকণ্ঠ : স্তব্ধ হও লুকুল্লুস! জ্বালিয়ে দেওয়া কোনও মানুষের লাশের মতো, বাড়ি ফেরার আশায় দীর্ঘ পথশ্রমে নিহত কোনও পিতার মতো তুমিও উপস্থিত এখন তেমনই কাতারে। তুমি সৎ না অসৎ, সাধু না শয়তান— সেই বিচার হবে আজ। কোনখানে যাবে তুমি স্বর্গ না নরকে,এইখানে হবে সে প্রমাণ। তুমি ভালো ছিলে না মন্দ, সাক্ষীরা দেবে সে বয়ান। অবশ্যই থাকবে তোমার জমানায় নির্যাতিতরাই, আর অন্যদিকে থাকবে তোমার 'হ্যাঁ'তে 'হ্যাঁ', 'না'তে 'না' মেলানো তোমার ভক্তেরাও। তারপর বিচার শেষে রায় পাবে তুমি, যাবে কোন পাড়ে- এপার না ওপার— (এতক্ষণ লুকুল্লুস মঞ্চে একাই ছিল। অন্ধকারে মঞ্চ বদল হয়েছে। বিচারক, শিক্ষক ও বৃদ্ধা বসে আছে মঞ্চের সামনের অংশে বাঁদিকে। ডানদিকে কাঠগড়া। একেবারে পেছন দিকে পর্দা ঘেরা অংশে সাক্ষীরা।)

শিক্ষক : এবার তো বাছা তোমার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এতদিন অন্যদের পাঠিয়েছ ওখানে এখন দেখতে পাবে কেমন লাগে সেখানে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাক্যবাণ ছুটে যাবে যখন ঢালহীন নিধিরাম কী করবে তখন (হাস্যরোল)।

লুকু : কাঠগড়ায়?

বিচারক : এখানে যে এটাই নিয়ম।

শিক্ষক : কখনও দাঁড়াতে হয়নি তোমাকে, শুধু ঠেলে দিয়েছিলে নিরপরাধ মানুষকে।

বিচারক : যাও, যাও, বিলম্বিত করোনা সময়। (লুকুল্লুস কাঠগড়ায় দাঁড়ায়)
এবার বলো তো মা, কী তোমার জিজ্ঞাসা?

বৃদ্ধা : দেখতো লাকাল্লেস, চিনতে পারোকি আমায়?

লুকু : লাকাল্লেস! ঠাট্টা করে অনেকেই ছোটবেলায় ডাকতো আমায়? আমাকে উত্যক্ত করতো অসভ্যতায়। না। কী অসভ্যতা করেছি মনে পড়ে না ।

বৃদ্ধা : আমায় কি বিশেষভাবে মনে পড়ে তোমার? এই যে আমার মুখের পোড়া দাগগুলো?

লুকু : আজগুবি কথায় শুধু কালক্ষেপ হবে।

বৃদ্ধা : আজগুবি ? নয় এ সত্য, নয় কি বাস্তব? অন্য ধর্মের উপাসনা করলেও মহল্লায় আমার দোকানটাই ছিল জনপ্রিয়। সঠিক দামে মানুষ সব জিনিস পেত। তুমি ছিলে দু-নম্বরী ঠ্যাটা। লোকে করত ছ্যা, নাম দিয়েছিল তোমার লাকাল্লাস। একরাত্রে জ্বালিয়ে দিলে আমার দোকান- জিনিসপত্র বাঁচাতে আধপোড়া হলাম। তারপর তুমি পালাতে পালাতে ছলে বলে কৌশলে হয়ে গেলে শাসনযন্ত্রের দালাল।

লুকু : থামো! এসব হচ্ছেটা কী ? আমাকে একা পেয়ে চালাকি! ভুলে গেলে আমার অবদান- রাজপথ, প্রাসাদ, উদ্যান, আর আনন্দের উপঢৌকন- বিনোদন?

বিচারক : বড়লোকদের জন্য সেসব ছিল অফুরান আর স্তাবকের গান? শুনবে সে গান? সরাও দেখি চালচিত্র- (চালচিত্রের পর্দা সরে। সেখানে গায়ক, বালকও খানসামা বিদ্যমান।

লুকু : এইতো ! এইতো সব আমার আপনজন। এতক্ষণে ধড়ে এল প্রাণ। কিন্তু এ ধড়, এ প্রাণ নিয়ে কী হবে আমার! ওরা কি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবে এই অসহ নিগড় থেকে! ফিরে যাব কি আবার নিজ প্রাসাদের ভিতরে? অফুরন্ত বাঁচার রসদ যেখানে থরে থরে!

বিচারক : বিচার হোক আগে। তারপর রায় শেষে জেনে যাবে স্থান কোথায় তোমার। এখন ওদের থেকে বেছে নাও কে গুণগান গাইবে তোমার।

লুকু : এসোতো গায়কভাই। শত্রুদের মুখে তুলে দাও ছাই।

গায়ক : ভাই!

লুকু : হ্যাঁ ভাই। আমায় নিয়ে তোমার লেখা গান ভরে তুলতো মানুষের মনপ্রাণ। কণ্ঠ ছেড়ে শোনাও তোমার গান। এ মরু হয়ে উঠুক ফুলের বাগান।

গায়ক : বেশ তবে শোনাই। (ছড়ায় ও সুরে) কারও কিছু চাইগো চাই। কল্পতরু আমি যে ভাই। চাকরি বাকরি দুহাতে কামাই। করতে পারো হাত সাফাই। বিদেশী মাল দেদার ভাই। দেশের জিনিস বন্ধ তাই। গরিবগুর্বো হবে উধাও। যত পার গুছিয়ে নাও। - আর কিছু চাই আর কিছু নাই- দু হাত ফাঁকা আর কিছু নাই, আর কিছু নাই। কারও কিছু —

লুকু : চোপ! একদম চোপ! এটা আমার গান না পয়মালদের শেখানো বয়ান?

গায়ক : আর কী বলি জঘন্য মহামান্য। জনতার জন্য শেখানো এ গানে কেবল গালি আর থুতু জুটেছে ভাগ্যে, হয়নিকো জীবনরক্ষে (সকলের হাসি)

লুকু : এসবই অনৈতিক। আমার অন্নে , আমার দাক্ষিণ্যে লালিত মানুষের মাথাকে তোমাদের শক্তির চাপে বশ করিয়ে রাখার নাম বিচার নয়।

লেখক : আমায় দেখেও কি তাই মনে হয়? একদিকে মানুষের ওপর নির্যাতন কিন্তু সেসব সরিয়ে করতাম তোমার গুণকীর্তন। একদিকে ক্ষুব্ধ তৃষ্ণার হাহাকার তবু আমার ছিল না বিকার। আমার স্ত্রী পুত্র সংসার সব গেল, শুধু থাকল তোমার দেওয়া সম্পদের পাহাড় আর অফুরন্ত রোজগার। কিন্তু একদিন তেতো হয়ে উঠল সব— এই আমারই কলম থেকে কী করে বেরিয়ে গেল তীক্ষ্ম শব্দের শর- যেহেতু আমি শান্তি চাই, যুদ্ধ নয়, যেহেতু আমি চোখে দেখতে চাই না ক্ষুৎকাতর সব শিশু অথবা শুকনো শিঁটিয়ে যাওয়া মেয়ে কিংবা চুপ করিয়ে দেওয়া জিভওলা মানুষ আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে লড়াই-

বালক : কীসব বলছ তুমি- আমাদের লুকুদাদা খুব ভালোমানুষ। ওনার কোলে চড়ে নেচেছি ফেলে দেন নি কখনও আমায়।

বিচারক : শোনো বালক, লোক দেখানোর জন্য অনেককিছুই করতে হয়। লোক ঠকাতে অনেক জ্ঞানের কথা আউড়াতে হয়। তারপর নিজের প্রয়োজনের সময় নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে বিরোধীদের তালগোল পাকিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

বালক : আমার বেলা হয়নি তা একেবারে। ওর প্রাসাদের পাঁচতলায় খেলছিলাম এক বিকেলে হঠাৎ কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে দিল ফেলে- তারপর এসেছি এই জনহীন প্রান্তরে।

শিক্ষক : তুমি ভুলে গিয়েছিলে ওখানে ছিল তোমার অনধিকার প্রবেশ। ওদের খেয়ালে খেয়ালে কখন কোথায় কোতল হয় তার হিসেব কেউ জানে না।

বালক : তাই বলে শিশুদেরও মরতে হবে এমনভাবে?

লুকু : না না। শুনো না ওদের কথা। বহুদিন ধরেই ওদের শত্রুতা সর্বজনবিদিত। ওরা ধৈর্য্য ধরে কথা শুনতে চায় না। চিল, চিৎকারেই ব্যস্ত ইট, পাটকেলেই অভ্যস্ত।

শিক্ষক : তাই শিক্ষায়তন থেকে অর্ধেক শিক্ষকদের বরখাস্ত, অর্ধেক ছাত্রদের পুলিশে দেওয়া আর তাড়িয়ে দেওয়া?

লেখক : আর যেসব সম্পাদকদের নিষ্কলুস পুলিশ রেকর্ড আছে, আছে রাষ্ট্রনায়কদের তেল দিয়ে চলা, তাদের সর্বত্র বসানো হয়েছে তোমাদের এক সংশোধকদের কাজে। যাতে সহি গলার মতো একটাও বিরোধী শব্দ মানুষের কাছে না পৌঁছতে পারে।

বিচারক : চুপ কেন? ইতিমধ্যে এক গণ্ডা গোল হজম করে ঘোল খেয়ে বসে আছো তো?

লুকু : খাওয়া, ও হো হো, খাওয়ার কথা তুললে কিন্তু খেলাম তো হাওয়া। আহাহা, এই সময়ের মধ্যে আমার তিনপ্রস্থ খাবার কথা।

বালক : আমাদের যে একবেলাও জুটত না কাকা।

লুকু : খাওয়াব ভাইপো, পেট ফাটিয়ে খেতে দেব, একবার এদের হাত থেকে নিস্তার পাই। ওফ্ খিদে!

খানসামা : আমি আসছি— আমি আসছি— (চালচিত্র থেকে নেমে আসে) এই তোমরা সর তো (চালচিত্রের অন্যরা সরে যায়) খেতে দেয়নি আপনাকে চালাকি! এঁরা মানুষ তো না কি? এই সময়ের মধ্যে ওর তিন তিনবার খেয়ে বিশ্রামের কথা!

বিচারক : একবার জোটানোই ছিল আমাদের বিলাসিতা।

লুকু : তোমরা কি আর দেশ চালাতে? ছিলে তো সব হাড়হাভাতে। বুদ্ধি যত খরচা হতো খাওয়াদাওয়াতে, ঘাটতি মিটতো—

বিচারক : শোনাও তো খানসামা - শুনে দেখি আমাদের সঙ্গে মেলে কিনা - পেটুক নামে বিখ্যাত ছিল লুকুল্লুস, শুনে আমাদের জিভে জল আসুক-

খানসামা : তবে আমি করজোড়ে নিবেদন
মহামান্য লুকুল্লুসের খাদ্য বিবরণ।
সকালে উঠেই, খেতেন যা উনি
বাদামের সরবত, ক্ষীর, দধি, ননী।
খানিক ভ্রমণ শেষে তাড়াতাড়ি এসে

কোথায় খাবার, দাও প্রাতরাশে বসে।।
তিরিশটা বাটার নান আর মিটবল
ঝুড়ি ভরা থাকত শতেকটা ফল।। —

লুকু : ও খিদে! কী খিদে! যা পারিস এনে দেবে !

সবাই : ওসব এখানে আসে না যে! (সকলের হাসি)

ঠকু : চোপ! খাবার চাই আমার, এ কী অত্যাচার!

বৃদ্ধা : জানো। তোমার কারাগারে ৭দিন নির্জলা ছিলাম এক্কেবারে।

শিক্ষক : শিক্ষকতা খুইয়ে অনাহারে মৃত্যু এসেছে ধীরে ধীরে।

খানসামা: আর দুপুরে ছিল সে মহা আয়োজন। আস্ত পাঁঠার ঠ্যাং স্যালাড কতরকম—

বিচারক : আচ্ছা খানসামা, এত যে রান্না করতে, পরিবেশন করতে, তোমার ইচ্ছে হতো না একদিন অমন খেতে?

খানসামা: হয়েছিল বৈ কি। একদিন কাছে পিঠে কেউ নেই দেখে এক টুকরো গোস্ত চেখে দেখেছিলাম-ব্যস ।

বৃদ্ধা : তারপর?

খানসামা: কেউ দেখে ফেলেছিল বোধহয়। জুটল একশো ঘা চাবুক আর ১০ দিন অনাহার।

শিক্ষক : তাহলেই বোঝো ঐ লোভী , পেটুক, শয়তানটার খিদমত খেটে, কী জুটেছে তোমার কপালে।

বিচারক : তোমাদের খাদ্যে কি বরাদ্দ ছিল?

খানসামা: বাসি রুটি আর ঝোল, কোনওদিন বেঁচে খাওয়া এক- আধ টুকরো মাংস।

লুকু : বল্ তাতেই ছিলি সন্তুষ্ট, আর ওরা চায় অর্ধেক অংশ - তাই তো?

বিচারক : না। আমরা চাই শ্রমের বিনিময়ে যা জোটে তার ষোল আনা—তোমার মতো ছিনিয়ে আনায় আমাদের ঘৃণা। বল তোমরা নিজের টুকুতেই ছিলে কিনা পূর্ণ তবু ঐ লোকটা তোমাদের সুখের খাদ্যকেই করেছিল নিজের অংশ।

অন্যরা : অভুক্ত থাকাই ছিল আমাদের ভাগ্য।

বালক : এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না লুকু কাকু, জবাব দাও না।

লুকু : আমি অস্ত্রহীন, নেই সৈন্যদল না হলে দেখিয়ে দিতাম ব্যঙ্গ করার সাজার কী ফল।

লেখক : তুমি হীন, কাপুরুষ, নেইকো তোমার মনোবল।

খানসামা: যাদের যে কাজের জন্য নিয়মবাঁধা তার থেকে বেচাল হলে তো শাস্তি পেতেই হবে।

শিক্ষক : নিয়মটাই শক্তপোক্ত, খাটনি উদয়াস্ত আর খাদ্যটা হবে উদ্বৃত্ত - তাই তো?

খানসামা: তবে কি আমাকেও মহামান্যের বিরুদ্ধে যেতে হবে?

অন্যরা : হ্যাঁ। তোমার শ্রমের উপযুক্ত সম্মান পেতে তোমাকেও আমাদের পথেই আসতে হবে।

বালক : আমি বাপু পারব না- ধূলো , কাদার রাস্তার চেয়ে কাকুর প্রাসাদের বাগান ভালো।

বিচারক : সে সব যে তোমার বাপ পিতামহর হাড়বাস কালি দিয়ে তৈরী করা তা কী জানো?

লুকু : আমার বিরুদ্ধে একটা বাচ্চাকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

লেখক : আজ ও নাবালক কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি বুঝতে শিখবে সেদিন রাজপ্রাসাদগুলো ধ্বসে পড়বে।

লুকু : আমাদের কিন্তু শক্তি কমবে না যেন। তোমাদের বিশৃঙ্খলা স্তব্ধ করতে নিত্যনূতন অস্ত্র তৈরী হবে— চিৎকৃত সব হাঁগুলো বন্ধ করতে নতুন নতুন গ্যাস আমদানি হবে আর তোমরা কীট পতঙ্গের মতো মরবে। তাই বলছি, সসম্মানে আমাকে স্বর্গের পথে এগিয়ে দাও তাতেই যদি হয় তোমাদের মুক্তি।

বালক : আরে কাকু, দাদাগিরি করছ কেন, তোমাকে জল্লাদ মনে হচ্ছে যেন—

লুকু : এই হারামজাদার পা ঝারা, তুই যে ওদের রক্তে গড়া, যেই অমনি সুযোগ পেলি, ওদের দলে ভিড়ে গেলি—

বিচারক : তোমাদের নিগ্রহে বিগ্রহ কেন কীট-পতঙ্গও সঙ্গ দেবে না।

বালক : অমাকে নেবে তোমাদের দলে?

বৃদ্ধা : চলে এসো ছেলে।

গায়ক : তাক্‌কুরাকুর তাক্- লুকুল্লুসের পর্দা ফাঁক। তাক্‌কুরাকুর তাক্— রাখবে কোথায় এবার জাঁক। ঢ্যাংকুরাকুর ঢ্যাং - গাইবে না কেউ তোমার গান। কর্মদোষে লুকুল্লুস হলো যে খান খান।

বিচারক : উচ্ছিষ্ট দিয়ে যাদের টেনেছিলে তারা সব আজ বৈরী।
লুকুল্লুস তুমি কি বিচারের জন্য তৈরী?

লুকুল্লুস : আমার বিচারের অধিকার দুপায়ে মাড়িয়েছিলাম, জানো তাই তোমাদের ক্ষমতাই নেই কোনও।

শিক্ষক : সেসব দিনের কথা ভুলে যাও দুর্বিনীত, এখন তুমি মৃতদের দরবারে নত।

লুকুল্লুস : একটা অস্ত্র থাকলে এখনই প্রমাণ করে দেখাতাম তোমার ঔদ্ধত্য।

লেখক : তোমার যতই অস্ত্র থাকুক, থাকলে আমার ক্ষুধা ভূমিকম্পের মতো পড়বে ভেঙে সবরকমের বাধা-

বৃদ্ধা : আচ্ছা, শুধুই কি কাব্য করে যাবে অপরাধীটা, শাস্তি কখন পাবে?

অন্যরা : শাস্তি শাস্তি শাস্তি -এছাড়া নেই স্বস্তি।

বিচারক : বেশ তবে তোমাদের কথাই মান্যতা পাক।

লুকুল্লুস : না তোমরা আমায় শাস্তি দিতে পার না।
জীবিত মানুষ এ অন্যায় মেনে নেবে না।

সকলে : আমরা ছায়া রাজ্যের বাসিন্দা অন্যের কথা জানি না।

বৃদ্ধা : আমি অভুক্ত থেকে থেকে মৃত।

লেখক : আমি আত্মগ্লানিতে ভুগে আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছি।

গায়ক : আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর গান— ফক্কার গান, তাই চলে গেছে আমার প্রাণ।

খানসামা: ওকে শ্রদ্ধা করতাম বিশ্বাস নিয়ে- এখন বুঝছি সব- সব মিথ্যে।

শিক্ষক : আমি সবাইকে শেখাতাম স্বাধীনতার রোদ মেখে বুক চিতিয়ে প্রতিবাদ করতে, শিখিয়েছিলাম শত্রুকে ঘৃণা করতে, প্রয়োজনে নিজের জীবনকেও শত্রুর সামনে বাজি রাখতে। আমি সেসব পেরেছিলাম তাই এই রাজ্যে এসেও আমি মনুষ্যজন্মের মতোই খুশি। - তাই আমি চাই ওর এমন শাস্তি যাতে আমাদের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের কোনও যোগ না থাকে। তাই ছায়ার রাজ্য থেকেও দূর করে দাও ওকে।

অন্যরা : দূর করে দাও- দূরে করে দাও ওকে ছায়ার রাজ্য থেকে।

বিচারক : শুনতে পেলে, সসাগরা ধরণীর স্বপ্নে বিভোর লুকুল্লুস, কোথায় স্থান হবে তোমার?

লুকুল্লুস : না কখনোই না, আমি স্বনামধন্য লুকুল্লুস, মানি না কো নীচুতলার ফরমান—
[কাঠগড়া থেকে নেমে পালিয়ে যেতে চায়—]

বিচারক : ধূ-ধূ এই পরিবেশ থেকে পালাবে কোথায়? তোমার স্থান হবে স্বাপদসঙ্কুল কোনও গুহায়। যাও, ওকে নিয়ে যাও অন্ধকার জগতের কোনও স্থানের উদ্দেশে, যেখানে সাতজন্ম কাটাবে নোংরা পরিবেশে।
[নিপীড়িতরা এক যোগে লুকুল্লুসের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে—]

সকলে : দূর হও- দূর হও, আমাদের ছায়ারাজ্য থেকে আবিশ্ব কোথাও তোমার সুনাম না থাকে, দূর হও- দূর হও আমাদের থেকে-
[প্রতিরোধের সামনে পেছতে থাকে লুকুল্লুস - পর্দা পড়তে থাকে]

(বেতার নাটককে মঞ্চরূপে দেওয়া দূরহ কাজ। সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দেশকের সৃজনশীলতায় এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যেতে পারে।)

লেখক : অনুপ কুমার রায়, নাট্যকার ও পরিচালক, 'কৃষ্টি', কাঁচরাপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

স্বাতী মিত্রের গল্প অনুসরনে

6:1
(সিক্স : ওয়ান)

সংগীতা চৌধুরী

চরিত্র

অনুরাধা, বিশ্বজিৎ, গণেশ, বব, কমলিকা, দাঁড়িয়ানা, প্রসন্ন, সেক্রেটারি-১
সেক্রেটারি-২, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো-ফ্লুরো-কার্বন(C.F.C)

চলুন আমরা টাইম মেশিনে চেপে চলে যাই ২০৫০ সালে, যখন গাছ দেখা যায় শুধুমাত্র রিজার্ভ ফরেস্টে। গ্লোবালওয়ার্মিং-এর জন্য পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক জলের তলায়। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির জন্য মানুষকে সর্বাঙ্গ ঢেকে বাইরে বের হতে হয়। গায়ের লোম পড়ে গেছে, মাথার চুল উঠে গেছে। বাতাসে অক্সিজেন প্রায় নেই। মানুষকে অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে ঘুরতে হয়। একটুতেই ঝিমিয়ে পড়ে তাই প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা চার্জ নিতে হয়। বাড়িতে অতিথি এলে অক্সিজেন বা চার্জ অফার করা হয়। যে পৃথিবী আমরা দায়িত্ব নিয়ে তৈরি করছি চলুন সেই পৃথিবীতে, দেখি কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

প্রথম দৃশ্য

[২০৫০ সালের উপযোগী একটি উচ্চবিত্ত বাড়ির ড্রয়িং রুম। ঘরে টেবিলে ল্যাপটপ রেখে অনুরাধা কিছু দেখছে (সিনেমার অংশ, যাতে বাৎসল্য রস আছে) আর কাঁদছে। বিশ্বজিৎ ঢোকে পাজামা-পাঞ্জাবী পরা]

বিশ্ব : কি হল রাধা, কাঁদছ কেন? বলবে তো কি হয়েছে? খিদে পেয়েছে? (অনু দৌড়ে গিয়ে নলের মাথায় লাগানো অক্সিজেন মাস্ক মুখে ধরে খুব জোরে টানে) এত কান্নাকাটি কেন যে কর। তোমায় কতদিন না বলেছি ঐ একশ বছরের পুরোনো মুভিগুলো দেখবে না। ওগুলো দেখবে, ইমোশনাল হবে আব বেশি বেশি অক্সিজেন টানবে। বলি এ মাসে অক্সিজেনের বিল কত এসেছে জানো?

অনু : কি?

বিশ্ব : না, নতুন সার্কুলার বেরিয়েছে। ফ্যামিলি মেম্বার পিছু চার ইউনিট করে অক্সিজেন সাপ্লাই দেবে। তাই একটু মেপে চলা , এই আর কি।

অনু : মেপে চলা হ্যাঁ, মেপে চলা- সকাল থেকে কটা সিগারেট খেয়েছ?

বিশ্ব : মাইরি বলছি, একটাও না- (কলিং বেল বাজে) এ সময়ে আবার কে এলো? (দেখে) ও গনেশ। দরজা খুলে দাও।

অনু : ঐ এলেন - নামের কি ছিরি- গনেশ। খালি বিগ বিগ টক্।

বিশ্ব : আঃ, দরজাটা তো খোলো।

অনু : খুলছি- তাড়াতাড়ি গুড বাই কোরো- আমার আবার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। (অনু গ্যাজেটের সাহায্যে দরজা খুলে ভিতরে চলে যায়।)

বিশ্ব : এসো-এসো- ভাই- সেই কবে এসেছিলে- (গনেশ হাঁপায় কিছু বলে না) কি হল ভাই? অমন করছ কেন? (গনেশ ইশারায় আকার ঈঙ্গিতে বলতে চায় যে অক্সিজেন খুব প্রয়োজন) এই ইশারা করলে বুঝব কেমন করে? মুখ দিয়ে বলো।

গণেশ : লজ্জা করছে।

বিশ্ব : কেন লজ্জা করছে কেন?

গণেশ : করবে না? বউটা আমায় মেরে ফেলতে চায়। ও চায় না আমি বেঁচে থাকি।

বিশ্ব : কেন মেরে ফেলতে চাইছে কেন??

গণেশ : চাইছে না? নিজে জিম করছে- হাঁপাচ্ছে- অক্সিজেন নিচ্ছে- আবার জিম করছে- হাঁপাচ্ছে অক্সিজেন নিচ্ছে। আর আমি এই বয়সে একটু বেশী অক্সিজেন চাই, পাব না? তাই, ভাই, দাদা এসেছি তোমার কাছে, একটু অক্সিজেন টানতে।

বিশ্ব : কি যে বলো- আমারই বাড়ন্ত। আমি কি করে দিই বলো তো ?

গণেশ : একটু দাও দাদা। তুমি কি চাও আমি অকালে চলে যাই? একটু দাও দাদা please

বিশ্ব : না- না কি বলছ। অসম্ভব।

গণেশ : না, দাদা সম্ভব। আচ্ছা বেশ, তুমি কোনদিন হাঁপিয়ে গেলে, আমার বাড়ি গিয়ে টেনে এসো।

বিশ্ব : বেশ- তবে বেশি না- দু টান।

গণেশ : না দাদা প্লিজ, পাঁচ টান-

বিশ্ব : না তুমি বুঝতে পারছ না গনেশ, এমনিতে আত্মীয় স্বজন, অতিথি-

গণেশ : তাহলে আমি অতিথি। অতিথিকে ফিরিয়ে দেবে? অতিথি নারায়ণ-

বিশ্ব : বেশ তবে তিন টান।

গণেশ : তবে তাই হোক (দৌড়ে গিয়ে নলের মাথায় লাগানো অক্সিজেন মাস্ক থেকে লম্বা লম্বা টান দিয়ে অক্সিজেন নেয়)

বিশ্ব : ব্যাস-ব্যাস-হয়ে গেছে— কতো লম্বা টান দিচ্ছ ভাই— এ তো দশ টান হয়ে গেল।

গণেশ : থ্যাঙ্ক ইউ দাদা। যেদিন বৌদি আপনাকে গ্যাস দেবে না, সেদিন আপনি আমার ফ্ল্যাট এ গিয়ে টেনে আসবেন।

বিশ্ব : থাক। আমি কোন মহিলার হাতে মার খেতে রাজি নই, thank you ভাই।

গণেশ : যা বলেছেন দাদা, সেই জন্যই তো ছেলেটার বিয়ে দিতে চাইছি। ছেলের

বউটা এলে একটু তার সেবা টেবা পাব। কিন্তু জুতসই মেয়ে পাচ্ছি না। আমাদের সময় দাদা- কি বলব আপনাকে - আমার পিছনে পিছনে লাইন দিত।

বিশ্ব : কি লাইন দিত?

গণেশ : মেয়েছেলে দাদা মেয়েছেলে।

বিশ্ব : মেয়েছেলে আবার কি কথা? হয় মেয়ে, নয় ছেলে। তা তোমার ছেলে কী করে এখন?

গণেশ : সে তো এখন কলকাতায়। মাছের ব্যবসা করে।

বিশ্ব : মাছের বিজনেস! মানে জেলে?

গণেশ : দূর, জেলে আবার কি? ফিসিং কোম্পানী দাদা ফিসিং কোম্পানী।

বিশ্ব : ওঃ ! কোম্পানী।

গণেশ : হ্যাঁ, কলকাতা তো এখন জলের তলায়, পুরো জল আর জল, শুধু মাছ আর মাছ।

বিশ্ব : কই, আমাকে তো কোনদিন একটাও মাছ খাওয়াও নি? আমি যে মাছ ভীষণ ভালবাসি, তা তো তুমি জানো।

গণেশ : আরে দাদা, সেই কোলকাতা থেকে এত দূরে আনা সম্ভব?

বিশ্ব : তা, কোলকাতায় তো মানুষ নেই প্রায়, তা এত মাছ খায় কারা?

গণেশ : Export - export হয় তো। ধরো দাদা, ঐ Writers' Building, সেটা তো জলের তলায় । তার ছাদ কিনে নিয়ে অফিস করেছি । Export Company বলে কথা। সেইজন্য দাদা দেখবেন, ছেলের এমন বিয়ে দেব না, সারা উত্তরবঙ্গের মানুষ দেখবে। আর এমন বউ আনব না, সারা দেশের মানুষ দেখবে। আসলে মেয়ে দেখছি, কিন্তু , পছন্দ হচ্ছে না । Export Company -র মালিক বলে কথা। তা দাদা, বব্ এর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? মেয়ে দেখেছেন ? তাহলে কি দেখবেন? আমি যে গুলো রিজেক্ট করেছি সেগুলো কি একবার দেখবেন? ফটোগুলো পাঠাব? (অনু প্রবেশ করে)

অনু : থাক ভাই গণেশ, লাগবে না। ওগুলো তোমার কাছেই থাক। আমরা তো নেট-এ দিয়ে দিয়েছি।

বিশ্ব : নেট-এ দিয়েছি! কবে? কই আমি জানি না তো! (অনুর দিকে তাকিয়ে) ও হ্যাঁ জানি।

গনেশ : (দু-জনের দিকে তাকিয়ে) ওঃ আপনি জানেন না? তাহলে বৌদি দিয়েছেন হয়ত- কি বৌদি পেলেন কোন মেয়ে? যদি কিছু ভাল পান তো, আমাকে বলবেন কিন্তু।

অনু : নিশ্চয়ই বলব। আপনি হলেন আমাদের প্রতিবেশী । নিশ্চয়ই বলবো।

গণেশ : তাহলে আমি চলি, যাই বৌদি, গিয়ে দেখি, জিম কতদূর এগোল। কি বলব বৌদি, জিম করছে- খাচ্ছে, জিম করছে- খাচ্ছে, আর এই মোটা হচ্ছে। এই যে আপনাকে দেখি- ঠিক যেন একই রকম ৩৫কি ৪০, ৪০ কি ৩৫, ঠিক ঠাওর করা যায় না। আর আমারটা-

অনু : আসলে আমরা খাই কম তো। তাছাড়া আমি তো ফুড সাপ্লিমেন্ট - এর উপরেই আছি।

বিশ্ব : আসলে, রাধা তো ট্যাবলেট খেয়েই বেঁচে আছে। তবে আমি কিন্তু মাছে-ভাতেই আছি। (অনু রাগ করে বিশ্বর দিকে তাকায়। বিশ্ব চুপ করে যায়।)

গণেশ : তাহলে যাই, গিয়ে বলি আমার ক্যান্ডিকে। (চলে যায়)

বিশ্ব : রাধা-

অনু : সরো- আর, কতবার বলেছি না যে ঐ নামে আমাকে ডাকবে না। তোমার জন্য সোসাইটিতে মুখ দেখাতে পারি না।

বিশ্ব : কেন - রাধা নামটা কত মিষ্টি নাম বলো তো এই নাম ধরে ডাকলেই মনে হয় প্রেম করি (অনু তাকায়) না মানে তোমার সাথে। কিন্তু ইমোশনাল হয়ে হাঁপিয়ে যাব, বেশি অক্সিজেন খরচ হয়ে যাবে সেই ভয়েই তো।

অনু : আর একবার ওই নাম ধরে ডাকলে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

বিশ্ব : মরে যাব রাধা। অক্সিজেন চার ইউনিট কমে যাবে। আচ্ছা তুমিই বলো কি নামে ডাকব-

অনু : কেন অ্যানি।

বিশ্ব : অ্যানি! পাশের বাড়ির কুকুরটার নাম অ্যানি। বৌকে ওই নামে ডাকতে ভালো লাগে?

অনু : কি ভালো লাগে তোমার বলো তো? রিটায়ারমেন্টের পর থেকে দুবেলা ভাত খাচ্ছ। উইথ্ পাতলা মাছের ঝোল। তার উপর এই পাজামা-পাঞ্জাবি ধরেছ।

বিশ্ব : তাও তো ঘরে, বাইরে আর পরতে পারি কই?

অনু : থ্যাঙ্ক গড! ভাগ্যিস পারো না। এইসব ব্যাকডেটেড পোশাক কি করে যে ভালো লাগে তোমার, বুঝি না! তোমাকে দেখি আর ভাবি, এই কি সেই মিষ্টার ডাট্, যাকে দেখে আমার বন্ধুরা হিংসায় জ্বলে যেত। কি হয়েছে বলোতো তোমার?

বিশ্ব : মিষ্টার ডাট্- এর খোলোসটা ছেড়ে, শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ দত্ত হওয়ার চেষ্টা করছি।

অনু : করো, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু কোন পার্টিতে গিয়ে আমাকে যদি শ্রীমতি অনুরাধা দত্ত বলে পরিচয় দাও তাহলে-

বিশ্ব : পাগল! পারি কখনও। তুমি তো আমার অ্যানি, অ্যানি ডাট্। কিন্তু আমার অ্যানির চোখে জল দেখলাম কেন? কি হয়েছে?

অনু : কিছু না-

বিশ্ব : দেখি, দেখি, অভিমান করলে তোমাকে এখনও সুইট সিক্সটিন লাগে-

অনু : চুপ করো তো, আমার কিছু ভালো লাগছে না।

বিশ্ব : কেন কী হয়েছে?

অনু : একা একা আমি আর থাকতে পারছি না। এই ভারচুয়াল জগতে থাকতে থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠছি। আমার একটা সত্যিকারের সম্পর্ক চাই। সত্যি সত্যি একটা বাচ্চা চাই। যে এই ঘরে থাকবে, দস্যিপনা করবে- (বিশ্ব অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে) কী হল, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

বিশ্ব : এই বয়সে তা কি সম্ভব! (অনু রেগে তাকায়) না মানে দেখতে দেখতে তোমাকে ফর্টি লাগলেও আসলে তো তুমি সিক্সটি। তাছাড়া ব্যাঙ্কে আমরা স্পার্ম বা ওভাম্ কিছুই তো প্রিজার্ভ করে রাখিনি।

অনু : চুপ করবে তুমি- এই বুদ্ধি নিয়ে কি করে যে চাকরী করেছ কে জানে! আমি কি আমাদের কথা বলেছি?

বিশ্ব : তো কার কথা?

অনু : ববের কথা।

বিশ্ব : ওঃ আমাদের ঘোতনের কথা-

অনু : আবার-

বিশ্ব : শুধু তোমার সামনেই তো বললাম।

অনু : বলবে না। আনকালচার্ড ওয়ার্ড ইউজ করবে না।

বিশ্ব : না, মা আমাকে ঐ নামেই ডাকতো। ঐ ডাকটায় মাকে খুঁজে পাই তাই-

অনু : মাকে খুঁজে পাবে। কিন্তু ছেলেকে হারাবে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে ছেলে এখনও আমাদের সাথে আছে।

বিশ্ব : সে-তো আমার বুদ্ধির জোরে। এই অ্যাপার্টমেন্টের ফিফটি ওয়ান আর ফিফটি টু , দুটো ফ্লোর কেমন কিনেছি বলো- ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে একটাই ফ্ল্যাট, বাইরের কমন লিফ্‌ট বা সিঁড়ি দিয়ে উঠলে দুটো সেপারেট ফ্ল্যাট। তোমার ছেলে স্বাধীনভাবে সংসার করতে পারবে ভেবেই তো-

অনু : সংসার তো আর একা করা যায় না, দুজন লাগে। এই তোমাদের জন্য আজ এই অবস্থা।

বিশ্ব : এই রে, আমি আবার কি করলাম!

অনু : বিয়েটা একটা কমিটমেন্ট, বুঝেছ। কমিটমেন্ট। আর সেটা সবাই মেয়েদের কাছ থেকেই এক্সপেক্ট করে। এই জন্যই মেয়ে পাওয়া যায় না। কে নিজের কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে পরের ঘরের কমিটমেন্ট রক্ষা করবে বলতো? (দরজা খোলে, ছেলে বব ঢোকে, মুখে মাস্ক, গায়ে ওভার কোট, হাঁপাচ্ছে।

কোটটা অনু খুলে নেয়। দেওয়ালে গোটানো একটা লম্বা নলের আগার মাস্কটা ওর মুখে ধরে। আস্তে আস্তে ছেলে অক্সিজেন নিতে থাকে।)

বিশ্ব : আরে আরে কি হচ্ছে এসব। সকাল থেকে তেরো ইউনিট খরচা হয়ে গেল।

অনু : চুপ কর। ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এল, কোথায় এক ইউনিট অক্সিজেন নিজে হাতে দেবে, তা -না টাকার হিসেব শুরু হয়ে গেল। এবার তো মনে হয় গেস্ট এলে এক ইউনিট অক্সিজেন খাইয়েই বিদেয় করবে।

বিশ্ব : রেশনিং হলে কি করব বল?

অনু : ব্ল্যাক-এ কিন্‌বে। (এবার ছেলেকে বলে) কি রে এখন ভালো লাগছে তো? অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়েছিল নাকি রে?

বব্ : না, অক্সিজেন ঠিকই ছিল। বাড়ি ঢুকেই যেতাম। কিন্তু আজ দুঘন্টা বৃষ্টির ফোরকাস্ট ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম। অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে। অগত্যা স্কাই ট্যাক্সি কল্ করলাম। নেমে দৌড়ে এসে উঠলাম তাই-

অনু : সর্বনাশ, বৃষ্টিতে ভিজিসনি তো?

বিশ্ব : বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে!

বব্ : বাবা, ডোন্ট বি সো ইমোশনাল! এটা অ্যাসিড বৃষ্টি ।। তোমাদের যুগ আর নেই। শুধু শুধু দেখে মন খারপ করে লাভ নেই। বি কুল ড্যাড- বি কুল।

বিশ্ব : কুল থাকতে থাকতে তো একদিন কুলপি হয়ে যাব রে ঘোত - না - মানে বব্

: বাবা, তোমার মুখে এই ঘোতনা নামটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে-

অনু : থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। এদিকে আমি যে ঘরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠছি। সে খেয়াল কারও আছে-

বব্ : কেন? কি হয়েছে মা তোমার! সোস্যাল নেটওয়ার্ক সাইট - এ তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, এত গেম আছে, আর কী চাই তোমার?

অনু : আমার একটা কমপ্লিট সংসার চাই। স্বামী- ছেলে-বৌমা-নাতি-নাতনি নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সংসার।

বব্ : স্বামী তোমার আছে, ছেলে আছি। আর নাতি নাতনি চাও তো ওভাম ব্যাংক থেকে ওভাম এনে সে ব্যবস্থাও হতে পারে। কিন্তু বৌমা- ওটা তো আমার হাতে নেই মা।

বিশ্ব : কেন্ ঐ যে মেয়েগুলো আসত তোর কাছে। আমাদের সাথে খেয়ে দেয়ে গল্প করে, তোর সাথে দোতলায় উঠে যেত- ওদের কাউকে বিয়ে কর না-

অনু : হ্যাঁ, ঐ যে ব্যাঞ্জো বলে মেয়েটা, ওকে আমাংর খুব পছন্দ ছিল। বেশ লক্ষী লক্ষী চেহারা, ওকে বিয়ে কর না—

বব্ : ও আমাকে বিয়ে করবে, তবে তো।

অনু : কেন? আমার এমন সোনার টুকরো ছেলেকে বিয়ে করবে না- কে ও?

বব্ : মা, ও যে প্ল্যাটিনামের টুকরো। দু-তিন দিন আমাকে সময় দিয়েছিল, রিসার্চ: পেপারের ব্যাপারে হেল্প করার জন্য।

অনু : ও সব জানি না - একটা বিয়ে কর বাবা। বিয়ে হবে বাচ্চা হবে- সংসার পরিপূর্ণ হবে-

বব্ : মা, এসব কি শুরু করলে বলোতো, বিয়ে এখন সম্ভব? মেয়ে কোথায় পাব?

বিশ্ব : খুঁজলে ঠিক পাওয়া যাবে-

বব্ : যাবে না। তোমরা সে সম্ভাবনা শেষ করে দিয়েছ।

বিশ্ব : আমি বলছি পাওয়া যাবে ।

বব্ : যাবে না, চ্যালেঞ্জ-

বিশ্ব : ঠিক আছে, চ্যালেঞ্চ এক্সেপ্টেড্-

বব্ : ও.কে., তবে আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। তোমাদের পছন্দ হলে বোলো, বিয়ে করব।

অনু : একে বারে বিয়ে করবি। একবারও দেখবি না?

বব্ : আমার অত সময় নেই মা, তাছাড়া আমি জানি তোমরা সাকসেস্ফুল হবে না। বাট আই ডোন্ট মাইন্ড টু প্লে দিজ গেম। ওকে, চলি। এখন গিয়ে আবার দশ ঘন্টা চার্জ নিতে হবে। কালকের কাজটা খুব ইমপোরটেন্ট।

অনু : এ ছেলে কি বিয়ে করবে বলতো। সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ।

বিশ্ব : আমাকে চ্যালেঞ্জ জানানো- বলে কিনা মেয়ে খুঁজে পাব না। আমি হলাম গিয়ে উঠে যাওয়া পুলিস ডিপার্টমেন্টের রিটার্য়ার্ড এ. সি. পি, আমাকে চ্যালেঞ্জ। শোনো রাধা যতদিন না আমি ববের জন্য মেয়ে খুঁজে পাব, ততদিন-ততদিন-ততদিন আমি ভাত খাব না- তোমাদের মত ট্যাবলেট খেয়ে থাকব।

অনু : আবার- কতবার না বলেছি এটা ট্যাবলেট নয়। ট্যাবলেট নয়, সাপ্লিমেন্ট। কী?

বিশ্ব : সা-সাপ্লিমেন্ট-

দৃশ্য দুই

(ঘরে বসে আছে বিশ্বজিৎ, কোলে বা টেবিলে ল্যাপটপ, মন দিয়ে লিখছে। অনু ঢোকে, হাতে একটা গ্লাস আর একটা কৌটো।)

অনু : তখন থেকে মাথা গুঁজে কি করছ বলতো? ব্রেকফাস্ট কে করবে? ৯টা বেজে গেছে। আরে কি হল?

বিশ্ব : ঘোতনের প্রোফাইলটা বানিয়েই ফেললাম। শোন তো একটু, কেমন হলো।

অনু : কিসের প্রোফাইল?

বিশ্ব : কিসের আবার- বিয়ের। বিয়ের বিজ্ঞাপন।

অনু : ও-মা তাই! বল, বল, শুনি। না থাক-

বিশ্ব : না কেন-

অনু : আগে খেয়ে নাও-

বিশ্ব : কী ? ট্যাবলেট!

অনু : আবার ব্যাকডেটেড কথা। এটা ট্যাবলেট নয় সাপ্লিমেন্ট । তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ ববের বিয়ে ঠিক না করা পর্যন্ত তুমি আমাদের মতো সাপ্লিমেন্ট খাবে।

বিশ্ব : ওহ, আচ্ছা দাও- (একটা ট্যাবলেট গালে ছুঁড়ে দেয় অনু, জল দেয়, খেয়ে নেয়)

অনু : এবার কি লিখেছ পড়-

বিশ্ব : বেশ বুদ্ধি করে গুছিয়ে গুছিয়ে লিখেছি বুঝেছ। মেয়ে পাওয়া যাবে না মানে- আমাদের ছেলে কি ফ্যালনা নাকি? শোন- বয়স তিরিশ, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহি, ফর্সা, কর্মক্ষেত্রে সক্ষম পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই।

অনু : হাইট -টা মেনশন্ করে দাও- ১৫৮ সেন্টিমিটার। আর দেখি দেখি (পড়ে) ----- লেখো বিবাহে ইচ্ছুক উপযুক্ত পাত্রী চাই। বিবাহে ইচ্ছুক কথাটা লেখ-

বিশ্ব : কেন ?

অনু : ঐ লিভ ইন্ করে নাতি-নাতনি আমার একদম পছন্দ না। আমি সংসার চাই- হ্যাঁ গো পাব তো- হবে তো বিয়ে?

বিশ্ব : হ্যাঁ, হ্যাঁ পেতেই হবে- নাহলে তো- থাক- আমরাই ভাল ছিলাম। কি সুন্দর প্রেম করেছি, বিয়ে করেছি। বাবা-মাকে কোন ঝক্কি পোয়াতে হয়নি-

অনু : একদিনে তো সমস্যাটা তৈরী হয়নি। নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভুগছি আমরা। তোমার মনে আছে, আমাদের কলেজ লাইফ-এ, তখনই তো WHO বলেছিল এইভাবে কন্যাভ্রূণ হত্যা হতে থাকলে ২০৩০ সালে মেয়ের সংখ্যা ছেলেদের অর্ধেক হয়ে যাবে। তখন টনক নড়েছিল কারোর! একটাও আন্দোলন হয়েছিল? এখন হা-হুতাশ করে কি হবে-

বিশ্ব : আসলে কি জানো, সাধারণ মানুষ মেয়ে সন্তানকে চিরকাল ভেবে এসেছে ‘পরের সম্পত্তি’। তাই ছেলে চেয়েছে, নিজের স্বার্থে-

অনু : অথচ দেখ, বউ চেয়েছে, প্রেমিকা চেয়েছে, মা চেয়েছে কিন্তু কন্যা সন্তান চায়নি। আরে বোকারা, মেয়ে আসবে কোথা থেকে- অঙ্কুরেই তো মেরে ফেলেছিস-

বিশ্ব : জানো, ববের প্রোফাইলটা বানানোর আগে নেট সার্চ করে দেখলাম- পরিসংখ্যান বলছে যে ক'জন মেয়ে বেঁচে আছে তার ৫০ শতাংশ মেয়ে নাকি বিয়েই করতে চাইছে না-

অনু : না না, অমন কথা বোলো না- আমরা ঠিক খুঁজে পাব- নিশ্চয়ই পাব। কি গো পাবো তো?

বিশ্ব : পেতে তো হবেই। না হলে আমি কি সারাজীবন ট্যাবলেট খেয়ে থাকব নাকি-

অনু : আবার-

দৃশ্য তিন

(সময় ভোর। আলোটা ফোটে নি। অন্ধকার ঘর, বিশ্বজিৎ ঝিমোচ্ছে, আরও দুজন ঘরের মধ্যে আছে)

CO_2 : Hello Sir, আপনি কি ঘুমোচ্ছেন? নিশ্চিন্তে ঘুম আসছে আপনার?

বিশ্ব : কে, কে আপনি!

CO_2 : আমি, চিনতে পারছেন না, ভালো করে দেখুন-

বিশ্ব : ভাল করে দেখতেই তো পারছি না, এত অন্ধকার!

CO_2 : এত অন্ধকার কে- কারা করে রেখেছে?

বিশ্ব : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই!

CO_2 : ভাই! তাই! আমি CO_2

বিশ্ব : CO_2! কি বলছেন ভাই!

CO_2 : হ্যাঁ, CO_2 সারা পৃথিবী জুড়ে আমরা রণে-বনে- জলে - জঙ্গলে-

বিশ্ব : কি মজা করছেন ভাই! আমার ঘরে ঢুকলেন কি করে?

CO_2 : কেন একটু আগে আপনি যখন সিগারেটটা পান করছিলেন, আপনার মিসেসকে লুকিয়ে, ঠিক তখনই

বিশ্ব : Please ওকে বলবেন না! মাইরি বলছি আমি আর কোনদিনও সিগারেট পান করবো না-

CO_2 : এখন আর এসব বলে লাভ নেই। যা সর্বনাশ হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন সারা পৃথিবী আমাদের দখলে-- হাঁ হাঁ - এতদিন, এতদিন ধরে এতো এতো তেল পুড়িয়ে অযথা বৈভব দেখানোর জন্য গাড়ি চড়েছেন, আমাদের জন্ম দিয়েছেন! অথচ আমাদের ধ্বংস করার দায়িত্ব নেন নি। **(দূরে বসে CFC কাঁদছে)**

বিশ্ব : কে ওখানে? কাঁদছ কেন ভাই-

CFC : ভাল করে দেখুন, চিনতে পারবেন। ওর মত আমিও অভাগা-

বিশ্ব : অভাগা! কি ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না-

CFC : অ্যাঁ, বুঝতে পারছি না- ন্যাকা! আমি CFC, এবার বোঝা গেল? আমরা দুই ভাই। কাঁদছি আর কি এমনি? কাঁদছি তোমাদের দুঃখে।

বিশ্ব : আমাদের দুঃখে-

CFC : হ্যাঁ রে শালা। তোদের দুঃখে, মানুষের দুঃখে, পৃথিবীর দুঃখে রে শালা-

বিশ্ব : এই দেখ, একটু আগে আপনি বলছিল, এখন আবার গালাগাল দেয়-

CFC : দেবো না! মানুষ ভোগ বিলাসের জন্য আমাদের জন্ম দিল, আর মানুষই আমায় গালাগাল দেয়! আমিই নাকি ধ্বংসের কারণ! যত দোষ নন্দ ঘোষ-

বিশ্ব : ওঃ তুমি মানে আপনি ক্লুরোফ্লুরো কার্বন- মানে green house gas!

CFC : হ্যাঁ, ওজনস্তর ফুঁটো করে দিইচি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং তৈরী করিচি, মেরুর বরফ গইলে দিইচি- বেশ করিচি! দোষ দেওয়ার আগে ভেবে দেখিস নি শালা, হারামি- আমি দোষী?

বিশ্ব : এই দেখ, আবার গালাগাল দেয়-

CFC : দেবোই তো, বেশ করব, ঠিক হয়েছে। শালা বোরখা পরে ঘোর, অক্সিজেন নিয়ে ঘোর-

CO_2 : আমরা পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কষ্ট হয় না তোদের আমাদের দেখে?

বিশ্ব : দেখো দেখি, এইমাত্র আপনি বলছিল! এখন তুই-তামারি করছে! দেখুন ভাইয়েরা আমরা চেষ্টা করছি পৃথিবীকে বাঁচাবার।

CFC : ছাই চেষ্টা করেছিস্। মনের আনন্দে মাছ ভাত গিলছে আর ঘুমোচ্ছে, গিলছে আর ঘুমোচ্ছে,

CO_2 : ধ্বংস হয়ে যাবে সব-

CFC : ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী-

(বলতে বলতে মিলিয়ে যায়, বিশ্ব বিড় বিড় করে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে, আলো আসে অনু ঢোকে হাতে চা নিয়ে।)

অনু : কি গো বসে বসে ঝিমোচ্ছো কেন? কি গো? সত্যি এত টেনশনের মধ্যে মানুষ কি করে মোষের মতো ঘুমোতে পারে বুঝি না! কি গো? মনে হয় চার্জ শেষ হয়ে গেছে। (চার্জ দেয়, বিশ্ব চেঁচিয়ে ওঠে)

বিশ্ব : আমি চার্জড্-

অনু : তাহলে ঝিমোচ্ছো কেন?

বিশ্ব : কে, কে তুমি?

অনু : আমি, আমি-

বিশ্ব : কে আমি?

অনু : আমি- চা খাও । আর দয়া করে একটু দেখ কেউ উত্তর দিল কিনা। ৩৬ ঘন্টা হয়ে গেল একটা রিপ্লাই এল না! কি হলো!

বিশ্ব : খাচ্ছি-

অনু : খেতে হবে না। আগে দেখ। আমি আর পারি না। কাল রাতে তিনবার ঘাড় ধরে উঠিয়ে নেট চেক করিয়েছি। আর কত করব! যত দায় যেন আমার। এই জন্যই মেয়েগুলো বিয়ে করতে চায় না!

বিশ্ব : এই তো ছ'টা মেয়ে আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছে গো। দেখ- একি- (অনু কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে ঠাকুরকে ডাকতে থাকে) আরে

চোখ বন্ধ করে রাখলে দেখবে কি করে?

অনু : তবে? এই বাজারে ছ-ছ জন মেয়ে উত্তর দিয়েছে। আমি জানতাম, অনেক মেয়েই আমার ছেলেকে বিয়ে করতে চাইবে। পড়ো পড়ো, কি লিখেছে পড়ো-

বিশ্ব : প্রথমটাই আগে পড়ি বল-

অনু : হ্যাঁ পড়ো-

বিশ্ব : প্রথমজন বলেছে। আমি কমলিকা দাসগুপ্তা। সংক্ষেপে কমা। বন্ধুরা আমাকে কমা বলেই ডাকে। আপনারাও এই নামেই ডাকবেন। এই নামটাই আমার পছন্দ।

অনু : কমা! এ আবার কেমন নাম গো- আমার বৌমার নাম কমা!

বিশ্ব : আগে হোক, তারপর অত ডিটেইলস্- এ ভেবো, আগে শোন- আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে সুদেহী ও স্মার্ট বলেই মনে করে । আমাকে দেখলে আপনারাও তাই মনে করবেন।

অনু : এ আবার কেমন কথা- না না, এ মেয়ে ভালো হবে না। পরের টা পড়ো-

বিশ্ব : ধুৎ, আগে পুরোটা শোনো- এত অধৈর্য্য হলে আর ছেলের বিয়ে দিতে হবে না। আরও লিখেছে (পড়ে) বাঃ বাঃ (মুখটা হাসিতে ভরে ওঠে)

অনু : আরে এত আনন্দের কি আছে-

বিশ্ব : বলেছে, ছেলে বা তার বাবা-মার সাথে আগামী দু-দিনের মধ্যে যেকোন দিন দুপুর একটা থেকে দু-টোর মধ্যে দেখা করতে রাজি। ঐ সময়টা লাঞ্চ ব্রেক-তাই খুব ভালো হয়- যদি ওর অফিসের কাছাকাছি Diamond Plaza Shopping Mall এর Food Court -এ আমরা ওর সাথে দেখা করি।-

অনু : Diamond Plaza - মানে আমাদের apartment - এর top floor-এ!

বিশ্ব : শোন না, ভালোই হোলো, এই সুযোগে ঘুরে আসি। এই ফাঁকে তুমিও শপিং করতে পারবে। কতদিন শপিং- এ যাওয়া হয় না তোমার।

অনু : থাক- আমার শপিং নিয়ে যেন কত চিন্তা! শপিং করতে গেলে তো রেস্ট রুমে বসে বসে ঝিমোও। আসল উদ্দেশ্যটা কি আমি বুঝি না ভেবেছ! Food Court - এ ভালো খাওয়া-

বিশ্ব : ওহ! তাহলে বাতিল-

অনু : বাতিল কেন? উপরের Food Court -এ না গিয়ে আমাদের ঘরে আসতে বলো। এটা ফাইনাল করে পরের মেইলটা পড়ো।

বিশ্ব : পড়ছি- আমি রিচা মিত্র, Computer Engineer, বিয়েতে ইচ্ছুক তবে Plural marriage-এ। এই পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক-

অনু : Plural marriage ! সেটা আবার কি-

বিশ্ব : 'বহুবাচনিক বিবাহ' এরকমই কিছু হবে-

অনু : বাবা- যার ভাষাই বুঝতে পারছি না, তাকে কি করে বুঝবো! এটা বাতিল- পরেরটা পড়ো-

বিশ্ব : আস্তে -এত অধৈর্য হলে হবে? পড়ছি-নাম-মালবিকা মুখার্জি, বয়স- এইরে!

অনু : কি হল, থেমে গেলে কেন?

বিশ্ব : বয়স Sixty Five-

অনু : কি! Sixty Five এর বুড়ি আমার কচি ছেলেটাকে বিয়ে করতে চায়! মরণ হয় না বুড়ির-

বিশ্ব : এটা বাতিল-

অনু : বাতিল-

বিশ্ব : পরেরটা শোন্ নাম- সিম্‌ফোনি সেন। বয়স কুড়ি-

অনু : বাঃ, কেমন সেতারের মত রিমঝিম করে উঠল! সিম্‌ফোনি সেন। বাহ-

বিশ্ব : মা বিখ্যাত মডেল মিস্ জোজোবা এবং সাগরিকা।

অনু : দাঁড়াও - মা কোন্ জন - জোজোবা না সাগরিকা।

বিশ্ব : ধ্যুর, পুরোটা না পড়লে বুঝব কি করে। চুপ করে শোন । বাবা বিখ্যাত Scientist- মিঃ জর্জ মিলান ।

অনু : দাঁড়াও দাঁড়াও- এ তো মহা মিথ্যেবাদী মেয়ে। বয়স লিখেছে কুড়ি আর বাবা মিঃ জর্জ মিলান। মিঃ জর্জ মিলান তো মারা গেছে পঞ্চাশ বছর বয়সে।

বিশ্ব : সেটাও ব্যাখ্যা করেছে। শোন- লিখেছে , আমার genetic mother বিখ্যাত মডেল মিস্ জোজোবার Ovum আর Sperm Bank- এ preserve করে রাখা বিখ্যাত Scientist - জর্জ মিলানের sperm -এর test tube মিলনেই আমার জন্ম। সাগরিকা আমার সারোগেট mother। আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল আমার মধ্যে মায়ের রূপ এবং বাবার গুণ থাকবে। আমার মায়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। আমি একাধারে Model এবং Scientist।

অনু : থাক্, এ মেয়ে আর সংসার করবে কখন! পরেরটা দেখ-

বিশ্ব : এইরকম করলে, তোমার কপালে ছেলের বউ জুটবে না-

অনু : পরেরটা দেখ-

বিশ্ব : দেখছি, আরে এ তো বুঝতে পারছি না বাঙালী না অবাঙালী-

অনু : নামটা বলো না-

বিশ্ব : দাঁড়িয়ানা, দাঁড়িয়ানা পুরকায়স্থ-

অনু : পুরকায়স্থ- মানে তো বাঙালীই হবে, তারপর-

বিশ্ব : লিখেছে, আমার মা বস্‌নিয়ার, বাবা বাঙালী-

অনু : ঠিক আছে, বাবা তো বাঙালী, তারপর-

বিশ্ব : জন্ম জার্মানীতে। পাঁচ বছর বয়সে বাবার সাথে India চলে আসে। পাঁচটা

International ভাষার সাথে সাতটা ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলতে পারে।

অনু : বাব্বা- এ তো ট্যালেন্টেড মেয়ে!

বিশ্ব : হ্যাঁ। একটা NGO Company -এর কর্ণধার। কিন্তু বয়স বলেনি-

অনু : ও ঠিক আছে। ও আমি দেখলেই বুঝতে পারব।

বিশ্ব : কিন্তু রাধা, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ, যে কটা মেইল এসেছে, সব কটাই পাত্রী নিজে করেছে। অভিভাবকরা কেন যোগাযোগ করেনি বুঝতে পারছি না।

অনু : ওসব তুমি বুঝবে না। জেনারেশন গ্যাপ। আজকালকার মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সঙ্গী পছন্দ করে। মা-বাবাকে বললে কোথা থেকে কাকে ধরে আনবে, যার সাথে না হবে মনের মিল, না হবে মতের মিল! আর কি লিখেছে পড়ো-

বিশ্ব : হ্যাঁ পড়ি। আরে এ মেয়ে তো বাবা-মাকে নিয়ে আসবে দেখা করতে!

অনু : লিখেছে নাকি-

বিশ্ব : দুজন কে নিয়ে আসবে লিখেছে-

অনু : কবে আসতে চায়-

বিশ্ব : পরশু। আরে বা: বা: বা:-

অনু : কি হল? ব্যা ব্যা ব্যা করছ কেন?

বিশ্ব : এই মেয়ের সাথে দেখা করবই?

অনু : কেন?

বিশ্ব : দাঁড়িয়ানার হবি হলো রান্না করা। একবার ভাবতো পুত্রবধূ হিসাবে না-মাসে, ছ-মাসে আত্মীয় স্বজনকে ডেকে যদি খাওয়ায়, আমাদের স্ট্যাটাস-টা কোথায় উঠে যাবে-

অনু : শুধু খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া- আমি বলে ঘর করছি! শোন, আগে কমা তারপর দাঁড়ি, ফাইনাল।

বিশ্ব : আর একটা মেইল আছে তো-

অনু : আর দেখতে হবে না। জানিয়ে দাও, কাল দুপুর একটায় Diamond Plaza Food Court -এ নয়, আমাদের আমাদের Flat-এ।

বিশ্ব : O.K. তাহলে জানিয়ে দিই, কাল দুপুর একটায় Diamond Plaza Food Court এ নয়, আমাদের Flat-এ।

চতুর্থ দৃশ্য

(ঘরে বসে বিশ্ব একটা গিফট প্যাক দেখছে। অনু সেজেগুজে ঢোকে। বিশ্বর হাত থেকে গিফট কেড়ে নেয়।)

বিশ্ব : এটা আবার কার জন্য কিনলে?

অনু : কমার জন্য-

বিশ্ব : মানে? উপঢৌকন দিয়ে হাতে রাখতে চাও নাকি?

অনু : মোটেও না। এটা ভারতীয় রীতি। শাশুড়ী-বৌমার বন্ধনকে শক্ত করে। তোমার মা-ও আমাকে দিয়েছিলেন-

বিশ্ব : কিন্তু তোমার তো এখনও কমাকে পছন্দই হয়নি-

অনু : পছন্দ হলে তবেই তো কমা, না হলে দাঁড়ি-

বিশ্ব : দাঁড়ি মানে, শেষ!

অনু : ধুৎ দাঁড়ি মানে দাঁড়িয়ানা।

(বেল বাজে, বিশ্ব গিয়ে কমাকে নিয়ে আসে। কমার পরনে সর্বাঙ্গ ঢাকা পোশাক জাম্প স্যুট হলে ভাল, তার ওপর জোব্বা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, মাস্ক, কাঁধে একটা ব্যাগ।)

কমা : আমি কমা, glad to meet you.

অনু : Same to you, (ঈশারায় বিশ্বকে একই কথা বলতে বলে)

বিশ্ব : Same to you. Same to you.

কমা : আপনারা হলেন Mr. & Mrs. Dutt. I mean ববের বাবা, মা , তাই তো-

অনু : হ্যাঁ হ্যাঁ- বসো। (কমা ওপরের জোব্বা, অক্সিজেন মাস্ক, অক্সিজেন সিলিণ্ডার খুলে রাখে)

কমা : Sorry to say, আমার হাতে সময় খুব কম। মাত্র এক ঘন্টা lunch break. তাই খেতে খেতে কথা বলাই ভালো। বলুন আপনারা কি খাবেন?

বিশ্ব : না, না - খাবার আমি আনব, তুমি বলো কি খাবে?

কমা : আমার জন্য একদম চিন্তা করবেন না। আমার lunch আমার সঙ্গেই আছে (ছোট্ট পানীয় ভরা একটা বোতল বের করে ব্যাগ থেকে) আপনারা বলুন কি খাবেন আমি আনাচ্ছি।

বিশ্ব : এখানকার স্পেশাল আইটেম মটন কষা আর ডাব চিংড়ি-

অনু : কিন্তু আমরা তো ওসব একদম খাই না। আসলে আমরা lunch -এ সামান্য স্যালাড ছাড়া আর কিছুই খাই না। তুমি একদম চিন্তা কর না। আমি তো কিচেনে কুচি কুচি করে কেটে রেখে এসেছি। মিঃ ডট্ গিয়ে দু-বাটি স্যালাড নিয়ে আসবে। ততক্ষণে আমরা গল্প করি। কি হলো যাও, যাও- **(বিশ্ব করুণ মুখে স্যালাড আনতে যায়)**

অনু : তুমি থাকো কোথায়?

কমা : হিল এরিয়াতে একটা বাড়ি করেছি। ওখানে পলিউশনটা একটু হলেও কম। এখানে তো মাস্ক ছাড়া বেরোনোই যায় না!

অনু : হ্যাঁ, এরপর যে কি হবে!

কমা : ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না। ওজনস্তর রিপেয়ার করা হচ্ছে। এনি

ওয়ে, প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করেছেন তো ?

অনু : হ্যাঁ, আমরা তো শুধু পিতল-তামা, স্টীলের বাসন আর জুটের ব্যাগ ব্যবহার করি-

কমা : গুড্। আমরা আশা রাখি, আর দশ বছর পর আমাদের আর মাস্ক পরে বাইরে বেরোতে হবে না। Total atmosphere আমাদের control- এ চলে আসবে।

অনু : কিন্তু এই জল-

কমা : কি করবেন বলুন, উত্তর মেরুর বরফ প্রায় গলে গেছে। সুন্দরবন তো পুরো জলের তলায়। কলকাতা ভেনিস হয়ে গেছে। আপনারা একটু নর্থে থাকেন বলে এখনো-

অনু : বেঁচে আছি। তবে কতদিন থাকব জানি না।

কমা : Anyway, আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।

অনু : হ্যাঁ, তোমার date of birth?

কমা : Perdon?

অনু : তোমার date of birth? প্রোফাইলে লেখো নি তো-

কমা : ওটা দিয়ে তো আপনাদের purpose serve হবে না। তাই জানাই নি। আমি সন্তান ধারণে সক্ষম। ব্যাস্ আর কি চাই আপনাদের ?

অনু : হ্যাঁ, ঠিক। আর কি চাই- (বিশ্ব ঢোকে স্যালাড নিয়ে)

কমা : ঐ তো মিঃ ডট্ এসে গেছেন। এবার important কথাগুলো সেরে ফেলি, দেখুন আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনারা যখন পরিবার চাইছেন, তখন senior citizen-দের জন্য with respect আমি বিয়ে করব।

অনু : করবে ?

কমা : Of course, but maximum 5 বছরের জন্য-

অনু : ৫ বছরের জন্য ! কেন ?

কমা : এর থেকে বেশী সময় একটা কাজে invest করা, এই পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়।

অনু : কাজ- বিয়েটা একটা কাজ ?

কমা : Yes, professional attitude না থাকলে কোন কিছুই ঠিক ভাবে করা যায় না।

অনু : Professional attitude - তা বিয়ের পর কি তুমি অফিসেই থাকবে মা ?

কমা : Oh, no, আপনাদের বাড়িতেই থাকব।

অনু : সত্যি ?

কমা : সত্যি। আপনারা পরিবার চাইছেন। আপনাদের চাওয়াটাকে respect

করাটাই তো আমার duty. But এক ঘরে থাকতে পারব না। দুজনের দুটো আলাদা ঘর থাকবে।

অনু : কেন? মানে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী এক ঘরেই থাকে। মানে আমরাও তো- এই বলো না-

বিশ্ব : হ্যাঁ- হ্যাঁ।

কমা : দেখুন Mrs. Dutt আপনাদের সময়টা চলে গেছে। এই ২০৫০ -এ মানুষ অক্সিজেনের অভাবে একটুতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছে, ঝিমোচ্ছে, Brain কাজ করছে না।

বিশ্ব : হ্যাঁ, এই regular দাড়ি কাটার মত। Regular Brain-কে charge করতে হচ্ছে। না হলেই ঝিমোচ্ছে।

অনু : চুপ করবে- (এবার কমাকে বলে) সব ঠিক বলছ মা, কিন্তু এর সঙ্গে একসাথে থাকার অসুবিধা-টা ঠিক কি, সেটা তো বুঝলাম না!

কমা : সময় অনেক এগিয়ে গেছে, যে কোন হেলদি সম্পর্কে সব থেকে বেশী প্রয়োজন হয় স্পেস্। স্পেস্ সম্পর্ককে মজবুত করে।

বিশ্ব : হ্যাঁ গো এই জন্যই তো অমিত (উচ্চারণটা অমিতো হবে) লাবণ্যকে নিয়ে দুটো আলাদা বাড়িতে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল। গঙ্গার স্পন্দন বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে এক ফালি জলধারা। তার এক পাড়ে অমিতের বাড়ি 'দীপক', আর এক পাড়ে লাবণ্যর বাড়ি 'মানসী'। একটা নৌকা খুঁটিতে বাঁধা, নাম- মিতালী, কাঠের সাঁকো দিয়ে মিলন অভিসার।

কমা : কে অমিত, কে লাবণ্য?

বিশ্ব : অমিত না, অমিত না। অমিতো। শেষের কবিতার মিতা আর বন্যা।

অনু : চুপ্ করে বসবে কি তুমি- (এবার কমাকে বলে) তুমি বলো মা তুমি বলো।

কমা : হ্যাঁ, সময় খুব কম। দেখুন, আমি প্রথম বছরেই চেষ্টা করব প্রেগন্যান্ট হতে। (বিশ্ব বিষম্ খায়)

অনু : (অনু বিশ্বকে পিঠে থাবড়া দিতে দিতে বলে) ওঃ! তুমি বল মা , তুমি বল।

কমা : পাঁচ বছরে একটি বাচ্চার কন্টাক্ট হবে আপনাদের ছেলের সাথে। মেয়ে হলে আলাদা হওয়ার সময় আমি নিয়ে যাবো, ছেলে হলে আপনাদের কাছে থাকতে পারে। তবে চিন্তা করবেন না, সেপারেশনের পরে বাবা তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে।

বিশ্ব : সেটাও কি চুক্তিপত্রে লেখা থাকবে, মা?

কমা : অবশ্যই। আমার চার বছরের মেয়ে তো তার বাবার সাথে মাসে দুটো Sundayতে meet করে।

অনু : ওঃ, তা তোমার চারবছরের মেয়ের বাবার সাথে তোমার সম্পর্কটা এখন

ঠিক কেমন মা?

কমা : Friend, Now we are just friend, good friend. ওর সাথে পাঁচ বছরের কন্টাক্ট শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দুজনেরই status এখন single.

অনু : ওঃ single.

কমা : আমার হাতে আর সময় নেই। যদি প্রয়োজন মনে করেন, ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। তবে পরের মিটিংটা আমি আপনাদের ছেলের সাথে করতে চাই। কারণ চুক্তিগুলো তো ওর সাথেই হবে। ও.কে. বাই। ও হ্যাঁ, এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ না করলে আমি আপনাদের মেইল-এ ব্লক করে দেব, বাই- হ্যাব এ গুড ডে। (কমা চলে যায়। চুপ করে থাকে ওরা)

বিশ্ব : বলছি কি, এবার মটন কষা আর ডাব চিংড়ির অর্ডারটা দিয়ে আসি।

অনু : চুপ, শুধু খাই-খাই-খাই-খাই-খাই, পরের মেইলটা দেখ-

বিশ্ব : পরের মেইল- মানে- দাঁড়িয়ানা-

অনু : হ্যাঁ-

বিশ্ব : লিখে দিচ্ছি, কালকেই আমরা দেখা করতে রাজি-

অনু : হ্যাঁ, আর শোনো, ওর সাথে কিন্তু মা বাবা থাকবে। সম্ভাব্য প্রশ্নের একটা লিস্ট তৈরী করো। এবারের মতো ল্যাজে গোবরে হয়ো না।

পঞ্চম দৃশ্য

(অনুরাধাদের বাড়ি, দাঁড়িয়ানা বসে বা দাঁড়িয়ে। ঘরে অনু বিশ্ব আর অন্য দুজন লোক, প্রথমজন কথা বলছে, দ্বিতীয়জন নোট নিচ্ছে।)

১ম জন : আপনার নাম-

বিশ্ব : শ্রীযুক্ত না, মিঃ বি ডট্

১ম জন : পুরো নাম-

বিশ্ব : মিঃ বিশ্বজিৎ ডট্

১ম জন : B+S-W-A_I, I না double ‘e’?

বিশ্ব : না, না আই-আই-

১ম জন : OK , আসলে আইডেনটিটি কার্ডে স্পেলিংটাই দরকার-

১ম জন : Occupation-

বিশ্ব : পাত্র কিন্তু আমার ছেলে। ওরটা বলব- না আমার টা-

১মজন : না আপনারটা

বিশ্ব : Retired Assistant Commissional of Police (উঠে যাওয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ACP)

১মজন : ম্যাডামের নাম -

অনু : মিসেস্ অনুরাধা ডট্। Anuradha Dutt. Retired School Teacher। মানে Voluntary retirement . E-school-এর দৌলতে স্কুলের পাঠ তো শেষ, তাই আর কি?

১মজন : ছেলে-

অনু : মিঃ বব্ ডট্ Scientist ওই এন্‌ভায়রনমেন্ট নিয়ে আর কি-

১মজন : ম্যাডাম আমাদের প্রাইমারী কাজ শেষ। (দাঁড়িয়ানা সাংকেতিক ভাষায় সেক্রেটারিদের কিছু নির্দেশ দেয়। সেক্রেটারিরা উত্তর দেয় ও নির্দেশ পালন করে)

দাঁড়ি : O.K., আমি দাঁড়িয়ানা, মানে দাঁড়ি। ওরা আমার সেক্রেটারী। আসলে আমি আমার প্রতিটা মিটিং - এর ডিটেইলস্ ভিডিও ও অডিও করে রাখতে পছন্দ করি। আপনাদের পারমিশন্ চেয়ে মেইল করেছিলাম। কিন্তু আপনারা answer না দেওয়ায় এই ব্যবস্থা।

অনু : আমাদের ছেলে সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে, বলো, লজ্জা কোরোনা-

দাঁড়ি : আপনার ছেলের height, weight পছন্দ -অপছন্দ সব আমার জানা।

অনু : ও-মা, তুমি চেনো নাকি ওকে!

দাঁড়ি : Come on Aunty, বিজ্ঞাপনে আপনাদের নাম আর Address দেখে আমার সেক্রেটারী net working site থেকে আপনার ছেলের সবটাই আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে।

বিশ্ব : ওঃ আমার ছেলের সবটাই দেখে ফেলেছো মা! ভালো। কিন্তু তোমার মত এইরকম well established & too busy lady আমার ছেলেকে কেন বিয়ে করতে চাইছে সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না, মা!

দাঁড়ি : O.K. I explain, আসলে আঙ্কেল , আমি বছরে পাঁচ থেকে সাতটা দেশ কাজের খাতিরে ঘুরে বেড়াই। অনেক দেশের অনেক ছেলের সাথেই আমার পরিচয় হয়েছে এবং হবে। কিন্তু যখন দেখলাম, আপনারা পাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তখন বুঝলাম একেই বলে ফ্যামিলি ভ্যালুজ , যা আজকাল তো পাওয়াই যায় না। তাই আমি চাইলাম, আমার একটা বাচ্চা অন্তত: এই ফ্যামিলি থেকে হোক।

অনু : একটা বাচ্চা, মানে?

দাঁড়ি : দেখুন, আমি দাঁড়িয়ানা পুরকায়স্থ। আমার রক্তে আছে বাঙালীর বুদ্ধি আর ইউরোপিয়ানদের লড়াকু ক্ষমতা। আমি চাই আরও ৫০টা দাঁড়িয়ানা আসুক এই পৃথিবীতে। তাই আমি ঠিক করেছি বছরে তিনটে করে বাচ্চার জন্ম দেব।

বিশ্ব : বছরে তিনটে! সেগুলো কি মানুষের বাচ্চা হবে মা!

অনু : দেখ দাঁড়ি, তুমি তো un-married, তার উপরে বয়সটাও অল্প, তাই আকাশ কুসুম ভাবছ। আসলে, মানুষের pregnancy period টা more or less 9 months হয় মা।

দাঁড়ি : হ্যাঁ, তাতে অসুবিধা কোথায়? আমি তো ডিম্বানু দেবো , আর বাচ্চার বাবা খুঁজে আনব, বাকি কাজ তো ডঃ আর সারোগেট মায়ের। আমি চাইলে বছরে তিনটের বেশি বাচ্চার জন্ম দিতে পারি।

বিশ্ব : হ্যাঁ, তা অবশ্যই পারো মা-

দাঁড়ি : দেখুন, এই সমাজে 'বিয়ে' কথাটা সোনার পাথর বাটি । কিন্তু আমি, দাঁড়িয়ানা আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সফল পুরুষদের সন্তান পৃথিবীতে আনতে চাই। এটা আমার কর্তব্য দেশের প্রতি, মানবজাতির প্রতি। এর জন্য যদি আপনাদের ছেলেকে বিয়ে করতে হয় করব। আসলে যে কোন মহৎ কাজের জন্য সামান্য বলিদান তো দিতেই হয়।

অনু : কিন্তু, আমার ছেলেকে বিয়ে করার পর, ওর সাথে থাকতে থাকতে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পুরুষদের থেকে তুমি কি করে বাচ্চা উৎপাদন করবে মা ? (বিশ্ব থামস্ আপ করে, ওর বুদ্ধির প্রশংসা করে)

দাঁড়ি : Come on, don't be upset। ভেঙে পড়বেন না। আমি তো বললাম, বাচ্চা হবে সারোগেসির মাধ্যমে আমি না হবো কারো শয্যাসঙ্গিনী, না বাচ্চা আমার গর্ভে বড় হবে, অসুবিধা কোথায়? সারা পৃথিবীতে already আমায় ছ-ছ'টা বাচ্চা আছে। আঙ্কেল, আন্টিকে বুঝিয়ে বলুন-

বিশ্ব : হ্যাঁ , হ্যাঁ, এভাবে চলতে থাকলে ৫০০০ বাচ্চা হয়ে যাবে-

দাঁড়ি : দেখুন আমি যতটুকু জানি, আপনারা ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন পরিবার বাড়ানোর জন্য। সেক্ষেত্রে আপনারা খুবই ভাগ্যবান যে, এই সফল দাঁড়িয়ানার অংশ পাবে আপনাদের নাতি বা নাতনি (অ্যালার্ম বাজে) O.K. time is up. আজকের মিটিং এখানেই শেষ।

অনু : শেষ! তোমার সাথে next কবে দেখা করতে হবে?

দাঁড়ি : আপনাদের ছেলের সাথে কথা বলে দু-দিনের মধ্যে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন । তা না হলে --- (সেকেন্ড জনকে জিজ্ঞাসা করে) next date কবে ফাঁকা আছি আমি?

২য় জন : 2nd Feb. 2051 মানে চার মাস বাদে দুপুর তিনটে থেকে পাঁচটা। (দাঁড়িয়ানা সাংকেতিক ভাষায় সেক্রেটারিদের নির্দেশ দেয়। ১ম জন একটি মেমরী চিপ দেয় অনুকে। অনু সেটা দেখে চমকে ওঠে।)

দাঁড়ি : ওটা আমাদের মিনিটস্ ওফ দ্য মিটিং। আপনাদের ছেলেকে বলবেন, এটা পড়ে একটা signature করে আজ রাতেই যেন একটা মেইল করে। আমি

টাইমের কাজ টাইম- এ করতেই পছন্দ করি, বাই-
(দাঁড়িয়ানা সাংকেতিক ভাষায় সেক্রেটারিদের প্রস্থানের নির্দেশ দেয়। ওরা সবাই চলে যায়, বিশ্ব ও অনু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

শেষ দৃশ্য

(বিশ্ব আর অনু অস্থির, পায়চারি করছে।)

অনু : কি গো চারটে দশ হয়ে গেল তো- মেইলটা ঠিকঠাক করেছিলে তো?

বিশ্ব : হ্যাঁ, রিপ্লাই করেছে তো দেখ।

অনু : না থাক। আসলে এই প্রথম এমন একজনকে পেলাম, যার ফ্যামিলি মেম্বার কথা বলতে আসছে। শোন না গো, এই মেয়ের সাথে বিয়ে দেব।

বিশ্ব : দাঁড়াও, মেয়ের বাড়ির লোক আসুক, ছেলেকে পছন্দ হোক, মেয়ের ছেলেকে পছন্দ হোক, তারপর তো বিয়ে।

অনু : কেন আমার ছেলে কি ফ্যালনা নাকি? দ্যাখো, ঠিক পছন্দ হবে। (কলিং বেল বাজে) ওই এসে গেছে। যাও যাও নিয়ে এস।

বিশ্ব : ঠিক আছে , যাই।

অনু : এই শোন, ওদের সামনে খাই খাই খাই করবে না। যাও, এই শোন- কথা-বার্তা মেপে বলবে, তোমার জন্য যেন এই মেয়ে ফসকে না যায়, যাও(বিশ্ব আবার ফিরে আসে) কি হল?

বিশ্ব : আর কিছু বলবে না?

অনু : যাও।

বিশ্ব : (নিয়ে আসে) এস, বাবা এস, বাবা এস।

প্রসন্ন : মিস্টার এণ্ড মিসেস্ দত্ত- নাইস্ টু মিট ইউ।

অনু : সেম্ টু ইউ, কি গো - সেম্ টু ইউ-

বিশ্ব : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেম্ টু ইউ।

প্রসন্ন : আমি প্রসন্ন, বন্ধুরা বলে প্রশ্ন,, আপনারাও তাই বলবেন- (জুতো খুলেই দুজনকেই প্রণাম করতে যায়)

অনু : একটু অক্সিজেন নাও।

প্রসন্ন : না, থাক, আমার আছে।

বিশ্ব : তাহলে একটু চার্জ নাও।

প্রসন্ন : না, না, আই অ্যাম ফুল্লি চার্জড, থ্যাঙ্ক ইউ। (জোব্বা, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, মাস্ক খুলে রাখে, তারপর বলে) ইফ ইউ ডোনট্ মাইণ্ড, আমি কি ওইখানে বসতে পারি?

বিশ্ব : হোয়াই নট, সিওর- বোসো, বোসো।

অনু : বোসো, চা খাবে তো?
প্রসন্ন : চা, ওকে, তবে উইদাউট সুগার এণ্ড মিল্ক।
বিশ্ব : আমারটা কিন্তু-
অনু : হ্যাঁ, জানি , মিঃ ডট্-ও তোমার মতো, উইদাউট সুগার এণ্ড মিল্ক - গ্রিন টি। আর আমার এই সময় ১২.৫ এম.এল্ ফ্রুট জ্যুস্। তোমরা গল্প কর, আসছি।
বিশ্ব : এখানে আসতে কোন অসুবিধা হয় নি তো?
অনু : না, না, গাড়ীর মেমরী চিপ - এ আপনাদের অ্যাড্রেসটা সেভ করে দিয়েছি, ব্যাস, চলে এলাম।
বিশ্ব : বাঃ ভাল। তা কি করা হয়?
অনু : আমি এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছি।
বিশ্ব : ওঃ! আমার বব্- এর মত। তা মা-বাবার সাথেই থাকো তো তোমরা?
অনু : অবশ্যই। ফ্যামিলি আমার কাছে সবার আগে। হোম ইজ লাইক এ ডেজার্ট, উইদাউট মম্ এণ্ড ড্যাড্।
বিশ্ব : বাহ্! আমরা তো এরকমই চাইছিলাম।
অনু : এই মডার্ণ ওর্য়াল্ড -ও ফ্যামিলি কন্সেপ্ট-টাই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা একে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। (অনু ঢোকে চা ও মিষ্টি নিয়ে)
অনু : চা-
বিশ্ব : হ্যাঁ গো, ওরা কিন্তু মা-বাবার সাথেই থাকে।
অনু : তাই। বাহ- (মিষ্টির প্লেট নিয়ে প্রসন্নকে দেয়)
প্রসন্ন : একি! মিসেস দত্ত, এগুলো আবার কেন?
বিশ্ব : খেয়ে নাও, কড়া পাকের সন্দেশ।
প্রসন্ন : আসলে, ওয়েট মেনটেইন করার জন্য রেগুলার জিম-এ যাচ্ছি। মিষ্টি খাওয়া একদম মানা।
অনু : আমার ছেলেও তো জিমে যায়।
প্রসন্ন : জানি।
অনু : ওঃ, তুমি চেনো নাকি আমার ছেলেকে?
প্রসন্ন : চিনি মানে? হি ইজ মাই বেস্ট ফ্র্যাণ্ড। আমার প্রশ্ন নামটা তো ওরই দেওয়া। সব বন্ধুদের ও এইরকম নাম দেয়। গত মাসে আমরা দু-জন তো ব্যাঙ্গালোর ট্যুরে গিয়েছিলাম।
বিশ্ব : তাহলে তো তোমাদের বাড়ির সবাইকেই আমার ছেলে ভালোভাবেই চেনে।
প্রসন্ন : না, বাড়ির সবাইকে না, শুধু আমাকে চেনে। সবকিছু ফাইনাল হওয়ার পর পরিচয় করাব। আমি আবার ওল্ড ভ্যালুজ গুলোকে রেসপেক্ট করি।

বিশ্ব : বাহ! তবে আমরা কিন্তু অত ওল্ড নই, এই যে তোমার আন্টি আর আন্টা, আমাদের যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হয়েছিল।

প্রসন্ন : আমারও হয়েছিল, একজনকে দেখে-

বিশ্ব : বাঃ, তারপর, তারপর?

প্রসন্ন : তার আর পর নেই, আঙ্কেল।

অনু : মানে?

প্রসন্ন : একটা মেয়েকে সম্পূর্ণরূপে নিজের করে পাওয়ার মত আর্থিক সঙ্গতি যে আমার নেই। কমপিটিশনে হেরে গেছি।

বিশ্ব : কেন? এখন তো এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্টে খাসা রোজগার।

প্রসন্ন : ভালো। মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে নিয়ে যারা বিজনেস করে, তাদের জন্য ভালো। কিন্তু কাজটা অন্যরকম। অ্যাওয়ারনেস বলতে পারেন। অ্যাওয়ারনেস ফর নেচার এণ্ড উওম্যান। মানুষকে শিক্ষিত করার একটা চেষ্টা।

অনু : ঠিক বলেছ। আমাদের ভোগবিলাস, অদূরদর্শিতা-ই তো আমাদের খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। WHO বলছে আর বছর কুড়ি পরে পৃথিবী নাকি আর বাসযোগ্য থাকবে না। এখনো যতটুকু আছে সেটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিশ্ব : কাকে শিক্ষিত করবে প্রসন্ন ! আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে এসেছি। আমাদের ধর্ম,পোষাক, খাদ্য, ভাষা সব আলাদা। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা এক, আমরা সবাই ছেলে চেয়ে এসেছি। প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছি প্রকাশ্যে, কন্যাভ্রূণ হত্যা করে এসেছি গোপনে।

প্রসন্ন : আপনাদের মতো করে ক'জন ভাবেন বলুন তো। ক'জন বা ভবিষ্যৎটা দেখতে পায়। সবাই বর্তমানের সুযোগ-সুবিধা নিতেই ব্যস্ত।

অনু : বর্তমানেও আমরা ভালো নেই প্রশ্ন! আমাদের মতো অনেক বাবা-মাই তো ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। মেয়ে পাচ্ছে না।

প্রসন্ন : কোথায় পাবে? এখন পুরুষ ও নারীর অনুপাত ৬ ঃ ১, ছ-জন পুরুষ প্রতি একজন নারী। তার উপর পলিউশন, স্ট্রেস ৪০% মানুষের প্রজনন ক্ষমতাই নেই। আপনার ছেলের জন্য আস্ত একটা মেয়ে কোথায় পাবেন?

অনু : আচ্ছা বলতো আমাদের পূর্বপুরুষেরা এত বোকা ছিল কেন? তারা কি বুঝতে পারেনি, নারী ও প্রকৃতি সমার্থক, একটা ধ্বংস হলেই সৃষ্টি থেমে যাবে?

প্রসন্ন : আচ্ছা, শুনেছি আপনাদের চারপাশে নাকি অনেক গাছ ছিল?

বিশ্ব : হ্যাঁ ছিল তো। এখন তোমরা হলিডেতে বেড়াতে যাও রিজার্ভ ফরেস্টে গাছ দেখতে । আমাদের অক্সিজেন দিত গাছ, আর এখন দেয় বিভিন্ন কোম্পানী ।

সূর্যের ইউ.ভি. রশ্মি থেকে বাঁচতে স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারছি না, জোব্বা পরছি। গায়ের লোম সব উঠে যাচ্ছে, চোখের সামনে সব শেষ হতে দেখছি প্রসন্ন।

প্রসন্ন : না আঙ্কেল, এখনও সব শেষ হয়নি, আমি আর বব্, ওয়ার ফর নেচার এণ্ড উওম্যান-এ সামিল হয়েছি।

বিশ্ব : আমাদের বব্! বলছ কি?

প্রসন্ন : হ্যাঁ, আমি আর বব্। এছাড়া আমাদের অনেক বন্ধুও আছে।

অনু : আমরাও আছি তোমাদের সাথে, কি গো তাই তো?

বিশ্ব : অবশ্যই, তা তোমাদের মিশন-টা কি?

প্রসন্ন : আমাদের প্রধান কাজ হল মানুষকে সচেতন করা। মানুষকে বোঝানো যে, নিজের স্বার্থেই প্রকৃতি আর নারীকে রক্ষা করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা এই প্রোজেক্ট এর প্রত্যেক সদস্য ৩ থেকে ৪টি কন্যা সন্তান জন্ম দেব।

অনু : সন্তান! বিয়ে করে তো?

প্রসন্ন : বিয়ের জন্য মেয়ে কোথায় পাব আন্টি?

অনু : তাহলে সারোগেসি?

প্রসন্ন : না, না। সারোগেট মাদার হায়ার করার খরচাও তো অনেক।

অনু : তাহলে?

প্রসন্ন : আমাদের জন্য ওভাম ব্যাঙ্ক -এ ওভাম আছে, আর আছে গ্রীন ইউটেরাস।

বিশ্ব : না, না। তা কেন? বলোতো, আমি তোমার জন্যও না হয় একটা মেয়ে খুঁজে দেব।

প্রসন্ন : মিথ্যে স্বপ্ন দেখাবেন না আঙ্কল। আমার কি ইচ্ছা করে না, একটা মেয়েকে বিয়ে করে স্বাভাবিক লাইফ লীড করতে! কি করব বলুন! তবে আঙ্কেল এই যুদ্ধটা যদি আমরা জিততে পারি, তাহলে নেক্সট জেনারেশন-এর ছেলেদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমরা যে সৈনিক।

বিশ্ব : এই বয়সে আমরা হয়ত প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতে পারব না প্রশ্ন, কিন্তু তোমাদের পাশে আমরা আছি।

প্রসন্ন : থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল, থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি। আজ সন্ধ্যেটা আপনাদের সাথে খুব ভালো কাটল। বাই দ্য বাই, আমার একটা এনভায়রনমেন্টের উপর সেমিনার এ্যাটেন্ড করতে হবে। আজ আসি। আচ্ছা, আমাকে আপনাদের কেমন লাগল যদি একটু বলেন?

অনু : তোমাকে তো আমার দারুণ লেগেছে মনে হচ্ছে যেন কত চেনা, কত আপন! হ্যাঁ গো তোমার?

বিশ্ব : দারুণ।

অনু : তুমি আমার ববের বন্ধু। এত ভালো একটা কাজ করছ, তোমাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা হবে ভেবেই আমার খুব ভালো লাগছে। এখন তোমার বোনকে দেখলেই বিয়ের দিনটা পাকা করে ফেলতে পারি।

প্রসন্ন : বোন!

অনু : হ্যাঁ, তোমার বোন, যার সাথে ববের বিয়ে দেব।

প্রসন্ন : আমার তো কোন বোন নেই।

অনু : তাহলে তুমি কার জন্য মানে-

প্রসন্ন : আমি তো এতক্ষণ আপনার ছেলের সাথে আমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছিলাম। (অনু অজ্ঞান হয়ে পড়ে, বিশ্ব জলের ঝাপটা দেয়)

অনু : আমি কোথায়?

বিশ্ব : এই তো আমার কোলে।

প্রসন্ন : সরি, আমার জন্য আন্টি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি। আচ্ছা বব্ কিছু বলেনি?

বিশ্ব : না।

প্রসন্ন : লাস্ট পাঁচ বছর ধরে আমরা খুব ভালো বন্ধু। এখন আমাদের স্ট্যাটাস টা সিঙ্গল থেকে ম্যারেড করতে চাই।

অনু : তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করতে চাও কেন?

প্রসন্ন : একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন মিসেস্ দত্ত। আপনারা কি চান- একটা সুন্দর ফ্যামিলি, ছেলে-বৌমা- নাতি-নাতনি, তাই তো? আমি সব দিতে পারব আপনাদের। একজন বৌমার মধ্যে যে যে গুণ আপনি চান, সব আমার মধ্যে পাবেন। আমি ভাল উপার্জন করি, রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অসুস্থ হলে সেবা করতে পারি, বাচ্চা মানুষ করতে পারি।

বিশ্ব : আচ্ছা বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব-মানে তুমি, মানে তোমরা কি?

প্রসন্ন : নো আঙ্কেল, উই আর নট গে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে আমরা সম্পূর্ণ পুরুষ।

বিশ্ব : তাহলে এই জীবন বেছে নিচ্ছ কেন? আমি না হয় তোমাদের দুজনের জন্যই মেয়ে খুঁজব।

প্রসন্ন : এই অবাস্তব ভাবনা নাই বা ভাবলাম! আমার-ও তো ইচ্ছা করে একটা মেয়েকে বিয়ে করে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন পেতে। আপনার ছেলেরও নিশ্চয়ই করে। কিন্তু উপায় নেই। এই যুদ্ধটা আমাদের জিততেই হবে। তাই আমি আর বব্ ঠিক করেছি, আমরা বিয়ে করব। হ্যাঁ স্বাভাবিক সেক্সুয়াল লাইফ আমরা পাব না জানি, কিন্তু একজন বন্ধু তো পাবো। একা একা কি বাঁচা যায় আন্টি? আপনারাও

নাতনি পাবেন। (কেউ কথা বলে না) মা, বাবা, এই যুদ্ধে আমাদের পাশে থাকুন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে সবুজ প্রকৃতি আর কন্যা সন্তান উপহার দিয়ে মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি আমরা। (কেউ কথা বলে না প্রসন্ন সব কিছু গুটিয়ে বেরোনোর সময় বলে) সরি, আপনাদের সন্ধ্যেটা আমি নষ্ট করে দিলাম। (বেরোনোর আগে থেমে গিয়ে) একটু ভেবে দেখবেন প্লীজ।

বিশ্ব : শুনলে রাধা আমাদের ছেলেদের কথা। ওরা যে পৃথিবীকে বাঁচানোর মহান ব্রত নিয়েছে।

অনু : কী বলছো কি তুমি! ওরা দুটো ছেলে বিয়ে করতে চাইছে, ওদের ভবিষ্যৎটা কী হবে ভেবেছো?

বিশ্ব : ওরা যে নিজেদের কথা না ভেবে নি:স্বার্থভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যতের কথা ভাবছে। নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করছে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য। এছাড়া যে আর কোনো উপায় নেই গো, পৃথিবীকে বাঁচাবার, মানব সভ্যতাকে বাঁচাবার। আমরা কি আমাদের ছেলেদের পাশে দাঁড়াতে পারি না?

লেখিকা : সংগীতা চৌধুরী, ইছাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)এর জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নাটককার।

সুশান গ্লাসপেলের

" সাপ্রেসড্ ডিজায়ার" অবলম্বনে নাটক

সুপ্ত বাসনা

শংকর বসুঠাকুর

। নির্বাণ । ডঃ রায় । মিঃ হাজরা । অনিতা । আত্রেয়ী ও কাবেরী ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক নির্বাণ সেনের বসবার ঘর। সকালবেলা। মঞ্চে উপস্থিত নামকরা প্রকাশক হাজরা বাবু এবং মনঃ সমীক্ষক ডাঃ রণেন রায়। দু'জনেই চা পান করছেন। অন্দর থেকে সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ভেসে আসছে। ডাঃ রায় গান উপভোগ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু হাজরাবাবুর সশব্দে চা পান ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। গান শেষ হয়। হাজরাবাবু সশব্দে শেষ চুমুক দিয়ে ঠক করে কাপ রাখেন....... ডাঃ রায় আর চুপ করে থাকতে না পেরে.......।

ডাঃ রায় : একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি হাজরা বাবু। আপনি কিন্তু খুব চালাক লোক।

হাজরা : তার মানে কি ক্ষতি করেছি আপনার যে এই ধরণের মন্তব্য করছেন!

ডাঃ রায় : ছি, ছি, আপনি অন্য মানে করবেন না! আমি বলতে চাইছিলাম চা খাবার সময় এত শব্দ করছিলেন যে গানটা ঠিকমতো উপভোগ করতে পারছিলাম না-

হাজরা : খুউব শব্দ হচ্ছিল?

ডাঃ রায় : ভী-ষ-ণ! আপনি যতবার চুমুক দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল এক একটা চড়াই পাখি ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে যোচ্ছিল—

হাজরা : [ইতিমধ্যে পকেট থেকে লবঙ্গ বের করে] খাবেন?

ডাঃ রায় : কি?

হাজরা : লবঙ্গ! [ডঃ রায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে। হাজরা নিজের মুখে লবঙ্গ ফেলে দুবার দ্রুত চুষে নিয়ে] Sad! Very sad! আমার জন্য আপনি সঙ্গীত সুধা পান করতে পারলেন না ইয়ে বাবু.....

ডাঃ রায় : রণেন -ডাঃ রণেন রায়........

হাজরা : ইয়েস, ডাঃ রণেন রায়, দেখুন আপনি একজন নামকরা লোক, তবু আপনার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি। আমার একি হল! ঠিক আছে, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন ডাক্তারবাবু....

ডাঃ রায় : ছি, ছি, আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন! অনেকেরই অনেকরকম বদভ্যাস আছে, সেগুলো বর্জন ....

হাজরা : আমার কোনো বদভ্যাস নেই, কিন্তু ইদানিং এমন টেনশনে ভুগছি না যে ইচ্ছে না থাকলেও জনসমক্ষে নানারকম অসভ্য আওয়াজ বেরিয়ে পড়ছে- কি করা যায় বলুন তো?

ডাঃ রায় : কি জন্য টেনশন সেই কারণটা খুঁজে বের করুন- এর পরে kill it.....

হাজরা : মেরে ফেলব?

ডাঃ রায় : হুম!

হাজরা : কি যে বলেন না-তাহলে তো এ বাড়ির কত্তা সাহিত্যিক নির্বাণ সেন কে মেরে ফেলতে হয়......

ডাঃ রায় : ব্যাপারটা এইরকম!

হাজরা : একদম! আসছে বইমেলায় ওঁর একটা মেগা উপন্যাস আমি ছাপছি [গলা নামিয়ে] মোটা টাকা আমি দিয়েছি কিন্তু উনি ক্রমাগত আমাকে হয়রান করে চলেছেন।

ডাঃ রায় : এটা করা ওনার উচিৎ হচ্ছে না-

হাজরা : (বিরক্ত) আজ পাঁচ পাতা দিলেন তো তিন দিন চুপ! তারপর দয়া করে দশ পাতা দিলেন- এই, এইভাবে ঘোরাচ্ছেন- আজ অন্তত পঞ্চাশ পাতা নিয়ে তবে যাব....

ডাঃ রায় : এইসব লোকের সাথে কাজ করেন কেন?

হাজরা : উপায় নেই, ওঁর লেখার দারুণ কাটতি মশাই, তবে আগে এরকম ছিলেন না। আকাদেমী পাবার পর থেকে লেজ মোটা হয়ে গেছে..... কেন যে প্রকাশক হলুম... একেবারে নাজেহাল অবস্থা...

ডাঃ রায় : আপনাদের লাইনটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়- কবি, সাহিত্যিক , পাঠক, বই!!!

হাজরা : কচু-কচু, এর থেকে আপনার মতো পাগলের ডাক্তার হলে অনেক ভালো হতো-

ডাঃ রায় : (বিরক্ত) কি ধরনের আপত্তিকর কথা বলছেন আপনি! " পাগলের ডাক্তার" এসব কথা বলতে আছে, ছিঃ-

হাজরা : তবে আপনি কি?

ডাঃ রায় : আমরা হচ্ছি সাইকোএনালিস্ট....

হাজরা : নির্বাণবাবু কিন্তু বলেন আপনি পাগলের ডাক্তার।

ডাঃ রায় : জানি তো। ঐ ভদ্রলোক আমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই আমার নামে এসব উল্টোপাল্টা কথা বলেন।

হাজরা : তা'বলে এখানে আসেন কেন?

ডাঃ রায় : ঐ কাবেরীর জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়।

হাজরা : কে কাবেরী?

ডাঃ রায় : আরে মিসেস সেন। আপনাদের নির্বাণবাবুর স্ত্রী।

হাজরা : [মজা পেয়ে] এই দ্যাখ- আপনাকেও ঐ রোগে ধরেছে।

ডাঃ রায় : [শুনতে না পেয়ে] আপনি কিছু বললেন?

হাজরা : এই জানতে চাইছিলুম, মিসেস সেন কি ছিটিয়াল?

ডাঃ রায় : আশ্চর্য্য-ওনার মতো একজন হাইলি সফেস্টিকেটেড মহিলা ছিটিয়াল হতে যাবেন কেন! আপনি জানেন,আমরা দুজন মিলে যে ব্রত পালন করে চলেছি, ভবিষ্যতে দেখবেন তার সুফল সমাজের প্রতিটা স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।একটা নিঃশব্দ বিপ্লব। এ সায়লেন্ট রেভলিউশান- [হাজরা বিকট হাই তোলে। ডাঃ রায় থমকে গিয়ে আবার শুরু করেন] এই নিঃশব্দ বিপ্লব- [হাজরা দ্বিতীয়বার হাই তোলে] আচ্ছা হাজরা বাবু, আপনি কি আমাকে কথা বলতে দিতে চান না-

হাজরা : যাঃ বাবা, আপনি এরকম ভাবছেন কেন?

ডাঃ রায় : ভাবছি এই কারণে; বার বার বিকট হাই তুলে আপনি আমাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করছেন-

হাজরা : ব্যাঘাত সৃষ্টি করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই মশাই। অপেক্ষা করে করে আমি একেবারে হেদিয়ে গেছি তাই ঝিমুনি আসছে, হাই উঠছে।

ডাঃ রায় : হতে পারে, অলসভাবে বসে থাকলে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়।

হাজরা : তবে আমি আবার বলছি ডাক্তারবাবু, আজ অন্তত তিন ফর্মা লেখা না নিয়ে আমি উঠবো না।

ডাঃ রায় : এই ধরনের মনের জোর, প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে মানুষকে সাহসী করে তোলে। তাহলে আমি যে কথা বলছিলাম মিঃ হাজরা, এই নিঃশব্দ বিপ্লব-

হাজরা : [হাত নেড়ে] বাদ দিন ঐসব কথা আমার মাথায় ঢুকবে না ....

ডাঃ রায় : বেশ, তাহলে অন্য প্রসঙ্গে যাই-

হাজরা : যদি পারেন একটু চুপ করে থাকুন না।

ডাঃ রায় : কেন চুপ করে থাকব, এই যে আমরা দু'জন মানুষ একজনের বৈঠকখানায় বসে রয়েছি এখন আমরা যদি কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকি তাহলে লোকে ভাববে যে আমাদের মধ্যে পরিচয় নেই অথবা একটা তিক্ত সম্পর্ক....

হাজরা : যে যা খুশি ভাবুক, আমি এখন চাইছি চুপ করে থাকতে।

ডাঃ রায় : থাকুন-চুপ করে থাকুন- কিন্তু আমি এখন আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করবো, সেগুলো আপনি আকারে-ইঙ্গিতে উত্তর দিন তাহলেই হবে।

হাজরা : আপনি খুব জ্বালাতন করছেন ডাক্তারবাবু।

ডাঃ রায় : আবার আপনি কথা বলছেন-চুপ-
[হাজরা হাতের ভঙ্গিতে জানায় ঠিক আছে। ডাঃ রায় ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে] এই

হাজরাবাবু, কিছুক্ষণ আগে আমরাযখন চা-পান করছিলাম তখন অন্দরমহল থেকে সুরেলা কণ্ঠে,রবীন্দ্র সংগীত ভেসে আসছিল, আপনি কি জানেন কে গাইছিলেন-

হাজরা : এইটুকু বলতে পারি যে ঐ গান আমি গাইনি-

ডাঃ রায় : [বিরক্ত] আপনি এইভাবে কথা বলছেন কেন। আমি দরকার না পড়লে এ বাড়িতে আসি না, আর আপনি তো রোজ আসেন।

হাজরা : তাতে কি হলো!

[এইসময় নির্বাণবাবুর বোন অনিতার প্রবেশ। পরনে হাউস কোট। সে কলেজে পড়ে।]

হাজরা : ঐ অনিতা মা এসে গেছে । ঘরের লোক। ওকেই জিজ্ঞেস করুন-

অনিতা : কি হয়েছে হাজরা কাকু-

হাজরা : আমার কিছু হয়নি মা, চুপটি করে বসে রয়েছি কিন্তু ডাক্তারবাবু.....

ডাঃ রায় : না- না- সিরিয়াস কিছু হয়নি। এই আমাদের দুজনের মধ্যে .....

অনিতা : নানারকম কথাবার্তা হচ্ছিল, তাই তো?

ডাঃ রায় : হ্যাঁ একজ্যাক্টলি, কতো কি আলোচনা। এই হাজরাবাবুর কাছ থেকে আজই প্রথম আমি জানতে পারলাম যে বই ছাপতে গেলে প্রকাশকের কত ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়। লেখকরা কিভাবে ......

অনিতা : আপনি বুঝি আমার দাদার দুর্নাম করছিলেন।

হাজরা : [হা হা করে ওঠে।] ছি ছি মা, আমি ওনার সম্বন্ধে অকথা- কুকথা বলতে পারি। এই পাগ- থুড়ি ডাক্তারবাবু আমার নামে বাজে কথা বলছে।

অনিতা : ঠিক আছে - ঠিক আছে- আপনাকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না। ডাক্তারবাবু আর এক কাপ চা খাবেন।

ডাঃ রায় : একদম না- থ্যাঙ্কয়্যু- তবে হাজরাবাবু....

অনিতা : হাজরাকাকু বেশী চা খান না। ঐ এক কাপ ব্যাস-

হাজরা : [খুশী] দেখুন ডাঃ রায়, অনিতা মা আমাকে কিরকম অন্তরঙ্গ ভাবে চেনে। হ্যাঁ গো, দাদার খবর কি?

অনিতা : খুব ভাল খবর। দাদা আপনার লেখাটা খস খস করে লিখে চলেছে, পাতার পর পাতা। কাল অনেক রাত পর্যন্ত লিখেছে, আজ আবার ভোর থেকেই বসে গেছে। এই তো আমি লুচি তরকারী খাইয়ে এলাম।

ডাঃ রায় : ওয়ান্ডারফুল— কাজের প্রতি কি নিষ্ঠা।

হাজরা : হ্যাঁ গো- নির্বাণবাবু লিখতে এত ব্যস্ত যে নিজের হাতে পর্যন্ত খেতে পারছেন না?

অনিতা : হ্যাঁ তো - আমি তো বাবারে - বাছারে বলে লুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে তুলে দিলাম।

খেতে খেতে দু'তিনবার আমাকে বলছে, "নিতাবুড়ী; হাজরাবাবুর জন্য যে লেখাটা লিখছি না, এটা হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখা ম্যাগনাম ওপাস-

[হাজরাবাবু উত্তেজনায়, উঠতে গিয়ে প্রায় টলে পড়ে।]

হাজরা : ওরেববাসরে, কত ভাগ্য করে এরকম লেখকের স্নেহ আমি পেয়েছি। তুমি দেখে নিও অনিতা মা তোমার দাদা এবার নোবেল পাবে।

অনিতা : আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

হাজরা : নিশ্চয়ই পড়বে মা, নিশ্চয়ই পড়বে। ডাঃ রায়, এই কিছুক্ষণ আগেই আপনাকে বলছিলাম না সাহিত্যিক নির্বাণ সেন একজন মহাপুরুষ।

ডাঃ রায় : এরকম কথা কখন বললেন!

হাজরা : আপনি তো ভালো কথা শুনতে পান না-

অনিতা : ঠিক আছে, ঝগড়া করতে হবে না।

হাজরা : আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো- [অনিতা ঘাড় নাড়ে] মহামানব আমায় কখন দর্শন দেবেন।

অনিতা : দাদা তো আপনার জন্যেই বসে রয়েছে, আমি আপনাকে নিতে এলাম।

হাজরা : [লাফিয়ে উঠে] সময় নষ্ট না করে এখনি চলো মা, তাকে দর্শন করি।

অনিতা : এত ছটফট করবেন না তো। জুতোটা খুলে রাখুন। দাদার লেখার ঘরে .....

হাজরা : [জীব কেটে] জানি তো। মন্দিরে কেউ জুতো পরে যায়! উত্তেজনায় ভুল করে ফেলেছিলাম চলো মা-চলো- [দুজনের প্রস্থান]

[ঘরে ডাঃ রায় একা গুনগুন করে গান গাইতে থাকে। যে গানটা সে আগে শুনেছিল।] [কাবেরীর প্রবেশ]

কাবেরী : মর্নিং ডাঃ রায়- [ডাঃ রায় সচকিত]

ডাঃ রায় : মর্নিং - গুড মর্নিং মিসেস সেন- বাঃ আপনাকে তো ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে "সো কিউট"।

কাবেরী : [সলজ্জ] যাঃ - কি যে বলেন, আমার কিন্তু খুব লজ্জা করছে।

ডাঃ রায় : শুনুন মিসেস সেন আমি কিন্তু একদম 'ফ্ল্যাটারি" করছি না। আপনি সত্যি আমার চোখ টেনে নিচ্ছেন, মন কেড়ে নিচ্ছেন।

কাবেরী : [খুশি] চমৎকারভাবে বললেন আপনি। অবশ্য সবাই একথা বলে যে আমি নাকি একটু সাজলেই.....

ডাঃ রায় : একদম ঠিক, একটু টাচ দিলেই, আই মিন জাস্ট এ লিটিল মেকওভার- আর ওমনি আপনি ভীষণ 'এ্যাট্রাক্টিভ" হয়ে ওঠেন।

কাবেরী : ওমা- তাই নাকি! এবার থেকে তাহলে সাজবই না।

ডাঃ রায় : ভুলেও এই ভয়ংকর কাজ করবেন না মিসেস সেন। "ডিজাস্টার" হয়ে যাবে। সমাজে বিপর্যয় ঘটে যাবে।

কাবেরী : ওমা ! কেন ?

ডাঃ রায় : [আবেগ] মনোরম , মসৃণ সৌন্দর্য্য মনকে শান্ত রাখে। এই যে, প্রাণী জগতে, বিশেষ করে মনুষ্যজগতে মনের মধ্যে না একটা ভায়লেন্ট আই মিন হিংসাত্মক পাঁচ মিশুলি ডাল টগবগ করে ফুটছে সেটাকে প্রশমিত করতে হলে চাই একটা 'এফেক্টিভ মশলা" এণ্ড মিসেস সেন সৌন্দর্য্য হচ্ছে সেই উপাদান। ভেতরের গনেগনে আঁচটা কমিয়ে দেয়,টগবগ, টগবগ করা হিংসাটা কমতে কমতে বুড়বুড়, বুড়বুড় করতে করতে এক্কেবারে ....

কাবেরী : [অবাক] কমে যায় !

ডাঃ রায় : শুধু কমে যায় কি- গরম দুধ ঠাণ্ডা হলে যেরকম সর পড়ে ঠিক সেইরকম আমাদের মনের ওপর একটা সর পড়ে যায়।

কাবেরী : [ভাবাদিষ্ট] তারপরে কি হয় ডাঃ রায় ?

ডাঃ রায় : [সাদামাটাভাবে] সরটা তুলে রাবড়ি বানিয়ে মেরে দিন।

কাবেরী : [খুশিতে হাত তালি দিয়ে] ওমা, কি সুন্দর সহজ-সরলভাবে আপনি আমাকে একটা জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন ডাঃ রায় ! আপনি একজন বিরল প্রতিভা।

ডাঃ রায় : [উচ্ছ্বসিত] এই যে আপনার মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং প্রাণময়তার যে অদ্ভূত মিশ্রণ ঘটেছে সেটা সচরাচর দেখা যায় না। আর এইজন্যই মিসেস সেন আপনি একজন বিরল ব্যক্তিত্ব।

কাবেরী : আমাকে কিন্তু একবারও আপনি কাবেরি বলে ডাকেন নি। খালি মিসেস সেন, মিসেস সেন করে যাচ্ছেন।

ডাঃ রায় : এই যে এবার বলছি, আচ্ছা কাবেরী কিছুক্ষণ আগে আপনাদের অন্দরমহলে কে যেন খুব মিষ্টি গলায় গান গাইছিলেন-

কাবেরী : আর সেই গানটাই তো আপনি গুন গুন করে গাইছিলেন।

ডাঃ রায় : ঐ গানটা আমার খুব প্রিয়।

কাবেরী :কিন্তু আপনার গানের গলা যে এতো ভালো সেটা তো আমি জানতাম না। [ডাঃ রায় প্রশংসা উপভোগ করেন।] আপনি না ভীষণ ইয়ে। এতদিন আপনার সাথে পরিচয় তবু আমাকে একটাও গান শোনান নি - কেন ?

ডাঃ রায় : আমাদের কি সে অবকাশ আছে কাবেরী। যে কঠিন ব্রত আমরা পালন করছি-

কাবেরী : ঠিক-ঠিক বলেছেন। অসুস্থ মনগুলোকে আমরা সুস্থ করে তুলছি অন্তত চেষ্টা করছি এটা কি কম কথা।

ডাঃ রায় : কিন্তু জানেন কাবেরী, আপনার হ্যাজবেণ্ড সে কথা বুঝতে চান না। তিনি লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি পাগলের ডাক্তার। এরপর হয়তো রটিয়ে দেবে আমি পাগল ডাক্তার। কি দুষ্টু লোক বলুন তো -

কাবেরী : [হেসে] আপনি নির্বাণের কথা ধরবেন না। লিখতে লিখতে না কিরকম

খিটখিটে হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষটা ভারি ভালো।

ডাঃ রায় : নিজের জিনিস খারাপ হলেও লোকে ভালো বলে বাজারে চালিয়ে দেয়।

কাবেরী : শুনুন ডাক্তারবাবু কবি, সাহিত্যিকদের লাইসেন্স আছে। ওরা যে কোন লোককে আজেবাজে কথা বলতে পারে।

ডাঃ রায় : এটা আপনি খাঁটি কথা বলেছেন।

কাবেরী : আজ তাহলে আমরা কোন বিষয়ে আলোচনা করবো?

ডাঃ রায় : আজ আলোচনাটা মুলতুবি থাক-

কাবেরী : সেই ভালো, বাড়ীতে আমার গেস্ট এসেছে, আই মিন, আমার বোন.....

ডাঃ রায় : গানটা বোধহয়.... !

কাবেরী : ঠিক ধরেছেন, ওর গানের গলা খুব ভালো। আর জানেন ডাক্তারবাবু ওর নামটাও ভারি মিষ্টি।

ডাঃ রায় : জানি তো ... গো-দা-ব-রী - তবে টাইটেলটা জানি না।

কাবেরী : ছিঃ আমার বোনের নাম ওরকম বিশ্রী হতে যাবে কেন, ওর নাম হচ্ছে "আত্রেয়ী"।

ডাঃ রায় : [বিব্রত] যাঃ - আমার অনুমানটা ভুল হয়ে গেল। কিন্তু কাবেরীর পর তো গোদাবরী হওয়া উচিত ছিল। আপনার বাবা কিন্তু ঠিক কাজ করেন নি।

কাবেরী : [রেগে] খবরদার ডাক্তারবাবু আমার বাবাকে নিয়ে কোনো সমীক্ষা করতে যাবেন না। ওঁকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি।

ডাঃ রায় : [বিব্রত] ভুল হয়ে গেছে কাবেরী। মার্জনা করে দিন।

কাবেরী : বাবার স্মৃতি আমাদের কাছে এমনই স্পর্শকাতর না, যে ওর কথা উঠলেই আমরা ভাই বোনেরা কিরকম আবিষ্ট হয়ে পড়ি।

ডাঃ রায় : "এক্সেলেন্ট"- কথায় বলে ভাবাবিষ্ট, কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন আমার বলতে ইচ্ছে করছে বাবাবিষ্ট হয়ে পড়ছি।

কাবেরী : [সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে] শান্ত হোন ডাক্তার রায়। আপনি "সাইকো অ্যানালিস্ট"। মনকে নির্মোহ রাখতে হবে। নইলে, ব্রত পালন করবেন কি করে।

ডাঃ রায় : [কাঁধ ঝাঁকিয়ে] এই দেখুন, একেবারে ভগবান বুদ্ধের মতো নির্মোহ হয়ে গেলাম, এবার আপনি একটার পর একটা রুগী ধরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন আর তারই সাথে আমাদের ব্রত পালন চলতে থাকুক। এই যাঃ - কথায় কথায় একটা জরুরী বিষয় আপনাকে জানাতে ভুলেই গেছি।

কাবেরী : [সাগ্রহে] বলুন না ডাক্তারবাবু-

ডাঃ রায় : গতমাসে আপনি দু'জন খদ্দের থুড়ি পেশেন্ট পাঠিয়ে ছিলেন এ মাসে এখন পর্যন্ত একজনও....

কাবেরী :[হতাশ] জানি তো, একজন রুগীও যোগাড় করতে পারিনি-

ডাঃ রায় : লক্ষণটা ভালো নয় কাবেরী। সুস্থ মানুষ মানে হচ্ছে অসুস্থ সমাজ। অপরদিকে ...

কাবেরী : [কথাটা ধরে নিয়ে] সুস্থ সমাজ মানে হচ্ছে অসুস্থ মানুষ।

ডাঃ রায় : এমন কি একজনও লোক পাননি যার রাত্তিরে ভালো করে ঘুম হচ্ছে না।

কাবেরী : একজনও না। সবাই বলছে মার-মার ঘুম হচ্ছে। উল্টে আমাকে জিজ্ঞেস করছে এমন কোনো ওষুধ বলতে পারো যেটা খেলে রাতে একটু কম ঘুম হয়।

ডাঃ রায় : স্ট্রেঞ্জ! চিন্তায় চিন্তায় আমারই তো রাতের ঘুম চলে যাবে।

কাবেরী : [উৎসাহ] তাই! আমাকে একটা সুযোগ দেবেন ডাক্তারবাবু,আপনাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া মানে সমীক্ষা করি।

ডাঃ রায় : [জিভ কেটে] সর্বনাশ- ভুলেও এই কাজ করবেন না। হাতুড়ে ডাক্তার আর হাতুড়ির ঘা সমান বিপজ্জনক।

কাবেরী : ঠিক আছে আপনার কথা মেনেই চলবো।

ডাঃ রায় : আচ্ছা কাবেরী!! কেউ স্বপ্ন দেখছেন?

কাবেরী : একদম না। সবাই বলছে এতো ঘুমোচ্ছি; স্বপ্ন দেখার সময় আছে।

ডাঃ ররায় : যা বাবা, মানুষ স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যাচ্ছে!

কাবেরী : ভুলে যাচ্ছে না, বলছে সময় পাচ্ছে না।

ডাঃ রায় : ওদের স্বপ্ন দেখান কাবেরী। আপনার মহান ব্রত হবে স্বপ্ন ফেরি করা।

কাবেরী : স্বপ্নের ফেরিওয়ালা? বলা মাত্রই আমি যেন কেমন রোমাঞ্চিত হচ্ছি।

ডাঃ রায় : গুড-ভেরী গুড- এই রোমাঞ্চটাকে এবার কাজে লাগিয়ে খদ্দের যোগাড় করে আনুন। এবার আমি যাই কাবেরী। চেম্বারে এ্যাটেণ্ড করতে হবে।

[প্রস্থান]

কাবেরী : স্ব-প্নে-র ফে-রি-ও-য়-লা-- আমি বেরিয়ে পড়বো, দুয়ারে দুয়ারে ফেরি করে বলবো স্বপ্ন নেবে না -স্বপ্ন-

[এই সময় কাবেরীর স্বামী নির্বাণ ও প্রকাশক হাজরাবাবু বেশ জোরে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করেন। হাজরাবাবু খুশীতে ডগমগ করছেন।]

নির্বাণ : শোনো কাবেরী শোনো, হাজরাবাবু তোমাকে কি উপহার দিতে চাইছেন-

কাবেরী : হঠাৎ কি হলো যে হাজরাবাবু আমার প্রতি এত সদয় হলেন-

হাজরা : [বিনয়ে গদগদ] কি বলেন ম্যাডাম। আপনাদের মতো মানুষের দয়া পেয়ে আমি বেঁচে আছি।

নির্বাণ : আরে মশাই তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে আপনি এবার আসুন। আমাকেও তৈরী হয়ে বেরোতে হবে।

হাজরা : এই যে স্যার শেষ করে ফেলছি। শুনুন ম্যাডাম, আমার ইচ্ছে যে,আপনি কোথাও ভ্রমণ করে আসুন এবং এরজন্য যা খরচ লাগবে হাজরা পাবলিকেশান তা স্পনসর করবে।

কাবেরী : আমি কিন্তু নিতুবুড়ীকে না নিয়ে কোথাও যাব না।
নির্বাণ : ওকে রেখে আমরা কোথাও যেতে পারি নাকি।
হাজরা : আপনার ননদকে নিয়ে আপনি অতি অবশ্যই যাবেন।
কাবেরী : [বিরক্ত] খবরদার ননদ বলবেন না। অনিতা হচ্ছে আমাদের মেয়ে।
নির্বাণ : ঠিক আছে রে বাবা, ঠিক আছে। এখন বলো কোথায় যাবে।
কাবেরী : তুমি বলো না কোথায় যেতে পারি।
হাজরা : না ম্যাডাম, আমি চাই কোথায় যাবেন সেটা আপনি ঠিক করুন। দেশে-বিদেশে যেখানে খুশী।
কাবেরী : ওমা তাই ! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিঃ হাজরা। সেই চার বছর আগে একবার ব্যাঙ্কক গিয়েছিলাম। বিদেশ যাওয়া সেই প্রথম সেই শেষ। এই লোকটা এতো কিপ্টে না- অথচ নিজে প্রতি বছর এখানে সেখানে চলে যাচ্ছে।
নির্বাণ : আরে বাবা সে তো পরের পয়সায় যাই, সাহিত্যসেবা করতে। এখন তাড়াতাড়ি বলো কোথায় যেতে চাও। হাজরাবাবুকে সব ব্যবস্থা করতে হবে।
কাবেরী : [আবেগে] স্ক্যান্ডিনেভিয়া- সুইডেন, নরওয়ে - ওঃ মিঃ হাজরা এই ট্যুরটা যদি আপনি অর্গানাইজ করে দিতে পারেন না, তাহলে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে এই লোকটার কাছ থেকে আপনার জন্যে লেখা বার করবো আমিই- প্রমিশ-
নির্বাণ : হাজরাবাবু অতো কাঁচা লোক নন। আমার কাছ থেকে কথা নিয়ে নিয়েছেন। আগামী দু'বছরে তিনটে মেগা উপন্যাস ওকে দিতে হবে। কিন্তু কাবেরী তুমি নরওয়ে- সুইডেন- এসব জায়গায় যেতে চাইছো কেন! চলো সুইজারল্যান্ড যাই, নয়তো ইউ.এস.এ.-
কাবেরী : যেখানে বলেছি সেখানেই যাব। ল্যান্ড অফ মিড নাইট শান- মধ্যরাতে সূর্য দেখবো। নর্দান লাইট দেখবো-
হাজরা : শুধু লাইট দেখতে অতদূর যাবেন, তার থেকে চন্দননগরের লাইট দেখা ভালো। কত লাইট, লরি-লরি লাইট।
কাবেরী : হাজরাবাবু নর্দান লাইট অন্য জিনিস। অরোরা-বরিয়ালিশ-মেরুছটা - সে এক অলৌকিক আলো।
হাজরা : ঠিক আছে, আমি ওদিকে সব ব্যবস্থা করি। এখন আসি ম্যাডাম। নির্বাণ স্যার আসছি।
[নির্বাণ ফোনে ব্যস্ত- হাত তুলে ঠিক আছে বলে]
[হাজরার প্রস্থান]
কাবেরী : ওঃ কি সুন্দর সকালটা হয়েছে। ডাঃ রায় আমাকে বললেন স্বপ্ন ফেরি করতে। স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। হাজরাবাবু, মেঘদূতের মতো এসে দুয়ার খুলে দিলেন। যেন নাগালের মধ্যে সেই মধ্য রাতের সূর্য। অরোরা-বোরিয়ালিশ।

[নির্বাণকে] ওগো তোমাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ ......
[ফোনে নির্বাণকে কথা বলতে দেখে।] বাজে লোক। দিনরাত খস খস করে কি আজেবাজে লিখছে, নয়তো ফোনে বক্ বক্ করছে। না হলে খেয়ে-দেয়ে - থার্ড ক্লাস [হঠাৎ কিছু মনে পড়ে] এই যাঃ; ভুল হয়ে গেছে তো [দরজার দিকে গিয়ে] ও হাজরাবাবু - হাজরাবাবু -

নির্বাণ : [ফোন বন্ধ করে, বিরক্ত ভাবে।] আরে ওরকম বিশ্রীভাবে চিৎকার করে ভদ্রলোককে ডাকছো কেন?

কাবেরী : একটা খুব জরুরী কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

নির্বাণ : পরে জিজ্ঞেস করবে- [কাবেরী কিছু বলতে যায়] আমরা তো কালকেই বেরিয়ে পড়ছি না। সব গুছিয়ে যাত্রা করতে কম করে ছ'মাস সময় লাগবে।

কাবেরী : বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন আমার মধ্যে নেই।

নির্বাণ : তবে?

কাবেরী : ভদ্রলোক কেমন আছে জিজ্ঞেস করবো না।

নির্বাণ : [অবাক] উনি কিছু খারাপ আছে বলে আমি শুনিনি। ধরে নাও উনি ভালো আছেন।

কাবেরী : আরে আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতাম ওনার রাতে ঘুম হচ্ছে কিনা?

নির্বাণ : না হলে কি করবে? তুমি ঘুম পাড়াবে?

কাবেরী : অসভ্যের মতো কথা বলো না তো, উনি আমাদের পরিচিত, ওনার কুশল সংবাদ নিতে হবে না।

নির্বাণ : ভদ্রলোক যদি নিদ্রাহীনমতায় ভোগেন, সেক্ষেত্রে তোমার কি করার আছে।

কাবেরী : কি লোক রে - আমি করতে যাব কেন? ডাঃ রায়ের কাছে নিয়ে যাব। ওনার কাউন্সেলিং দরকার।

নির্বাণ : একদম বাড়াবাড়ি করবে না। চিটফান্ডের এজেন্টদের মতো খদ্দের ধরে ধরে ঐ পাগলদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে না।

কাবেরী : মাই গড- মাই গড- এই লোকটা কিরকম ভায়োলেন্ট। তোমাকে দেখে আমার খুব চিন্তা হয়। হ্যাগা- তোমার রাতে ভালো করে ঘুম হয় তো!

নির্বাণ : [দুষ্টুমী করে] একদম ঘুম হয় না গো-

কাবেরী : [চিন্তিত] তুমি তো আমায় মহা ভাবনায় ফেলে দিলে। ঘুম হয়না কেন? কী চিন্তা করো তুমি ? সারা রাত কী করো?

নির্বাণ : [দুষ্টুমি করে] তোমাকে দেখি। অবাক হয়ে তোমাকে দেখি।

কাবেরী : [লজ্জিত] ধ্যাত- বয়স তো কম হলো না। অমন করে দেখার কি আছে।

নির্বাণ : দেখি কেমন করে একটা তথাকথিত সভ্য মহিলা অসভ্যের মতো নাক ডাকতে পারে।

কাবেরী : [রেগে] ছোটলোক লেখক। তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আজই তোমাকে ডাঃ রায়ের কাছে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব। তোমার কাউন্সেলিং দরকার।

নির্বাণ : তার আগে তোমাকে আমি মানসিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেবো। ঐ পাগলের ডাক্তারের সাথে থেকে থেকে তুমি পাগলী হয়ে গেছ-
[অনিতার প্রবেশ]
[হাঁটু পর্যন্ত চাপা প্যান্ট/স্ল্যাক্স। সংগে মানানসই টপ। হাতে ব্যাক-প্যাক]

অনিতা : কি হচ্ছে দাদা। তোমাকে আমি কতদিন বলেছি বউদির সাথে এভাবে কথা বলবে না। ও বৌদি তুমি কেঁদোনা গো- দাদার সাথে তুমি কথা বলতে যাও কেন।

কাবেরী : দেখ না, আমাকে যা খুশী তাই বলে যাচ্ছে। আমি নাকি পাগলী, অসভ্যের মতো নাক ডাকি।

অনিতা : এইসব কথা বলেছে? আমার বৌদি পাগলী তো কার কী- তুমি আরো জোরে নাক ডাকবে। কারও যদি ভালো না লাগে সে অন্য ঘরে শোবে।

নির্বাণ : একপেশে কথা-বার্তা বলবি না। জানিস্ , ঐ ভদ্রমহিলা আমাকে ডাঃ রায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার নাকি কাউন্সেলিং দরকার। তারপর ঐ হাজরাবাবুকেও পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল।

কাবেরী : আমি লোকের ভালোর জন্যে এসব করতে যাই। ডাঃ রায় আমাকে বলেছেন স্বপ্ন ফেরি করতে।

অনিতা : করবে না। স্বপ্ন বিক্রী করার জন্যে অনেক লোক আছে । আর একটা কথা দুজনকেই বলছি। আত্রেয়ী দিদি এসেছে তার সামনে ঝগড়াঝাটি করো না, বুঝলে-
[কাবেরী ঘাড় নাড়ে। নির্বাণ বোনকে লক্ষ্য করতে করতে গোমড়া মুখে সায় দেয়] আমি কলেজে চললুম বুঝলে-

কাবেরী : এসো- সাবধানে যাবে। শোনো তোমার পার্সে দুশো টাকা আছে। টিফিন বক্স টেবিলে ছিলো সেটা ব্যাক প্যাকে ঢুকিয়েছো-

অনিতা : হ্যাঁ গো,সব ঠিক আছে। দাদা আমি আসছি।

নির্বাণ : [হুকুমের সুরে] না একদম যাবে না।

অনিতা : কেন? কী কারণে?

কাবেরী : বেরোবার মুখে বাধা দিচ্ছো কেন?

নির্বাণ : তোমার চোখ আর মগজ ঠিক থাকলে এই অপ্রিয় কাজটা করতে হতো না।

অনিতা : ব্যাপারটা কি খুলেই বলো না-

কাবেরী : কোনো কারণ নেই, এই লেখক হচ্ছেন একজন ঝামেলাবাজ লোক।

নির্বাণ : [অনিতার মুখোমুখি], বেরোবার আগে আয়নাতে নিজেকে দেখেছো?

অনিতা : হ্যাঁ- দেখেছি তো, কেন? চুলটা ঘেঁটে গেছে নাকি? মুখে কোনো দাগ- ও বৌদি কাছে এসে দেখো তো-

কাবেরী : আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি সব ঠিক আছে। তুই এবার আয় তো-

নির্বাণ : [দৃঢ়ভাবে] যাবে না- মেয়ের মা ঠিক থাকলে আমায় বলতে হতো না। মেয়ে কি পোষাকে বেরোচ্ছে দেখেছো?

অনিতা : কেন কি হয়েছে ? পোষাকটা খারাপ কিসের?

কাবেরী : মাথায় একটা কিছু এলো অমনি বলে ফেললো।

নির্বাণ : ক্ষেত্র বিশেষে, সময় বিশেষে পোশাক নির্বাচন করতে হয়। এটা কলেজে যাবার পোষাক?

অনিতা : কত মেয়ে এইভাবেই যাচ্ছে।

নির্বাণ : তারা যাচ্ছে যাক। তোমাকে আমি এইভাবে যেতে দেবো না।

কাবেরী : বুড়ো ঠাকুর্দা-

[অনিতা কিছু বলতে যায়। তাকে বাধা দিয়ে নির্বাণ।]

নির্বাণ : যা বলার বলে দিয়েছি আর কোনও তর্ক নয়। এই পোষাক পাল্টে ভদ্র পোষাক পরে কলেজে যাও।

অনিতা :[কেঁদে ফেলে] দেখছো আমাকে কিভাবে বকছে-

কাবেরী : [ছুটে আসে] দ্যাখো- দ্যাখো -দ্যাখো- মেয়েটাকে শেষ পর্যন্ত কাঁদিয়ে ছাড়লো। কাঁদেনা- কাঁদে না সোনা- কাঁদেনা সোনা- [নিজেও কাঁদো কাঁদো] তুই চুপ না করলে আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলবো-

অনিতা : একজন আমাকে একটুও ভালোবাসে না। একটু - ওদিক হলেই বকে- [কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে চলে যায়]

কাবেরী : দিলে তো মেয়েটার কলেজ যাওয়া মাটি করে-

নির্বাণ : [কাঁদো কাঁদো গলায় ।] আমাকে বকবার অনেক সময় পাবে, গিয়ে ওকে সামলাও না, ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে গেলে.... এইসব মেয়েদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

কাবেরী : ও মা গো, কি অলুক্ষুণে কথা বলছো- [অনিতার প্রবেশ]

অনিতা : বৌদি একজনকে বলে দাও আমার জন্যে চিন্তা না করতে। আমি খারাপ কিছু করবো না। আমি পোষাকটা পাল্টেই কলেজে যাব। [ভেতরে যায়]

নির্বাণ : [অভিমান] আমাকে কেউ বোঝবার চেষ্টা করে না। পর না,নানারকম পোষাক পর কে বারণ করেছে। তাই বলে কলেজে এভাবে যেতে হবে- [গলা তুলে] একজনের জন্যে চিন্তায় চিন্তায় আমি সব সময় অস্থির হয়ে থাকি সে কথা কেউ ভাবে- বাবা, মা- তো ওপরে গিয়ে দিব্যি আছ। ওরে বাপরে শরীরটা কিরকম অস্থির- অস্থির করছে-

[কাবেরী কেসটা খপ্ করে খেয়ে নেয়]

কাবেরী : ওগো একটু চুপ করে বোসো না.....

নিবাণ : বসছি, বসছি, কিন্তু তুমি আমার কাছে একদম আসবে না, দূরে থাকো। পারলে মেয়েটাকে গিয়ে দেখো.....

কাবেরী : একদম চিন্তা করো না। ও খুব বুঝদার মেয়ে। আমার চিন্তা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে। [অনির্বাণে শারীরিক ভাষায় অস্থিরতা] হ্যাঁগো, খুলে বলো না লক্ষ্মীটি- তোমার মনের ভেতর পাঁচ মেশালি ডাল টগবগ করে ফুটছে কি না-

নির্বাণ : মানে!!

কাবেরী : অ-স্থি-র-তা- এই অস্থিরতাই মানসিক উত্তেজনার কারণ, যাকে বলে 'টেনশন' আর সেখান থেকে ডাঃ রায় বলেন.......

[নির্বাণ রাগে লাফিয়ে ওঠে]

নির্বাণ : আমি ডাঃ রায়ের ঠ্যাঙ ভেঙ্গে দেবো যাতে ও কোনোদিনই এ বাড়িতে না আসতে পারে।

[আত্রেয়ী-র প্রবেশ। আধুনিকা। রুচিসম্মত সাজে তাকে বেশ সুশ্রী দেখাচ্ছে।]

আত্রেয়ী : গুড মর্নিং নির্বাণদা- এতো উত্তেজিত হয়েপড়েছেন কেন? এনি প্রবলেম?

কাবেরী : নো প্রবলেম। এটা আমাদের সকাল বেলার আলাপ।

নির্বাণ : তোমার দিদির সাথে পাঁচ মিনিট কথা বললেই ঝটকা লাগবেই লাগবে-

আত্রেয়ী : [হেসে] আমার সম্পর্কে আপনার ভায়রা ভাই এই একই কথা বলে।

কাবেরী : বাজে কথা বলবি না তো। আদিত্য খুব ভালো ছেলে। তোর নির্বাণদার মতো এরকম রগচটা নয়।

নির্বাণ : শুনলে আত্রেয়ী, তোমার দিদির কথা-মুখে যা আসে তাই বলে যায়।

আত্রেয়ী : ওরে বাবা-শান্তি শান্তি। হ্যাঁরে দিদি অনিতার কী হয়েছে?

নির্বাণ : এই দেখ না, দোষের মধ্যে আমি.....

কাবেরী : বাদ দে, বাদ দে, ওসব কথা। মাঝে মধ্যেই দাদা-বোনে খুনসুটি লেগেই থাকে। এখন বল- কাল রাতে তোর ভালো করে ঘুম হয়েছিলো?

আত্রেয়ী : দারুণ ঘুমিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি দিদি ঘুম নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই।

কাবেরী : যা বাবা- তোরও ভালো করে ঘুম হয়?

আত্রেয়ী : হয়তো, এ নিয়ে তোর সমস্যা কোথায়!

নির্বাণ : [শ্লেষ] খদ্দের হাতছাড়া হয়ে গেল।

আত্রেয়ী : মানে?

নির্বাণ : তুমি যদি বলতে তোমর ঘুম হয় না তাহলেই তোমার দিদি চেপে ধরতো আর ঘ্যানর ঘ্যানর করতো, কেন তোর ঘুম হয় না,নিশ্চয়ই কোনো টেনশন আছে।

কাবেরী : অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম এবং অবশ্যই বলতাম, এই টেনশনটা দূর করতে হলে খুঁজে বের করতে হবে তোর অন্তরে কোনো সুপ্ত বাসনা চাপা পড়ে আছে কিনা।

আত্রেয়ী : " সাপ্রেজড্ ডিজায়ার" " সুপ্তবাসনা"?

কাবেরী : ইয়েস কিন্তু ...

নির্বাণ : তুমি দিদির সব আশায় জল ঢেলে দিলে। একটা পোটেনশিয়াল খদ্দের হাত ছাড়া হয়ে গেল।

আত্রেয়ী : [হেসে] তখন থেকে আপনি খদ্দের খদ্দের করছেন, দিদি কোনো ব্যবসা করছে নাকি?

নির্বাণ : একজন ব্যবসাটা করেন। তোমার দিদি হচ্ছেন তার এজেন্ট। গোদা বাংলায় দালাল।

কাবেরী : এই লোকটা ছাইপাঁশ লিখে কিছু নাম করেছে তো তাই সবাইকে তাচ্ছিল্য করে। জানিস বোন আমি একটা ব্রত পালন করছি। ডাঃ রায় বলেন......

আত্রেয়ী : ডাঃ রায়! তিনি কে? কিসের ডাক্তার?

নির্বাণ : [ব্যাঙ্গ করে] ত-ক্ষ-ক

কাবেরী : মোটেই না। উনি হচ্ছেন মন সমীক্ষক।

আত্রেয়ী : সেটা আবার কি?

কাবেরী : সাইকো অ্যানালিস্ট-

আত্রেয়ী : এতক্ষণে বুঝলাম। সাইকো অ্যানালিস্ট, মানে হচ্ছে মন নিয়ে.....

নির্বাণ : [গানের সুরে] মন নিয়ে কাছাকাছি - [প্রস্থান]

কাবেরী : [চিন্তিত] দ্যাখ-দ্যাখ- দ্যাখ তোর নির্বাণদাকে একটু বেসামাল মনে হচ্ছে না?

আত্রেয়ী : কি বলছিস রে দিদি! নির্বাণদা আজকাল ঐ সব ধরেছে নাকি! তাই বলে সাত সকালে......

কাবেরী : কার সম্বন্ধে কি বলছিস্? ওই লোকটা একটা সিগারেট পর্যন্ত খায় না।

আত্রেয়ী : ওমা- তুই তো বললি বেসামাল হয়ে পড়েছে।

কাবেরী : আমি মিন করতে চেয়েছি- লোকটাকে কিরকম অস্থির অস্থির মনে হচ্ছে না। আমার ওকে নিয়ে এতো চিন্তা হয় না। একবার যদি ওকে ডাঃ রায়ের কাছে বসাতে পারতাম-

আত্রেয়ী : উনি খুব নামকরা ডাক্তার না কি রে?

কাবেরী : ধন্বন্তরি- কতো জটিল কেস যে উনি ভালো করেছেন না, তা গুণে বলা যাবে না। আমি তো কম করে কুড়ি বাইশ জন পাঠিয়েছি।

আত্রেয়ী : হ্যাঁরে দিদি, তুই যে এতো খদ্দের ধরে দিস- দালালি পাস?

কাবেরী : [রেগে] তোর জামাইবাবুর মতো ইতর ভাষা প্রয়োগ করবি না তো। আমি

সমাজের মঙ্গলের জন্য একটা ব্রত পালন করছি। পয়সা রোজগারের জন্য নয়-বুঝলি-

আত্রেয়ী : প্লীজ দিদি ক্ষমা করে দে। আমি তোকে হার্ট করতে চাইনি।

কাবেরী : ঠিক আছে- ঠিক আছে। আমি সবাইকার জন্য ভেবে মরি অথচ আমার নিজের লোকই আমার বদনম করছে।, আচ্ছা অত্রেয়ী শোন, তুই বললি ঘুম নিয়ে তোর কোনো সমস্যা নেই-

আত্রেয়ী : বললাম তো, বালিশে মাথা দিলেই ঘুম।

কাবেরী :আচ্ছা , এই যে তুই ঘুমিয়ে পড়িস- সেই সময় অন্য কোনো অনুভূতি তোকে স্পর্শ করে না?

আত্রেয়ী : তোর কথার মানে তো আমি বুঝতে পারলাম না।

কাবেরী : আচ্ছা তুই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিস না?

আত্রেয়ী : স্বপ্ন কে না দ্যাখে, আমিও দেখি-

কাবেরী : [উৎফুল্ল] দেখিস- কিরকম স্বপ্ন দেখিস, সেই সাবজেক্টগুলো আমায় বলতে পারবি?

আত্রেয়ী : কতো কি দেখি, সব মনে থাকে নাকি। [হেসে] জানিস দিদি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আমি এভারেস্টের চুড়োয় বসে পেঁয়াজ,কাঁচালংকা দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছি। আর কাল রাতে দেখেছি, আমি একটা সাদা মুরগী হয়ে গেছি। ভয় পেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটছি, সামনে, পেছনে, পাশে কার , স্কুটার, বাইক সাঁই সাঁই করে যাচ্ছে, কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। কঁক কঁক কঁক করছি
- হঠাৎ দেখি পেছনে ঠিক এত্তো বড় একটা তাগড়া মোরগ আমাকে ধাওয়া করেছে।

কাবেরী : [খুবই উৎসাহিত] হ্যাঁরে মোরগটা তখন কতো দূরে?

আত্রেয়ী : একেবারে গায়ে পড়ো, গায়ে পড়ো অবস্থা। আর কি অসভ্যের মতো ডাকছিল রে দিদি-

কাবেরী : তোর নাম ধরে ডাকছিল?

আত্রেয়ী : হ্যাঁ তো, বলছিলো- আত্রেয়ী মত্ ভাগো, আত্রেয়ী মত্ ভাগো আর আমি ততো ছুটছি।

কাবেরী : ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট- হ্যাঁরে বোন, মোরগটা হিন্দীতে কথা বলছিলো!! বাঙালী মোরগ নয়?

আত্রেয়ী : তাই হবে বোধহয়। তারপর জানিস দিদি- হঠাৎ দেখি একটা দমকলের গাড়ি ট্যাং ট্যাং করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে আসছে আর একটা হেলমেট পরা লোক আমাকে বলছে ঐ মোরগ থেকে বাঁচতে হলে আমার গাড়িতে উঠে পড়ো। আত্রেয়ী - আমার গাড়ীতে উঠে পড়ো-

কাবেরী : দারুণ - দারুণ- স্বপ্ন দেখেছিস বোন, ডাঃ রায়কে ফোন করতে হবে- একটা মুরগি পাওয়া গেছে [কাবেরী ডাঃ রায়কে ফোন করতে থাকে।]

[নির্বাণ আর অনিতার প্রবেশ। অনিতার পরনে লাল লং স্কার্ট ম্যাচিং টপ।]

নির্বাণ : এই দেখ - আমাদের নিতু বুড়ীকে কি সুন্দর দেখতে লাগছে।

আত্রেয়ী : নির্বাণদা আপনি বুঝি বোনের মান ভঞ্জন করতে গিয়েছিলেন।

নির্বাণ : একদম না। ওর মতো মাত্রাবোধ কটা মেয়ের আছে । আরে কাবেরী ও কলেজে যাচ্ছে এই সময় তোমার ফোনে কথা বলা শুরু হলো-

কাবেরী : দুগ্গা- দুগ্গা- সাবধানে যাবে- [আবার ফোনে কথা শুরু করে]

অনিতা : আমি আসছি, তোমরা দুজনে কিন্তু আবার ঝগড়া করবে না-

আত্রেয়ী : ঝগড়া করলেই হলো। আমি আছি না।

অনিতা : হ্যাঁ, এই দুজনকে একটু দেখে রাখবে তো - আর শোনো দাদা- হাজরাবাবুকে আমার হয়ে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে দিও।

নির্বাণ : কেন রে? হঠাৎ ধন্যবাদ জানাতে যাবো কেন?

অনিতা : ঐ যে তুমি বললে না অরোরা বো-রি-য়া-লি-শ [প্রস্থান]

নির্বাণ : ঠিক আছে, ঠিক আছে বলে দেবো-

আত্রেয়ী : অনিতা যাবার মুখে কি যেন বলে গেল?

নির্বাণ : দারুণ ব্যাপার গো। আমরা মাস ছ'য়েকের মধ্যে সুইডেন-নরওয়ে যাবো। হাজরাবাবু স্পনসর করছে। যেখানে আমরা মেরুচ্ছটা মানে অরোরা - বোরিয়ালিশ দেখবো, মানে এমনটাই তোমার দিদির ইচ্ছে ।

আত্রেয়ী : কি সুন্দর নামটা না- অরোরা বোরিয়ালিশ-

[দ্রুত বেগে হাজরাবাবুর প্রবেশ]

হাজরা : এটা আপনি কি করলেন স্যার! আমাকে একেবারে পালিশ করে দিলেন।

নির্বাণ : [অবস্থা সামাল দিতে দিতে] আরে কী হলো হাজরাবাবু; আপনি এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?

হাজরা : আপনি আমার সর্বনাশ করে দিলেন স্যার। হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে-

আত্রেয়ী : কি সাংঘাতিক কথা-

হাজরা : তবে আর বলছি কি ম্যাডাম- কিন্তু আপনি কে?

নির্বাণ : উনি হচ্ছেন আত্রেয়ী, আমার শ্যালিকা-

হাজরা : ভেরি গুড নেম। আমাদের বাংলার নদী আত্রেয়ী। কিন্তু স্যার, আপনি কাজটা ভালো করেন নি একটা পুরনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি নতুন বলে চালিয়ে দিলেন-

নির্বাণ : ওমা, তাই নাকি! তবে বোধহয় থলে বদল হয়ে গেছে-

হাজরা : [আৎকে] হাজরা পাবলিকেশন -এর থলে আপনি অন্য প্রকাশককে দিয়ে . দিলেন।

নির্বাণ : যা বাবা- দিয়ে দেবো কেন, আমার ঘরেই আছে। বিকেলে আমি নিজে গিয়ে আপনাকে দিয়ে আসব।

হাজরা : ঐ ঝুঁকি নেব না স্যার। ঘরে চলুন আমি নিজে নিয়ে যাবো-

আত্রেয়ী : আর কতক্ষণ কথা বলবি দিদি, এবার ছাড় না।

নির্বাণ : তবে চলুন। [দুজনে ভেতরে যায়]

কাবেরী : ডাঃ বাবু শুনছেন- আমার বোন বলছে কলটা কেটে দিতে। বোকা মেয়ে জানে না আবার ডিস্টার্বেন্স হচ্ছে। আপনি কি চেম্বারে নেই? চারদিকে এতো হট্টগোল কেন? কি বলছেন- রাস্তায় হাঁটছেন- পেশেন্ট দেখা শেষ- মাইগড- একজনও আসেনি আরে চেম্বারে বসে থাকুন, তবে তো খদ্দের আসবে- যা -কেটে গেল-

আত্রেয়ী : হেসে কি ডাক্তার রে দিদি। একটাও রুগী নেই

কাবেরী : বোকার মতো হাসবি না তো। উনি হচ্ছেন ডাক্তার। মল, মূত্র, কফের ডাক্তার নয়। [ডাক্তারের প্রবেশ] ওমা ডাক্তারবাবু! এইমাত্র আপনি বললেন রাস্তায় হাঁটছেন!

ডাঃ রায় : বলেছিলাম তো - হাঁটাপথেই তো আপনাদের বাড়িতে আসছিলাম। [আত্রেয়ীকে দেখে] ইনিই আমাদের সম্মানীয়া অতিথি, তাই না কাবেরী? নমস্কার গোদাবরী।

আত্রেয়ী : [চমকে] হোয়াট?

কাবেরী : ওর নাম আত্রেয়ী সেটা ভুলে গেলেন?

ডাঃ রায় : এতো বড় বড় কথা ভাবি যে মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যাপার ভুল হয়ে যায়।

আত্রেয়ী : থ্যাঙ্কিয়্যু ডাক্তার- আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে আমি একজন সাধারণ মানুষ।

ডাঃ রায় : ছিঃ - ছিঃ একদম না। আপনি হচ্ছেন আমাদের কাছে একজন দামী মুরগী-

কাবেরী : যে সে মুরগী নয়, সাদা মুরগী-পেছনে লাল মোরগ।

আত্রেয়ী : ঐরকম করে বলবি না তো দিদি। আমি মুরগী না কি।
[নির্বাণ ও হাজরার প্রবেশ]

নির্বাণ : ওরা তোমাকেও মুরগী বানিয়েই ছাড়বে। আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি তো এইমাত্র গেলেন আবার চলে এলেন।

হাজরা : বোধহয় আমার মতো থলে বদল হয়েছে- আমি এবার আসি স্যার। অনেক দেরী হয়ে গেল-
[প্রস্থান]

ডাঃ রায় : হাজরাবাবু কি কোনো আপত্তিকর কথা বলে গেলেন-

কাবেরী : এদের কথা আপনি গায়ে মাখবেন না। এখন আমার বোনের কেসটা নিয়ে ভাবুন।

নির্বাণ : তোমার হঠাৎ কি হলো যে ডাক্তারবাবুকে ছুটে আসতে হলো।

আত্রেয়ী : [বিব্রত] কথায় কথায় দিদিকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছি অমনি......

নির্বাণ : আমি অল্পক্ষণের জন্য ভেতরে গেছি, এর মধ্যেই তুমি স্বপ্নের ফাঁদে পা দিয়ে দিয়েছো !....

আত্রেয়ী : ফাঁদ বলছেন কেন ?

নির্বাণ : তোমার দিদি আর এই ডাক্তারবাবু দু'জনে মিলে এমন সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে না যে একটা সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।

আত্রেয়ী : ওমা তাই নাকি !

ডাঃ রায় :আপনি অন্যায় দোষারোপ করছেন। মোস্ট আনফরচুনেট।

কাবেরী : অপপ্রচার। একটা ভালো জিনিসকে খাটো করে দেখাতে তোমার বিবেক দংশন হচ্ছে না।

ডাঃ রায় : আপনি ফ্রয়েড পড়েননি নির্বাণবাবু ?

কাবেরী : আরে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করে, ফ্রয়েড -এর নাম শুনেছে না কি-

ডাঃ রায় : এভাবে বলতে নেই কাবেরী। আমি তো রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা পড়িনি। কিন্তু সময় মতো পড়ে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি নির্বাণবাবু , আমি জলের মতো করে বুঝিয়ে দেবো এই স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েড কি বলছেন। তিনি বলেছেন.....

নির্বাণ : তিনি কি বলেছেন আমি জানি না কিন্তু আমি বলছি আপনি এখন আসুন, আমাদের ফ্যামিলি স্পেসে ঢুকে পড়বেন না। না-না- না- কোনো কথা নয়। আপনি এখন আসুন।

ডাঃ রায় : মিসেস রায়- আপনার হাজবেণ্ড কিন্তু ভীষণ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছেন। ডেঞ্জারাস। এসব কেস ফেলে রাখবেন না। এক্ষুণি ব্যবস্থা নিন- [প্রস্থান]

আত্রেয়ী : ভদ্রলোককে ভাগিয়ে দিলেন ? স্বপ্ন সম্বন্ধে উনি কি বলেন একটু শুনতাম।

কাবেরী : কোনও ভালো জিনিষের মধ্যে তোর জামাইবাবু আছে? ঐ হাজরাবাবুর মতো হাভাতে লোকেরা ওর সঙ্গী।

নির্বাণ : এখন তো হাজরাবাবুকে হাভাতে বলবে অথচ ওর পয়সায় মধ্য রাতে সূর্য দর্শন করে ধেই ধেই করে নাচবে, অকৃতজ্ঞ মহিলা।

কাবেরী : এই যে- এই যে - হাজরাবাবু কি আমাদের দয়া করছেন নাকি- তোমার লেখা ছেপে দেদার লাভ করছে বলেই তো কিছুটা ছাড়ছে। যাকে বলে গিভ এণ্ড টেক। কিন্তু আমি আর ডাঃ রায় যে কাজটা করছি....

আত্রেয়ী : দূর- স্বপ্ন চটকে দিয়ে দু'জনে ঝগড়া শুরু করলো।

নির্বাণ : কি শুনতে চাও আমাকে বলো না। ধরো তুমি একটা স্বপ্ন দেখলে,তারপর তোমার দিদিকে বললে-" জানিস দিদি আমি স্বপ্নে দেখলাম এই হয়েছে, সেই হয়েছে, তাই হয়েছে- নাই হয়েছে-অমনি তোমার দিদি একটা মানে বলে দেবে।

আর সেটা যদি লেগে যায় তো তাক, আর তা না হলে তুক।"

কাবেরী : কি আহ্লাদ রে। ব্যাপারটা যেন এতো সোজা। মনস্তত্ত্ব হচ্ছে একটা বিজ্ঞান। ঠিক মতো অ্যানালাইসিস করতেপারলে প্রত্যেকটা স্বপ্নের একটা মানে খুঁজে বার করা যাবে।

আত্রেয়ী : জানেন নির্বানদা, কিছুক্ষণ আগে দিদিকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। আমি এভারেষ্টের চূড়ায় বসে কাঁচা লংকা, পিয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছিলাম। এর মানেটা কি হতে পারে?

নির্বাণ : মানেটা খুব সোজা। স্বপ্নটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তোমার মনে একটা সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে তুমি তোমার শ্বশুরকে খুন করে শাশুড়িকে বিয়ে করতে চাইছো।

আত্রেয়ী : এমা ছি-ছি - কি অসভ্য আপনি।

কাবেরী : এবার বুঝতে পারছিস ইনি কি বস্তু-

নির্বাণ : আরে ম্যাডাম তোমরা তো এই ধরনের উদ্ভট বিশ্লেষণ করো তাই আমি বললাম আর কি—

কাবেরী : উদ্ভট বিশ্লেষণ- এই তুমি বুঝলে। আর লোকগুলো যে সুফল পাচ্ছে, সেরে যাচ্ছে তা এমনি না? জানিস বোন, তোকে বলছিলাম না আমি কম করে বাইশ জনকে নিয়ে গেছি তারা এখন সবাই স্বস্তিতে আছে।

নির্বাণ : যে সংখ্যাটা ও বললো না এই এতগুলো বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এক একটা কাপল পাঁচ থেকে পনের বছর এক সাথে ঘর করেছে। তাদের সংসারগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে তোমার দিদি আর ডাঃ রায়।

আত্রেয়ী : কি সাংঘাতিক! হ্যাঁ রে দিদি নির্বাণদা যা বলছে.....

কাবেরী : একদম ঠিক। হ্যাঁ আমার হাত দিয়েই কুড়ি -বাইশ টা বিভোর্স হয়েছে - কারণ ঐ সব বিয়েগুলো ছিলো নিছক যান্ত্রিক কু-অভ্যাস। দুটো মন গুমরে গুমরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছিল, আমি তাদের পরামর্শ দিয়েছি, ডাঃ রায়ের কাছে নিয়ে গেছি- ব্যাস, তিনটে সিটিং, তারপরেই তাদের মুক্তি আলোয় অলোয়। এই যে তুই, আমার বোন আত্রেয়ী, একটা সাদা মুরগী হয়ে রাস্তায় ছুটছিস দিশেহারা হয়ে [আলো ও শব্দের মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে] পেছনে তাগড়া ঝুটি ওয়ালা মোরগটা তোকে তাড়া করছে। ফায়ার ব্রিগেড, দূরন্ত গতিতে দু'দিক দিয়ে যানবাহন ছুটে চলেছে, এর মধ্যে তুই একা। লক্ষ্য কর আমি বলছি তুই একা। আত্রেয়ী- এই স্বপ্নটা কি শুধুই মানস পটে ভেসে ওঠা মরীচিকাসম কোনো অলীক দর্শন? না এর কোনো অর্থ আছে?

আত্রেয়ী : [ত্রাসে] কী অর্থ রে দিদি?

কাবেরী : তোর অন্তরে একটু সুপ্ত বাসনা আছে। তোর কাউন্সেলিং দরকার। এই মুরগীর স্বপ্নের সূত্র ধরেই ডাঃ রায় তোকে নিস্তার পাবার পথ বলে দেবেন।

আত্রেয়ী : [কান্না] দিদি আমার খুব ভয় করছে রে—

কাবেরী : আমি আছি তো তোর পাশে। শুধু আমাকে বলতো তুই কি আদিত্যর হাত থেকে মনে মনে মুক্তি কামনা করিস?

আত্রেয়ী : [তীব্র প্রতিবাদ] আমি ওকে ছেড়ে বাঁচতে পারবো না রে দিদি। সেও আমাকে খুব ভালোবাসে। আমাদের একটা ভীষণ মিষ্টি প্রাণবন্ত ছেলে রয়েছে।

কাবেরী : মরীচিকা- তুই, আদিত্য, তোদের ছেলে, সংসার সব মরীচিকা। এখন খুঁজে বের করতে হবে ঐ অবাঙালী মোরগটা কে। আর ঐ দমকলের লোকটাই বা কে। ডাঃ রায়-ই পারবেন এই রহস্যের সমাধান করতে।

নির্বাণ : এই কাবেরী, তোমার কথা শুনে আমার তো খুব ভয় করছে।

কাবেরী : কেন, তোমাকে কোনো মুরগী তাড়া করছে না কি? ফালতু লোক।

নির্বাণ : না ঐভাবে হালকা করে দিও না কাবেরী। আমিও না একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি।

আত্রেয়ী : বলুন না, নির্বাণদা কি দেখেছেন আপনি-

কাবেরী : ওর কথা বাদ দে তো। ছ্যাবলামি করবে-

নির্বাণ : আগে আমার কথা শুনে নাও তারপরে বকাবকি করো।

আত্রেয়ী : বলতে দে না দিদি।

কাবেরী : ঠিক আছে বলুক-

নির্বাণ : পরশুদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা বড় বাড়ী, সুন্দর করে সাজানো, লোকজন আসা-যাওয়া করছে, তুমি আর নিতুবুড়ী তাদের আপ্যায়ন করছে। আর একটা বিরাট হলঘরের মধ্যে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম হলঘরের দেয়ালগুলো, মাথার ছাদ সব ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এইভাবে সংকুচিত হতে হতে আমাকে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিল। আমার গলা চিঁ চিঁ করে শব্দ বেরোচ্ছে কিন্তু তোমরা কেউ শুনতো পাচ্ছো না। তরপর সেই দেয়ালটা এমনভাবে সংকুচিত হলো যে আলোর একটু রশ্মিও সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না। এ ব্ল্যাক হোল- কৃষ্ণ গহ্বর। মহাশূন্যে সে ভেসে গেল। সাথে সাথে নিয়ে গেল চিঁড়ে চ্যাপ্টা আমাকে। কান্না ভেজা গলায় আমার কি হবে কাবেরী? ডাঃ রায় কি আমাকে দেখবেন?

কাবেরী : একদম ভাববে না। আমি রয়েছি তো, চল যাই তার কাছে। মাত্র তিনটি সিটিং সব ঠিক হয়ে যাবে। [আস্তে আস্তে মঞ্চ অন্ধকার হয়]

[দৃশ্য পরিবর্তন। দেখা যায় নৃত্যরতা অনিতা।] [কাবেরীর প্রবেশ]

কাবেরী : [হাতে মগ] একশোদিন বলেছি খালি পেটে নাচ প্র্যাকটিস করবি না। তুই কি আমার কথা শুনবি না।

অনিতা : দাও- দাও-সত্যি একটু একটু খিদে পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

[হেলথ ড্রিংকটা খায়]

কাবেরী : এটা শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নেবে, এগারোটা বাজতে চলল।

তোমার দাদা, আত্রেয়ী এক্ষুণি ফিরে আসবে।

অনিতা : অন্য দিনতো ফিরতে ফিরতে একটা দেড়টা বেজে যায়। আজ এতো তাড়াতাড়ি?

কাবেরী : আজ লাস্ট সিটিং- ভোর ছ'টার সময় ওরা গেছে, এর মধ্যে ডাঃ রায় একবার ফোন করেছিলেন। দারুণ রেসপন্স। ওরা দু'জনেই ক্রাইসিস্টা কাটিয়ে উঠেছে। খবরটা শুনে তোর ভাল লাগছে না? নিতুবুড়ী। [কাপটা রেখে] বুঝতে পারছি না।

কাবেরী : সে কি রে? তোর দাদার ভালো খবরে তোর আনন্দ হচ্ছে না?

অনিতা : আমার দাদা মন্দ ছিলো না কি?

কাবেরী : আলবাৎ ছিলো। ওর মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা ঘেঁটে একেবারে 'ঘ' হয়েছিলো। লক্ষ্য করিসনি তোর দাদা কিরকম অস্থিরতার মধ্যে থাকতো। খিটখিটে, বদমেজাজী-

অনিতা : শোনো বৌদি- বুদ্ধিজীবীরা ওরকম একটু খিটখিটে হয়।

কাবেরী : তোর দাদা বুদ্ধিজীবী? তাহলে আমি কি?

অনিতা : [বৌদিকে জড়িয়ে ধরে] তুমি হচ্ছো সুপার বুদ্ধিজীবী। এবার বলতো বৌদি দুপুরে ভোজনের কি ব্যবস্থা করেছো-

কাবেরী : তুই আর তোর দাদা যা যা খেতে ভালোবাসিস সব পদ হবে- খুশী?

অনিতা : দারুণ খুশী- সেলিব্রেশন ইন বিগ ওয়ে-
[গান গাইতে গাইতে নির্বাণের প্রবেশ]
ওমা দাদা! একি হলো তোমার একেবারে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলে!

নির্বাণ : ডেলিভারেন্স- ডেলিভারেন্স- মুক্তি। মাথা হালকা হয়ে গেছে মন পরিস্কার হয়ে গেছে, এতো আরাম যে তোকে বোঝাতে পারবো না।

কাবেরী : ওগো আমার বোন কোথায়?

অনিতা : আসছে, আসছে, তোমার জন্য 'বোকে' নিয়ে আসছে।

কাবেরী : ওমা কেন?

নির্বাণ : সে তোমার বোনকে জিজ্ঞেস করবে।

অনিতা : আমার জন্যে কিছু আনবে না?

নির্বাণ : আরে আমি তো তোর জন্য একটা বড় চকলেটের বাক্স আনছিলাম কিন্তু আত্রেয়ী বললো, এবার থেকে নিতুবুড়ীর জন্য যা কেনার আমিই কিনব। অন্য কেউ নয়।

কাবেরী : দেখলি নিতুবুড়ী- আমার বোনের মনটা কতবড়।

নির্বাণ : সত্যি বিরাট বড় ডাঃ রায় তো বলছিলেন যে এত বিরাট মন, আর কি গভীর, থৈ পাওয়া যায় না। খুব কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে সুপ্ত বাসনা উদ্ধার করতে হয়েছে।

কাবেরী : [মুগ্ধ]আর এই ডাঃ রায়কে তুমি কতও হেয় করেছো।
নির্বাণ : ভুল করেছিলাম, এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ঠিক করেছি ওর কাছে আমার আত্মা বিক্রয় করে দেবো।
অনিতা : থাক-থাক অত বাড়াবাড়ি করতে হবে না।
কাবেরী : দ্যাখ-দ্যাখ নিতুবুড়ী , তোর দাদার মুখে কিরকম একটা প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে দ্যাখ। কি সুন্দর একটা দ্যুতি-
অনিতা : "অরোরা বোরিয়ালিশ"
কাবেরী : ওরে না রে বাবা, এটা হচ্ছে স্বর্গীয় আলো।
নির্বাণ : [দুষ্টুমী করে কাবেরীকে] তুমি নরকের আলো দেখেছো সোনা-
কাবেরী : [বিরক্ত] এমা- নরকের আলো দেখতে যাব কেন!
নির্বাণ : তাহলে আমার মুখে স্বর্গের আলো ফুটে উঠেছে বুঝলে কি করে?
অনিতা : [হেসে উঠে]
কাবেরী : [বিরক্ত] এই মেয়ে থাম। দাদার মতো ফাজিল হয়েছে। [নির্বাণকে] হ্যাঁগো বলো না তুমি কিরকম বোধ করছো?
নির্বাণ : আজ পর্যন্ত অন্তরে কখনো এত আরাম বোধ করিনি-[কাবেরীকে প্রণাম করতে যায়। সে বাধা দেয়। নিতু হাসতে থাকে।]
কাবেরী : এটা কি করছো তুমি? পাগল হলে নাকি!
নির্বাণ : [ভাবালু] ছিলাম। পাগল ছিলাম। কিন্তু তোমার দেখানো পথে আমি সুস্থ হয়েছি। তুমি আমার গুরু-মাতৃসমা-
কাবেরী : আমি তোমার গুরু হতে যাব কেন?
নির্বাণ : গুরু মানে জানো তুমি? গু-রু-। 'গু' মান । [অনিতা নাক সিটকায়।] অন্ধকার আর 'রু'- মানে আলো। অন্ধকার থেকে তুমি আমায় আলোয় নিয়ে এসেছো। প্রণাম একটা করবই গুরু-মা-
[কাবেরী আঁতকে ওঠে। অনিতা হাসে। ফুল হাতে আত্রেয়ীর প্রবেশ]
আত্রেয়ী : দিদিরে তোর ঋণ আমি জীবনে কখনো শোধ করতে পারবো না। শুধু এই ফুল নিবেদন করে বলি-
কাবেরী : থাক-থাক আর বেশী বলতে হবে না। তোরা সুস্থ হয়েছিস এই আমার যথেষ্ট। এবার সবাই স্নান সেরে তৈরী হয়ে নাও তারপরে আমরা লাঞ্চ সেরে সবাই মিলে একটা ভালো সিনেমা দেখতে যাবো।
আত্রেয়ী : ওসব বাদ দে দিদি। আমাকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে, আদিত্য খুব আপসেট হয়ে গেছে।
কাবেরী : ওমা- সেকি! কী হয়েছে?
অনিতা : কোনো দুর্ঘটনা ?

নির্বাণ : [অনিতাকে] আহা- বড়দের কথায় থাকতে নেই। তুমি যাও।

অনিতা : [বৌদিকে] দেখছো কি রকম করছে-

কাবেরী : চুপ কর না, আগে ব্যাপারটা শুনি। তারপরে তোর দাদাকে দেখছি।

নির্বাণ : শুনুন ম্যাডাম। হঠাৎ এইরকম একটা খবর পেলে যে কেউ আপসেট হবে। আদিত্যও হয়েছে। কাটিয়ে উঠবে। পুরুষ মানুষ - আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে।

কাবেরী : কেন? আমার কী হয়েছে?

নির্বাণ : তুমি সব ব্যাপারে এত বেশী 'ইনভলভড' হয়ে থাকো না, যাকে বলে মাখামাখি। বেসনে চোবানো বেগুনের মতো। ভাজা ভাজা না হলে রেহাই নেই।

কাবেরী : [আত্রেয়ীকে] তোরা দু'জনে এরকম হেঁয়ালি করছিস কেন বলতো-

আত্রেয়ী : কারণ আমরা যে একই পথের পথিক-

নির্বাণ : তুমি আমাদের সে পথ দেখিয়েছো গুরু-মা-

কাবেরী : দোহাই তোমাদের, খুলে বলো কি হয়েছে।

আত্রেয়ী : আমি আদিত্যকে ডিভোর্স করবো রে দিদি। না হলে আমার মুক্তি নেই।

নির্বাণ : ডাঃ রায় বললেন এ কথা। তিনদিন ধরে সমীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেছে যে ঐ লাল মোরগটা হচ্ছে আদিত্য।

কাবেরী : 'ভুল ডায়াগনোসিস'। ডাঃ রায়কে বলেছিলি যে তোর স্বপ্নের মোরগটা ছিলো অবাঙালী।

আত্রেয়ী : বলেছিলাম তো-

নির্বাণ : ডাঃ রায় খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মোরগটা হচ্ছে প্রবাসী বাঙালী, হিন্দী কথা বলতে ভালবাসে।

কাবেরী : দ্যাখ-দ্যাখ- ডাঃ রায় কত বড় সাইকো অ্যানালিস্ট, মন সমীক্ষক- আরে এটাতো সত্যি আদিত্যরা হচ্ছে প্রবাসী বাঙালী। গ্রেট-গ্রেট-হ্যাঁ, তুই ডিভোর্স দিয়ে দে।

আত্রেয়ী : আদিত্যকে তো সেই কথাই বললাম। কিন্তু ও বলেছে এমনটা হলে গলায় দড়ি দেবে।

কাবেরী : ডিভোর্সের পর ও গলায় মালা পরুক, দড়ি পরুক তাতে তোর কি। ডিভোর্স ফাইনাল -বলো?

নির্বাণ : একদম ঠিক ফাইনাল।

অনিতা : বারে এরকম আবার হয় নাকি। কে-কি বললো,, অমনি ডিভোর্স!

কাবেরী : না নিতুবুড়ী বড়দের মধ্যে কথা বলবে না।

অনিতা : [গজগজ করে] যাচ্ছে তাই সব কথা।

কাবেরী : ডিভোর্সের পরে কি হবে, সে বিষয়ে ডাঃ রায় কিছু বললেন?

নির্বাণ : বললেন তো। আত্রেয়ীকে বললেন মোরগটাকে ছেড়ে একলাফে দমকলের গাড়িতে উঠে পড়ুন। দেখবেন লোকটা কি আদরে রাখবে আপনার মতো সাদা মুরগীকে।

অনিতা : কেটে খেয়ে ফেলবে না তো?

কাবেরী : না রে, ডাঃ রায় যখন সাজেস্ট করেছেন তখন দমকলের লোকটা খুব আরামে রাখবে আত্রেয়ীকে । হ্যাঁরে - দমকলের লোকটার আইডেন্টিটি জানা গেল। কে সে?

আত্রেয়ী : দমকল-দমকল বলবি না। বল অগ্নিনির্বাপন - অগ্নি-নি-র্বা-ণ

অনিতা ও কাবেরী : মানে?

নির্বাণ : ডাঃ রায় বললেন, আত্রেয়ী যেন আমাকে বিয়ে করে । এই নির্বাণকে এবং এতেই আত্রেয়ীর মনের আগুন নিভবে। [অনিতা কাঁদতে থাকে]

কাবেরী : আমার কি হবে?

নির্বাণ : সে ডাঃ রায় সমীক্ষা করে কাউকে খুঁজে দেবে।

কাবেরী : এই আমার সাজানো বাড়ীটা। এই আমার ফুলের মতো মেয়েটা, এই তুমি- এই সব ছেড়ে আমি যাবো কোথায়?
[ডাঃ রায়ের প্রবেশ]

ডাঃ রায় : মিসেস সেন, সব প্রবলেম শেষ করে দিয়েছি। এবার আপনাকে নিয়ে বসতে হবে।

কাবেরী : নিতু, আমার মাংস কিমা করা চপারটা নিয়ে আয়তো। আজ আমি এই পাগলের ডাক্তারকে কিমা করে ছাড়বো—
[সকলে হেসে ওঠে, ডাঃ রায় ছুটে পালিয়ে যায়]

[পর্দা পড়ে]

লেখক : শংকর বসুঠাকুর, চুঁচুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) এর জনপ্রিয় নাটককার।

পুতুল নাচের কথা

সমীর বিশ্বাস

(পুতুল নাচের আদলে রাজার অভিনয় হবে)

রাজার গান: হবেই হবে, হবেই হবে, শুনতে হবে, দেখতে হবে
যা বলি তা শোনো সবে, ঘরের কোণে চুপটি রবে
কারোর সাথে মিশলে তবে, গারদ ঘরে পচতে হবে
হবেই হবে, হবেই হবে, শুনতে হবে, দেখতে হবে
যা বলি তা শোনো সবে, ঘরের কোণে চুপটি রবে।

ভাগ্নে : ও মামা উনি অমনিভাবে নাচচে কেন গো?

মামা : ওমা নাচচে কোতায় উনি তো ওমনি

ভাগ্নে : ওমনি মানি?

মামা : ওমনি মানি ওমনি। ওমনির আবার মানি কি?

ভাগ্নে : যা বাবা। আমি নিজির চোকে দেখনু উনি নেচি নেচি কতা বলচেন।

মামা : আরে বাবা না। যা দেকিচিস ভুল দেকিচিস।

ভাগ্নে : ভুল দেকিচি ? তালি তুমি কি বলতি চাও আমার চোকরে আমি বিশ্বেস যাবোনি?

মামা : না সব সময় যা দেকা যায় তা সত্যি হয়নে। তেমনি যা শোনা যায় তাও সত্যি হয়নে।

ভাগ্নে : তুমি যে কি বলো আমি কিচ্চু বুঝিনে। আমি দেকচি উনি কোমর দুলায়ে নাচচে।

মামা : তোর ঘটে কিচ্চু নেই। আরে বাবা উনি নাচচে নে উনি ওমনিই। উনি যকন কতা বলেন তকন ওইভাবেই বলেন। ঘাড় ব্যাঁকায়ে, ভুরু পাকায়ে, কোমর দুলায়ে।

ভাগ্নে : কেন? উনি কি পুতুলের দ্যাশের লোক যে পুতুলের মতন কতা বলচে?

মামা : দূর! পুতুলের দ্যাশের লোক হতি যাবেন কেন? উনি তো এই দ্যাশেরই রাজা।

ভাগ্নে : রাজা? উনি রাজা? এই দ্যাশের? আমি তো ভাবলুম.....

মামা : কিচ্চু ভাবা লাগবে নে। একন চুপ মার দিনি। কি বলে শুনতি দে।

রাজার গান: হাত ধুয়েছ? ধোওনি কেন? ভাইরাসটা লাগবে যেনো।
লাগবে নাকে-মুখে-হাতে, লাগবে সবার তোমার সাথে
আলো জ্বালাও ঘন্টা বাজাও, ঘরে থাকো, চুপ করে রও
মালিক শোনো কারখানাতে, সময় খারাপ খরচ কমাও
তিন শিফটের একটা ঘোঁচাও মাইনে না দাও সময় বাড়াও।
সময় খারাপ খারাপ সময়, ঘরে ব'সে চুপ করে রও

ভাগ্নে : মামা আমি যা শুনছি তুমিও শুনছো?

মামা : ছাগলের মতো প্রশ্ন শুনলেই না তারে কিমা বানায়ে ঘুঘনি খেতে ইচ্ছে করে।

ভাগ্নে : আমার প্রশ্নটারে তোমার ছাগলের মতো প্রশ্ন বলি মনে হোলো?

মামা : হোলো নে? আচ্ছা একজন কতা বললি দুজন দুরকম শোনে কোন আক্কেলে?

ভাগ্নে : এক কতার দুরম মানি হতি পারে না? আর তা ছাড়া আমিতো সে কতা বলছিলেন?

মামা : সে কতা বলছো না তো কোন কতা বলছো শুনি?

ভাগ্নে : না। মানি আমি ভুল শুনলাম কিনা তাই বলছিলেম।

মামা : না। যা শুনিছ তা ঠিকি শুনিছ।

ভাগ্নে : তাইলে এই রাজা ঐরম কতা বললো কেন? টাকা না দাও সময় বাড়াও। আচ্ছা টাকাও দেবে নে আবার কাজের সময়টা বাড়ায়ে দেবে? এ কিরম কতা?

মামা : উনি ঐরমই কতা বলেন।

ভাগ্নে : কেন ? কেন?

মামা : উনি রাজা হবার আগে গ্রামে পুতুল খেলা দেখাতো কিনা তাই। দিনে বটতলায় বসি জিলিপি ভাজতো আর রাতে পুতুল খেলা দেখাতো।

ভাগ্নে : ও আমাদের ক্ষ্যান্তিপিসির মতো? তাই বলো।

মামা : এই এতক্ষণ একটা ঠিক কতা বললি। দুজনের হাবভাবও তো একরকম।

ভাগ্নে : তবে ক্ষ্যান্তিপিসি তো জিলিপি ভাজতো না। ফুলুরি ভাজতো।

মামা : যাই ভাজুক তোমায় আর মুরুলি মারতে হবে নে। কি বলে এট্টু শুনতি দে।

রাজার গান: গোয়ালপাড়ার গরুরগাড়ি, মন্ডামিঠাই কাড়ি কাড়ি
মিহিদানা পুলিপিঠে, আমের আচার, খাটামিঠে
যতখুশি খাও শুধু, মুখ খুলো নাকো চাঁদু
পারো যদি লুটে খাও ঘরে চুপ করে রও
যা করি তা দেখে যাও, তেলা মাথে তেল দাও
দাও দাও টাকা দাও, সময় খারাপ শুনে নাও
দেখে যাও বুঝে নাও, আর যা করি তা দেখে যাও।।

ভাগ্নে : মামা এ বলে কি? একদম ক্ষ্যান্তপিসির মতো কতা। কি বলে তা নিজেই বোঝে।

মামা : তাও বোঝে কিনা সন্দ। বলতে হয় তাই বলে।

ভাগ্নে : আর আমরা যা জানি তাও সব কেমন য্যান গুলিয়ে যায়। হি: হি: হি:।

মামা : দাঁত বাড় না করি হাসতি পারো না ?

ভাগ্নে : এক এক সময় কি যে কও? দাঁত বাড় না করি হাসা যায়?

মামা : না গেলিও হাসতি হবে। দাঁত বাড় হলি দাঁতে রোগ লেগি যাবে না?

ভাাগ্নে : রোগ লেগি যাবে? দাঁতে?

মামা : শুদু দাঁতে না। সব্বাঙ্গে।
ভাগ্নে : পাছায়? তালে তো হাগা বন্দ হয়ে যাবে মামা।
মামা : ধ্যাৎতেরি না। যেকানে যেকানে ঢাকা থাকবে সেখানে রোগ লাগবে নে।
ভাগ্নে : ও তাই আমরা নাকে মুকে ন্যাকড়া জড়ায়েছি?
মামা : ওটাকে ন্যাকরা বলে না। গাধা।
ভাগ্নে : তালে কি বলে?
মামা : মাস বলে মাস। যাক অনেকখন হোলো। লাগা লাগা।
ভাগ্নে : কি লাগাবো মামা।
মামা : হাতশুদ্ধি।
ভাগ্নে : কি শুদ্দি?
মামা : হাতশুদ্ধি।
ভাগ্নে : হাতশুদ্ধি সেটা আবার কি?
মামা : হাতে সাবান লাগালে তাকে হাতসুদ্দি বলে। (হঠাৎ ওদের গায়ে স্প্রে করে দিয়ে যায়।)
ভাগ্নে : মামা। ওরা গায়ে জল ছেটায়ে দিলো কেন গো? ও বুজিছি। আগে বে বাড়ীতে গেলি গায়ে গোলাপ জল ছেটায়ে দিত না? তা এখানে কার বিয়ে গো?
মামা : তোর বাপের। মর্কট। আরে এটা জল না। জল না। এটারে বলে গাশুদ্ধি।
ভাগ্নে : গাশুদ্ধি? কতরম সুদ্দি গো মামা। গরুর মুত খেলিও নাকি রোগসুদ্দি হয়?
মামা : কোন আহাম্মক বললো?
ভাগ্নে : ওই যে কারা য্যানো ঢকঢক করি গরুর মুত খাচ্চে। টিবিতে দেখালো তো।
মামা : দেখালো তো তুমিও খাও। নিজেই তো গরু। খাও। নিজের মুত নিজেই খাও। দ্যাকো রোগ সারে কিনা। আরে বাবা গরুর মুত খেলে যদি রোগ সারতো তালে সরকার রুগিদের ধরে ধরে হাসপাতালে না পাঠায়ে গোয়ালে পাঠাতো।
ভাগ্নে : এ কতাখান তুমি ঠিক বলেচো মামা। মামা ঐ দ্যাখো দলে দলে পুটলি পোটলা নি ছেলে বুড়ো সব কোতায় যাচ্ছে।
মামা : তাই তো। এই যে শোনো তোমরা দলে দলে কোতায় যাচ্ছো গো?
জনৈক : আমরা দেশি ফিরি যাচ্চি (জনৈকের খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রবেশ)।
ভাগ্নে : দেশে? এই দুর্যোগে ? কেন গো?
জনৈক : না গিয়ে কি কোরবো? একানে কাজকম্ম সব বনদো হয়ি গ্যাচে। খাবো কি?
ভাগ্নে : তা ঠিক। আমাদেরো তো কারখানা বন্দ হয়ি গ্যাছে।
মামা : তা তোমাদের দেশ কোতায় গো?
জনৈক : সে বহুদূর। ৫০০ ক্রোশ হবে।
ভাগ্নে : কোতা থেকি আসছো?

জনৈক : ডায়মন্ডহারবার।
মামা : উরি বাবা। সেতো বহুদূরে গো।
ভাগ্নে : ট্রেন বাস এ যেতি পারলে নে? এতদূর হাঁটা যায়?
জনৈক : ওসব তো চলছে নে।
মামা : কোনো খবর-ই তো রাকিস নে। সাদে কি তোরে বলি উল্লুক?
ভাগ্নে : এই নে সাতবার গাল পারলে বলি দেলাম মামা।
মামা : সাতবার কেনো এরম আজেবাজে কতা বললি সাতশো বার গাল দেবো।
জনৈক : আমারে একটু খেতি দিতে পারো? খুব ক্ষিদে লেগেছে।
ভাগ্নে : খাবার? আমাদের কাছে তো খাবার নেই গো।
জনৈক : ও । ঠিক আচে।
মামা : শোনো আমার কাচে একটু মুড়ি আর বাতাসা আচে। খাবা।
জনৈক : দাও। কাল থেকে তো কিচ্চু খায়নি। তাই। তা তোমরা খাবা না?
ভাগ্নে : না গো। আমরা পরে খাবো।
মামা : এই নাও। খাও। আর এই বিশটা টাকা আছে। নাও। রাস্তায় কিনে খেও।
ভাগ্নে : মামা। ওঠা দে দিলে আমরা খাবো কি?
মামা : চুপ কর। দেকচিস নে? ওনার কি কষ্ট হচ্চে? তাছাড়া কতদূরে যাবে বল দিনি।
ভাগ্নে : তা ঠিক। আমার কাচে থাকলিও দিতাম।
মামা : তোর কাচে কবে থাকে?
জনৈক : ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবে।
ভাগ্নে : ভগবান তোমাদেরও মঙ্গল করুক।
জনৈক : আমি তবে চলি?
মামা : সাবধানে যেও। শোনো অনেক জায়গায় খাবার দিচ্ছে। পেয়ে যাবে (জনৈক চলে যায়)
ভাগ্নে : মামা ওদের দেখি একটা কতা মনি পড়ে গেলো। সেই কবে একটা সিনেমা দেকিছিলাম সবাই হাঁটছে তো হাঁটছে আর গান গাইছে।
মামা : (গান ধরে) মা! মা গো। পথের ক্লান্তি ভুলে
স্নেহ ভরা কোলে তব মা গো বলো কবে শীতল হব
কত দূর; আর কত দূর ; বলো মা।
আঁধারের ভ্রুকুটিতে ভয় নাই
মা গো তোমার চরণে জানি পাব ঠাঁই
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেধে পায়
হাসি মুখে সে বেদনা সবো
কতদূর আর কত দূর ; বলো মা।
(এক পাগল নাচতে নাচতে ওদের সামনে এসে ছড়া কাটতে থাকে।)

পাগল : কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না
কেউ পাবে আর কেউ পাবে না,তা হবে না তা হবে না
রাজা উজির মন্ত্রী ফকির,সবাই সমান সবাই সমান
তোমার টাকা সবই ফাঁকা, যতই থাকুক পাহাড় প্রমাণ
হা হা হা হা কি মজা ভাই কি মজা
কেউ রাজা নয় সবই প্রজা
কেউ খাবে আর কেউ খাবেনা, তা হবে না তা হবে না।
কেউ পাবে আর কেউ পাবে না, তা হবে না তা হবে না।

মামা : কি গো অমন ভাবে নাচছো কেন গো? গায়ে রোগ লেগে যাবে যে।

পাগল : রোগ? হা হা হা হা। রোগতো তোমাদের ব্যাপার। আমাদের ওসব রোগভোগ হয় না, আমাদের হয় না কোনো রোগ। আমাদের তো একটাই দুর্ভোগ। জানো সেটা কি?

ভাগ্নে : কি?

পাগল : এ মা জানে না, জানে না। মুর্খ। ক্ষিদে। ক্ষিদে।

মামা :তা তুমি ঘর থেকে বেড়িয়েছ কেন?

পাগল : ঘর থেকে বেড়িয়েছি কেন? হা হা হা । কোথায় ঘর? আমার তো কোনো ঘরই নেই। খোলা আকাশেণ নীচে। এই যে ফুটপাত। জীবনভোর এটাই তো আমার ঘর। আমি তো সারীজীবন বাইরেই থাকি। তা সেখান থাকে কোথায় বেড়োবো গো? হা হা হা ।

ভাগ্নে : আচ্ছা তুমি নাকে কাপড় গোঁজোনি কেন?

পাগল : তুমি তো একটা আস্ত পাগল। যার পোঁদে কাপড় নেই সে কাপড় গুঁজবে নাকে?

মামা : চারদিকে ভয়ংকর রোগ ছড়াচ্ছে। খুব বিপদ। শোনোনি? সরকার ঘর থেকে বেড়োতে বারণ করেছে। সবাইকে ঘরে থাকতে বলেছে।

পাগল : কে সরকার? কার সরকার? আমাদের কোনো সরকার নেই। আমিই মন্ত্রী আমিই প্রজা। আর তুমি তো দেখছি বদ্ধ পাগল। বললাম না খোলা আকাশের নীচে। এই যে ফুটপাত। এটা আমার ঘর। শীতকালে, ঝড় বাদলে। খুব কষ্ট হয় জানো। তা তোমার ঐ সরকারকে বলো না একটা ঘর করে দিতে। তাহলে আর ঘর থেকে বেড়োবো না। বলো না বলবে?তোমাদের ঐ সরকারকে ? বলবে বলো না।

ভাগ্নে : করোনা। করোনা নিয়ে সরকার এখন খুব ব্যস্ত। এখন কিছু শুনতে পাবেনে।

পাগল : কবে শুনতে পায়? আমাদের কথা? এই রাস্তায় ফুটপাতে আদারে বাদারে যে সব মানুষ পড়ে থাকে তাদের তাদের বৌ-ছেলেমেয়েদের কান্না কবে শুনতে পায়?

মামা : তারা তো সব সময় আকাশপানে তাকিয়ে তাকে। মাটির কথা, মাটির কান্না তাদের কানে কি ঢোকে? ঢোকে না। আমরা কি খাই কি পড়ি এসব জানে তোমার ঐ সরকার? জানে না। (সুর করে) ওরা চোখে দ্যাখে না। ওরা কানে শোনে না। তাই তো বলি এবার তোরা কেমন লাগে দ্যাখ। ঘরের মধ্যে থাক। হা হা হা। (প্রস্থান)

(হঠাৎ কোথা থেকে আলুথালু বেশের এক নিরন্ন মানুষকে প্রবেশ করতে দেখা যায়।)

সুলেমান : আমাকে একটা কাগজ দিদি পারো? একখান কাগজ? একখান অলৌকিক কাগজ? কি গো তোমাদের বলছি গো। পারবে? দিতি? একখান অলৌকিক কাগজ?

মামা : কিসের কাগজ গো খুড়ো?

সুলেমান : একখান অলৌকিক কাগজ

মামা : অলৌকিক কাগজ? সেটা আবার কি গো খুড়ো?

সুলেমান : ঐ যে চাইছে।

ভাগ্নে : কে চাইছে গো খুড়ো?

সুলেমান : ঐ যে বাবুরা। বলছে এ দ্যাশে থাকতি হলি কাগজ দ্যাখাতি হবে। কাগজ দেখাতি না পারলি এ দ্যাশ ছাড়ি চলি যেতি হবে। তোমরা বলতি পারো সে কাগজ কোতায় পাবো? যে কাগজে নেখা আচে এটাই আমার দ্যাশ? যেখানে লেখা আচে এ সেই ভিটে যেখানে আমি, আমার বাপজান, আমার নানা সবাই সবাই জন্মেছে। লেখা আছে আমার মার কতা। আমার আম্মিজান ও তো এই দ্যাশেই জন্মেচে গো বাবুরা। বলোনা কোন সে কাগজ যেখানে এ সব কতা লেকা আচে?

মামা : কেন? তোমার কাছে ভোটার কার্ড নেই?

সুলেমান : সে কাগজে তো হবে না বাবা।

মামা : তাহলে আধার কার্ড ? নেই।

সুলেমান : সাদা সবুজ গেরুয়া তেরঙ্গা কাগজ? তাতেও হবে না।

ভাগ্নে : তাহলে বেগুনী কাগজ? নেই?

সুলেমান : র‍্যাশন কাডেও হবে না গো বাবু। বাবুরা বলে পয়সাদি নাকি এসব কিনতি পাওয়া যায় ওতে নাকি পেমান হয়না যে আমি এই দ্যাশের লোক। সেই জন্যিই তো বলচি আমারে একখান এমন অলৌকিক কাগজ দ্যাও যেকানে পষ্ট বোজা যাবে যে আমরা চোদ্দপুরুষ এই দ্যাশের মানুষ। এ দ্যাশটা আমাদের। জানেন বাবু আমার বাপজান ঐ বন্দ হয়ি যাওয়া চটকলে কাজ করতো। মিস্তিরি ছিলো গো বাবু। বাপজান একবার মেশিনের শব্দ শুনিই বলি দিতি পারতো মেশিনটার

কি হয়িচে। চটকলটা বন্দ হয়ি যাবার আগেও চট কলের বাবুরা মেশিন খারাপ হলিই বাপজানরি ডেকি পাঠাতো। পঞ্চাশ সালের পর থেকি ছেচল্লিশ বছর ঐ চটকলি কাজ করি জেবনটা কাটায়ে দেবার পরেও বাপজানরি পেমান করতি হবে যে, বাপজান এই দ্যাশের মানুষ। হ্যাঁ বাবু। পেমান করতি হবে যে, যে মাটি তারে বড় করিচে যে মাটি তার মুখি খাবার তুলি দেছে সেই মাটি সে দ্যাশ তার কিনা। করতি হবে পেমান। বলতি পারো বছরির পর বছর মাটিতে সোনার ফসল ফলানোটা যদি পেমান না হয়, বুকির রক্ত জল করি কারখানার মজুরিগিরি করাটা যদি পেমান না হয় তাহলি কি করি পেমান হবে আমি এই দ্যাশে জন্ময়েছি এ দ্যাশটা আমার। আমার নানা দ্যাশ সাদীন করার লড়াইয়ে যে পেরান দিলো তা কোন কাগজে লেখা আছে। বলোনা গো বাবু বলোনা।

মামা : শোনো এখন ওসব কাগজের দরকার নেই। এখন ঘরে থাকা দরকার। ভয়ংকর রোগ ছড়াচ্চে। যে রোগ থেকি কারোর নিস্তার নেই।

সুলেমান : ঠাট্টা করছো? ঠাট্টা ? আমাদের সাথি তো সবাই ঠাট্টা করে গেলো গো দ্যাশ সাদীন হবার আগে থেকেই তো সবাই ঠাট্টা করে চলেছে। নানা বলতো দ্যাশ সাদীন হলি আমাদের সব অভাব সব দুঃখ কষ্ট নাকি শ্যাষ হয়ি যাবে। সাদীন দ্যাশে দুঃখ কষ্ট বলি আর কিছু থাকবে না। দ্যাশ সাদীন হলো । সারা দ্যাশ জুড়ে তেরঙ্গা পতাকা উড়লো । তারপর কতদিন কেটি গেলো, কি হোলো? এখনো আমরা দুবেলা পেট ভরে খেতে পাইনা গো বাবু। দিন আনি দিন খাই। তাও সব বন্ধ।

ভাগ্নে : মামা তোমার সাথে ঠাট্টা করেনি গো খুড়ো।

সুলেমান : নানা তো আগেই চলি গেছে ইংরেজগো গুলিতে। তারপর বাপজান । সেও গেলো। ইংরেজগো গুলিতে না । জমির লড়াই লড়তি যেয়ি খাঁকি পোষাক পড়া সাদীন দ্যাশের সাদীন পুলিশির গুলিতে। রইলাম আমি। না গো আমি মরি নাই। এখনো মরি নাই। বেঁচি আছি। আচ্ছা বাপু আপনে বলতি পারেন আমি সত্যিই বেঁচি আছি কিনা? আর আপনেরা এই না মরি বেঁচি থাকা মানুষগুলারে নিয়ি ঠাট্টা করেন? কি আনন্দ পান? ঠাট্টা করি? আমরা কি আপনাগো ঠাট্টার পাত্তর বলেন তো?

মামা : (হঠাৎ চিৎকার করে) আমি ঠাট্টা করিনি সুলেমান। গরীব খেটে খাওয়া মানুষের সাথে আমি ঠাট্টা করতে পারি না। এই দেশের বড় বড় নেতারা বছরের পর বছর ধরে ঠাট্টা করেছেন। হাজার হাজার মানুষের রক্ত দিয়ে ঠাট্টা করেছেন। হাজার হাজার মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। শুধু দেশাত্মবোধের কথা বলেছেন আর দেশের মানুষের সাথে ঠাট্টা করেছেন। (হঠাৎ গান শোনা যায় 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা'। দুজন ছেলে ঢোকে। হাতে ব্যাগ। ব্যাগ থেকে খাবার বার করে তিনজনকে দেয়)

ভাগ্নে : এ আবার কি গো?

প্রথম : খাবার।

মামা : খাবার?

দ্বিতীয় : আমরা জানি আপনাদের এ কদিন ঠিকমত খাওয়া হয়নি।

প্রথম : তাই আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী আপনাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের হাতে খাবার পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছি।

দ্বিতীয় : নিন ধরুন (সুলেমান ইতস্তত: করে) নিন।

মামা : ধরেন, ধরেন। আরে বাবা এতো বড় দ্যাশে এখনো আপনার বাবার মতো ভালো মানুষরাও আছে।

সুলেমান : এটা আমারে দিলা? খাবার?

ভাগ্নে : এটা ঠাট্টা নয়কো খুড়ো। আটা আসল। কোনো ভেজাল নেই। নিয়ে নিন।

প্রথম : নিন। আমাদের আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে।

দ্বিতীয় : নিন ধরুন। (সুলেমান খাবার নিতে নিতে হাও হাও করে কেঁদে ফেলে)

প্রথম : ভয় নেই আপনার পাশে আছি।

মামা : খুড়ো বুকের রক্তদি যারা দেশটারে স্বাধীন করলো তাদের রক্ততো এই দেশেরই। তাদের রক্ত তো এরাই বয়ে নি যাচ্ছে। আমাদের এই দেশ থেকি তাড়ায় সে সাধ্যি কার? কোনো ভয় নেই তোমার। রোগ খরা বন্যা দাঙ্গা কোনো কিছুই আমাদের শেষ করতি পারবে না।

ছেলেরা : মজহব নেহি শিখাতা,আপস মে বায়ের রাখনা
হিন্দি হ্যায় হাম হিন্দি হ্যায় হাম হিন্দি হ্যায় হাম
বতন হ্যায় হিন্দুস্তা হামারা।

(এই রিদমেই আস্তে আস্তে 'আমরা করব জয়' গানে চলে যায়।)
(সবাই আস্তে আস্তে গলা মেলায়)

লেখক : সমীর বিশ্বাস, ব্যারাকপুরের (পশ্চিমবঙ্গ) জনপ্রিয় নাটককার।

জননী

মৃণাল দে

চরিত্র ঃ নীলাদ্রি, বিজয়া, মামি ও বাবা

(নীলাদ্রির মামা বাড়ি। ইটের দেওয়াল ও অ্যাসবেস্টারের চাল। মঞ্চে দুটো ভাগ। একভাবে মামির থাকার ঘর। তাতে একটা চৌকি, মামি শুয়ে আছে। একটা টুল, একটা আলনায় মামির পোশাক গোছানো আছে, ও একটা সেল্ফ তাতে মুড়ি, বিস্কুট ও ওষুধের কয়েকটা কৌটো। অন্য ঘরটি সাধারণ মানের কিছু আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। নীলাদ্রি অফিস থেকে ফিরে সরাসরি মামির ঘরে প্রবেশ করে। সময় - সন্ধ্যা উত্তীর্ণ)।

নীলাদ্রি : তোমার বিস্কুটের কৌটটা কই?

মামি : ঐতো।

নীলাদ্রি : আবার উপরে রেখেছ? কোন দিন পড়ে হাত-পা ভাঙ্গবে। নীচে রাখলে কি অসুবিধা?

মামি : পিঁপড়ের জ্বালায় কিছুই নীচে রাখা যায় না।

নীলাদ্রি : লক্ষ্মণ রেখা আছে। বিজয়াকে বললেই রেখা টেনে দেবে। মামি এই নাও টাকাগুলো রাখ।

মামি : আজ মাইনা পেলি? শোন নীলু, আমারে মাসে মাসে আর টাকা দিস না।

নীলাদ্রি : কেন বিজয়া কিছু বলেছে?

মামি : আ-হা বৌমাকে কেন সন্দেহ করিস। ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার জন্য কত টাকা ধার করেছিস। পুরো মাইনেও পাস না। তার উপর সেখানে যাওয়া, সংসার সাজিয়ে তোলা। কত খরচ বল দেখি।

নীলাদ্রি : তোমাকে অত ভাবতে হবে না। টাকাগুলো রাখ।

মামি : আমার কথা শোন আমারে দিসনে। আর ও দিয়ে আমি করবটা কি? হাঁটা-চলার ক্ষমতা নেই। বিছানায় সারাক্ষণ শুয়ে বসে। মাঝে মাঝে কাপড়ে চোপড়ে করে ফেলি। তুই এসে পরিষ্কার করে দিস তাই; নাহলে যে কি দুর্ভোগে পড়তাম।

নীলাদ্রি : রাখ তো, সব ছেলেমেয়ে ই বুড়ো মা-বাবার জন্য এটুকু করে, এই যে তোমার হরলিক্স, চিনি, তেল, পাউডার, সাবান, পেষ্ট।

মামি : নীলু, আয় বাবা আমার কাছে একটু বয়। আয় বাবা-

নীলাদ্রি : বল কি বলবে? (কাছে বসতে বসতে বলে)

মামি : কিছু না। বাবা। আর জন্মে যেন তোরে সত্যি-সত্যিই গর্ভে ধারণ করতে পারি। ঠাকুরের কাছে এই কামনা করি।

নীলাদ্রি : ঠিক আছে। ঠিক আছে, চুপ কর। শোন তোমার রেকারিং ডিপোজিট এমাসেই

শেষ। জমা দিয়ে দিয়েছি। আর সামনের মাসে ফিক্সড ডিপোজিটটাও ম্যাচিওর করে যাবে। সব মিলিয়ে লাখ দেড়েক হবে। পোষ্ট অফিসে এম.আই,এস . করে দেব মাসে মাসে প্রায় এগারোশো টাকা পাবে। ঠিক আছে তো?

মামি : তুই যা করবি সেটাই ঠিক? তবে একটা কথা রাখবি?

নীলাদ্রি : কি কথা?

মামি : ও টাকাগুলো আর জমাইয়ে রাখিসনে, বাড়ির কাজে খরচা করি ফ্যাল।

নীলাদ্রি : তোমার কি হয়েছে বলো তো?

মামি : কি আবার হবে? তুই এত কষ্ট করছিস! তাই টাকাগুলো কাজে লাগুক।

নীলাদ্রি : তুমি চুপ করবে, নাকি চলে যাব।

মামি : শোন শোন বাবা, রাগ করিস নে। তোর তিল তিল করে জমানো এত কষ্টের টাকা, সেটা যদি তোর ফ্ল্যাট-বাড়ির কাজে লাগে , তাহলে আমিই সব চাইতে খুশী হব বাবা।

নীলাদ্রি : আমি ওই টাকা নিয়ে আর কোন কথা শুনতে চাই না।

বিজয়া : (নেপথ্যে) এই শুনছো চা বসাচ্ছি এস।

মামি : যা বাবা, অফিস থেকে এসেছিস, হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে বিশ্রাম নে।

নীলাদ্রি : ও-হো একদম ভুলে গেলাম তোমার পান আনা হয়নি।

মামি : যা আছে আজ হয়ে যাবে। কাল বাজার থেকে এনে দিস। হ্যারে নীলু একটু দোক্তাপাতা এনে দিস।

নীলাদ্রি : ঠিক আছে।

(প্রস্থান । আলো অফ্। আলো জ্বললে দেখা যায় নীলাদ্রি গামছা দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে অন্য ঘরে প্রবেশ করে)।

নীলাদ্রি : চা হয়েছে? নিয়ে এসো। জলের বোতলটা এনো।

বিজয়া : আনছি আনছি — (প্লেটসহ চা বিস্কুট নিয়ে প্রবেশ)।

এই বিস্কুটও ফুরিয়ে এসেছে। দোকানে গেলে বিস্কুট , নুন, আলু, ও ভাল কথা একটু বেসন এনো, পাট পাতার বড়া করব।

নীলাদ্রি : ঠিক আছে, দোকানে যাওয়ার সময় মনে করো। জল কই?

বিজয়া : ধর, ওই তো জলের বোতল। (টেবিলে চা রাখে)। এই ঠাকুর মশাই-এর ছেলে এসেছিল বলে গেছে সামনের মাসে উনিশ তারিখে ভাল দিন আছে।

নীলাদ্রি : তাই, তাহলে তো মাস খানেকও বাকি নেই।

বিজয়া : ফ্ল্যাটের কাজ কিছু বাকি আছে?

নীলাদ্রি : কলের ফিটিংস, লাইটগুলো লাগানো, আর কিছু টুকি-টাকি কাজ।

বিজয়া : প্রমোটারকে বল উনিশ তারিখের আগে সব কাজ শেষ করতে।

নীলাদ্রি : সে-তো বুঝলাম কিন্তু গৃহপ্রবেশে ভাল খরচা আছে।

বিজয়া : তোমার দাদাদের, দুই একজন প্রতিবেশী , আর কয়েকজন বন্ধুদের বল।

নীলাদ্রি : ওই করতে করতে দেড়শোয় দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে এক লাখের ধাক্কা।

বিজয়া : তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিও। আমি সব ম্যানেজ করে নেব। এই শোন না গৃহপ্রবেশের তারিখটা পাবার পর আমি আর বাবা মামিকে সব বললাম। শুনে উনি কেমন যেন মন মরা হয়ে গেল। বাবা বুঝিয়ে বলল আপনার নাতির পড়া শেষ হতে এখনো বছর দুই বাকি, তার আগে ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরছে না। ঘরটা ফাঁকাই থাকবে। ওর ঘরে আপনি থাকবেন, আমাদের সাথে চলুন।

নীলাদ্রি : মামি কি বলল?

বিজয়া : কোন কথাই বলে না, চুপ। বাবা তোমার কথা বলছিল। তুমি বললে নিশ্চয়ই যাবে।

নীলাদ্রি : মাস খানেক আগে মামিকে যখন ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম তখনি মনে হয়েছিল মামি যাবে না।

বিজয়া : কেন?

নীলাদ্রি : ফ্ল্যাট দেখতে দেখতে মামির চোখে-মুখে ছিল দারুণ এক তৃপ্তি। দোতলার পূবে ঝলমলে ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে বসে আমার শৈশব-কৈশোর, যৌবনের কত কথা, কত গল্প করে গেল। তারপর একে একে যখন ঘরগুলো দেখিয়ে বর্ণনা দিতে দিতে বললাম এটা এর ঘর, ওটা ওর ঘর। আর মামির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম— তাঁর বুকের গভীরে, অনেক অতলে কোথায় যেন রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে।

বিজয়া : সে কি , কি হয়েছিল ওনার?

নীলাদ্রি : সে তুমি বুঝবে না। হয়ত ক্ষীণ আশা ছিল এই নতুন ফ্ল্যাটে সামান্য কিছুটা জায়গা তাঁর জন্য বরাদ্দ আছে, আমি বলেছিলাম ড্রয়িং রুম থেকে কিছুটা নিয়ে একটা ছোট ঘর করি।

বিজয়া : অসম্ভব। গেস্ট ঢুকে দেখবে একজন বুড়ি মাখামাখি করে শুয়ে আছে। দুর্গন্ধ বেরচ্ছে।

নীলাদ্রি : তোমার স্বামীর ছোটবেলার গু-মুত উনিই কিন্তু পরিষ্কার করতেন।

বিজয়া : দুটো কি এক হলো? তাছাড়া ওনার ছেলে-পুলে নেই, তাই ভাগ্নে হিসাবে এতদিন তো সব দেখলে।

নীলাদ্রি : আর এখন?

বিজয়া : দেখ, বস্তিবাড়ি হলেও কলকাতার উপরে। এ বাড়ির যা কিছু ডেভেলপমেন্ট তা তোমার পয়সায় হয়েছে। হিসাবমত ভাড়ার ভাগ তোমারও পাওয়া উচিত। কিন্তু নিও না। ওনার ঘরটা বাদ দিয়ে বাকিটা ভাড়া দিয়ে দাও। সেই পয়সায় একটা আয়া রেখে দিব্যি চলে যাবে।

নীলাদ্রি : বাঃ কি সুন্দর একটা যোগ বিয়োগের হিসাব করে দিলে তো।

বিজয়া : যতই ব্যঙ্গ কর না কেন, কি পেলে আর কি দিলে তাই নিয়েই প্রতিটা জীবন।

নীলাদ্রি : মানে তোমার সাথে তোমার ছেলের সম্পর্কটাও তাই।

বিজয়া : নাড়িকাটা সম্পর্কর সাথে অন্য সম্পর্কের তুলনা হয় না।

নীলাদ্রি : একটা ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছ। রক্তের সম্পর্কের পরেও আরো অনেক কিছু থাকে, তাই তো মামি ক্রমশ মা হয়ে যায়। তাই তো বুকের ওম দিয়ে রুগ্ন অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে বাঁচিয়ে তুলেছে। একটু একটু করে সব সঞ্চিত উষ্ণতা দিয়ে, মমতা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সেদিনের শিশুকে বড় করেছে, পড়ালেখা শিখিয়েছে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তুমি যাকে বুড়ি বলছ সে যদি না থাকত কোথায় পেতে তোমার স্বামীকে, সন্তানকে, স্বপ্নের ফ্ল্যাটটিকে?

বিজয়া : বেশ তো তুমি এখানে তোমার মামিকে নিয়ে থাক।

নীলাদ্রি : মানে মামিকে কোন অবস্থাতেই ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া যাবে না?

বিজয়া : ঠিক তাই, আর আশা করি তুমি এ নিয়ে অশান্তি করবে না।

নীলাদ্রি : এটাই চূড়ান্ত! বেশ মনে রাখব।

বিজয়া : তবে চাই তুমি আমাদের সাথে ফ্ল্যাটে চলো।

নীলাদ্রি : ভাবি, ভেবে পরে বলব।

বিজয়া : বাড়ি ভাড়া দিয়ে আয়া রাখা ছাড়াও আমরা মানে আমি আর বাবা আরো কিছু ভেবেছি শুনবে?

নীলাদ্রি : বল।

বিজয়া : ছোট ছোট কিছু নারসিং হোম আছে ওরা এধরনের পেসেন্টদের মাসহারা চুক্তিতে রাখে।

নীলাদ্রি : মানে বার্ধক্যজনিত কারণ ছাড়া কোন রোগ না থাকা সত্বেও রোগীদের সঙ্গে তাঁকে থাকতে হবে।

বিজয়া : কিন্তু সুবিধা হলো রেগুলার ডাক্তার দেখবে। নার্স, আয়ারা, পরিচর্যা করবে।

নীলাদ্রি : সারাক্ষণ রোগ জীবাণুর মধ্যে থাকতে থাকতে নিজেই একদিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে।। অসম্ভব,, কখনই না।

বিজয়া : বেশ তাহলে বৃদ্ধাশ্রম। বাড়িভাড়ার টাকায় যদি কম পড়ে নিজেরা একটু কষ্ট করে দেবে। আর কতদিনই বা বাঁচবেন। মারা গেলে বাড়িটা বিক্রি করে তোমার লোনেরও অনেকটা শোধ হয়ে যাবে। কি হলো উঠলে । 'হ্যা' 'না' কিছুই বললে না ? (নীলাদ্রি দাঁড়ায়)।

নীলাদ্রি : দোকানে যেতে হবে মামির জন্য পান, দোক্তাপাতা, আর সংসারের জন্য বিস্কুট, নুন, আলু, বেসন তাই তো?

বিজয়া : সে পরে হবে। কিছু বলে যাও (কলিংবেল)।

নীলাদ্রি : যাও, তোমার বাবা সান্ধ্য ভ্রমণ থেকে এলেন।

বিজয়া : না, বাবা অন্য জায়গায় গিয়েছিল।
নীলাদ্রি : কোথায়? (দরজা খোলে)।
বিজয়া : পরে বলছি।(বিজয়ার বাবার প্রবেশ)
বাবা : নীলাদ্রি কোথাও বেরচ্ছ?
নীলাদ্রি : হু, একটু দোকানে।
বাবা : ও। তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।
নীলাদ্রি : আসছি। একটু বাদে। (চলে যায়)
বিজয়া : বাবা খোঁজ পেয়েছ?
বাবা : তিন জায়গা থেকে খোঁজ এনেছি।
বিজয়া : কিরকম খরচা?
বাবা : সবচাইতে কম সাত হাজার।
বিজয়া : বাবাঃ সা-ত-হা-জা-র। আর সব চাইতে বেশী?
বাবা : বারো হাজার।
বিজয়া : বলো কি! এ কি বৃদ্ধাশ্রম না কসাইখানা? একজন বুড়ি মানুষ থাকবে। রাতে দুটো রুটি, দিনে নিরামিষ সব্জি দিয়ে একটু ভাত তার জন্য এত?
বাবা : তা বললে হবে কেন? ডাক্তারের রেগুলার চেকআপ, অষুধ-পথ্যি, আলাদা ঘর, বেড, এ.সি, এ্যাটাচ বাথ, রিক্রিয়েশনের জন্য টি.ভি., খেলার উপকরণ, মাঝে মাঝে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া।
বিজয়া : অত শত দরকার নেই। মাঝামাঝি কিছু পেলে না।
বাবা : আছে মান্থলি দশ হাজার।
বিজয়া : নানা সাত হাজারটাই অনেক বেশি। তবুও ওটাই দেখ।
বাবা : সেখানে নীলাদ্রির পরমারাধ্যকে রাখা যাবে কিনা সেটা ওর সাথে আলোচনা করে দেখ।
বিজয়া : কেমন সেটা?
বাবা : এমনি ঠিক আছে তবে এক একটা ঘরে তিনজন-চারজন করে, তার উপর কমন বাথরুম।
বিজয়া : ও ঠিক রাজি হবে না। সব কেটে-কুটে হাজার পঁচিশ মত হাতে পায় তার থেকে না - না।
বাবা : এক দারোয়ানের থেকে খবর পেয়ে আমতলা ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে এক বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম, খরচা অনেকটা কম, কিন্তু —
বিজয়া : কত লাগবে মাসে মাসে?
বাবা : দিতে হবে চার হাজার, আর জেনারেটর, ডাক্তার আলাদা, সব মিলিয়ে ধরে নে হাজার পাঁচেক।

বিজয়া : ওটাই দেখ, নাগালের মধ্যে থাকলে ঠিক রাজি করিয়ে নিতে পারব।
বাবা : কিন্তু টিনের চাল, খুব গরম হবে। দেওয়ালগুলো ড্যামেজ, স্যাঁতস্যাঁতে। যদিও গাছগাছালি আছে, বেশ খোলামেলা।
বিজয়া : এটাই তো ভাল, ফ্রেশ এয়ার পাবে। শরীরও ভাল থাকবে। ভাড়াও কম, বাবা ওকে এটার কথাই বল। অন্যগুলোর কিছু বলো না। বাবা চলো না আমরাই মামি শাশুড়িকে বলি।
বাবা : নীলাদ্রিকে না জানিয়ে বলাটা কি ঠিক হবে?
বিজয়া : বরং ও জানলেই কেঁচেগন্ডুস হবে। আমরা বলে মত নিয়ে রাখি ও এলেই ওকে জানাবো।
বাবা : বেশ চল।
(দুজনে প্রস্থানোদ্যত। আলো অফ্। আলো জ্বললে দেখা যায় মামির ঘর)।
বিজয়া : মামি - মামি।
মামি : ভিতরে এস। ও তোমার বাবাও আছে। বৌমা ওই টুলটা দাও। বসেন। বৌমা কিছু বলবে?
বিজয়া : হ্যাঁ, মানে বাবা— ; ও বাবা বল না।
বাবা : বলা বলতে ফ্ল্যাটে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে সামনের উনিশ তারিখ, হাতে মাত্র তেইশ দিন। কিন্তু আপনাকে তো এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না। তাই ভাবছিলাম আপনার জন্য যদি একটা বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করা যায়। মানে আপনি যদি বলেন খোঁজ-খবর নিতে পারি।
বিজয়া : খোলাখুলিই বলো না, একটা বৃদ্ধাশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। চারিদিকে গাছপালা-মাঝখানে পুকুর মাছেরা খেলা করছে।
বাবা : জলে পদ্মপাতা, শালুক ফুল ফুটেছে, হাসেরা সাঁতার কাটছে। বৃদ্ধাশ্রমের গরু-ছাগলরা চড়ে বেড়াচ্ছে। অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তাল, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল গাছে চারদিক ঘেরা। যেন ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।
মামি : এতো আমার গাঁ-এর মত যেন পটে আঁকা ছবি। সেই বারো বছর বয়েসে বিয়ে করে ওর মামার সাথে এ বঙ্গে চলে এসেছি, আর যাই নাই। অথচ এখনো নিজামকান্তির কথা ভুলি নাই।
বাবা : জীবনের শেষ প্রান্তে আবার কিছুদিন গ্রামে থাকবেন। দেশ-গাঁয়ের সেই ছবি, সেই আলো-বাতাস আপনার মন-প্রাণকে ভরিয়ে তুলবে।
বিজয়া : বুকভরা নিশ্বাস নেবে। শুদ্ধ অক্সিজেন।
বাবা : একজন বয়স্ক হিসাবে আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনারও ভাল লাগবে, খুব ভালো থাকবেন ওখানে। আয়ু বেড়ে যাবে। তাহলে সব ব্যবস্থা পাকা করি?
বিজয়া : মামি বাবা অনেক কষ্ট করে, সোর্স খাটিয়ে ব্যবস্থা করেছে।

মামি : যেতে তো মন চায়, কিন্তু নীলুর এত ধার দেনা, তারপরে আমাকে ওইখানে রাখার জন্যও মাসে মাসে কাড়ি-কাড়ি খরচা।

বাবা : ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। আমি তো আছি। মেয়ে ছাড়া আমার তো পৃথিবীতে কেউ নেই। ফলে—

মামি : সেটা তো হক্ কথাই। না হলি কি নীলু অতবড় একখানা ফ্ল্যাট বাড়ি কেনার সাহস পেত।

বাবা : তা কেন? ওর সব কিছুর পিছনেই আপনি।

মামি : আমি আর কি করতে পারলাম! মরলে এই বস্তিবাড়িটা বিক্রি করে হয়তো কিছু টাকা পাবে। কিন্তু মরলে তবে তো পাবে। আমি মরতে চাই অথচ কিছুতেই মরণ আসে না। আর আপনারা আমারে বাঁচায়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন।

বাবা : আপনি চাইলেই আমরা মরতে দিতে পারি না। আপনার নাতি পড়াশোনা শেষ করে বড় চাকরি করবে তারপর ওর বিয়ে দিয়ে নাতির ঘরে পুতির মুখ দেখে আশীর্ব্বাদ করে তবে আপনার ছুটি।

বিজয়া : হ্যাঁ মামি আমাদের আবদার তোমাকে ততদিন বাঁচতেই হবে।

বাবা : তাহলে বৃদ্ধাশ্রমের সবকিছু ফাইনাল করছি।

বিজয়া : কি হলো তুমি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' কিছু বলো। কিছু না বললে তো এগোনো যাবে না।

বাবা : সময়ও নেই ফলে যা করতে হবে তাড়াতাড়ি।

বিজয়া : মামি, কিছু বল?

মামি : যে ক'টা দিন বাঁচি এখানেই থাকি।

বিজয়া : আমাদের এভাবে বিপদে ফেলতে চাও?

মামি : আমার আর কতটুকু খ্যামতা যে বিপদে ফেলব।

বিজয়া : তুমি খুব ভাল করে জানো যে ও তোমার একটা ব্যবস্থা না করে এখান থেকে কিছুতেই যাবে না।

মামি : সে ওরে আমি বুঝিয়ে বলব ও ঠিক যাবে। আর আমারে নিয়ে ভেবো না, এখনো বাংলাদেশের দশ-বারো ঘর লোক আছে। ওরা আমাকে ফেলতে পারবে না।

বাবা : তবু আপনি ভাবুন, নীলাদ্রির সঙ্গেও কথা বলুন। সব দিক বিবেচনা করে প্রস্তাবটা কিন্তু খুব ভাল ছিল। বিজু চল।

(আলো অফ্ । আলো জ্বললে দেখা যায় মামির ঘরে মামির সাথে নীলাদ্রি কথা বলছে)।

নীলাদ্রি : আমি কোন কথা শুনতে চাইনা, তুমি যাবে।

মামি : কেন তুই বার বার এক কথাই বলিস।

নীলাদ্রি : তুমিই বা কেন আমাদের একটা কথাও শুনছ না?

মামি : শোনার মত কি কোন কথা কইছিস?

নীলাদ্রি : বৃদ্ধাশ্রম যাবে না, নতুন ফ্ল্যাটেও যাবে না। কি চাও?

মামি : সংসারের কোন কাজে লাগে না বুড়ো গরুর মতো বাতিল বুড়ো-বুড়িদের রেখে আসার জায়গা তো? কেন যাব? এ ঘরটা তো আছে, মরলি এখানে মরব। আর ফ্ল্যাট বাড়ি! মুখে যাই বলুক তোর বৌ-শ্বশুর চায় না আমি যাই।

নীলাদ্রি : কি ওরা এইসব— । ওদের আমি বুঝে নেব। তুমি যাবেই।

মামি : নীলু আমারে নিয়ে সংসারে অশান্তি করিস নে, একথা তো সত্যি জামাকাপড় নোংরা, গা থেকে চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানা গন্ধ।

নীলাদ্রি : কি! তুমি কি জন্তু জানোয়ার নাকি? কে কে বলেছে এইসব কথা? নিশ্চয়ই বিজয়ার বাবা? ঐ বুড়োটার সব বিষয়ে নাক গলানো। কেন, কেন আছে মেয়ের সংসারে? নিজে পারেনা বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে। আজ তোমার নাক যদি না ভোঁতা করেছি।

মামি : শোন শোন নীলু উত্তেজিত হোস না।

নীলাদ্রি : উত্তেজিত হব না, তোমরা যে যার মত চলছ, আমার কথা কেউ শুনছ? ওদিকে ফ্ল্যাটের সমস্যা, গৃহপ্রবেশের হ্যাপা। তারপর তোমাদের এক এক জনের এক এক রকম বায়না। কি করে মাথা ঠান্ডা রাখি বলতে পার?

মামি : শোন বাবা, আমার কাছে বস। বুঝি বাবা আমার জন্য তোর বুকের ভিতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। ভিতরের যন্ত্রনায় কারণে অকারণে মাথা গরম করে ফেলছিস। মাথা ঠান্ডা রেখে গৃহপ্রবেশ মেটা। পরে নয় কোনদিন যাব।

নীলাদ্রি : না তুমি আমাদের সাথেই যাবে। তোমাকে বাদ দিয়ে কোনভাবেই আমি গৃহপ্রবেশ করব না। আর তুমি যদি না যাও সব-সব কিছু বন্ধ করে দেব।

মামি : ক্ষ্যাপামি করিস নে।

নীলাদ্রি : ক্ষ্যাপামি কিসের? আর যদি ক্ষ্যাপামি করে থাকি সেও তো তোমার কাছ থেকেই শেখা। তুমিই তো বল পূজা-আচ্ছা যাই করিস না কেন মানুষই সব। মানুষের মধ্যে ভগবান আছে আর যাকে তুমি প্রচন্ড অভাব অনটনের মধ্যেও নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে বড় করেছ, একটু একটু গড়ে তুলেছ আজ তার গৃহপ্রবেশে তুমি যাবে না!

মামি : নীলু গৃহটা শুধু তোর নয় বৌ-এর সাথে শ্বশুরেরও ভাগ আছে।

নীলাদ্রি : কিসের ভাগ? দশ লাখ টাকা ধার নিয়েছি শোধ করে দেব। আর ওই ঘরে তুমি থাকবে, ওনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবো।

মামি : হায় ভগবান তোরে নিশ্চয়ই দুষ্টু গ্রহ ধরেছে। এসব মাথা থেকে সরা। যে ক'টা দিন বাঁচি, শান্তিতে বাঁচতে দে।

নীলাদ্রি : আমার কিসে শান্তি তুমি বোঝো না। তুমি যাবে। হ্যাঁ তুমি যাবেই। তার জন্য যা

কিছু ঘটে ঘটুক।

মামি : ঠাকুর তুমি মুখ তুলে চাও ঠাকুর। আমার বাছাধনের সুমতি দাও। ওরে ভাল রাখ, সুস্থ রাখ ঠাকুর।

নীলাদ্রি : আমাকে ভাল রাখার মন্ত্র তুমি জান। (যেন পুত্র মাকে জড়িয়ে ধরেছে) বল যাবে? বল যাবে?

মামি : ওরে ছাড়-ছাড়, দম বন্ধ হয়ে যায়। এখন কি অত সইতে পারি। নাকি তুই আমার সেই ছোট্ট বাছাধন?

নীলাদ্রি : হ্যাঁ আমি তোমার সেই ছোট্ট নীলু, যতক্ষণ না 'হ্যাঁ' বলবে ততক্ষণ ছাড়বো না। বল যাবে? বল যাবে?

মামি : ছাড়- ছাড়, আচ্ছা যাব যাবরে বাবা যাব।

নীলাদ্রি : ঠিক ঠিক—।

মামি : ঠিক রে বাবা ঠিক। ছাড় ছাড়।

নীলাদ্রি : ও- হো , কি আনন্দ আমার মামি যাবে। আমার মামি যাবে।
(আনন্দে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে লাফাতে থাকে)

মামি : পাগল ছেলে আমার, পাগল ছেলে —।
(আলো অফ্। আলো জ্বললে দেখা যায় গৃহ প্রবেশের পূজোতে যাবে বলে সবাই ব্যস্ত)।

বাবা : হ্যারে বিজু তাড়াতড়ি কর সাতটা বাজতে চলল। এগারোটা উনিশে ভাল সময়। ওই সময়ে পুজো শুরু করতে হবে।

বিজয়া : মাল-পত্তর নিয়ে গেছে, ও রেখে আসুক, ওই গাড়িতেই যাব।

বাবা : হ্যারে মামি শাশুড়িকে দেখ, শুয়েই আছে, সাড়া-শব্দও নেই।

বিজয়া : কি করতে পারি বল সেই ভোর চারটেয় উঠে এনার জন্য রান্না করেছি। ধোকার ডালনা, নারকেল দিয়ে মুগডাল, আলু পটলের কোরমা, বেগুন ভাজা, যা যা ভালবাসে। স্নান করে খেয়ে নেবার জন্য কতবার ডাকলাম। পাত্তাই দিল না।

বাবা : তবুও যাবে যখন তৈরি করে—।

বিজয়া : ভেবো না, নতুন সায়া-ব্লাউজ-শাড়ি চলে এসেছে। ওকে আসতে দাও, সব রেডি করে নিয়ে যাবে।

বাবা : জানিস বিজু আজ দাদুভাই এর কথা খুব মনে পড়ছে। এ রকম একটা শুভ দিনে

বিজয়া : কাল রাতে ফোনে কথা হয়েছে। পুজোতে আসবে। সামনের সপ্তাহে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

বাবা : বলেছিস তো ভাল করে পরীক্ষা দিতে। এই অনুষ্ঠান নিয়ে কোন চিন্তা না করে।

বিজয়া : বলেছি, তবে বার বার গৃহপ্রবেশের কথা, মামির কথা জানতে চাইছিল।

বাবা : কি কথা?

বিজয়া : মামির শরীর কেমন আছে? ফ্ল্যাটে যাচ্ছে কিনা— এইসব।

বাবা : ঠাকুরমাকে ও খুব ভালোবাসে তাই না রে?

বিজয়া : এ ব্যাপারে বাপ-ছেলের খুব মিল। তবে ওর না আসাটা একদিক থেকে ভাল হয়েছে। মামি ক'টা দিন ওখানে থাকুক।

বাবা : থাকুক, তবে ক'টাদিনই। এমনভাবে রাখতে হবে যেন ওনার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওখান থেকে বেরোনোর জন্য হাঁক্-পাক্ করে।

বিজয়া : এমন ব্যবস্থা করব ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। সারা জীবনের মত প্রাসাদে থাকার শখ ঘুচে যাবে।

বাবা : একটা কথা কি জানিস মা হলে নয় কথা ছিল। মামিকে নিয়ে নীলাদ্রির বড়ই বাড়াবাড়ি। খুব দৃষ্টিকটু।

বিজয়া : কে ওকে বোঝাবে বল। যতবার বলতে গেছি ততবারই অশান্তি। আমার কোন কথাই শুনতে চায় না, অথচ আমাকেই অথর্ব মৃতপ্রায়, জড় জীবনটাকে টেনে টেনে চলতে হচ্ছে।

বাবা : এভাবে গতিহীন প্রাণকে জীবনের সাথে জুড়ে রাখা মানেই তোদের জীবনের গতি কমে যাওয়া। বৃদ্ধাশ্রমের কথা নীলাদ্রিকে বোঝা।

বিজয়া : কোন লাভ নেই, বরং বলে - এখানেই নাকি ও জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। ওর ধারণা মামি যদি না থাকতো তাহলে নাকি ওর জীবনটা এভাবে গড়ে উঠত না, ও হয়ত পৃথিবীতেই থাকত না।

বাবা : কেন ওর মা -বাবা।

বিজয়া : ওর উপলব্ধি ওর জন্মটা একটা ইন্সিডেন্ট। ওই টুকু বাদ দিলে মামির স্নেহ ভালবাসার উষ্ণতাতে বাকি জীবনের জন্ম।

বাবা : ওসব কথার মোড়ক। মা - বাবার জায়গা কেউ নিতে পারে না, মা সব সময় মা; মামি মামিই; কখনই মা হতে পারে না। ওরা তো অনেকগুলো ভাই-বোন। দু-চারমাস করে বাকি জীবনটা তাদের কাছেও থাকতে পারে।

বিজয়া : শুভদিনে এসব কথা তুলো না বাবা। ওর কানে গেলেই ঝগড়াঝাটি, খুব অশান্তি শুরু হবে।

(গাড়ি থামার শব্দ। কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খোলে। নালীদ্রির প্রবেশ)।

নীলাদ্রি : তোমরা সব রেডি তো?

বাবা : ও দিকে সব ঠিক-ঠাক এগোচ্ছে?

নীলাদ্রি : ডেকোররেটরের কাজ শেষ। ফুল, মালা, লাইট দিয়ে সাজানো হচ্ছে। ক্যাটারিংও ঠিক আছে। এবার শুধু পুজোর ব্যবস্থা করা।

বাবা : কিন্তু তোমার মামিকে তুলতে পারছি না, শুয়েই আছে।

নীলাদ্রি : ক'দিন ধরেই শরীর ঠিক নেই, ঠিকমত কথা বলছে না, খাচ্ছে না।

বিজয়া : তুমি মামিকে রেডি কর। টুকি-টাকি কয়েকটা জিনিস নেওয়ার অছে সেগুলো গাড়িতে তুলছি।

নীলাদ্রি : সাবধানে তুলো। এই আমার ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে নাও, ওখানে স্নান করে পূজোয় বসব। মা - বাবা- মামার ফটোগুলো নিও।
(আলো জ্বলে। নীলাদ্রি মামির ঘরে যায়)।

বিজয়া : আচ্ছা। বাবা এদিকে এস। আমায় একটু হেল্প কর। (দুজনে জিনিসপত্তর নিয়ে গাড়িতে তোলার জন্য বাইরে যায়। আলো অফ্)।

নীলাদ্রি : মামি-ও-মামি, কি হলো ওঠো, ওঠ। অনেক কাজ, বেলাও বয়ে যাচ্ছে। (বলতে বলতে কৌটো, শিশি, ওষুধ , ব্যাগে ভরতে থাকে)। ওঠো, আমাকে এগারোটায় পূজোয় বসতে হবে। কি হলো উঠে বাথরুমে চল, তৈরি হয়ে নাও। কি হলো শরীর খারাপ নাকি, চলো স্নান করে কিছু খেয়ে ওষুধ খেয়ে নেবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। মামি এদিকে ঘোরো। (বিছানায় বসে মামির গায়ে হাত দিয়ে টানে) একি চোখ বোজা, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। মামি মামি (ভালো করে দেখে চিৎকার করে কাঁদে)। এ হতে পারে না। এ হতে পারে না।

বিজয়া ও বাবা: (প্রায় ছুটে আসে) কি হয়েছে, কি হয়েছে?

নীলাদ্রি : মা, আমাকে ছেড়ে চলে গেলে মা। আমার যে আর কেউ রইল না। আমাকে অনাথ করে দিলে মা।

বিজয়া : আর জন্মের শত্রুতা। ধনে মানে পুরো ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাদ্রি : চুপ কর। একটা কথাও বলবে না। অকৃতজ্ঞের দল। মা-মাগো তোমার ঘরে তুমি অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করেছ। তবুও তো মা তুমি ছিলে। আজ আমি একা— বড় একা মা। ।

(মামিকে জড়িয়ে ধরে নীলাদ্রি হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। নেপথ্যেও করুণ সুর বাজতে থাকে। পর্দা পড়তে থাকে)।

লেখক : মৃণাল দে, জনপ্রিয় নাট্যকার - পশ্চিমবঙ্গ

আজকের প্রমেথিউস

সঞ্জয় আচার্য

চরিত্র ঃ সূত্রধার-১, সূত্রধার-২, সূত্রধার-৩, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, ক্যাপ্টেন রাসেল, কমাণ্ডার মুসেমবার্গ, আবিদ হাসান, কেবিন বয় - ২জন।

(সূত্রধারের চরিত্রগুলি অন্যান্য চরিত্রাভিনেতারাই করতে পারে। একমাত্র নেতাজীর চরিত্রাভিনেতা ব্যতীত)

(সূত্রধাররা মঞ্চের বিভিন্ন কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে একটি ছোট আলোক বৃত্তে নেতাজী দণ্ডায়মান, অতি দূরদিকে তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত, একটি সাবমেরিনের টুকরো টুকরো অংশ দিয়ে পরে মঞ্চসজ্জা নির্মিত হবে। লেফ্‌টে ব্যাক স্টেজে একটি উঁচু রস্ট্রামে পেরিস্কোপ লাগানো থাকবে। রাইট ব্যাকে জাহাজের একটি ছোট কেবিন ঘরও নির্মাণ করা যেতে পারে। নেতাজী ভাবাতুর, ঈষৎ চিন্তামগ্ন। সামমেরিন এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের গভীর অন্ত:স্রোত ভেদ করে অজানা দ্বীপের সন্ধানে ভারত মহাসাগরের দিকে)।

১ম : এ যেন বিপন্ন খর্বকায় যুগ। কোথাও দেখা মেলে না দৃঢ়চেতা কোন ব্যক্তিত্ব। সর্বত্রই ধান্দাবাজ দালালদের চতুর আনাগোনা।

২য় : পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন। সর্বত্রই নিষ্ঠুরতা যেন বাতাসকে ঘিরে আছে। রাজনীতি আর নীতিহীন এক রাজার নীতি, বদমায়েশী আর বজ্জাতির চূড়ান্ত আখড়া।

৩য় : কুৎসার ক্লেদ, মিথ্যচারের মায়াবী ছলনা। ভণ্ডামির ভড়ং আর লোক ঠাকানোর মতলব।

১ম : ফিস ফিস কথা এখন আর প্রতিবাদ হয়ে সমুদ্রের ওপাড়ে পৌঁছায় না, অতল স্রোতে প্রতিধ্বনিত হয়ে গুমড়ে গুমড়ে ফিরে আসে।

কোরাস: এ সময় বন্ধ্যা সময় এ সময় প্রকাশহীন, সময়ের অভিশাপে হিজড়ে হয়ে গেছি আমরা- সবাই প্রতিবাদহীন, ভাষাহীন, শব্দহীন মৃত কীটের মত ভ্রষ্ট হয়ে গেছি সবাই।

১ম : অথচ খোলামুখ এই রৌরবে, সময়ের প্রেতাত্মার উদ্দাম নাচের মাঝেও এখনো একজন আছে।

২য় : হাঁ, এখনো একজন আছে যার নাম এখনো করিনি আমরা। ঐ যে তিনি দাঁড়িয়ে। অপেক্ষমান, চিন্তামগ্ন, অনেক দূরের পথে তার চিন্তা নিক্ষিপ্ত।

কোরাস: বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, আদর্শবাদী, অকল্পনীয় সাহসী, ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সংঘর্ষে পাথরের মত অবিচল।

১ম : কিন্তু সেই মহত্তম মানুষটির ভ্রু আজ কুঞ্চিত কেন? নিরন্তর সময় কি ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে তার?

কোরাস: অপেক্ষা, অপেক্ষা, তীব্র অপেক্ষা। (বলতে বলতে সূত্রধাররা মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। তাদের গলার উত্তরীয় মঞ্চের সামনে রাখে। তারপর মঞ্চের বাইরে বেরিয়ে যায়। নেতাজী রস্ট্রাম থেকে নেমে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে)।

বোস : না, না আমি আর অপেক্ষা করতে রাজী নই। (জার্মান অফিসার হয়ে এক সূত্রধার দাঁড়িয়ে পড়ে)

অফিসার : হের হিটলার, এত অস্থির হচ্ছেন কেন? ইয়োর এক্সেলেন্সি।

বোস : অস্থির হবো না! কি বলছেন অফিসার। সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত, এই তো সুযোগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শেষ আঘাত হেনে আমার দেশকে মুক্ত করার। অথচ আমি এই জার্মানিতে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে থেকে নিশ্চিন্ত দিন কাটাচ্ছি।

অফিসার : আপনি এখানে হাত গুটিয়ে বসে নেই হের বোস।

বোস : হাঁ, হাঁ জানি, এই বার্লিন রেডিওতে কিছু উত্তেজক বক্তৃতা, ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন— ব্যস্! এই জন্যই কি আমি দেশ ছেড়ে এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি?

অফিসার : হের বোস, আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

বোস : যথাসাধ্য! না না অফিসার কোনো হাফ হার্টেড এটেম্পটে আমি বিশ্বাস করি না।

অফিসার : আপনি কেনো বুঝছেন না ইয়োর এক্সেলেন্সী, কাজটা ভীষণ কঠিন। প্রায় অসম্ভব, ইম্‌পসিবল।

বোস : অসম্ভব শব্দটি সম্পর্কে নেপোলিয়ান কি বলেছিলেন জানেন? ইম্‌পসিবল ইজ এ ওয়ার্ড টু বি ফাউণ্ড ইন ফুলস্ ডিক্সনারি, আর এটা আমারও কথা।

অফিসার : আপনি মিছি মিছি মহান ফুয়েরারকে ভুল বুঝছেন স্যার। আসলে আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই উনি—

বোস : আমার নিরাপত্তার চেয়েও অনেক বড় দেশের স্বার্থ, আমার ভারতবর্ষের স্বার্থ। কেন আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি জানেন? কেননা কেবলমাত্র ওখানেই চিরশত্রু ব্রিটিশ দস্যুদের আমি মুখোমুখি পাবো এবং ওদের বিধ্বস্ত বাহিনীর বুকের ওপর দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবো বিজয়ী মুক্তিফৌজ নিয়ে। সেটা এই জার্মানিতে বসে কখনোই সম্ভব নয়।

অফিসার : আপনার যুক্তি ফ্যুয়েরার মেনে নিয়েছেন স্যার। কিন্তু সমস্যাটা হলো—

বোস : না না কোন সমস্যা নয়। আমি তো ইচ্ছে করলে কংগ্রেসী নেতাদের মতো ঘরে বসেই রাজনীতি করতে পারতাম, সভায় সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতাম, আর

মাঝে মধ্যে জেলে যেতাম, জেল থেকে বেরুলে লোকে মালা দিয়ে মাথায় তুলে নাচতো। না অফিসার সে পথ বোসের নয়, ফুলের পাপড়ী ছড়ানো পথে কোনো বিপ্লবী হাঁটে না।

অফিসার : আপনার দুঃসাহসকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি হের বোস।

বোস : যদি আমি রাশিয়াতে থাকার অনুমতি পেতাম, তবে হয়তো বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতাম না। কেননা রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্ত আছে। আর আফগানিস্তানের সাথে ভারতের, ফলে আমি স্থল পথেই আমার মুক্তিবাহিনী নিয়ে হাজির হতে পারতাম প্রিয় মাতৃভূমিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে আসতে হলো জার্মানিতে। আর এখানে দিনের পর দিন থাকা আমার কাছে বিড়ম্বনা হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ইতিহাস আমার কাঁধে যে কাজের দায়ভার দিয়েছে তার আমি বিন্দুমাত্র পালণ করতে পারছি না।

অফিসার : ইয়োর এক্সেলেন্সি। এই জার্মানিতেও আপনি যা করেছেন তার তুলনা হয় না। সমগ্র ইউরোপ আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা আপনার কাছ থেকে জানছে। মাৎসিনী গ্যারিবল্ডির সাথে একসঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে আপনার নাম। বার্লিনে ফ্রি ইণ্ডিয়া সেন্টার আপনার নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়েছে, গড়ে উঠেছে আজাদ-হিন্দ রেডিও, আপনার আশ্চর্য সংগঠন কুশলতায় মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে উঠেছে ভবিষ্যৎ ভারতের প্রথম সেনাদল- ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন।

বোস : হাঁ, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ন! ভবিষ্যতের ভারতীয় সেনাদল যেন অঙ্কুরিত হল আজ, এই জার্মানের মাটিতে। কিন্তু যখনই ভাবি এই সেনাদল ভারতে স্থলপথে কোন মতেই পৌঁছতে পারবে না, তখনই আমি অস্থির হয়ে উঠি, দূর প্রাচ্যে যাবার জন্য মনটা ছট ফট করে ওঠে। ওখানে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠনের প্রাথমিক পর্ব সম্পূর্ণ। উনি আমার কাছে কাতর আবেদন পাঠাচ্ছেন— আমি যেন দ্রুত সেখানে গিয়ে আই.এন. এর নেতৃত্ব নিই, না অফিসার আমাকে যেতেই হবে, পূর্ব এশিয়ায় আমাকে যেতেই হবে।

অফিসার : আপনি তো জানেন ইয়োর এক্সেলেন্সি— মহান ফ্যুয়েরার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনাকে জাপানে পাঠাবেন— জাপান সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও হয়ে গেছে।

বোস : খালি কথা, কথা আর কথা, কথাই যদি হয়ে থাকে তবে এত দেরি কেন?

অফিসার : আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইনা ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারটাই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

বোস : সেই এক কথা! আমার নিরাপত্তা! শুনুন অফিসার ঝুঁকি নিতে সুভাষ বোস ভয় পায় না।

অফিসার : প্রশ্নটা শুধু আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে নয় হের বোস। আপনি এখন নিছক একজন ব্যক্তিমাত্র নন, আপনার কাঁধে ভর করেই গড়ে উঠছে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ।

বোস : আপনাদের মিথ্যা চাটুকারিতা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে অফিসার। এতখানি নির্বোধ আমি নই।

অফিসার : আপনি বুঝতে পারছেন না কেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এই সময় জার্মানী থেকে দঃ পূর্ব এশিয়ায় আপনাকে পৌঁছে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

বোস : যদি প্রতিজ্ঞার জোর থাকে, তবে কোন কিছুই কঠিন নয় অফিসার।

অফিসার : আকাশ পথে আপনাকে কোন অবস্থাতেই ওখানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, জার্মান থেকে জাপান অনেক দূর। আকাশ পথ জুড়ে মার্কিন মদতপুষ্ট ব্রিটিশ বিমানের আধিপত্য, এই দীর্ঘপথ বিমানে পাড়ি দেবার অর্থ হাত পা বেঁধে জলে ঝাপ দেওয়া।

বোস : তা সত্বেও আমাকে যেতে হবে অফিসার, বিমান পথ নাইবা হলো সমুদ্র পথ তো রয়েছে।

অফিসার : সমুদ্র পথও মোটেই বিপদমুক্ত নয় স্যার, ইংলিশ চ্যানেল, ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর— সবই অ্যাংলো আমেরিকান জোটের দখলে। সুতরাং জাহাজেও এই দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়।

বোস : ও ডিসগাস্টিং। শুধু সম্ভব নয়, সম্ভব নয়—

অফিসার : একটা উপায় আছে - সাবমেরিন, শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে জলের তলা দিয়ে যাওয়া—।

বোস : আমি সাবমেরিনেই যাবো।

অফিসার : কিন্তু বিপদ সেখানেও আছে স্যার, এত দীর্ঘ সমুদ্রপথের বেশীরভাগটাই শত্রুর দখলে। কখন যে টর্পেডো বা ভাসমান মাইন বা ডেপথ্ চার্জ বা ভারী কামানের গোলা সাবমেরিনকে ধ্বংস করবে তা বলা যায়না।

বোস : যাই ঘটুক না কেনো, আমি সাবমেরিনেই যাবো। আপনাদের ফ্যুয়েরার মহামান্য হিটলারকে বলুন ব্যবস্থা করতে।

অফিসার : কিন্তু—

বোস : আর কোন কথা নয় অফিসার— গুড বাই।

অফিসার : ও.কে. ইয়োর এক্সিলেন্সি, চলি হের হিটলার—

(অফিসার চলে যায়, নেতাজী একা আবৃত্তি করতে থাকে, কোরাস অংশ নেয় তাতে)

বোস : বল বীর - বল উন্নত মম শির। শির নেহারি আমারি নত-শির,ওই শিখর হিমাদ্রি। বলবীর - আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস/ মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ/ আমি

সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি পরশুরামের কয়োর কঠোর, নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার ।আমি হল-বলরাম স্কন্ধে, আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

কোরাস : মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না—। বিদ্রোহী রণক্লান্ত! আমি সেই দিন হব শান্ত!
(আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সাবমেরিনের কিছু টুকরো অংশ দিয়ে মঞ্চ আবৃত করা হবে। দড়ি, টায়ার, পেরিস্কোপ এইসব দ্রব্যাদি দিয়ে মঞ্চ ভরে উঠবে)।

২য় : সমগ্র যাত্রাপথকে ভাগ করা হলো দু ভাগে। প্রথমে তিনি যাত্রা করবেন জর্মান সাবমেরিনে, জার্মান সাবমেরিন তাকে পৌঁছে দেবে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে, সেখান থেকে বাকি পথটুকু তাঁকে যেতে হবে জাপানী সাবমেরিনে।

৩য় : গোটা অঞ্চলটিই বিস্ফোরক মাইনে ভর্তি, এছাড়া সমুদ্র পথেও নিচ্ছিদ্র প্রহরা।

২য় : নেতাজীর সফর সঙ্গী নির্বাচিত হলেন আবিদ হাসান। শিক্ষিত, মেধাবী, ইণ্ডিয়ান লিজিয়ানের সদস্য। নেতাজীর বিশ্বস্ত সাথী।

(সূত্রধারেরা কেউ কেবিন ক্যাপ্টেন, কেউ পেরিস্কোপ ওয়াচার হিসাবে নির্দিষ্ট স্পেসে চলে গেলেন, আবিদ একটা বই থেকে কিছু পাঠ করতে করতে নেতাজীর দিকে এগিয়ে আসে)

আবিদ : পথ অত্যন্ত দুর্গম, প্রতি মুহুর্তেই মৃত্যুর আশংকা। কিন্তু আমার সারা শরীরে অদ্ভূত একটা উত্তেজনার শিহরণ বয়ে যাচ্ছিল—যাদি বেঁচে থাকি আর কিছুকাল—তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের একমাত্র সাক্ষী হিসেবে ডাক পড়বে আমার। আমাদের সাবমেরিনটি এই মুহুর্তে জার্মান সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে। যাত্রপথের পুরোটাই জলের তলা দিয়ে। আমাদের এই সাবমেরিনে আর যারা আছেন, তারা সবাই এই যানটির জার্মান দল। নেতাজী যে এক বিশাল মাপের নেতা, তা তারা জানেন। তাঁকে নির্বিঘ্নে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব সম্পর্কেও তারা অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু এই বিরাট মাপের মানুষটিকে, তাঁর অত্যন্ত কর্মময়, বর্ণময় জীবনকে এইভাবে একান্তে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমি ছাড়া আর কারো নেই। আমার পরিচয়? আমি নেতাজীর সেক্রেটারী— আবিদ হাসান। (জোন ভেঙে নেতাজীর দিকে এগিয়ে)
গুড মর্নিং স্যার—

নেতাজী : ভয় করছে আবিদ?

আবিদ : আপনি থাকতে ভয়! অন্যায়ের সাজানো নিয়ম বুনে, দানবীয় বর্বরতায় যারা শাসন করছে, ঐ চেয়ে দেখুন— সেই অত্যাচারীদের সমাধি ও বিজয়ীর বিধ্বস্ত

প্রাসাদের চূড়া পড়ে আছে, মানুষের পৃথিবীতে দাসত্বের কারাগার এবং শৃঙ্খল আজ উৎপাটিত না হলেও শুধু তা দাঁড়িয়ে আছে উপেক্ষিত অমর্যাদা নিয়ে।

নেতাজী : মায়োকোভোস্কি?

হাসান : নো স্যার, পি.বি. শেলী -

বোস : ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শেলীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ প্রমেথিউস আনবাউণ্ডস থেকে নেওয়া চমৎকার লেখা— তোমাকে সেলাম আবিদ — এই সামমেরিনে আসন্ন মৃত্যুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সাহসের পাখায় ভর দিয়ে প্রমেথিউস পড়ছ—

আবিদ : চিরকালের বিদ্রোহী বীর প্রমেথিউসের ছিনিয়ে আনা স্বর্গের আগুনের উত্তাপে আমার ভেতরের ভয়-ভীতি দ্বিধা, দুর্বলতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই।

নেতাজী : সাবাস! সাবাস আবিদ!

বোস : এই আড়াই মাসের সুমদ্র যাত্রায় আর কি কি বই নিয়ে চলেছ সঙ্গে।

আবিদ : দাস ক্যাপিটাল, অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত আর আমাদের পথের দাবী।

বোস : একটা গ্রীক ভাষা শিক্ষার বই দেখলাম তোমার ঝোলাতে?

আবিদ : হ্যাঁ, স্যার ভাষাটা একটু শেখার চেষ্টা করছি— কখন কাজে লেগে যায় বলা তো যায় না।

বোস : বাঃ, বাঃ চমৎকার। খুবই ভালো হবে — সমুদ্রযাত্রা যখন একঘেয়ে হয়ে উঠবে দুজনে মিলে গ্রীক ভাষা চর্চা করা যাবে, কি বল আবিদ?

অবিদ : একদম স্যার (দুজনে হেসে ওঠে)
(ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গর ঘোষণা শোনা যায়)

মুসেমবার্গ : ক্যাপ্টেন! এই ডুবোজাহাজে রয়েছেন বিশ্ব রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মানুষ, আমি ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গ। ওনার নিরাপত্তার সমস্ত দায় দায়িত্ব এখন আমার হাতে, সবাই মন দিয়ে শুনুন— শত্রুপক্ষের জাল চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে, যে কোনো মুহুর্তের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। দরকার পড়লে জলের ট্যাঙ্কগুলো ভর্তি করে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যেতে হবে। আবার দরকার পড়লে দ্রুত ট্যাঙ্ক খালি করে মুহুর্তের মধ্যে ভেসে উঠতে হবে। শত্রুপক্ষের জাহাজের দিকে নজর রাখতে হবে। লেটস্ স্টার্ট আওয়ার ভয়েজ।
(সুত্রধার বলে)

৩য় : ক্যাপ্টেন মুসেমবার্গর নেতৃত্বে অতলান্তিকের অতল গভীর দিয়ে বিপদের বেড়াজাল ছিন্ন করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে সাবমেরিন। আর সেই আলো বাতাসহীন শ্বাসহীন ছোট কুঠুরিতে নির্লিপ্ত দুজন সাহসী পুরুষ।

২য় : দিন নেই, রাত নেই, কাজে ডুবে রয়েছেন তিনি। পরিকল্পনা, ছক, ব্লু প্রিন্ট, সব তিনি আগে থেকেই তৈরী করে রাখতে চান। অনর্গল বলে চলেছেন তিনি। আর আবিদ নোট নিয়েই চলেছে খাতায়।

(এতক্ষণ বোস অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন আর আবিদ লিখে যাচ্ছিলেন। এবার আবিদ লেখা বন্ধ করে। হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙেন। তাই দেখে—)

বোস : আবিদ কষ্ট হচ্ছে?

আবিদ : কিসের কষ্ট?

বোস : সাবমেরিনে যাচ্ছো। জলের কি ভয়ঙ্কর চাপ অনুভব করতে পাছো? শুনেছি এই চাপেই নাকি মানুষের স্ট্রোক এমন কি হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যেতে পারে—

আবিদ : যাই হয়ে যাক স্যার, আপনি আছেন, আমার কিচ্ছুটি হবে না। এক অপরূপ রূপকথার নায়কের সফরসঙ্গী আমি কোন চাপ, কোন ভয়েই আমি ভীত নই।

বোস : রূপকথার নায়ক, হা, হা, এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না আবিদ?

আবিদ : কি বলছেন স্যার, এটা বাড়াবাড়ি? পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি এমন কোন নেতাকে দেখান তো যে এই মধ্য বয়স আপনার মতো এমন একটা ভয়ংকর এ্যাডভেঞ্চাররে পাড়ি দিয়েছেন।

বোস : এ্যাডভেঞ্চার! হা, হা, হা, ঠিকই বলেছ, এটা একটা এ্যাডভেঞ্চারই বটে।

আবিদ : এ্যাডভেঞ্চার নয় তো কি স্যার— কি করেননি আপনি— দুর্গম হিন্দুকুশ পর্বতমালা পায়ে হেঁটে পেরিয়েছেন, তারপর বিপদ-সঙ্কুল আফগানিস্তান, সেখান থেকে নানা ঘুরপথে ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে রাশিয়া তারপর একের পর এক ছদ্মবেশে ছদ্মনামে জার্মানিতে পৌঁছানো, এটা এ্যাডভেঞ্চার নয় স্যার-!

বোস : এটা এ্যাডভেঞ্চার নয় আবিদ, ওটা ছিল ভবিষ্যতের আরও দুঃসাহসিক অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব।

আবিদ : অভিযানে আপনার স ফর সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা ভগৎরাম - তাই তো স্যার?

বোস : হ্যাঁ আবিদ ভগতরাম তলোয়ার। ভগত ছিল একজন দুঃসাহসিক কমিউনিষ্ট, বুদ্ধিমান, খুব ভালো মানুষ - তুমিও খুব ভালো আবিদ — ও হো দেরী হয়ে যাচ্ছে, শোনো আবিদ - আজাদ হিন্দ বাহিনীতে কয়েকটা গেরিলা বাহিনী রাখতে হবে।

আবিদ : গেরিলা বাহিনী মানে যারা অতর্কিতে, গোপনে শত্রুপক্ষের ওপর আঘাত হানতে পারবে?

বোস : ইয়েস আবিদ,আর এই গেরিলা বাহিনীরএক একটা আলাদা আলাদা নাম রাখতে হবে, গান্ধী ব্রিগেড গান্ধীজীর নামে, আর দ্বিতীয় ব্রিগেডের নাম রাখব নেহেরুজীর নামে, নেহেরু ব্রিগেড। ইয়েস্ আবিদ।

আবিদ : কিন্তু স্যার, গান্ধীজি, নেহেরু এরা সবাই নরম পন্থী। এরা কেউই আপনার এই বিপ্লবী অভিযানকে ভালো চোকে দেখছেন না— নেহেরু কি বলছেন জানেন, ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে আপনাকে ফুলের মালা নয় বন্দুকের নল দিয়ে

আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে, আর গান্ধীজি আপনার পরাজয়েই যিনি খুশী হন বারবার— আর আপনি এনাদের নামেই আপনার ব্রিগেডের নাম রাখতে চাইছেন—

বোস : কে ঠিক কে ভুল, সে তো ইতিহাস বিচার করবে আবিদ, তা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত ভাবে ওদের সাথে তো শত্রুতা নেই, হ্যাঁ এটা ঠিক যে ওদের নীতির সাথে আমার নীতি কিছুটা মেলেনা। আমি মনে করিনা গান্ধীজির দেখানো পথে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে পারি— কিংবা নেহেরু বা কংগ্রেসী আপোসী নীতিতে। তা ছাড়া স্বাধীনতা ইংরেজদের কোন দান নয় আবিদ। স্বাধীনতা আমাদের অধিকার, আর আমরা তা ছিনিয়ে আনবো। আশা করি ওরা একদিন আমার কথা বুঝতে পারবে—

আবিদ : ততদিনে অনেক দেরী হয়ে যাবে না স্যার, আপনি কি দেখতে পারছেন না ভবিষ্যৎ ভারতের ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রটা। একদিকে ইংরেজদের পদলেহনকারী ধান্দাবাজ দালাল শ্রেণী অন্যদিকে অসাধু ভণ্ড ব্যবসায়ীরা ভারতের স্বাধীনতাকে গ্রাস করে ফেলেছে, তার ওপরে আছে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজন দ্বি-জাতি তত্ত্বের বীজ। এই নীতিহীন অন্ধ রাজনীতি থেকে আমাদের কি কখনো মুক্তি ঘটবে না স্যার।

বোস : আচ্ছা, গান্ধীজি কি এগুলো বুঝেও বুঝবেন না— মানলাম খিলাফত ইস্যুতে গান্ধীজি ভারতীয় মুসলমানদের কংগ্রেসের অনেক কাছে এনেছেন— কিন্তু প্যান ইসলামিক মুভমেন্ট যে ন্যাশানালিজম নয় সেটা তো গান্ধীজির বোঝার কথা, নেহেরুরও উচিত এই মৌলবাদের তীব্র বিরোধিতা করা।

আবিদ : বিরোধীতা করলে ঘোলা জলে মাছ ধরার সুবিধা যে থাকে না স্যার, জিন্না মাঝে মাঝেই Direct action -এর কথা বলে মুসলমানদের লেলিয়ে দিতে চাইছে হিন্দুদের ওপর। জেহাদের কথা বলছে, হিংসার কথা বলছে, যুদ্ধের কথা বলছে জিন্না। ভাবতে পারছেন ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, প্যাটেল, আজাদ, নেহেরু এদের সমর্থন করছে।

বোস : ও কি! নোংরা রাজনীতির কবলে আমার ভাতরবর্ষ বন্দী হয়ে পড়েছে।

আবিদ : যে ভাইয়ের হাত ধরে গতকালও মহল্লায় ঘুরেছি, খেলেছি, খেয়েছি, সে-ই বলছে, শালা গরু কাটার জাত, ভাগ এখান থেকে। হিন্দু মুসলিমকে মারছে, মুসলিম হিন্দুকে, ঘরবাড়ি, পাড়া, মহল্লা এই দেশ, সব আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। স্যার, আমাদের মনের কোমল বৃত্তিগুলো সবই কি শেষ হয়ে গেলো— কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই আর।

বোস : শান্ত হও আবিদ। আমার স্বপ্নের মুক্তিফৌজ পারবে এই সব কিছুর অবসান ঘটাতে, হ্যাঁ এক নতুন আজাদ ভারত গড়ে উঠবে— আবিদ। আবিদ জরুরী

একটা নোট নাও।

আবিদ : নিচ্ছি স্যার, বলুন।

বোস : আজাদহিন্দ ফৌজে একটি নারীদের গেরিলা বাহিনীও রাখতে হবে।

আবিদ : কি বলছেন স্যার, মেয়েরা যুদ্ধ করবে?

বোস : মধ্যযুগীয় পচা-গলা সংস্কার তো তোমার নেই আবিদ, জোয়ান অব-আর্ক যদি পারে আমাদের মেয়েরা কেন পারবে না। আর এই নারী বাহিনী গঠন শুধু যুদ্ধের প্রয়োজনেই নয়, এ হবে নারীর যুগ যুগান্তরের দাসত্বের অবসান, নারী মুক্তির প্রথম সোপান।

আবিদ : কিন্তু স্যার, যুদ্ধ করার মতো কঠিন শারিরীক, মানসিক সক্ষমতা আমাদের মেয়েরা কি অর্জন করতে পারবে?

বোস : আমাদের দেশেও এর আগে মেয়েরা যুদ্ধ করেছে, দেশও চালিয়েছে। রিজিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী রূপে কোন পুরুষের চেয়ে কম ছিলেন না। কিংবা সিপাহী বিদ্রোহে— ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই, ইয়েস, আমার মুক্তিফৌজে নারী বাহিনীর নাম হবে রানী ঝাঁসী বাহিনী— লেখো আবিদ, লেখো।

(মুসেমবার্গ চিৎকার করে ওঠে, পেরিস্কোপে চোখ রেখে দেখে নেয় সমুদ্রের ওপরের অংশ)

মুসেমবার্গ: জলের চাপটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, ক্যাপ্টেন রাসেল ওয়াচ পেরিস্কোপ কুইকলি

রাসেল : ইয়েস কমাণ্ডার

মুসেমবার্গ: কি দেখা যাচ্ছে ?

রাসেল : একটা ব্রিটিশ কার্গোশিপ কমাণ্ডার—

মুসেমবার্গ: তার আশ পাশে পেছনে আর কোন জাহাজ দেখা যাচ্ছে?

রাসেল : নো কমাণ্ডার, আর কিছু নেই।

(বোস উপস্থিত হয়ে কমাণ্ডারকে বলে)

বোস : পেরিস্কোপ কি বলছে কমাণ্ডার? (পেরিস্কোপে চোখ রাখে)

মুসেমবার্গ: স্যার একটা মামুলি কার্গোসিপ, ব্রিটিশদের মালপত্রবাহী জাহাজ আমাদের কাছে এসে পড়েছে।

আবিদ : ভয়ের কোন কারণ নেই তো কমাণ্ডার?

রাসেল : নো স্যার, এই জাহাজটি ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে মাল নিয়ে যাচ্ছে।

(পেরিস্কোপ দেকে বোস বলে)

বোস : ইংরেজদের জাহাজ! এক্ষুনি ধ্বংস করো ওকে এক্ষুনি।

মুসেমবার্গ: ধ্বংস করবো? সামান্য একটি মালবাহী জাহাজ।

বোস : না, না, কমাণ্ডার সামান্য নয়, এই জাহাজ ব্রিটিস সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক/ এক্ষুনি টর্পেডো চার্জ করে ওকে ডুবিয়ে দাও।

মুসেমবার্গ: স্যার, একটা মালবাহী জাহাজ আমাদের কি ক্ষতি করবে?

বোস : কি মাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে জান ইংল্যাণ্ডে? আমাদের দেশের খেটে খাওয়া রক্তজল করে অর্জন করা সম্পদ। আমাদের প্রাণ।

আবিদ : আমাদের দেশের কাঁড়ি কাঁড়ি সম্পদ লুণ্ঠন করে ঐ ইংরেজরা নিজেদের দেশ ভরাচ্ছে— আদেশ পালণ করুন কমাণ্ডার, ধ্বংস করুন ওটাকে।

মুসেমবার্গ: কিন্তু স্যার, আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছিনা, ওকে পাহারা দিতে পেছনে হয়তো ব্রিটিশ ড্রেস্ট্রয়ার আসছে। কার্গোশিপ আক্রান্ত হলে আমরা নজরে পড়ে যাবো, তখন আপনার নিরাপত্তাই বিপন্ন হবে।

বোস : আমার নিরাপত্তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না মুসেমবার্গ, আমার দেশকে যারা দু'শ বছর ধরে অত্যাচারে, লুণ্ঠনে নিপীড়নে সর্বহারা করে রেখেছে তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার সামান্য সুযোগও আমি ছাড়বো না। টর্পেডো চার্জ করে ওকে ডুবিয়ে দাও এক্ষুনি।

মুসেমবার্গ: পরে কিন্তু আমায় দোষ দেবেন না স্যার, রাসেল—

রাসেল : হের হিটলার—

মুসেমবার্গ: চার্জ টর্পেডো— ফায়ার— (বোমার আওয়াজ হয়)

আবিদ : ডুবছে, ডুবছে স্যার, ওদের জাহাজ ডুবছে—

বোস : সাবাস কমাণ্ডার, সাবাস! মুসেমবার্গ ঠিক এই ভাবেই বিটিশ গৌরব সুর্যকে ডুবিয়ে দেবো আমি অকুল সাগরে ঠিক এই ভাবেই।

মুসেমবার্গ: আপনাকে স্যালুট মিঃ বোস, আমি আজ পর্যন্ত ব্রিটিস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এত তীব্র ঘৃণা আর কারো চোখে দেখিনি।

বোস : চলো আবিদ লেটস্ ওয়ার্ক।

আবিদ : কমাণ্ডার, কেবিনে কিছু খাবার আছে?

রাসেল : অনলি বার্ণ পটেটো, পোড়া আলুই খাওয়াতে পারি আপনাদের, আর কিছু নেই স্যার-

আবিদ : হা, আল্লা, এই আড়াই মাসে খাবার বলতে পোড়া আলু।

মুসেমবার্গ: এক্সেক্টলি স্যার (সাবাই হেসে ওঠে)

বোস : চলো আবিদ আলু খেতে খেতে আলোচনাও সেরে ফেলি।

আবিদ : অগত্যা, আমার একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে নেতাজী—

বোস : অবলীলায় বলতে পারো আবিদ—

রাসেল : স্যার ডিস্ রেডি, বার্ণ পটেটো—

আবিদ : ভাই আমরা বন শহর দেখেছি, বার্ণ রুটিও দেখেছি কিন্তু এই বার্ণ পটেটো, এই ডিসটার কথা কস্মিনকালেও শুনিনি। পোড়া আলু খেয়ে আমার পিত্তরস যে শুকিয়ে যাবে স্যার।

বোস : পিত্তের থেকে চিত্তের পুষ্টি আমাদের বেশী প্রয়োজন আবিদ। আর তুমি তো সেই পুষ্টির সন্ধানেই চলেছো।

আবিদ : ঠিক বলেছেন স্যার, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য/ উচ্চ যেথা শির / জ্ঞান যেথা মুক্ত / যেথা গৃহের প্রাচীর / আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি- হ্যাঁ স্যার, যেটা বলেছিলাম, এই সুঃসাহসিক অভিযানের জন্য আপনি এই সময়টা বেছে নিলেন কেন স্যার?
এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, জলে-স্থলে-আকাশে, সর্বত্র ধ্বংস ও মৃত্যুর হাহাকার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নিরীহ নিরপরাধ মানুষ জীবন দিচ্ছে এই পাশবিক যুদ্ধে। আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের এটা কি সঠিক সময়?

বোস : এটা একদম সঠিক সময় আবিদ। পৃথিবী জুড়ে ঘটে চলা এই মারণ যুদ্ধই এনে দিতে পারে আমাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা —

আবিদ : এই মারণ যুদ্ধ! কি বলছেন স্যার—

বোস : হ্যাঁ আবিদ, আমি যুদ্ধবাজ নই, পারলে আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও এই মারণবহ্নি আমি নেভাতাম, বন্ধ করতাম লক্ষ লক্ষ নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, কিন্তু শুধু আমার ইচ্ছাতেই ঘটনার গতি পাল্টাবেনা আবিদ। ইতিহাসের নিজস্ব একটা ধারা আছে—আর একজন প্রকৃত নেতার কাজ সময়ের প্রতিটি উত্থান পতনকে কাজে লাগানো, তাই আমি বিশ্বযুদ্ধের এই সময়টাকে আমার স্বাধীনতার সুযোগে পরিণত করতে চেয়েছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিনাশ করার এর থেকে ভালো সময় আর আসবে না।

আবিদ : তাই বলে একটা সাম্রাজ্যবাদকে বিনাস করতে আর একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবেন স্যার?

বোস : আমি জানি আবিদ, সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্র কখনোই ভিন্ন হয় না। সমস্ত দেশে সমস্ত কালে তা একই রকম। আর আমি শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নই, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। কিন্তু কখনো কখনো কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আবিদ : বিশ্বজুড়ে নাৎসীজম, ফ্যাসীজমের তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়েছে। হিটলার, মুসোলিনি ওদের কাজের জন্য ঘৃণিত হচ্ছে, নিন্দিত হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ওদের বিরুদ্ধে উনি কলম ধরেছেন, লিখেছেন 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস / শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'।

বোস : হ্যাঁ আবিদ, স্পেনে / ফ্রাংকোর ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে কবি গর্জে উঠেছেন, বলেছেন যারা পশুর মত বাঁচতে চাইছে, আজ থেকে বা কাল থেকে তারা একে অপরকে ছিঁড়ে খাবে।

আবিদ : ইয়েস স্যার, স্যার জার্মানী থেকে আইনস্টাইন, ব্রেখটের মত ভুবনজয়ী ব্যক্তিত্বরা বিতাড়িত। সেক্সপিয়ার, গ্যেটে, রেমার্ক, মার্কস ফ্রয়েড জ্যোলা - এদের সমস্ত বই আজ জার্মানীর মাটিতে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। ইয়েস স্যার, পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। নেংরামি, ভণ্ডামির এক অমানবিক বর্বরতা কায়েম করতে চাইছে। এরা পৃথিবীতে এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইছে একমাত্র অতি মানবেরাই পারে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে। ইয়েস স্যার, ইতালিতে মুসোলিনি, স্পেনে ফ্রাংকো, জাপানে তোজো আর জর্মানিতে এই হিটলার। এরাই কখনো ইলদুচে, কখনো জেনারেল কখনো ফুয়েরার। এদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই আমাদের ভবিতব্য স্যার?

বোস : এরা সবাই বিগ /ব্লন্ড /বিস্ট / সোনালী চুলের এক বিশাল জানোয়ার।

আবিদ : স্যার হিটলারের সঙ্গে হাত মেলানো আপনার উচিত হয়নি।

বোস : আমি তো রাশিয়াতে যেতে চেয়েছিলাম। স্তালিনের সাহায্য না পেয়ে আমাকে হিটলারের শরনাপন্ন হতে হয়েছে। ভারতে আমার বন্ধু কমরেডরা একদিন ভুল বুঝতে পারবে, আবিদ colonial thesis-এর বিরোধিতা কমিউনিস্টরা নিজেরাই করবে একদিন আর আমি যে পেটি বুর্জোয়া নই সেটাও ওরা বুঝতে পারবে। আমি ওদের সঙ্গে আছি থাকবও।

আবিদ : জার্মান ফ্যুয়েরার হিটলারকে বিশ্বাস করবেন না স্যার, উনি আপনার সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে গোপনে ওনার গেস্টাপো বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে। উনি চান আপনি জার্মান ত্যাগ করুন-

বোস : সেটা আমি বুঝেছিলাম আবিদ — হিটলারের সঙ্গে আমি কখনোই তাই সখ্যতা গড়ে তুলিনি—

আবিদ : হিটলারি আগ্রাসন কি তীব্র গতিতে এগোচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্যার। আজ রাশিয়া আক্রমণ করেছে,কাল রাশিয়া দখল করতে পারলেই আফগানিস্তান। আফগানিস্তান পারলেই ভারত দখলের অভিলাষও ওর পূর্ণ হয়ে যাবে স্যার।

বোস : কখনোই না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেবো না, আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি হিটলারের ওই আগ্রাসন আটকাবো।

আবিদ : আপনার ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের সেনাদের হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইছে।

বোস : ইণ্ডিয়ান লিজিয়নের কোন সেনা রাশিয়ার বিরুদ্ধে কখনোই অস্ত্র তুলবে না। এটা আমার আদেশ আবিদ আর সেটা হিটলারও জানে।

অবিদ : হিটলার যদি সেটা না শোনে, জোর করে বাধ্য করে আমাদের সেনাদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামায়?

বোস : তাহলে আমার বন্দুক হিটলারের দিকেই ঘুরে যাবে আবিদ।

আবিদ : আস্তে স্যার, আস্তে ওরা শুনতে পাবে।

বোস : আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না আবিদ।

আবিদ : কি নিষ্ঠুর মানুষ এই হিটলার - লক্ষ লক্ষ ইহুদি, লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নির্মম অত্যাচার করে প্রতিনিয়ত মেরে চলেছে— কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে ভরছে, গ্যাস চেম্বারে নগ্ন করে মহিলা পুরুষ, শিশুদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে।

বোস : কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা।

আবিদ : ছোটো ছোটো গ্যাস চেম্বারে নিরীহ মানুষদের নগ্ন করে হিটলারের জহ্লাদরা বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অমানুষিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মানুষগুলো কুৎসিত রক্তাক্ত পিণ্ডে পরিণত হচ্ছে।

বোস : মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

আবিদ : হিটলারের জহ্লাদরা সব পারে। ফায়ারিং স্কোয়াডে যেমন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে, অথবা গ্যাস চেম্বারে মানুষের অসহায় মরণ-পণ আকুতি দেখে মজা পেয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে পারে ।

বোস : ও-কি পাশবিক?

আবিদ : কেনো মানবতাকামী মানুষ হিটলারের পাশে থাকতে পারে না নেতাজী। আপনি অবিলম্বে ওর সংসর্গ ত্যাগ করুন — ইতিহাসকে আপনি কি জবাব দেবেন কুইসলিং?

বোস : না — আবিদ।

আবিদ : ফ্যাসিস্ট, দালাল—

বোস : না, না, কখনোই না,

আবিদ : হিটলারের চামচে, তোজোর কুকুর-

বোস : আঃ চুপ করো, চুপ করো আবিদ—

আবিদ : ভারতের কমিউনিস্টরা বলছে আপনার ইণ্ডিয়ান লিজিয়ান যদি সত্যি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে তাহলে তাদেরও হিটলারের জহ্লাদের মুখোমুখি বসতে হবে ।কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের অন্যান্য বন্দীর মতই তাদের অবস্থা হবে। নৃশংস, বীভৎস ভাবে হত্যা। সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে জার্মান, জাপান, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা সবাই এক স্যার। কিছু দিন পর দেখবেন এই বিদেশী বেনিয়ারা নিজে থেকেই আমাদের দেশকে লোক দেখানো স্বাধীনতা দিয়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে দূর থেকে কলকাঠি নাড়ছে। কিন্তু সে স্বাধীনতা হবে ঝুটা স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা হবে কেবল বেনিয়াদের স্বাধীনতা। আপনি বুঝতে পারছেন স্যার, সাম্রাজ্যবাদী নব্য উপনিবেশবাদী এই সব শক্তিগুলো দানবীয় হুঙ্কার ছেড়ে এক ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের

মত কিভাবে আমাদের পেঁচিয়ে ধরছে, এদের জাল ছিঁড়ে বের হওয়া যে অসম্ভব। কোন দিন এদের জাল ছিঁড়ে বেরোতে পারব না।

বোস : পারব আবিদ, আমাকে পারতেই হবে। আবিদ প্রকৃত স্বাধীত্রানতা কখনো আপোসে আসেনা। আজাদহিন্দ সেনাদের বন্দুকের গর্জনই আনবে প্রকৃত স্বাধীনতা, আমার ভারতবাসীই আনবে প্রকৃত স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা হবে গরীব, মেহনতী মানুষের। যে স্বাধীনতা হবে শ্রমিক, কৃষকের, যে স্বাধীনতা হবে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষের, আমাকে পারতেই হবে আবিদ, পারতেই হবে আমাকে।

(ওঠোগো ভারতলক্ষ্মী গানটি ব্যাকে শোনা যাবে, আস্তে আস্তে আলো নিভবে, আলো জ্বললে সূত্রধারবেশী মুসেমবার্গ ও রাসেলকে দেখা যায়)

২য় : নিরন্তর যাত্রার যেন শেষ নেই, আড়াই মাস প্রায় অতিক্রান্ত, সাবমেরিনের জ্বালানি, খাবার, পানীয় জল সবই প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, সমুদ্রের এই জায়গা সর্বদা বিপদ সংকুল, সকলের চোখে, মুখে ক্লান্তি আর ভয়ের ছাপ, দুই চোখে সবার নিরাশার ছাপ স্পষ্ট, কি অপেক্ষা করে আছে সামনে কেউ জানে না। ব্যতিক্রম শুধু নেতাজী।

৩য় : ব্যতিক্রম শুধু নেতাজী, উনার উদ্যমের যেন কোথাও এতটুকু ঘাটতি নেই, উনারও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, শরীর ক্ষয় হচ্ছে দ্রুত, তবুও তিনি নিরন্তর ছক সাজিয়ে চলেছেন। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা তিনি করে চলেছেন।

আবিদ : জাপানে পৌঁছেই প্রথম কাজ সেনা সংগ্রহ, জাপানে সিঙ্গাপুরে বন্দী সমস্ত ভারতীয় সেনাকে নিয়ে গড়ে উঠবে আজাদহিন্দ ফৌজ, তারপর সেই ফৌজে সামিল করতে হবে বার্মা, মালয় তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্ত অনাবাসী ভারতীয়দের।

বোস : ইংরাজদের ওপর প্রথম আঘাত হানব আমরা মনিপুর ও নাগাল্যন্ডে।

আবিদ : নেতাজী, ওখানেই প্রথম ভারতের মাটি স্পর্শ করব আমরা?
(ব্যাকগ্রাউণ্ডে ও আমার জন্মভূমি গানটি শুরু হয়)

বোস : হ্যাঁ, আবিদ ওখানেই ভারত মাতার চরণ স্পর্শ করব আমরা, আবিদ কতদিন আমরা ঘরছাড়া। আমার জন্মভূমি আমাকে ডাকছে আবিদ আমার মাতৃভূমি আমাকে দু হাত তুলে ডাকছে, মা আমাকে ডাকছে আবিদ। আমার জন্মভূমি-পৃথিবীর সেরা পূণ্যভূমি, কোথায় আছে এমন সবুজ ফসল ভরা মাঠ।

আবিদ : কোথায় আছে এমন গোলাভরা ধান—

বোস : কোথায় আছে এমন নদী-পাহাড়-প্রান্তর—

আবিদ : দীঘিভরা জল করে টলমল / নানা ফুল ধারে ধারে।

নেতাজী : কলসী কাঁকে মেয়েদের ঘাটে জল নিতে আসা / সন্ধ্যায় শাঁখের ডাক

আবিদ : শিউলি ফুলের গন্ধ, ভোরের আজান,

নেতাজী : জন্মভূমি, আমাদের জন্মভূমি - -
(মুসেমবার্গ চিৎকার করে ওঠে)

মুসেম : আমেরিকান ওয়ার শিপ! মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের দল, আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তৈরী হও সব — কুইক অ্যাণ্ড ফাস্ট, কুইক অ্যাণ্ড ফাস্ট।

আবিদ : স্যার, আমেরিকান ওয়ারশিপ — এগিয়ে আসছে —

বোস : তুমি বোস— আমি যা বলছি লেখো
(একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরী হয়। সামমেরিন টাল-মটাল হতে থাকে। কেউ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সেনাবাহিনী ছোটাছুটি করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে)

মুসেম : আমেরিকান ফাইটার জাহাজগুলো গতি বাড়িয়ে জল কেটে এদিকে এগিয়ে আসছে। এক্ষুনি ডেপথ চার্জ করে আমাদের সাবমেরিন ধ্বংস করে দেবে ওরা— পাল্টা টর্পেডো চার্জ করো রাসেল, চার্জ টর্পেডো—

আবিদ : স্যার, আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

বোস : ওদের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আবিদ, তুমি নোট নাও,

আবিদ : মুসেমবার্গের কথাগুলো শুনুন স্যার, ওর গলায় ভয়ের সুর।

বোস : ও আবিদ, কিচ্ছু হয়নি লেখো যা বলছি।

মুসেম : কি করছো রাসেল? টর্পেডো চার্জ করার বদলে জলের ট্যাঙ্ক খালি করে দিচ্ছো, সর্বনাশ ওপরে ভেসে উঠছে সাবমেরিন। কি করলে রাসেল— আমরা নিজেরাও শেষ হবো, সেই সঙ্গে সলিল সমাধি ঘটবে এই মহান নেতার— কি ভয়ঙ্কর— ফাইটারটি আরও কাছে এসে গেছে।

আবিদ : স্যার, এবার কি হবে স্যার? যে কোন সময় মৃত্যু।

বোস : আবিদ, লেখো বলছি — কি হচ্ছে কি?

মুসেম : ওরা ডেপথ চার্জ করছে। সাবমেরিনের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো।

রাসেল : এখন আমরা কি করবো কমাণ্ডার—
(আবিদ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে বার বার)

বোস : আবিদ, এবার কিন্তু আমি সত্যিই রেগে যাবো—
হোল্ড ইয়োর পেন, টেক ডিকটেসন—

মুসেম : আর রক্ষা করতে পারলাম না বোধ হয় ট্র্যাঙ্কগুলো দ্রুত ভর্তি করো রাসেল, কুইক এণ্ড ফাস্ট, কুইক এণ্ড ফাস্ট, জলের অনেক গভীরে চলে যেতে হবে আমাদের— কুইক রাসেল কুইক—

আবিদ : এইবার মৃত্যু! আর কোন আশা নেই স্যার, আপনার স্বপ্নের এখানে সলিল সমাধি ঘটে গেল।

বোস : আঃ আবিদ, কি হচ্ছে কি ? তুমি না বিপ্লবী। মৃত্যুতে এত ভয় তোমার—ক্ষুদিরাম,

প্রফুল্ল চাকী ভগত সিং এরা যদি অবলীলায় দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে তুমি কেন পারবে না আবিদ, মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী সত্য। যখন তখন আসতে পারে। তাই বলে কাজ থামিয়ে রাখবে? ওঠ! উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াও বলছি।

মুসেমবার্গ: (ছুটে আসে) হের বোস, আর ভয় নেই, আমরা আউট অফ ডেঞ্জার— আমেরিকার ফাইটারদের নাগাল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আমরা।

বোস : সাবাস, কমাণ্ডার সাবাস, ক্যারি অন।

আবিদ : আপনি কে স্যার? আমি ভগবান দেখিনি কখনো, আল্লাও দেখিনি- কিন্তু আজ আপনাকে দেখলাম সামনে মৃত্যু— অথচ ভয়হীন, অবিচলিত আপনার হৃদয়, সত্যি বলুন স্যার কে আপনি?

(রাসেল দৌঁড়ে আসে)

রাসেল : স্যার, আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। পেরিস্কোপে জাপানী সাবমেরিন দেখা যাচ্ছে—

মুসেমবার্গ: কিন্তু দুই জাহাজের মাঝখানে ভীষণ ঢেউ, ঝড়ো হাওয়া বইছে। এটা ঝড়ের অন্তরীপ। ওদের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব স্যার -

বোস : কোনো কিছুই অসম্ভব নয় রবারের ভেলা ভাসাও।

মুসেমবার্গ: এই প্রচণ্ড ঢেউয়ে রবারের ভেলা যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে, একটু অপেক্ষা করুন স্যার, ঝড় থামুক, ঢেউ কমুক।

বোস : আর এক মুহুর্ত অপেক্ষা করার সময় নেই আমার। রবারের ভেলা নামাও কমাণ্ডার, আমরা দুজন এই ভেলায় চেপে জাপানী সাবমেরিনে যাবো। আবিদ তোমার ভয় করবে না তো?

আবিদ : না স্যার, আপনি পাশে থাকলে মৃত্যুতেও আমার আর কোনো ভয় নেই।

বোস : বিদায় কমাণ্ডার, বিদায় ক্যাপ্টেন।

মুসেমবার্গ: আপনাকে কোনো দিন ভুলবো না হের বোস। বিদায়

রাসেল : এই সফরকে কোনো দিন ভুলতে পারবো না হের বোস, বিদায়—

মুসেম ও রাসেল : আপনার স্বপ্ন সফল হোক।

(সবাই নেতাজীকে স্যালুট জানায়)

বোস : হ্যাঁ স্বপ্ন সফল হবেই এক দিন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার স্বপ্নের মুক্তি ফৌজ শত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে ব্রিটিশ সেনাদের বিধ্বস্ত করে এগিয়ে চলেছে দিল্লীর দিকে। আমি দেখতে পাচ্ছি লালকেল্লার উপরে উড়ছে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা। হে ভারতবাসী তোমরা আমায় রক্ত দাও - আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো— (সংলাপ বলতে বলতে নেতাজী মিডল রস্টামের ওপর উঠে দিল্লী চলো ভঙ্গীতে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নেপথ্যে কদম কদম বাড়ায়ে যা - গানটি বাজতে

থাকে। এই গানের তালে তালে অভিনেতারা মঞ্চের সামনে খুলে রাখা উত্তরীয় গলায় পরে সূত্রধারে রূপান্তরিত হয় এবং নাটক শুরুর সময় যে কম্পোজিশনে ছিল, সেই কম্পোজিশনে এসে দাঁড়ায়।)

(আবিদ ঘুরে সূত্রধার রূপে - বলে-)

আবিদ : আচ্ছা ইতিহাস কি কোনো কথা বলে? না কি কোনো কথা বলে ইতিহাসকে ছোঁয়া যায়? নেতাজী সফল হয়েছে কি হয়নি? নেতাজী ভুল কি ঠিক? সেই তর্ক হয়তো আরো অনেক শতাব্দী ধরে চলবে —

২য় : কিন্তু উন্নত শির, ইস্পাত কঠিন মেরুদণ্ড, অকুতোভয় দেশকে ভালোবেসে দেশের মানুষকে ভালোবেসে মরণের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া নেতাজীকে ভুলব কি করে আমরা।

৩য় : আজ যখন ভণ্ড তপস্বীরা বসেছে তপস্যায়, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কাঁদতে গেলে গ্লিসারিন চোখে লাগাতে হয়, তখন বড্ড বেশী তোমার কথা মনে পড়ে নেতাজী।

কোরাস : হে নেতাজী, ফিরে এসো নেতাজী, আর একবার এই ভারতভূমিতে ফিরে এসো।

১ম : হে নেতাজী আজকের প্রমেথিউস স্বর্গের আগুন চুরি করে এনে ছড়িয়ে দাও আমাদের মধ্যে।

২য় : সে আগুনে পুড়ে আমরা শুদ্ধ হই, ধন্য হই, ইস্পাত কঠিন মেরুদণ্ড গড়ে উঠুক আমদের।

৩য় : যে আগুনের তীব্র দহনে পুড়িয়ে দাও যত নোংরামি, ভণ্ডামী রাজনীতির এই ভ্রষ্ট সময়কে—

কোরাস : হে নেতাজী, আজকের প্রমেথিউস, ফিরে এসো, তোমার আগুনের স্পর্শে শুদ্ধ করো আমাদের—

("যদি তোর ডাক শুনে" গানটি ব্যাকগ্রাউণ্ডে বাজতে থাকে। আস্তে আস্তে পর্দা পড়ে)

তথ্যসূত্র:

১. উইলিয়াম সাইরবি
২. 'ডুবোজাহাজে নেতাজী'— আবিদ হাসান
৩. আমি সুভাষ বলছি।

লেখক : সঞ্জয় আচার্য, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় নাট্যকার।

রুদিজলা এলাকার জলজীবি মানুষের সংস্কৃতি,
জীবনযাপন বিষয়ে রচিত নাটক

বান্ধঅ কেন দালান ঘর ....

পার্থ মজুমদার

[শুরুতেই দেখা যাবে ৩/৪ টি নৌকা বাইচ এর দৃশ্য। তীব্র প্রতিযোগিতা। কেউ একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে- বিভিন্ন গান চলতে থাকে- প্রচলিত জারি-সারি গানের পাশাপাশি বর্তমান সময়ের হিন্দী চটুল গান ও চলতে পারে, লোকগান হতে পারে: ১) হাত ছাইড়্যা দেও সোনার দেওরা রে.... ২) কলসী ভাঙ্গা নাগর কানাই .....৩) জল ভরিয়া ঘাটে রইয় না/ শোন রাধে গো/ কালার নয়ন পানে চাইয় না.... এমন গান চলবে- প্রতিদলে ৮/১০ জন করে থাকবে। প্রতিযোগিতা-র শেষে পুরস্কার বিতরণের মঞ্চ। প্রতিযোগিতার মঞ্চে কোনো একটি উঁচু আসনে ঘোষক- পাশে সব দলের প্রতিযোগী রা দাঁড়িয়ে থাকবে। তীব্র উত্তেজনা -কিছুটা বাদানুবাদ চলতে পারে।]

ঘোষক : প্রিয় রুদিজলা এলাকার গ্রামবাসীগণ- এইমাত্র শেষ হল এলাকার সবচেয়ে বড় উৎসব- আমাদের জলজীবী মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উৎসব নৌকাবাইচ-এবার এই উৎসবে - রুদিজলা সংলগ্ন ১৭টি কলোনীর অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতাকে অন্যমাত্রা দিয়েছে- আমি এবার অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা এই এলাকার বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণবাবুকে কিছু বলার জন্য।

হরিনারায়ণ: নমস্কার-আমরা নিম্নবর্গের মানুষ- সহজ সরল-পরিশ্রমী মানুষ - দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস সাক্ষী সংঘাত ও সংকল্পের এক আশ্চর্য যুগলবন্দী ঘটিয়েছেন উদ্বাস্তু হয়ে আসা আপনারা- আমরা সবাই - আজ কোনো ভাষণ নয়- এখানে কেমতলী-বৈদ্যের মুড়া- চন্দনমুড়া- দুর্লভনারায়ণ প্রায় সবগুলি কলোনীর বাসিন্দারা আছেন- চলুন সবাই মিলে একটু গান-নাচ হয়ে যাক- তারপর পুরস্কার বিতরণ-

কোরাস : হওক হওক

হরিনারায়ণ: (কাউকে উদ্দেশ্য করে-) চলরে ভাই ধর (বাদকদের) তোমরাও ধর- (গান)
কলসী ভাঙ্গা নাগর কানাই ....
(নাচ-গানের কোনো গ্রাম্য/লোকনৃত্য-র কোরিওগ্রাফি চলবে)

ঘোষক : এবার নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছে রুদিজলা কলোনী
(পুরস্কার নেয়)
দ্বিতীয় হয়েছে- চন্দনমুড়া কলোনী- প্রথম হয়েছে - কেমতলী কলোনী।

(পুরস্কার বিতরণের পর সবাই বেরিয়ে যায়-কেমতলী কলোনীর ওরা থাকে-গ্রামের মুরুব্বিকে কাঁধে তুলে নাচ - গান,গানের মাঝেই সমীর নামে একজন মূল গায়ক বিমলকে উদ্দেশ্য করে-)

সমীর : অই- অই- হে আবার লয়ডা কমাইয়া লাইছে- হের লেইগ্যা একবার আমরা পিছাইয়া গেছলাম গা-

বিমল : বিমল (নোয়াখালি ভাষায়) অইছে অইছে সমীরে কিয়া কয়- আই ত লয় কমাইয়া লাইছলাম- আই ত (গান দ্রুত লয়ে) কলসীভাংগা নাগর কানাই ----

সমীর : না বিমল তুই এ্যামনে গাইছিলি না - তুই গাইছিলি (মধ্য লয়ে) কলসী ভাঙ্গা নাগর কানাই -

দীপক : হইছে হইছে- ছাড়ছে সমীর- বিমল আমরার মূল গায়ক - হেরে তুই এ্যামনে কথা কইছ না।

রাজু : দীপক সমীর ঠিকঐ কইছে- আমরা যে বৈঠা মারুম এইডা তো হের গানের উপরেই depend করে - তাই না-

দীপক : জিতছত হেইডাই বড় কথা- আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই-

রাজু : হ-হ, তুই ঠিকঐ কইছত(কোনো মহিলাকে উদ্দেশ্য করে) ঐ কাকিমা তুমি অহনে চুপ কইরা রইছ কেরে-

সমীর : হ, খেলা শুরু হওনের আগে দেহি কত plan বানাইছ- তপতী বৌদি তুমি কিতা কও?

তপতী : সর্বানী-র মা-র অহনে লাজ লাগছে- ভাবছিল গতবারের মত এইবার ও বুঝি আমরা হারুম- জিতনে অহনে আর মুখে দিয়া রা সরে না-

বিমল : ও বৌদি, ও তপতী বৌদি তাইলে আন্যেই কনছে--
(সবাই বিমলের কথা শুনে হেসে উঠে)

দীপক : ওই বেডা- গান গাছ সময় দেহি তর সব ঠিক থাকে- কথা কওনের সময় তর কিতা হয়?

বিমল : কিল্যে আই হাজার ভাষা কইতে লইজ্জা কিরে? তরা আর ভাষা লই যতই হাসবি আই এ্যাই ভাষাতেই কমু- কইগো তপতী বৌদি কও না-

তপতী : (লজ্জায়) জেডা-পাডা-

মুরুব্বি : (চমকে উঠে) পাডা- আ...মি..?

রাজু : আরে নানা - কাকিমা কইছিল জিতলে - দাদু-তুমারে পাডার মাংস খাওয়ানের কথা কইব।

মুরুব্বি : ও হেই কথা - আমি ত ভাবলাম তারা হগলে মিল্যা আমারে নি আবার—

সমীর : ধুর, ধুর — দাদু যে কিতা কওন— আসল কথাডা— হইব নি?

মুরুব্বি : (কপট রাগ) হইব নি? কি হইব নি? (সবাই চুপ) সবাই মিল্যা- পাডার মাংস দিয়া পিকনিক- এইডা কি- (একটু থেমে) না হইয়া যায়- (সবাই হেসে উঠে-

মুরুব্বিকে কাধে নিয়ে আবার আনন্দে মেতে উঠে-) তা কও তোমরা কি কি দিবা-

বিমল : ladies first, কইগো মালতীদি তুমিও কও তুমি কিয়ে দিবা-

মালতী : আমি লাকড়ি দিমু- আর কিচ্ছু দিতাম পারতাম না-(দু'একটা বাচ্চা মাঝে মাঝে পিকনিকের আনন্দে লাফাতে থাকে)

বিমল : তই-তপতী বৌদি, কাকিমা আন্যের?

সর্বানীর মা : আমি ১ কেজি ডাইল দিমু-

তপতী : আমি ২ কেজি চাল দিমু-

বিমল : তইলে তো হইয়াই গেছে- আই-
(মুরুব্বি মাঝখানে বিমলকে থামায়)

মুরুব্বি : শোন- আমার একটা কথা আছে- এই বিমল হইছে আমরার মেইন গায়ক- হের লেইগ্যা আজগা আমরার কেমতলী কলোনীর নাম উজ্জ্বল হইছে- হের কিচ্ছু দেওয়ান লাগদ না-

দীপক-রাজু: আর- আমরা- আমরা -যে মাথার ঘাম পাও অ ফালাইয়া বৈড়া মারলাম- আমরার বুঝি contribution নাই।

বিমল : মিছা কথা ন কইছ, মাথার ঘাম পায়েত্তে ফালাওরে- বই বই বৈডা মাররে- মাথার ঘাম আই হাড়ুত্তে এনা পরছ

মুরুব্বি : হইছে হইছে- সব বুঝঝি- কারোর কিছু দওয়ন লাগদ না- আজগা রাত্রে এই কেমতলী কলোনীর সবাই আমার বাড়িতে পাড়ার মাংস দিয়া পিকনিক - হইছে- এবার চল সবাই আয়োজন কর- (সবাই আনন্দে লাফায়) ।

দীপক : জিতছে কেডা-

সবাই : কেমতলী

দীপক : হারছে কেডা-

সবাই : চন্দনমুড়া

দীপক : (একটু গলা চড়িয়ে) হারছে কেডা-

সবাই : বৈদ্যের মুড়া-

দীপক : (গলা আরো চড়িয়ে) হারছে কেডা-

সবাই : দুর্লভনারায়ণ-

দীপক : (গলা আরো চড়িয়ে) জিতছে কেডা-

সবাই : কেমতলী-

(এই জোনের আলো নিভে। অপর জোনে আলো জ্বলে - দেখা যাবে সূত্রধারকে)

সূত্রধার : খুবই পরিচিত দৃশ্য, তাই না? নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন না তো? ফিরে যাচ্ছেন না তো আপন আপন শৈশবে? শহুরে শৈশব এর কাছে তো এই দৃশ্য

কল্পনাতীত- কিন্তু বাস্তব হল- এই দৃশ্যের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠে আমাদের গ্রাম্য ত্রিপুরার বর্তমান সময়ের ও যাপন চিত্র। এই নাটকটিতে আমি আমাদের শ্যামলী ত্রিপুরার বৈচিত্র্যময় লোক সংস্কৃতির একটি ছোট্ট এলাকার চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি- যদিও গল্পের বুনোন ঠিক রাখতে গিয়ে ইতিহাস বিধৃত প্রকৃত ঘটনা যেমন এই নাটকের চরিত্র হয়ে উঠেছে- তেমনি আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কিন্তু কাল্পনিক চরিত্রের- কোনো চরিত্রের সঙ্গে যদি সুধী দর্শকমন্ডলী আপনাদের কারোর মিল খুঁজে পান- তবে তা সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছাকৃত কল্পনার ফসল- চলুন এগিয়ে যাই- (আলো নিভে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রামের কোনো সম্ভ্রান্ত বাড়ির উঠোন এর দৃশ্য- খড়ের কুঞ্জি, ঢেকি ঘর, তুলসী বেদি ইত্যাদি দেখানো যেতে পারে। গ্রামের মহিলাদের নাচ-গান এর দৃশ্য - ধামাইল বা অন্য কোন লোকগান ব্যবহার করা যেতে পারে। মহিলাদের পাশাপাশি শিশু-কিশোর কিশোরীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে - পুরুষরা বিভন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে সঙ্গত করবে- উঠোনে কোন চেয়ারে গ্রামের মুরুব্বি বসা- নাচ গান এর মাঝে দু'জন কিশোর কিশোরীর ভালবাসার ইঙ্গিত/খুনসুটি দেখানো যেতে পারে। গান নাচ শেষে--]

মুরুব্বি : কৈরে গোপাল তরার রান্নাবান্না শেষ হইছে?

গোপাল : (নেপথ্যে) আর একটু কর্তা- প্রায় শেষ-

গোপাল : (মহিলাদেরকে) কৈগো মাইয়ারা- যাও তোমরা ভিতরে গিয়া খাওনের জোগাড় আয়োজন কর-

মালতী : হ - জেডা যাইতাছি- (অন্য মহিলাদেরকে) কৈলো চল চল (মহিলাদের প্রস্থান) [কিশোর-কিশোরী, বাচ্চারা মুরুব্বির দিকে এগিয়ে যায়]

যুবক সুদীপ্ত : তা দাদু- আমরারে তুমি এই রুদিজলার গল্প কও না— [বাচাচারা সমস্বরে] হ, হ দাদু কও না- কও না (সবাই মুরুব্বিকে কেন্দ্র করে বসে- সুদীপ্ত ও সুবর্ণা পাশাপাশি বসে- তাদের মধ্যেকার ভালবাসার চিহ্ন এই দৃশ্যে আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় বিভিন্ন খুনসুটির মধ্য দিয়ে)

মুরুব্বি : রুদিজলার আর গল্প কি? এই জলাভূমি তো প্রাকৃতিকভাবে-ই তৈরী হইছে- মহারাজা যখন এই জলাভূমিতে নীরমহল বানায় তখন একটা বাঁধ দিয়া এই কৃত্রিম জলাশয় তৈরী করে- এইডার আয়তন ৪ বর্গমাইল-

সুবর্ণা : কোন মহারাজা দাদু?

মুরুব্বি : মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের লেইগ্যা এই নীরমহল বানায় ১৯৩৮ সালে- হেই বছরই আমার জন্ম হয়। এই রুদিজলার বৈশিষ্ট্য কি জান- এই জলাশয়ের মধ্য দিয়া একটা ছোট নদী বইয়া গিয়া মিশছে

গোমতী নদীতে- এই ছোট্ট নদীটাত সারা বছর প্রবহমান থাকত- ফলে প্রচুর মাছ হইত ইহানে। এমন কি বাঘেরা পর্যন্ত মাছ খাওয়ানের লেইগ্যা এই জলাভূমিতে আইত। ছোটবেলায় আমরা এই জলাশয়ে নৌকা লইয়া ঘুরতাম-মাছ ধরতাম-

কোন বাচ্চা : কেউ কিচ্ছু কইত না?

মুরুব্বি : আমরা তো আর বেশি মাছ ধরতাম না- তবে মহারাজা নীরমহল বানানের পরে এই জলাশয়ের ইজারা দিয়া দেয়- রাজবংশের ঐ একজন লোক কৃষ্ণ দেববর্মারে - তাইনেই পুরা জলাশয়ের মধ্যে মাছ চাষ করত- যাই হোক ইতা বাদ দেও-

সুদীপ্ত : দাদু তুমি কি তখন থেইক্যাই গান গাইতা?

মুরুব্বি : গান আর কিতা- ঐ নৌকা লইয়া সারাদিন ঘুরতাম আর নিজে নিজেই গাইতাম- বন্ধু বান্ধবরা কইত আমি বলে ভালাই গাই- তহন তো আর তুমরার মত আমরার পড়াশুনার এত চাপ আছিল না- সারাদিন খেলা-নৌকা লইয়া মাছ ধরা- তিন কিলোমিটার দূরের ইস্কুল গিয়া পড়াশুনা- কোনমতে এইট পাশ করলাম- এইভাবেই বড় হইতে থাকলাম- নিজেরা নিজেরা নৌকা লইয়া প্রতিযোগিতা করতাম-আস্তে আস্তে আজগার এই প্রতিযোগিতা আইছে-

সর্বাণী : তারপর?

মুরুব্বি : আমার তহন ১২/১৩ বছর বয়স ১৯৫১-৫২ সাল- সব উলট-পালট হইয়া গেলগা- বাংলাদেশে লাগল জাতি দাঙ্গা- বরিশাল রায়ট- নোয়াখালি রায়ট- দলে দলে হিন্দু উদ্বাস্তরা পালাইয়া আইয়া আশ্রয় লইল পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা-আসাম এ। (এখানে উদ্বাস্তুদের দৃশ্য দেখানো যেতে পারে।) এই পাহাড়ি ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু তখন সবাইরে অতিথির মত আশ্রয় দিল- আমরার এলাকার মুসলমানরাও এই এলাকা ছাইড়া- বাংলাদেশে আশ্রয় লইল- তবে এই রুদিজলা এলাকাতে আইল মূলত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও নোয়াখালির মানুষজন।-

সুদীপ্ত : ও এলেইগ্যাই বিমল এমনে কথা কয়-

সর্বাণী : তুমি চুপ করবা? আগে শুন না দাদু কিতা কয়?

সুদীপ্ত : (ভেংচি কেটে) ওমাগো- অহনই দেহি আমারে পুলিশের মত ধমকায়- পরে ত তাইলে দারোগা এনা হইয়া দাড়াইব- (সবাই হেসে উঠে)

মুরুব্বি : দারোগা নারে ভাই- দারোগা না- তহন হইব মা চণ্ডী- যে একহাতে তোমারে সামলাইয়া রাখব- আর এক হাতে শাসনও করব-

কোন কিশোর: (হাততালি দিয়ে) দাদু সব জানে - দাদু সব জানে-

সর্বাণী : (ধমক দিয়ে) এই রাকেশটা বেশী বাচাল হইয়া গেছেগা- এ্যাই তুই চুপ কর- তা দাদু এরপরে কও-

মুরুব্বি : তখন ত্রিপুরাত কোন বিধানসভা আছিল না- আছিল না কোন মন্ত্রীসভা- প্রশাসন চলত দিল্লী থেইক্যা মনোনীত কোন আই. এ. এস. অফিসার দ্বারা- এই অফিসাররে কওয়া হইত চিফ কমিশনার। চাইর এর দশকের থেইক্যা উদ্বাস্তু আওয়নের

ফলে এই পাহাড়ি ত্রিপুরার সমাজ জীবনে ব্যাপক চাপ- খাওয়া নাই- ঘর নাই- মানুষের দুর্বিসহ অবস্থা- এমন সময় ১৯৬০ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নিল এই রুদ্রসাগরের পাড়ের সকল উদ্বাস্তু পরিবাররে পুনর্বাসন দিব- স্বাধীনতা সংগ্রামী এক সৎ-নির্ভীক অফিসার- দেবু স্যাররে পাঠাইলেন এই প্রকল্পের কাজে- আমরা তহন ২০/২২ বছরের যুবক- পুরা নাম আছিল দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত- তিনি আইয়া আমরারে লগে লইলেন-

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

[দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত একটি উঁচু টিলা জমির উপর বসা- নীচে ৭/৮ জন যুবক]

দেবপ্রসাদ : (যুবকদের উদ্দেশ্যে) দ্যাখ, তোমরার সবার অক্লান্ত পরিশ্রমেই আমরা জলাশয়ের এই বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ করতাম পারছি- তবে সরকার থেইক্যা নির্দেশ আইছে- এই এলাকায় ৬০০ উদ্বাস্তু পরিবাররে পুনর্বাসন দওন লাগব-

যুবক ১ : কিন্তু স্যার এই কৃষ্ণ কর্তা কি দিব তা করনের লেইগ্যা-

দেবপ্রসাদ : বাপী - অহনে আর ইজারা কৃষ্ণ দেববর্মার নামে নাই- পুরা জলাশয় সরকারের নামে -

যুবক ২ : কিন্তু স্যার আমরা যখন বোরো চাষ করতাম যাই তহন তো তাইনের সঙ্গী সাথীরা নানাভাবে আমরারে ডিস্টার্ব করে। সঙ্গে লইছে কতডি মুসলমান লাইঠ্যাল রে-

দেবপ্রসাদ : আমি সব জানি, বিশু-তোমরার চিন্তা করন লাগদ না - আমি জেলাশাসক রঞ্জিৎ ঘোষ স্যাররে জানাইছি- তিনিও জানেন কৃষ্ণ দেববর্মা যে চড়া দামে বাজারে ভিটি বিক্রী করতাছে উদ্বাস্তুরার কাছে-

যুবক ৩ : স্যার বিশু ঠিকঐ কইছে- তাইনে কিন্তু বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করতাছে- এমনকি আপনের বিরুদ্ধেও-

যুবক ৪ : হ স্যার, নারায়ণের কথাডা কিন্তু আপনে হালকাভাবে নিয়েন না-

দেবপ্রসাদ: সুবীর আমি সব জানি- নারায়ণের কথাও হাল্কাভাবে নিতাছি না- (হাসি) আমি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই কইরা - জেল খাইট্যা ইহন আইছি- তোমরা কি ভাব- আমি এত সহজে ভয় পাইয়া যামুগা- তবে মনে রাইখ্য - শান্তি-সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে - সেদিকে খেয়াল থাকে যেন—

যুবক ৫ : (নোয়াখালি ভাষায়) তারারে কিছু কইলে আনরা ছাড়ি দিমু না- এই লাডিয়া কিত্য আছে- ইগ্যা বাড়ি দিয়েরে মাথাডা হাডাইয়া দিমু না-

দেবপ্রসাদ: আরে আরে দ্যাখ দ্যাখ- এই অমইল্যাডা কওনের আগে বুইজ্যা লায়- আর বুজনের আগে চেইত্যা যায়গা (সবাই হাসে)

যুবক ৬ : নোয়াখালি-ত্তে উইঠ্যা আইছে না-

অমল : (লাঠি দিয়ে খোঁচা দিয়ে- নোয়াখালি ভাষায়) অই হইরা - আনডা কি তরার মত

ব্রাহ্মণবাড়ীর লোকরে- কইতরের জান- আনডা ডরাই চলি না - ভদ্রতারে দুর্বলতা ভাবলে আনডা অভদ্র হইতাম ফারি ।

দেবপ্রসাদ : আরে, আরে- তোমরা থাম— আমি কইতে আছলাম অন্য কথা—

কোরাস : কি?

দেবপ্রসাদ: তোমরা তো নিজেরা নিজেরা নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা কর— এমনে না কইরা সবাই মিল্যা যদি এইরকম একটা প্রতিযোগিতা করন যায়- মনে রাইখ্য- খেলাধূলা - গান বাজনা এইসব এর মধ্য দিয়ে হিংসা -দ্বেষ - জাতপাতের বিভেদ অনেক কিচ্ছু ভুলাইয়া লাওন যায়- ফিরাইয়া আনন যায় শান্তি —

[এই জায়গায় ধান কাটার দৃশ্য দেখানো যেতে পারে]

[এমন সময় হই হট্টগোলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ২/৩ জন যুবক]

কোরাস : অই তরা ইহন বইয়া রইছত - আর হেদিকে কৃষ্ণ দেববর্মার মুসলমান লাইঠ্যাল বাহিনী আমরার জমির সব ধান কাইট্যা লইয়া যাইতাছেগা-

অমল : [নোয়াখালি ভাষায়] কিতা কইলি?- চল-

[সবাই লাঠিসোটা নিয়ে হই হই করে বেরিয়ে পরে-দেবপ্রসাদ থামানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়। ভীড়ের মাঝে শোনা যায় ২/১ বার “ডাক তরার কৃষ্ণ কর্তারে- তাইনে কাইজ্যা লাগাইয়া অহনে কই ভাগছে”-

“ যা গিয়া ক- কৃষ্ণ দেববর্মারে- আর যাতে কোনদিন কাইজ্যা লাগানের চিন্তা না করে আর যদি করে তাইনের এই জায়গা ছাইড়া যাওয়নগা লাগব- আগেরদিন ভুইল্যা যাইত গা—” হঠাৎ দেখা যায় লাঠির আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে কৃষ্ণকর্তার লোকরা পালিয়ে যায়- (বেশীরভাগ মুসলিম)

[মঞ্চের আলো ডিম হয়- মুরুব্বির মুখের আলো উজ্জ্বল হয়]

সর্বাণী : তারপর- তারপর কিতা হইল?

মুরুব্বি : আমরা সবাই কৃষ্ণ দেববর্মার লাইঠ্যাল বাহিনীরে পিট্যা ভাগাইয়া দিছি-

কোন বাচ্চা: দাদু, তুমি পিডা দিছ?

মুরুব্বি : হ-রে ভাই- আমরা সবাই মিল্যা দিছি- আজগা যে তোমরা নৌকাবাইচ জিতছ- গান-বাজনা করতাছ- খাওয়া-দাওয়া করবা- এইডির লেইগ্যা আমরার অনেক কষ্ট করন লাগছে - আমরা যেমন উদ্বাস্তুরারে আপন কইরা লইছি- তারাও আমরারে- এই ৭০ বছরেও আমরার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নাই- আমরা সব এক হইয়া যাইগা এই নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতাতে আইয়া-

সুদীপ্ত : তা এই ঘটনার কোন বিচার হইছে না?

মুরুব্বি : হ- হইছে- প্রথমে কৃষ্ণ দেববর্মা ষড়যন্ত্র কইরা এই জাতিগত সন্ত্রাস এর দায় চাপায় দেয় আমরাার প্রিয় দেবু স্যার এর উপরে। কিন্তু জেলাশাসক রঞ্জিৎ ঘোষ সব জানতেন- দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত-র ডাক পড়ে চিফ্ কমিশনার নানজাপ্পা

সাহেবের কাছে—

[এই জোনের আলো ডিম হবে- অন্য জোনে দেখা যাবে ছয় এর দশকের কোন আই.এ.এস অফিসার-এর অফিসঘর - নানজাপ্পা বসা- প্রবেশ করে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত]

দেবপ্রসাদ: May I come in Sir?

নানজাপ্পা : Yes, Mr. Sengupta - কি শুনছি? আপনি সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে রুদ্রসাগর প্রকল্পের কাজ করছেন জানি- কিন্তু আপনি— (নানজাপ্পা-র কথার মাঝে)

দেবপ্রসাদ : স্যার- আমি এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার- আর এই ষড়যন্ত্রের মূল কুচক্রী হচ্ছেন কৃষ্ণ দেববর্মা- আমি লিখিতভাবে এই ঘটনার পুরো রিপোর্ট জেলাশাসক রঞ্জিৎ ঘোষ মহাশয়ের কাছে পেশ করেছি।

নানজাপ্পা : হ্যা, জানি- উনি উনার রিপোর্ট সহ আপনার রিপোর্ট আমার কাছে পাঠিয়েছেন - আমি সব দেখেছি- আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই আপনার বক্তব্য;

দেবপ্রসাদ : স্যার, আমি ঐ এলাকার মানুষ-এর সাথে মিশে দেখেছি- ওরা খুব সহজ - সরল- পরিশ্রমী- কিন্তু একটা অংশ ওদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ওদের ঠকাচ্ছে এবং এই অংশটি যথেষ্ট প্রভাবশালী। স্যার, ৬০০ পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে- ওদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে এই রুদ্রসাগরসহ নীরমহল একদিন ত্রিপুরার গর্ব হয়ে উঠবে। ওদের চাহিদা খুবই কম- চায় শুধু একটু ভালবাসা- এটা নষ্ট হতে দেবেন না স্যার। আমি এ ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ চাই -

নানজাপ্পা : ওকে-You may go now- আমি সবটাই বুঝতে পেরেছি- আমি দেখছি- আপনি আপনার কাজ নির্দ্বিধায় করে যান- (এই জোনে আলো অফ্- মুরুব্বির জোনে আলো উজ্জ্বল হয়)

সুদীপ্ত : মানে দাদু- তোমরার জয় হইল-

মুরুব্বি : হ-রে ভাই- তহন আমরা সবাই মিল্যা মিশ্যা অনেক সুন্দর দিন কাডাইতাম- নৌকা চালাইতাম- গান গাইতে গাইতে মাছ ধরতাম-চাষ করতাম-আনন্দডাই অন্যরকম আছিল।

কোন বাচ্চা: দাদু তোমরা কি গান গাইতা- একটু গাও না-

সর্বাণী : হ-দাদু গাও না-

মুরুব্বি : গাইতাম-(গান) একদিন মাটির ভিতর/হবে আমার ঘর/... কেন বান্ধ দালান ঘর (লোকগীতি) (গান -এর মাঝখানে নেপথ্যে গোপাল এর কণ্ঠ)

গোপাল : কর্তা খাওয়ন রেডী- আইয়া পরেন-

মুরুব্বি : চল-চল-অহনে খাইতাম যাই-

তৃতীয় দৃশ্য

[আলো জ্বললে দেখা যাবে সুদীপ্ত একটি উঁচু টিলাজমিতে একটি গাছের নীচে অপেক্ষা করছে- কারোর অপেক্ষায় চঞ্চল হচ্ছে গুনগুন করে গান গাইছে- হাতে বাশি থাকতে পারে। সুবর্ণার প্রবেশ- টিলা জমির পেছন থেকে সুদীপ্তকে ঢিল ছোঁড়ে]

সুদীপ্ত : (জোরে গান ধরে) গান : ফুইট্টা আছে করবী কেওড়া / গন্ধরাজ মালতী-/ বুঝতে পারি লুকাইয়া আছ / মোর রাই শ্রীমতি-

(সুবর্ণা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে-হাতে কদম ফুল থাকতে পারে)

সুবর্ণা : আইচ্ছা তুমি কথায় কথায় এমনভাবে গান বান্ধ কেমনে?

সুদীপ্ত : (গান) বান্ধি আমি মনের সুখে-/মনের তাড়নায়/তারি জইন্য চিন্তা আমি/কিছু করি নাই

সুবর্ণা : তুমি-তুমি একজন জাত শিল্পী-

সুদীপ্ত : তাই- (গান) আইস আইস প্রাণের বন্ধু/বইস আমার কাছে/ দেখিব তোমার ঐ মুখে/ কত মধু আছে রে/ আইস আইস পরাণের বন্ধু /বইস আমার কাছে-

সুবর্ণা : (গান) তুমি হইলা তরুরে বন্ধু/ আমি হইলাম লতা/ বেইড়া রাখুম যুগলচরণ/ ছাইড়া যাইবা কোথা -রে

সুদীপ্ত : (গান) শরমে ঢাকরে কইন্যা/ আপন যৌবন-/ নজর দিব আকাশ বাতাস,/ চোরা পথিক মন/ না যাইও না যাইও কইন্যা/ একলা নদীর ঘাটে-/ বেবাক লোকের কামকাজ/ উইঠ্যা যাইব লাটে-/ না যাইও না যাইও কইন্যা/ একলা নদীর ঘাটে (দুজনে) আইস আইস প্রাণের বন্ধু /বইস আমার কাছে/দেখিব তোমার ঐ মুখে/ কত মধু আছে রে/ আইস আইস প্রাণের বন্ধু/বইস আমার কাছে/-

সুদীপ্ত : ঘরে যাইবা না? এখানে আইছ ক্যান?

সুবর্ণা : মানে? তুমি এখানে আইছ ক্যান?

সুদীপ্ত : তুমার লেইগ্যা-

সুবর্ণা : (সুদীপ্ত-র পিঠে চাপড় দিয়ে) মজা করবার জায়গা পাওনা- না - আমি ঘরে যামু না- ঐ দ্যাহ- পশ্চিম আকাশটা কি সুন্দর লাল হইয়া রইছে- অন্ধকার হইতে দেরি আছে-

সুদীপ্ত : তুমার মঙ্গলি- দ্যাখনা অহনই তুমারে না দেইখ্যা কাইন্দা দিব-

সুবর্ণা : মঙ্গলি জীবনেও ইতা করত না- তাই জানে আমি তুমার লগে দেহা করতাম আইছি-

সুদীপ্ত : ওহ্ - একটা গাই-রেও তুমি বশ মানাইয়া লাইছ- তইলে আমি তো কোন ছাই-

সুবর্ণা : কী কইলা? আমি তুমারে বশ মানাইছি?

সুদীপ্ত : না বশ মানাইছ না - বশ হইছি- তুমার ঐ-
সুবর্ণা : তুমি কি চুপ কইরা গেলা গা যে?
সুদীপ্ত : তুমার লগে কথা কইয়া আমি পারতাম না-
সুবর্ণা : আর আমি যে তুমার লগে কুন কিছুতেই পারতাম না-
সুদীপ্ত : বুঝলাম না-
সুবর্ণা : ঐ ধর তুমার মত কথায় কথায় গান বানতাম পারি না- তুমার মত বাঁশি বাজাইতাম পারি না- তুমার মত মন জয় করইন্যা কথা কইতাম পারি না-
সুদীপ্ত : কেডা কইল- তুমিও তো ভালাই গান গাও-
সুবর্ণা : গান গাই— মা মনসার বই পড়ার গান গাওয়ন আর গান বানদন তো এক কথা না - আইচ্ছা- সারাদিন এত পরিশ্রম কর কেরে?
সুদীপ্ত : বেডা মাইনষের আর কি কাম- নৌকা বাইয়া বাইয়া মাছ ধরন -গরু চাড়ান- (থেমে) আর তুমার ছবি মনের তুলি দিয়া আঁকন আর গান বান্দন- এই তো কাম-
সুবর্ণা : খালি মন রাখইন্যা কথা-
সুদীপ্ত : এখন ঘরে যাও- এই নদীর চড়ে কত মাইনষের আনাগোনা- ইহন বইয়া এইভাবে প্রেমালাপ করন ঠিক না - লোকে বেহায়া কইব
সুবর্ণা : (হাসতে হাসতে) তুমারে বেহায়া কইলে আমার কি?
সুদীপ্ত : আরে আমারে কইব ক্যান - আমি পুরুষ মানুষ- এই সমাজে আমরার পুরুষরার কোন কলঙ্ক লাগে না- বেহায়া কইব তুমারে - তুমি যে মাইয়া মানুষ – - (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)
সুবর্ণা : আমারে বেহায়া কইলে তুমার কি?
সুদীপ্ত : ওমা তুমি যে আমার রাই-শ্রীমতি-
সুবর্ণা : রাই শ্রীমতি? ওরে আমার নাগর-কানাই-(কপট চড়) [সুদীপ্ত কপট রাগ দেখিয়ে চলে যেতে চায়- সুবর্ণা দৌড়ে গিয়ে সুদীপ্তকে জড়িয়ে গান ধরে]

(গান) শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন/সারী বলে .... [গান শুরু হলে আলো দু'জনের মুখে কেন্দ্রীভূত হয়-মঞ্চে তিনটি ছোট ছোট জোনে তিন জোড়া রাধাকৃষ্ণকে বিভিন্ন প্রেমজ বিভঙ্গে দেখা যায়। গান শেষ হলে ছোট জোনগুলির আলো অফ্ হয়- আলো পূর্বের অবস্থায় চলে আসে- এমন সময় দেখা যায় একটি দিঘল/ পরমেশ্বর ঘুড়ি ভেসে ভেসে এসে মঞ্চে পড়ে- ঘুড়ির দুটি রং হবে নীল এবং হলুদ। সুদীপ্ত ছুটে গিয়ে ঘুড়িটা ধরে নিয়ে আসে-]

সুদীপ্ত : চৈল হওয়া ঘুড়ি মাটিতে পড়তে দেখলে আমার একদম ভাল লাগে না- ইচ্ছে হয় ঘুড়ির মত সারাজীবন উড়ে বেড়াই-

সুবর্ণা : (ঘুড়ির রং দেখিয়ে)এ্যাই দ্যাখ- এইডা যেন ঠিক কৃষ্ণ-রাধা-কাল-হলুদ-রাই শ্রীমতি -নাগরকানাই-

সুদীপ্ত : ওরে বাবা-ইহনও রাধাকৃষ্ণ? ইহনও প্রেম? (গান) প্রেম যে কাঠালের আঠা/ লাগলে পরে ছুটে না-

সুবর্ণা : আমরা কৃষ্ণ ভক্ত - আমরা সব কিছুতেই রাধা-কৃষ্ণ -রে খুইজ্যা পাই- (হঠাৎ গম্ভীর)

সুদীপ্ত : (হাসতে হাসতে) কী হইল তুমার রাধে- হঠাৎ করি কিসের লাগি মন কান্দে-

সুবর্ণা : (কাঁদো কাঁদো স্বরে) আইচ্ছা সুদীপ্ত তুমি সত্যি সত্যি নাগর কানাই হইবা না তো?

সুদীপ্ত : কেন হইতাম না? তুমি হইবা আমার রাই শ্রীমতি- আমি তুমার নাগর কানাই

সুবর্ণা : (কেঁদে) মানে কৃষ্ণ যেমন রাধা-রে বৃন্দাবনে রাইখ্যা -বিয়া না কইরা - মথুরায় গেছিলগা চিরকালের লেইগ্যা- তুমিও ইতা করবা? আমারে ছাইড়া দিয়া যাইবা গা?

সুদীপ্ত : ধুরউ- কিতা যে কও- রাধা হইল কৃষ্ণের আত্মার আর এক রূপ- কৃষ্ণ নিজের লগে নিজে কেমনে বিয়া করব? তাই করছে না- কিন্তু আমি তুমারে ছাইড়া যামু ক্যান?

সুবর্ণ : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) দুই গুড্ডির কাটাকাটিতে একটা চৈল হইয়া যায় গা- আমার জানি কেরে ডর লাগদাছে-

সুদীপ্ত : কেরে- আমার লগে তুমার আবার কবে গুড্ডির কাডাকাডি হইল যে আমি চৈল হইয়া যামু গা?

সুবর্ণা : আমার যে বড় ডর লাগে-

সুদীপ্ত : আমি চৈল হইয়া গেলেগা তুমি কি করবা?

সুবর্ণা : (চোখ ছলছল- গান ধরে) ভ্রমর কইও কইও গিয়া/কৃষ্ণরে বুঝাইয়া------- (গান শেষে) বাবা-মা আমার লেইগ্যা সম্বন্ধ খুজতাছে-

সুদীপ্ত : তাইলে তো ভালই- বিয়া কইরা লামু-

সুবর্ণা : হরেকৃষ্ণ- আমি কারে লইয়া ঘর বান্দনের স্বপ্ন দেহি- আরে বেডা- তুমার লগে না - অন্য বেডার লগে আমারে বিয়া দওয়নের সম্বন্ধ খুজতাছে-
(নেপথ্যে গরুর "হাম্বা" ডাক শোনা যায়)
আমি যাই - মঙ্গলীর খাওয়ন শেষ- বাড়িত যাওনের তাড়া দিতাছে-
[ভ্রমর কইও গিয়া- গান গুন গুন করতে করতে সুবর্ণার প্রস্থান- সুদীপ্ত তাকিয়ে থাকে- ধীরে ধীরে বাঁশি বাজিয়ে গান ধরে।]

সুদীপ্ত : (গান) ওই ভাটি গাঙে বাঁধা / আমার সাধের নাও/ জোয়ারের জলে ভাইস্যা যায়/ বুকের নদী উথাল পাথাল / হইল ঝড়ে বেসামাল/ জানি না কি করি

উপায়/ জোয়ারের জলে ভাইস্যা যায়-
(গানের মাঝামাঝি অংশে হরিনারায়ণ বাবুর প্রবেশ- গান শোনে- গান শেষে)

হরিনারায়ণ: (হাততালি দিয়ে) বা: বা: বা: কী সুন্দর গানের গলা আমার এই ছোড ভাইডার- তা সুদীপ্ত - তুই গাছ না কেরে রে ভাই- এত সুন্দর গাছ তুই-

সুদীপ্ত : (হাসিমুখে) দাদা যে কিতা কন-কৈ গাই না - গান ঐ তো আমার জীবন-

হরিনারায়ণ: আরে ধুর বেডা- আমি কি এই গানের কথা কইছি নি- কৈরে তরা কৈ (কয়েকজন যুবকের প্রবেশ) ঐ দ্যাখ আমি কই কিতা- আর আমার সারিন্দা বাজায় কিতা।

যুবক ১ : ঐ সুদীপ্যা- তুই বেডা এত ভুন্দা কেরে?

সুদীপ্ত : আসলে সমীরদা - আমি কিচ্ছু বুঝদাছি না তুমরা কিতা কইতাছ?

যুবক ২ : তবে শোন- দ্যাখ তুই এত ভালা গাছ আর কলোনীর মানুষ নৌকা বাইচ-অ বিমইল্যা-রে মেইন গায়ক বানায়

হরিনারায়ণ: হ, আমিও দীপকের কথাডাই কইতাছি- বিমইল্যা হইল আমরার বিরোধী দলের হে কেরে মেইন গায়ক হইব?

সুদীপ্ত : ওমা -হইলে কিতা হইছে? কালকা -ত হে ঐ গান গাইয়া আমরারে জিতাইয়া আনছে-

যুবক ৩ : শোন সুদীপ্যা - আমরা ঠিক করছি আগামীবার তুই হইবি আমরার মেইন গায়ক- বিরোধীদলের কোন নৌকা জল-অ নামতাম দিতাম না-

সুদীপ্ত : শোন বাপী- আমি অখ্যনই এই ব্যাপারে কিছু কইতে পারতাম না - আমি গান গাই মনের তাড়নায় -গান লইয়া দলবাজী আমি করতে পারতাম না।

হরিনারায়ণ: ওমা - (যুবকদের) কিরে- হে দেহি উল্ডা সুরে তান ধরে- শোন সুদীপ্ত- আমি সব জানি - দুলালবাবুর মাইয়ারে লইয়া যে তুই ফষ্টি নষ্টি করছ- কি জানি মাইয়াডার নাম

যুবক ১ : সুবর্ণা

হরিনারায়ণ: হ- সুবর্ণারে লইয়া তুই কিতা করছ আমি সব জানি- আমার কথাত রাজী না হইলে এই মাইয়ারে বিয়া করন লাগদ না- গান-অ দেখবা তুমার মুহে দিয়া না - তুমার নীচে দিয়া বাইর হইব-

যুবক ২ : হাড়ুডি ভাইঙ্গা বাড়িত বওইয়া রাখুম-

যুবক ৩ : (নরম সুরে) সুদীপ্যা তুই হইলি আমরার দলের রত্ন - তুই কেমনে যাস বিরোধী দলেরটির লগে নৌকা বাইতি?

হরিনারায়ণ: (নরম সুরে) সুদীপ্ত - তুই না আমার ছোড ভাই- এ্যাই আমরার সুযোগ - নৌকাবাইচ এই এলাকার জলজীবী মানুষের মেইন উৎসব অহন- ইহন যদি বিরোধী দলের কমরটা ভাইঙ্গা দিতাম পারি - আর তর লেইগ্যা একটা ছোড-খাড

সরকারী চাকরীর চিন্তা ও আমি করতাছি- তুই ভাইব্যা দেখ-কৈরে চল-
[সুদীপ্ত বাদে বাকিদের প্রস্থান। সুদীপ্ত তাকিয়ে থাকে-ধীরে ধীরে বাঁশি হাতে তুলে নেয়- করুণ কোন সুর তোলে- হঠাৎ করে বাঁশি থামিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়-]

চতুর্থ দৃশ্য

[মুরুব্বির বাড়ি- দেখা যাবে মুরুব্বি দাওয়ায় বসা-দুলালবাবু (সুবর্ণার বাবা) মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলছে-]

মুরুব্বি : সবঐ ঠিক আছে দুলাল - তুমিত তুমার কথা কইছ -শুনলাম- কিন্তু আমি কই দুইডা ব্যাপার - একটা হইতাছে- তুমার একটা মাইয়া - এইডারে এতদূরে বিয়া দিবা - পুলা কেমন ইতাও তো ঠিক কইরা খুঁজ-খবর লওন যাইত না- একটা মাইয়া - আমার একটু খটকা লাগদাছে- আর একটা ব্যাপার হইল তাইর লগে কথা কইছ নি ? তাইর মনের কথাডাও তো একটু শুইন্যা লও-
[মুরুব্বির উঠোনের মধ্য দিয়ে কোন জেলে কাঁধে গামছায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বেঁধে হেটে যায় - যেন গ্রামের কোন সর্টকাট রাস্তা]

মুরুব্বি : কি খবর সুনীল- আজগা যমুন বাজারতে তাড়াতাড়ি আইয়া পড়লা ?

সুনীল : হ, মাছ সব বেইচ্যা লাইছি- ঐ বাড়ির সদাই কিন্যা ঘর -অ যাইতাছি
(সুনীল-এর প্রস্থান)

দুলাল : জ্যেডা - এ্যামনে আপনের বাড়ির রাস্তাডারে সটকাট বানাইতে বানাইতে একদিন দেখবেন -আপনের বাড়ির উডান -ডা সত্যি সত্যি চলাচলের লেইগ্যা এজমালি রাস্তা হইয়া গেছে গা-

মুরুব্বি : যদি হয় মন-অ করুম এইডা আমার সৌভাগ্য। যাওগ্যা- যেইডা কইতে আছলাম- দুলাল বেশি তাড়াহুড়া কইর না -আগে সুবর্ণার কথাডা একটু শুইন্যা লও-

দুলাল : আরে জেডা- এইডা কিতা কইলেন- তাইর লগে আবার কিতা কথা কইতাম- আমি যিহনঅ বিয়া ঠিক করুম- ইহনঐত্য তাইর বিয়া বওয়ন লাগব-

মুরুব্বি : (হাসি) ধুর বেডা- অহন আর হেই দিন নাই - (উদাস) আজগা থেইক্যা পঞ্চাশ বছর আগে আমি বিয়া করছি নিজের পছন্দে- (দুলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে) তবে তুমার জেডিমাও কিন্তু খারাপ আছিলঅ না- (দু'জনের হাসি)

দুলাল : জেডিমা-র মা-বাবা জানি আপনের লাডির ভয়ে রাজী হইয়া গেছেগা-

মুরুব্বি : ধুর বেডা - আমি লাডি ভাঙ্গছি যিতানে আমরারে শোষণ করণের চিন্তা করছিল- বিভেদ করানের চেষ্টা করছিল- হেরার মাথাত- ভালা মাইনষেরে আমি আগলাইয়া রাখছি- বয়স হইছে চাইর কুড়ি দুই-অহনঅ লাডি হাত লইলে কয় বেডা আগ্যাইয়া আওয়নের সাহস আছে আমি জানি- তবে তোমার জেডিমার

মত আমার শ্বশুর-শাশুড়িও ভালাই আছিল- গেলে কাসার থালা এতবড় কাতলা মাছের মাথাডা আমার লেইগ্যা বান্দা আছিল-

দুলাল : তা জেডিমা যে আপনেরে ছাইড়া গেলগা- কোনো সন্তান - আদিও নাই- আপনের মন্অ কষ্ট হয় না?

মুরুব্বি : (হাসি) কষ্ট- কষ্ট ত নিজের মন-এর কাছে -তুমি যদি কষ্ট বাড়াইতা চাও বাড়ব- আর কমাইতে চাইলে কমব-সবডা নিজের উপরে - শুন দুলাল ভালা মানুষ বেশিদিন সংসার-অ থাকে না- তাই জেডিমা আমারে ছাইরা গেছে গা- আর তুমরা আছঅ না- এই রুদিজলাত আমার কতডা পুলা-মাইয়া তুমিই কও-তাই আমার কি কষ্ট—

দুলাল : তা অবইশ্য ঠিক-আইচ্ছা জেডা আমি অহন যাই—

মুরুব্বি : হ, আইয়-তবে শুনঅ-তুমি অহনঐ কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইয় না- আমি একটু সুবর্ণার লগে কথা কইয়া লই-

দুলাল : ঠিক আছে — জেডা আপনে যা কইবেন হেইডাই হইব—

[দুলাল বাবুর প্রস্থান- মুরুব্বি উদাসভাবে গান ধরে]

(গান) একদিন মাটির ভিতর হবে আমার ঘর/ও মন আমার কেন বান্ধ দালান ঘর

[গানের মাঝামাঝি সুদীপ্ত প্রবেশ করে-গানের সুরে বিভোর হয়ে বাঁশি ধরে হঠাৎ মুরুব্বির সম্বিৎ ফিরে]

মুরুব্বি : (গান থামিয়ে) আরে সুদীপ্ত -কিরে-বেডা- বাক্কা দেহি সঙ্গত করছ-আয়-আয়-ব (সুদীপ্ত দাওয়ায় বসে)

সুদীপ্ত : দাদু- একটা কথা কইতাম-

মুরুব্বি : হ-জানি-কিতা কইবি-মৌমাছি ত চাইরদিকে ঘুরতাছে-গিয়া খবর দিয়া লাইছে আর কি -আমার বাড়িত কেডা আইছিল-

সুদীপ্ত : দাদু তুমি কিতা কইতাছঅ বুঝদাছি না -

মুরুব্বি : (উঠে দাঁড়ায়-সুদীপ্ত কেও দাঁড় করায়) অই-তুই সুবর্ণারে বিয়া করবি? (সুদীপ্ত চমকে উঠে)(ধমক দিয়ে) অই বেডা কথা ক-

সুদীপ্ত : দাদু-দা---দু

মুরুব্বি : (কপট রাগ) অই বেডা মিনমিন করছ কেরে-বেডা মাইনষের মত ক-নইলে এই লাডিডা দিয়া অহনই তর মাথা ফাডাইয়া লামু-

সুদীপ্ত : দাদু -তুমি যে কিতা কও আ---মি

মুরুব্বি : (হেসে) এ্যাই শুন-মাইইয়াডা ভালা-আমার বয়স থাকলেও আমি ঐ বিয়া কইরা লাইতাম -তরে আর প্রেম করতে দিলাম না হইলে-

সুদীপ্ত : দাদু-ইতা কিচ্ছু না- আমি-

মুরুব্বি : আবার মিছা কথা -আমি সব-জানি আমার কিনারঅ বইয়া একজন আর একজনরে গল্প শুনতে শুনতে চিমডানি-আমি কিচ্ছু বুঝি না- না? অহনে

সুজাসুজি ক-বিয়া করবি?

সুদীপ্ত : (আস্তে) করুম-

মুরুব্বি : জোরে ক-

সুদীপ্ত : (একটু জোরে) করুম-

মুরুব্বি : আরো জোরে ক-

সুদীপ্ত : হ-হ-হ আমি সুবর্ণারে করুম -বিয়া করুম—বিয়া করুম—বিয়া করুম—

মুরুব্বি : এ্যাই এ-না বেডা-প্রেম করছত কি অন্যায় করছত? রাধা-কৃষ্ণ ও তো প্রেম করছে-সব সময় মাথা উঁচা কইরা বেডা মাইনষের মত চলবি-অরে মিনমিন কইরা কথাত কইব চোর-বাটপার-দান্দাল হেরা এনা- চুরি ত করছত না-তবে জুড়ে কথা কইতে অসুবিধা কিতা- তা অহনে ক কেরে আইছিলি?

সুদীপ্ত : দাদু- একটু আগে ঐ চড়ার মাঠ-অ হরিদা গিয়া হাজির - আমারে ধমকাইয়া আইছে - কেলেইগ্যা আমরার গ্রামের নৌকাত বিমল্যা-রে মেইন গায়ক বানানি হয়-হে বিরোধী দলের- তাই আগামীবার হেরা আমারে মেইন গায়ক বানাইয়া নৌকা লামাইবার প্ল্যান করছে- আমি রাজী না হইলে বলে আমার হাড়ুডি ভাইঙ্গা লাইব-

মুরুব্বি : (চোয়াল শক্ত) হু বুঝঝি- তুই - যা- (সুদীপ্ত প্রস্থানোদ্যোত) আরে শোন শোন- কারুরে দিয়া দুলালের বাড়িত খবর পাডা - দুলাল যাতে আমার লগে আইয়া দেখা করে-

সুদীপ্ত : ঠিক আছে-(প্রস্থানোদ্যোত প্রবেশ করে হরিনারায়ণ-সাথে দুই সাগরেদ-সুদীপ্ত ও হরিনারায়ণ মুখোমুখি)

হরিনারায়ণ: (সুদীপ্তকে) অ- জাগাত আইয়া পড়ছ-

সাগরেদ১ : কিচ্ছু হইলেই ইহনও আইয়া পরন-দাঁড়া-তরে দেহামু মজাডা-

(সুদীপ্ত-র প্রস্থান)

মুরুব্বি : আরে হরিনারায়ণবাবু যে- আয়েন-আয়েন, (হাঁক দিয়ে) গোপাল গোপাল

নেপথ্যে : আজ্ঞে কর্তা-

মুরুব্বি : একটা চেয়ার আইন্যা দে-

হরিনারায়ণ: আরে লাগদ না- লাগদ না-ইহনঐ বই-

মুরুব্বি : আরে আরে আপনে কন কিতা- আপনে অহনে জনপ্রতিনিধি - (গোপাল চেয়ার নিয়ে প্রবেশ করে - (চেয়ার দিয়ে বেরিয়ে যায় -)

হরিনারায়ণ: (চেয়ারে বসতে বসতে -সাগরেদ কে) বুঝছনি -জেডা অহনে আমারে খুঁচা দিতাছে- আপনে আপনে কইরা কইতাছে-

মুরুব্বি : আমি কারুরে খুঁচা দেই না- ছোডবেলাত্যেই আমার খুঁচাখুঁচির স্বভাব নাই- দিলে ঘাই দেই- হরিনারায়ণবাবু হইল অহনে জনপ্রতিনিধি - আগে তুমি তুমি কইলেও কি অহনে আর তুমি কওয়ন যায়?

সাগরেদ-১: ঠিক ঐত্য- আপনের একটা মান-সম্মান আছে না-

হরিনারায়ণ: (মুরুব্বির পা ধরে) জেডা যে কিতা কন-আপনে আমরারে ছোড বেলাত্যে চিনেন-আপনে যদি এমন কন-

মুরুব্বি : (ব্যাঙ্গাত্মক সুরে) হ-ছোড বেলাইত্যেই ত চিনি। তা কেউ কেরে আইছিলা।

সাগরেদ-১ : ঐ সুদীপ্তর ব্যাপারে একটু কথা কইতাম-

মুরব্বি : হে কেডা? তুমার চেলা?

সাগরেদ-১ : এ্যাই আপনে মুখ সামলাইয়া কথা কন

হরিনারায়ণ : এ্যাই কমল- তুই চুপ কর

সাগরেদ-২ : দাদা, হেত ঠিকৈ কইছে- আইছি পরেত তাইনে খুচানি আরম্ভ করছে-

মুরব্বি : (রাগে উঠে দাঁড়ায়) কিতা কইলি? আমি মুখ সামলাইয়া কথা কইতাম? অই-তুই কেডা? কবে আইছত? কার লগে কথা কইতাছত জানছ নি?

সাগরেদ-২ : হ, হ, জানি- আপনে কেডা - ভুইল্যা যানগা আগের দিন- শুধু দাদা----

মুরুব্বি : (চিৎকার) এ্যাই হরি- খুব খারাপ হইতাছে কিন্তু -

হরিনারায়ণ: এ্যাই কমল-দিলীপ- তরা চুপ করবি? একটা চড় দিমু কিন্তু-(সাগরেদরা চুপ করে যায়- মুরুব্বি শান্ত হয়ে বসে পড়ে) জেডা- বেনিফিসিয়ারী বাছাই করনের যেই লিষ্টটা গেছে-হেইডাতে ত কিছু নাম বাদ দওয়ন লাগে -

মুরুব্বি : হ, আমি দেখছি হেই লিষ্টটা -একটা নামও বাদ যাইত না - প্রধান আমার লগে কথা কইয়াই বানাইছে-

হরিনারায়ণ: কিন্তু-

মুরুব্বি : দ্যাহ, হরিনারায়ণ-রাজনীতিতে আইছ ভালা কথা-সমাজসেবা করবা-সব ঠিক আছে-কিন্তু একটা কথা কই-মানুষের পেট লইয়া রাজনীতি কইর না- পেটের লগে কোন দল নাই-কোন রঙ নাই-

হরিনারায়ণ: না হেই কথা না- আমি-

মুরুব্বি : (কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে) কোন কথা আমার শোনন লাগদ না- শোন জনপ্রতিনিধি না হইয়া জননেতা হওনের চেষ্টা কর- মানুষের ভালবাসা পাইবা-নয়তো মানুষের ঘৃণা লইয়া মরবা-

সাগরেদ-১: (কমল) : ওমা- তাইনে এইডি কিতা কয়?

সাগরেদ-২: (দিলীপ): আরে বাদ দে - হইত্য যুগের চিন্তা লইয়া পইরা রইছে-

কমল : দাদাও যে তাইনেরে কেরে এত-----

মুরুব্বি : (রাগান্বিত স্বরে) হরি—

হরিনারায়ণ : তরা চুপ কইরা বইবি? এ্যালেইগ্যা কি আমার বিরোধীরারেও ভাতার ব্যবস্থা আমি কইরা—

মুরুব্বি : (থামিয়ে রাগান্বিত স্বরে) হ, তুমি কইরা দিবা-বিরোধী- বিরোধী আবার কিতা? তুমি এই এলাকার জনপ্রতিনিধি না? তাইলে এই এলাকার সবার

কথাই তুমার চিন্তা করন লাগব-এ্যালেগ্যাই তুমি জনপ্রতিনিধি-এইডা মন -অ রাইখ্য-

সাগরেদ-১ : আপনে কিতা কন---

মুরুব্বি : (ধমক দিয়ে) এ্যাই তিত্‌পুড়ি -চুপ কইরা ব-নইলে বাইর হ আমার বাড়িত্যে

-দিলীপ: : না বাইর হইলে কিতা করবেন?

কমল : আমরা কই যামু -কইত্যে বাইর হমু -হেইডা কি আপনেরে জিগাইয়া করন লাগব? (মুরুব্বি রাগতে থাকে)

দিলীপ : এ্যাই ময়াল-অ আমরার উপরে কথা কওনের সাহস কেউপর নাই- বুঝছেন?

মুরুব্বি : (প্রচন্ড রাগে লাঠি হাতে তুলে নেয়-সাগরেদের বেধরক মারতে থাকে- হরিনারাণ থামানোর চেষ্টা করে) শালা- তরা জীবন দাস-রে চোখ রাঙাছ?

হরিনারায়ণ: (সাগরেদ-কে) অই তরা অহনে যা-ত-যা আমি একটু কথা কইয়া আইতাছি (গোপাল ঘর থেকে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে)।

গোপাল : (কমল-দিলীপকে) ভাই-তুমরা অহনে যাও যাও- তুমরাত নূতন আইয়া জুইরা বইতা চাইতাছ- কর্তাবাবুরে চিন না

কমল : হ-হ যাইতাছি - তর কথা কওয়ন লাগদ না-

দিলীপ : দাদা কইছে দেইখ্যা শুধু যাইতাছি - না হইলে-

গোপাল : কর্তাবাবুর জীবনে এ্যামন অনেক 'না -হইলে' আইছে আর গেছে- নিজেরার ভালা চাইলে বাইর হও (সাগরেদদের প্রস্থান) কর্তা বয়স হইছে ত? এ্যমনে রাইগ্যা গেলেগা কোন সময় কোন বিপদ হইব—

মুরুব্বি : গোপাল-তুই ভিতরে যা- হরি কও কিতা কইবা? তারাতারি কও-আমার সন্ধ্যাহ্নিক বাকি রইছে-

হরিনারায়ণ : জেঠা আমি কিছু লোকের নাম তবু বাদ দিমু-

মুরুব্বি : (প্রচন্ড রেগে উঠে দাঁড়ায়) কী- এতবড় সাহস-আমার উপরে- এই জীবন দাসের উপরে কথা কওয়নের সাহস হইয়া গেছেগা-(হরিনারায়ণের কলারে ধরে)শোন হরি-ভুইল্যা যাইছগা না আমার নাম জীবন দাস-নিজের ভালা চাইলে নিজেরে শুধরাইয়া লাও- এই শোষণের রাজনীতি -এই ভাগাভাগি করণের রাজনীতি-বন্ধ কর- যারা ইতা করছে এতদিন-তারারে মানুষ আছাড় দিয়া বার বার মাডিত ফালাইছে- ভুইল্যা গেছ গা না- রাজনীতি কর মানুষের লেইগ্যা-

হরিনারায়ণ: (কিছুটা রেগে) জেডা আপনে কিন্তু আমারে ভুল বুঝদাছেন-

মুরুব্বি : ভুল-কী ভুল বুঝঝি-গতবার আমরার চিরাচরিত ঐতিহ্য-রে ভাইঙ্গা এই কেমতলী গ্রামেত্তে দুইডা নৌকা লামাইছলি না? কিতা হইছে? লাষ্ট এত্তে ফাষ্ট হইছে-কই আমি ত গতবার নাক গলাইছিলাম না- কিন্তু দেখলাম তরার মত মানুষের হাতে আমরার সংস্কৃতিরে ছাড়লে বিপদ হইব- তাই এইবার

আবার আমার নাক গলান লাগল। তুই মনঅ করছ আমি কিছু জানি না - অহনে আবার ধান্ধা করতাছত ভাগাভাগি করনের-সুদীপ্তর মত একটা সৎ পুলারে বলির পাডা বানানের চিন্তা করতাছত- আমি থাকতে তা হইতে দিতাম না - আমার মরণের পরেও অন্তত ২০/২৫ বছরে এই নৌকা বাইচ- এই ভাটিয়ালি গান-এই লোকনৃত্য- এইডিরে তরা কেও হাজার চেষ্টা কইরাও ভাঙ্গতি পারতি না— দীপক, বিমল, সুদীপ্ত-রাজু সবডিরে বানাইয়া রাইখ্যা যাইতাছি- তরা যদি না বদলাছ-তরারে শায়েস্তা করণের লেইগ্যা (নেপথ্যে আজ্ঞে কর্তা) ।

হরিনারায়ণ: জেডা- আপনে বন-আপনে বন- এই বয়সে এত রাগ কইরেন না - আমি কি আপনেরে না জিগাইয়া কোন কাম করুম-

মুরুব্বি : গোপাল-গোপাল- (নেপথ্যে আজ্ঞে কর্তা)

নেপথ্যে : আমরার হরিবাবুর লেইগ্যা চা লইয়া আয়।

হরিনারায়ণ: না- না- জেডা চা খাইতাম না - (উঠতে যায়)

মুরুব্বি : এই হরি- ইহন চুপ কইরা ব-(ধমক) (হরিনারায়ণ বসে পরে) (নরম স্বরে) শোন- আমার মনঅ হয়- সারা ভারতবর্ষের মইধ্যে ইহন ঐ এ্যাই সংস্কৃতি আছে- এই নৌকা বাইচ- আমরারে একটা সূতার মইধ্যে মালার মত গাইথ্যা রাখছে-নাই জাতপাত-নাই ধনী- গরিব-নাই কোন রাজনীতি -আজগা প্রায় ৭০ বছর ধইরাতো এ্যামনে কাডাইতাছি-ইডারে নষ্ট হইতে দিও না—তোমার ভালার লেইগ্যাই কইতাছি- (হঠাৎ সুবর্ণা দৌড় দিয়ে প্রবেশ করে-হরিনারায়ণকে দেখে থমকে যায়-আবার দৌড় দিয়ে বেরিয়ে যায়)

মুরুব্বি : সুবর্ণা-সুবর্ণা-আরে কইয়া যা কেরে আইছিলি-(হরিনারায়ণকে) বুঝলা হরি-এই দ্যাখ তাই তুমারে দেইখ্যা দৌড় দিয়া বাইর হইয়া গেছেগা- এইডা হইতে দিও না - জনপ্রতিনিধি হও না- জননেতা হও -ছোড-বড় সবাই যাতে তোমার কাছে মন খুইল্যা কথা কইতে পারে- মানুষের ভালোবাসা পাইবা- (হরিনারায়ণ চুপ -ধীরে আলো অফ হয়)।

পঞ্চম দৃশ্য

(আলো জ্বললে দেখা যাবে মুরুব্বির বাড়ি। বারান্দায় চেয়ারে বসা মুরুব্বি -পাশে মাটিতে দুলালবাবু ও সুবর্ণার মা বসা ।গ্রামের অন্যান্য লোক উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা-)

মুরুব্বি : শোন-তুমরারে আজগা ডাকানের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে-

বিমল : (নোয়াখালি ভাষায়) আই জানি- সুদীপ্যা আর সুবর্ণার বিয়া

দুলাল : তুই থামবি- চুপ কইরা ব-

মুরুব্বি : হ, হে ঠিকঐ কইছে- তুমরা সবাই শোন- আমার আদরের নাতিন সুবর্ণার লেইগ্যা দুলাল-এর কাছে অনেকটি আলাপঐ আইছিল- কিন্তু দুলাল হেরা আমার কথা

শুইন্যা সুদীপ্ত-র লগেই বিয়া দিব মন ঠিক করছে-তা তুমরা কি কও-

তপতী : বাঃ - এইডা তো ভালাই- আমরার ঘরের মাইয়া ঘরঐ থাকব-

মুরুব্বি : দ্যাহ সুদীপের মা নাই- বাপ নাই-ঠিক-আছে কিন্তু জমিজমা যেমুন আছে- পুলাডাও ত উদ্যোগী -পরিশ্রমী-

বিমল : (নোয়াখালি ভাষায়) অত খুব ভালা

গ্রামের কোন পুরুষ: এ্যাই বিমইল্যা তোর জ্যেঠামি করন লাগদ না -চুপ কইরা তুই ব-

মুরুব্বি : হ, হরিপদ ঠিকঐ কইছে-বিমল তুই চুপ কইরা ব- তাইলে আর কিতা- তুমরা রেডী হও- আর কও কেডা কেমনে বিয়াত সাহায্য করবা-

দুলাল : (সুবর্ণার মা-কে) কই গো তুমি কও না-

সুবর্ণার মা : জ্যাডা - একটা কথা কইতাম-

মুরুব্বি : কও-

সুবর্ণার মা: (কান্না ভেজা গলায়) মাইয়া জন্ম হইছে পরেত্তেই তো জানতাম- একদিন এই দিন আইব- তখন থেইক্যাই আস্তে আস্তে আমি সব গুচাইয়া লইছি-

দুলাল : তাই আমরা ভাবদাছি কারোর থেইক্যা---

মুরুব্বি : বুঝঝি— এইডা তুমরার ইচ্ছা তবে আমরার এই ১৭ডা কলোনীর যেই ঐতিহ্য আমরা মনেত্তে পালন কইরা আইতাছি—

দীপক : দুলাল কাহা, এইডা হইত না - এতদিন আমরা আমরার গ্রামের মাইয়া বিয়া দিছি ১৭ডা কলোনীর সবাই মিল্যা— এইবারও এমনঐ হইব—

রাজু : যে যেমুন পারে এমন এনা সাহায্য করব- কারুরে তো জোর করা হয় না-

সমীর : হ-হ আমরা সবাই মিল্যাই সুবর্ণার বিয়া দিমু-গয়নাগাটি-খাট পালঙ-খাওয়া দাওয়া সব সময়ের মত আমরা সবাই মিল্যাই দিমু-

গ্রামের পুরুষ ২: আরে তরা রাখ রাখ-বুঝনের আগে চেইত্যা যাছগা- চেতনের আগে বাইন্দা লইয়াছ- আমরা সবাই আছি ত- তরা একটু চুপ কইরা ব—

বিমল : (নোয়াখালি ভাষায়) সুদীপ্ত আওয়ার দোস্ত- আই হেতার বিয়াত্তে কিছু কইরত্তে পাইত্যন নো-

মুরুব্বি : দুলাল নও-এইবার কি করবা কর- বুঝঝ ত কলোনীর মাইনষের মনের অবস্থা-

দুলাল : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার মন-অ হয় আমরা ভারতবর্ষে নাই-পণের লেইগ্যা নির্যাতন -মাইয়া বিয়া দওনের কথা মাথাত আইলে বাপের মাথার ঘাম পাও পরে- আর আমরার এইহন? (গলা ধরে আসে)

মুরুব্বি : (দুলালের বন্ধু) দিবাকর এইবার তুমি সামলাও তুমার বন্ধুরে-

দিবাকর : শোন সব্বাই -দুলাল যখন কইতাছে হের কথা আমরার মাইন্যা লওয়নডাই ঠিক হইব-আমরা বরং সব্বাই শরীর দিয়া পরিশ্রম কইরা বিয়াডা সুন্দর কইরা দিয়া দেই-

কোরাস : হ, হ এইডাই ঠিক হইব-

মুরুব্বি :(উঠে জাঁড়ায়) শোন সক্কলে- আমার দুইডা ইচ্ছা- (সবাই উৎসুক হয়ে তাকায়) আমরার কলোনীর মানুষের মইধ্যে এই যে এখটা সদ্ভাব-এইডা কিন্তু আইছে- আমরার জলজীবী মানুষের জীবন জীবিকা থেইক্যা- আমরার সংস্কৃতি-র থেইক্যা-এইডারে তুমরা নষ্ট হইতে দিও না- (বিমল কে ডাক দেয়) এই বিমল এদিকে আয়-(বিমল আসে) তুই কবে পডাইবি? (সবাই হাসে) আইচ্ছা যেইডা কইতে আছলাম — আমার একটা ইচ্ছা হইল— তারার বিয়ার রাত্রে বিয়া বাড়িত কৃষ্ণলীলা হইব- আর এই লীলা পরিচালনা করব আমরার বিমল— (বিমলকে) কিরে পারতি না?

বিমল : (নোয়াখালি ভাষায়) কিল্যা পাইত্যান নু? নৌকা বাইচ- অ-অ-গান গাই গাইছি।

মুরুব্বি : বা: বেডা - যা গিয়া ব- আমার আর দুইডা ইচ্ছা-একটা হইল আগামীবার থেইক্যা কেমতলী নৌকা বাইচে মেইন গায়ক হইব সুদীপ্ত-

দীপক-রাজু-সমীর : ঠিক আছে- ঠিক আছে

মুরুব্বি : আর দ্বিতীয় ইচ্ছা হইল -কৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে আমার তো বিষয় সম্পত্তি কম নাই- বয়সও হইছে- বেশীদিন আর আমি নাই- আমি চাই এই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করনের লেইগ্যা একটা ট্রাষ্টি বোর্ড করতাম- এই ট্রাষ্টি বোর্ডের মইধ্যে দীপক-রাজু-সমীর -বিমল-সুদীপ্ত হেরা মেইন থাকব- কোন রাজনীতি থাকতে পারত না- আর আমার সম্পত্তিতে কোনদিন কোন বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হইতে পারত না - হইলে অনাথ আশ্রম হইব - আর বিষয় সম্পত্তির আয় দিয়া এই ১৭ ডা কলোনীর কোন মাইনষের অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার খরচ চলব - কারণ এই এলাকার মানুষ সবই দিন আনি দিন খাই অবস্থা- আমার পয়সা কড়ি আছে- তুমরার চোখে আমি বড়লোক - কিন্তু আমি জানি - মনেত্তে আমি গরীবঐ রইয়া গেলাম (গলা ধরে আসে)

দীপক-রাজু : হইছে- হইছে- তুমার সব ইচ্ছা পালন হইব (গ্রামবাসীদের) যাও যাও তুমরা অহন গিয়া বিয়ার তৈয়ারী কর (সবার প্রস্থান - দীপক, রাজু, বিমল সবাই দাদুকে ঘিরে ধরে)

রাজু : দাদু তুমি ইতা কিতা কর-

সমীর : তুমি হইলা আমরার কাছে শাহারুখ খান- সলমন খান-অক্ষয় কুমার সব-আর তুমি যদি মন ভাইঙ্গা লাও-

মুরুব্বি : (গলা ধরা অবস্থায়) নারে ভাই - আমার তো সময় শেষ-তোমরা মানুষ হও- আমরার জলজীবী মানুষের মইধ্যে আজগা যেই একতা-যেই সংস্কৃতি এমনভাবে সবাইরে বাইন্দা রাখছে-এইডারে নষ্ট হইতে দিও না তোমরা-

দীপক : তুমি কিতা? তুমি অহনঅ আমরাত্তে জোয়ান-তুমার আরো অনেক সময় থাকন লাগব-

মুরুব্বি : নারে ভাই-(গান ধরে) একবার হরিবলে মন রসনা/মানবদেহের গৈরব কৈর না- (ধীরে ধীরে অলো নিভে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আবহ সঙ্গীতে আলো জ্বলবে- মাঝ মঞ্চে গ্রামের সবাই বিয়ের প্রস্তুতি তে ব্যস্ত-কুঞ্জ সাজাও গো এবং শ্যামের বাঁশি বাজে কোন সে ব্রজপুরে/রাধা কেঁদে ফিরে কদমতলীতে এই দুটো গানকে নিয়ে বিমল ও তার দলবল রাসলীলা করছে- লীলার মাঝখানেই সুদীপ্ত ও সুবর্ণার বিয়ের দৃশ্য মঞ্চায়ন হবে- মুরুব্বি বসা-বিয়ে শেষে সুবর্ণা-সুদীপ্ত , দুলালবাবু ও সুবর্ণার মা থেকে আশীর্ব্বাদ নিয়ে মুরুব্বির কাছে আসে- পরিবেশ গম্ভীর হয়- দীপক -রাজু-র ইশারায় বিমল গান ধরে- (গান) দু'হাত তুলে বল রে কৃষ্ণ নাম/পুরবে সকল মনস্কাম-গানের মাঝেই সবার নাচ-এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আলো নিভে]

সপ্তম দৃশ্য

[দেখা যাবে গ্রামের লোকেরা সবাই দাঁড়িয়ে -মুরুব্বি একটা চেয়ারে বসা -একজন পুরোহিত একটি বড় কাঠের লগ-কে পুজো করছে-আনুষঙ্গিক মঞ্চসজ্জা থাকবে-এটা মুরুব্বির বাড়ির উঠোন হতে পারে-পুরোহিত পূজা শেষে উলুধ্বনি -শঙ্খধ্বনি-র পর সবাইকে পান-সুপারি ও মিষ্টি বিতরণ করে]

মুরুব্বি : নও এইবার পূজাপালি শেষ হইছে- এইবার আগামীবার -এর নৌকা বাইচ-এর লেইগ্যা নৌকা বানানি শুরু কর-কিরে সুদীপ্ত- পারবি তো-

সুদীপ্ত : আরে দাদু তুমি কিতা কও - না পারলে তো লগে বিমইল্যা আছেই-

বিমল : পাইত্যন- ন- পাইত্যন ন- এবার তর হইছে দায়িত্ব - তুর একলাই করণ লাগব-

দীপক : আরে দাদু তুমি চিন্তা কইর না- আমরা সবাই মিল্যা দেইখ্য আগামীরবারও কেমতলী রে চ্যাম্পিয়ান বানামু-

(বাইরে থেকে হরিনারায়ণ -এর প্রবেশ)

হরিনারায়ণ: আর-তাইলে আগামীবার রাত্রের পিকনিকটা আমি করামু সবাইরে-

মুরুব্বি : আরে হরি-আইয় আইয়-ঠিকঐ কইছত- অহনে তোমরাই দায়িত্ব লও-

হরিনারায়ণ: জ্যাঠা আপনে চিন্তা কইরেন না- এই ১৭ ডা কলোনীর সবাইরে দেখবেন আমরা সবাই মিল্যা ভালাই রাখুম- জ্যাঠা আপনের কথায়- আপনের মন মানসিকতা দেইখ্যা আমার জীবন দর্শন অনেক পাল্টাইয়া গেছেগা-

মুরুব্বি : না-বেশী ভালা হইলেও হইত না- সময়ে সময়ে (হাতের লাঠি দেখিয়ে) এইডারও কাম লাগে (লাঠি দিতে গিয়ে চেয়ারে পরে যায়- সুদীপ্ত দৌড়ে এসে মুরুব্বিকে ধরে- সবাই জড়ো হয়।)

সুদীপ্ত : দাদু-দাদু-তুমার কিতা হইছে-

মুরুব্বি : ভাই বুকটাত ব্যথা- তরার দিদিমা আর আমারে ছাইরা একলা থাকত পারতাছে না-

রাজু : ইতা কিতা কইতাছ তুমি?

মুরুব্বি : বিমল-বৈঠা-টা লইয়া আমার হাত দে- (বিমল পূজার জায়গা থেকে বৈঠা নিয়ে এসে মুরুব্বিকে দেয়) সুদীপ্ত-রাজু-বিমল-দীপক নও ভাই তুমরা এইবার এইডা ধর-

হরিনারায়ণ: দাঁড়া-দাঁড়া আমি এ্যাম্বুলেন্স রে ফোন করতাছি-অখ্যনই হাসপাতাল নেওয়ন লাগব

মুরুব্বি : হরি জীবন দাস এর জীবন আর কোন হাসপাতালঅ গিয়া আর বাড়ত না- শোন তুমরা সাবই-তুমরা মনঅ রাইখ্য আমার জলজীবি মানুষের কাছে এই বৈঠা হইল-দেবতার সমান-আমরার ঐতিহ্যডারে তুমরা সবাই মিল্যা ধইরা রাইখ্য- সুদীপ্ত, বিমল ভাই তরা দুইজনে আমারে একটা গান শুনাইতি না- (সবাই হতবিহ্বল- আনুষঙ্গিক দৃশ্যায়ণ- সুদীপ্ত- বিমল ধীরে ধীরে গান ধরে-)

গান : একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে/মন আমার, কেন বান্ধ দালান ঘর/ প্রাণ পাখি উড়ে যাবে, পিঞ্জর ছেড়ে/ধরা ধামে সবই রবে, তুমি যাবে চলে/বন্ধু-বান্ধব যত, মাতা পিতা দারা সুত/সকলই হবে তোমার পর-/রে মন আমার, কেন বান্ধ দালান ঘর (অনেকগুলো বৈঠা নিয়ে কোন ক্যোরিওগ্রাফি হবে)

[ধীরে ধীরে পর্দা নামবে]

লেখক: পার্থ মজুমদার, ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকার।।

ত্রিপুরী লোককথা অবলম্বনে নাটক

রাইমা সাইমা

সঞ্জয় কর

[মঞ্চে অর্ধবৃত্তাকারে বসে সব কুশীলব। একদিকে বাদ্যযন্ত্রীরা।]

মূল গায়ক : বন্দনা বন্দনা বন্দনা
বন্দনা যে করি মোরা
মঞ্চের চারিদিকে
আছেন যত দেবদেবী অন্তরে বাহিরে।

সমবেত দোহার : বন্দনা বন্দনা বন্দনা

গায়ক : রঙ্গমঞ্চের রক্ষাকর্তা
ব্রহ্মা বিষ্ণু -মহেশ্বর
পূর্বরঙ্গেতে বন্দনা করি
পরম পিতার পদ।।

স. দোহার : বন্দনা বন্দনা বন্দনা

গায়ক : মঞ্চ প্রদক্ষিণ শেষে
তোমায় প্রণমি ঋষি
নাট্য শাস্ত্রের প্রণেতা তুমি
নাম যে ভরত মুণি।

স. দোহার : বন্দনা বন্দনা বন্দনা

গায়ক : সর্বশেষে প্রণাম মোদের
সমাগত সুধীজনে
নাট্যঅর্ঘ্য সাজাব এবার
সর্বশিল্প দিয়ে।

স. দোহার : বন্দনা— বন্দনা— বন্দনা।

সূত্রধার : এইবার তাইলে বিদায় দেন। সমাপ্ত হইল আমাদের পালাগান। (সবার গুঞ্জন)

গায়ক : (জিভ কেটে) ইস্। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

সূত্রধার : কিসের ক্রিয়া?

গায়ক : এই পালার অন্তর্জলী ক্রিয়া আপনি সম্পন্ন করলেন? আরে পালা শুরুই হয় নাই তো আপনি সমাপ্ত করলেন কি কইরা?

সূত্রধার : আরে সব্বনাশ! না - না - পালার সমাপ্তি না। সমাপ্ত হইল আমাদের পূর্বরঙ্গ মানে আসর বন্দনা।

গায়ক : আপনের চরিত্রটাও মন্দ না। উল্ট পাল্টা কইলেও কোন দুষ নাই।

সূত্রধার : হে— হে— হে— সূত্রধার - বইল্লা কথা। জান, আমার জন্ম ঐ সংস্কৃত নাটকের যুগে— প্রায় দুই হাজার বছর আগে।

গায়ক : জানি। আপনি হইলেন আজকের দিনের টিভি সিরিয়ালের মতো– জন্ম আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই।

সূত্রধার : কি আমি টিভি সিরিয়াল? এত বড় অপমান—

অন্যরা : ও কর্তারা, এইখানে কি আপনারা ঝগড়া বিবাদ করবেন? না পালাগান শুরু করবেন। ঐ দর্শকরা খেইপ্যা উঠলে কিন্তু আমরা জুতা জোড়া বগলে লইয়া সোজা দৌড় দিমু।

সূত্রধার : না— না— হইব— পালা হইব। এই— ধর দেখি

স্থাপক : কি ধরবা আইজ—(গান) ভারতের উত্তরপূর্ব কোনেতে
আছে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রকৃতিরও কোলেতে,
পাহাড় লুঙ্গা সমতল, রৌদ্র ছায়া খেলে,
জাতি, জনজাতির মিলনভূমি ত্রিপুরা।
বাঁশ পাতার শিষের সুরে দোলে ধানের চারা।
চমপ্রেঙের সুর ঢাকের বোলে সবে আত্মহারা।

সূত্রধার : পার্বতী ত্রিপুরার বুকের উপর দিয়া,
টিলা লুঙ্গারে শীতল কইরা
গড়াইয়া গেছে যে জলের ধারা,
কি নাম তার, কও নাগো ত্বরা।

সবাই : হেইডা জান না নাকি, সে যে আমাদের গোমতী নদী।

সূত্রধার : আরে বাস্। দেখেন সুধীজন, নাট্যের কুশীলবের গুণের সঙ্গে যদি থাকে জ্ঞান, তাইলে সে নাট্য বইয়া যাইবো গোমতীর ধারার মতো। থাকবো আমাদের মান।

স্থাপক : মানের কথা ছাড়ান দেও।
আমার প্রশ্নের জবাব দাও দেখি এইবার তুমি সূত্রধার, যে নদী বহিছে নিরবধি যুগ যুগ ধরে, শত শত বর্ষে কত শত কাহিনী বুকের মাঝে ধরে, উৎপত্তি কেমনে হইল বল দেখি তার?

সূত্রধার : গোমতী নদীর উৎপত্তির কথা জানতে চাও সখা, ধৈর্য্য ধর কিয়ৎকাল, না করিও তাড়া, নানা নানীর মুখে আজও ফেরে সে গাথা। লোককথা বলে তারে, আজও সবাই শুনে। হেই কে- কে- যাইবা সেই লোককথার দেশে। আইসা পড়। আইসা পড়, তাড়াতাড়ি নব নব বেশে।।

গান ও নাচ : চল, লোক কথার দেশে
মোরা যামু অচিন দেশে।।
সেই দেশেতে মানুষ আছে।

আছে জানোয়ার,
সুখ দুখেরও দোলা আছে
আছে রক্তপাত।
চল, লোক কথার দেশে।।
কাহিনীর কুশীলব
নয়তো অচেনা
নাট্যকারের কারসাজিতে চিনি নাগো না
চল, লোককথার দেশে
মোরা যামু অচিন দেশে।।

[নাচের মধ্যেই কয়েকজন পূজার জিনিষপত্র নিয়ে আসে। একজন মাথার উপর বিরাট মিষ্টিকুমোড়, একজন বিরাট একটি মোরগ, অন্যরা অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে আসে। বাঁশের একটি পূজোর ঝাড়, একটি বিরাট কলস নিয়ে ঢোকে] ।

সূত্রধার : লোককথার দেশে পাহাড় ঘেরা এই অঞ্চলটায় দূরে দূরে টিলার উপর এক একটা বসতি। এইরকমই একটা টিলার উপর আমরা এখন আইয়া উপস্থিত।

[লোকেরা জিনিষপত্র এক জায়গায় রাখে। বাঁশের ঝাড়ের সামনে পূজো দেয় অচাই। মোরগ বলি দেয়।]

অচাই : লও। জোগার দেও। কই জুমিয়া বাবা কই- প্রণাম কর। ভক্তি লইয়া প্রণাম কর।

গ্রামবাসী ১ : বাবা, তুমি আমরার অরক। বাবা, এই বছরে জুমের ফসল ভাল হইব নি—

অচাই : হ— হ ভাল হইব।

গ্রামবাসী২ : বাবা। বন্য হাতি যেন ফসল নষ্ট না করে

অচাই : না— বাবা কইছে নষ্ট করত না

গ্রামবাসী-৩ : গত ফিরার মতো যেমন খরা না হয় বাবা—

অচাই : হ, বাবায় কইছে খরা হইত না—

[পূজা শেষ হল]

গ্রামবাসী-১ : বাবা, লাঙ্গি সেবা কর—

[বাবা উঠে বড় কলস থেকে দাঁড়িয়ে লাঙ্গি পান করে। অন্যরা সব কলসটাতে প্রণাম করে]

অচাই : লও— প্রসাদ লও হক্কলে। [একজনের পর একজন লাঙ্গি টানে]

অচাই বৌ : এইবার তোমরা আমরারে বিদায় দেও। আমার মন এইবার ছুইট্টা গেছে—

গ্রামবাসী-৩ : কিতা হইল মা— আমরার নি কুনু দোষ হইল?

অচাই বৌ : নারে বাবা। কোনো দুষ না। খালি ঘরে মাইয়া দুইটারে ফালাইয়া আইছি—

অচাই : আরে রাখ— চুপ কর—

অচাই বৌ : চুপ করতাম কেরে? আমার পরাণ তারার লাইগ্যা কান্দে। কিতা খায়— কেমনে

খায়?

অচাই : আরে চিন্তার কুনু কারণ নাই। জিহ্বা দিছেন যিনি, খাওন দিবেন তিনি। লও— লও— টান— আনন্দ কর—

গ্রামবাসী : অচাই বাবা কি—

সকলে : জয়।

গ্রামবাসী-৪ : অ অচাই, আমার বৌটারে বাঁচাও। ঐটা থাল ভইরা বাত খায়, কিন্তু শরীর পাটকাঠি।

অচাই : [একদিকে আঙুল দেখিয়ে] ঐ দেখ— চাইয়া দেখ হক্কলে—

সবাই : [ঐ দিকে তাকিয়ে] কিতা বাবা?

অচাই : ঐ দেখ পাহাড়ের শরীল বাইয়া নাইম্মা আসে ধূয়া—

সবাই : বাবা, ঐটাতো কুয়াশা, শীতের রাইতে পাহাড় থাইক্কা সন্ধ্যা কালে নাইম্মা আসে

অচাই : বুরবুকের দল— ভাল কইরা দেখ। ঐটা কুয়াশা না। ঐটা হইল লারিমা বুড়ির চুলার ধুয়া। [অচাইবৌ হঠাৎ কেশে ওঠে]

সবাই : লারিমা বুড়ি? ঐটা কে?

অচাই : লারিমা বুড়ি, পাহাড়ে গভীর জঙ্গলে তার বাস।
[গ্রামবাসীরা একজনের কাঁধের উপর একজন ওঠে। লারিমা বুড়ির অবস্থান দেখার চেষ্টা করে]

গ্রামবাসী-৪ : ও ওচাই বাবা, কই ঘর? কুনু ঘরতো দেখা যায় না—

অচাইবৌ : আরে ধুর— এমনে কুনু লারিমার ঘর দেখবা নি?
আরে রে রে — এইটির নেশা হইয়া গেছে—

অচাই : নাম — নাম কান্ধের থাইক্যা। আরে বুরবুকের দল, লারিমা বুড়ির ঘর জীবিত মানুষ চোখে দেখে না—

সবাই : তইলে কেটায় দেখে?

অচাই : মরা মাইনসে দেখে—

সকলে : ও মাগো, মরা মাইনসে?

অচাই : হ, মরণের পর দেখবা— এই রকম একটা সাদা রাস্তা— লম্বা রাস্তা— এই পথের শেযে থাকে লারিমা বুড়ি। ঘরের সামনে বুড়ি বড় চুলায় রান্না করে— তরকারি, ভাত। শত শত বছর বুড়ির বয়স। বুচ্ছনি? লারিমা বুড়িই হইল, মানুষের মরণের পরে দেখা শেষ জীবিত মানুষ। [গ্রামবাসী দেখতে থাকে লারিমা বুড়িকে। একজন মৃত মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে] মরা মানুষ যত আগাইয়া যায় বুড়ির দিকে, ততই সে তার জীবদ্দশার কথা সব ভুলতে থাকে। লারিমা তারে জল দেয়, খাওন দেয়। তরপর সে ধীরে ধীরে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। [লারিমা বুড়ি বিরাট কড়াই থেকে মৃতকে খাবার দেয়]

গ্রামবাসী-১ : কিন্তু, অখন লারিমা বুড়ির চুলার ধূয়া আমরার গ্রামে আইল কেমনে?

সকলে : ও বাবা— কুনু অমঙ্গল হইব নি?

অচাই : ঘোর অমঙ্গল আগাইয়া আইতাছে এইদিকে। এই ধূয়া যেদিকে যাইব সেইখানেই সর্বনাশ।

গ্রামবাসী-১ : আমরা মরমুনি হক্কলে? অ বাবা, অ মা - আমরারে বিধান দেও।

অচাই : মতাই— মতাই দেঅন লাগবো। গ্রাম চুক্তি—

অ : বৌ : গ্রাম চুক্তি কেরে? সম্প্রাইয়ের বৌয়ের সূতিকা— হে দিলেই তো হয়।

অচাই : তুমি চুপ কর। লারিমার ধূয়া দেখছ কুনুদিন? সারা গ্রামে এক্কেরে মড়ক লাগবো- মইরা সাফ হইয়া যাইব—

সকলে : দিমু বাবা। মতাই দিমু - গ্রামচুক্তি দিমু।

অচাই : [মুখে অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ করে] আগামী অমাবস্যায়

অ : বৌ : অমাবস্যায়! অম্মা অত দিন! আমি বাড়ি যাইতাম।

অচাই : চুপ কর। হেরারে না বাঁচাইলে আমরা বাঁচুম কেমনে? যা, আগামী অমাবস্যায় হক্কলে একটা কইরা লাঙ্গির কলস, ধান পাঁচ পুরা, ডাইল চাইর ছটাক, তিষির তেল, মাইট্টা তেল এক চোঙা কইরা। লবণ একপুটলা আর—

সবাই : বাবা, এইখানে খ্যান্ত দেও

অচাই : দাঁড়া — লারিমা বুড়ির পরণের লাইগ্যা তিনখান রিগনাই রিসা, খাইট্টা ধুতি, গামছা একখান কইরা।

গ্রা:বা:৪ : দিমু বাবা দিমু — বাবা খাইট্টা ধুতি কার লাইগ্যা?

অচাই : ঐটা তোর বাপের লাইগ্যা — যা অখন যা ।

সবাই : হ বাবা, দিমু সব দিমু। বাঁচন তো লাগব । [প্রস্থান]

অচাই : ইটি এক্কেবারে বুরবুক।

অচাই বৌ: বুদ্ধি থাকলে লারিমা বুড়ির কাহিনী নিয়া তারারে বেকুব বানাইতে পারতা না।

অচাই : আগামী ছয় মাসের ভরণ পোষণের তো ব্যবস্থা করন লাগবো।

বৌ : আর না — এইবার বাড়ি চল— মাইয়া দুইটারে বাঘে খাইছে না, সাপে কাটছে কেটায় জানে।

অচাই : হুর, ইতানের মাথায় গোবর। সংসারে ভালা মন্দ কুস্তা বোঝে না মর গিয়া।

স্থাপক : এই যে অচাই ঠাকুর —এই লারিমা বুড়ির গল্পটা এইখানে ঢুকল কেমনে? গোমতী নদীর জন্মের মধ্যে এইটা আইল কেমনে?

অচাই : আমি কিচ্ছু জানি না কর্তা। সবই তাইনের [সূত্রধারকে দেখিয়ে] কারসাজি—

স্থাপক : আরে সূত্রধার — এক লোককথার মইধ্যে আরেক লোককথা টুকলি মাইরা দিলেন?

সুত্রধার : তাতে ক্ষতি কিছু হইল?

স্থাপক : আরে এইডাতো হইয়া গেছে আমরার দিল্লী আগরতলা রেলের মতো— একটার

পর একটা ট্রেইনরে পাস দিয়া নিজে জায়গায় পৌঁছাইতে কারবার সারা।

সূত্রধার : বৃক্ষের যদি না থাকে শাখা প্রশাখা তবে তার সৌন্দর্য দীর্ঘ দণ্ড যথা।
লারিমাবুড়ি : ও দাদা, গরমে শরীল ভিজ্জা একসা —

স্থাপক : তোমার পার্ট তো শেষ। পোষাক পইড়া বইয়া আছ কেন? কিসের আশায়? সূত্রধাররে তেল মাইরা একবার এন্ট্রি লইছ। আর না। যাও, তোমার পার্ট শেষ, এক্ষুনি ভেতরে যাও— [অজগরের প্রস্থান]

সূত্রধার : ঐ দিকে যখন অচাই আর তার বৌ গেরামে গেরামে পূজা আচরা কইরা ঘুইরা বেড়ায়, তখন আরেক গেরামে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় তাদের দুই মাইয়া। [প্রস্থান] [এক বৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে প্রবেশ করে]

বৃদ্ধা : বরক না, এইতারে বরক কয় না, ইতা হইল ওয়াক্ ছা— শূয়র বাইচ্চা। ধর্মে কর্মে এমন মতি হইলে, সংসার করছস কেরে? ছাওয়াল বাইচ্চা পয়দা করছস কেরে? গেলি তো গেলি মাগীটারেও সঙ্গে লইয়া গেলি। মাগী ছাড়া ধর্ম হয় না? হাতের কাছে পাইলে, এই লাঠি দিয়া তার মাথা ফাটাইতাম— ঐ রাইমা, রাই-মা, ঐ সাইমা— সাই- মা—, ওই রাইমা সাইমা— (রাইমা সাইমা আসে, রাইমা ধীর স্থির, কিন্তু সাইমা চঞ্চল)।

সাইমা : হো— হো— হো— হি— হি—হি— কোজা বুড়ি সোজা হও, ডাকে তোমার নাত বৌ।
হি— হি—হি— নাত বউয়ের ছাওয়াল হইব, তোমার চিতায় আগুন দিব।

বৃদ্ধা : মর— মর— মর— হক্কলটি মর। আহা — হা— হা— হা, কত সাধ— আমার চিতায় আগুন দিত। তার আগে তরা মর— মর— হক্কলটি মর।

রাইমা : ঐ তুই সর। সর এইখান থাইক্যা। নানীরে বইতে দে।

সাইমা : বুড়ির লাঠি ব্যাকা ত্যাড়া, খালি লাগায় ছেড়া ব্যাড়া।।

বৃদ্ধা : যা— যা— ভাগ—

অন্যরা : ও বুড়ি তোর জামাই কই, গেছে বুঝি চড়তে মই?

বৃদ্ধা : মর — মর — ভাগ — যা— ভাগ — এইখান থেইক্যা, ভাগ।

রাইমা : সাইমা থাম। নানীরে খ্যাপাইছনা।

সাইমা : এ্যাই বুড়িরে খ্যাপামু না তো কারে খ্যাপামু? ঐ বুড়ি — কাঠালের আঠার মতো যে তোমার গায়ে লাইগা থাকতে ইচ্ছা করে।
[বুড়ির গলা ধরে সাইমা জুড়ে যায়]

বৃদ্ধা : আ- আ— আ — রে — ছাড়— ছাড় — ছাড় গায় ধরলে আমর যে কুতকুতানি লাগে, ছাড় —

সাইমা : ছাড়ুম, আগে কও — আইজগাও একটা কেরেঙ কথমা শুনাইবা — কও—

রাইমা : হ — নানী আইজগা আরেকটা গল্প শোনাও না—

বৃদ্ধা : শোনামু রে শোনামু। আগে ক, তোরা দুইটায় কাইলকা রাইতে কি খাইছস?

রাইমা : দুইটা মাইট্টা আলু আছিল — দুই বইনে খাইছি।

সাইমা : হের পরে, পেট ভইরা জল খাইয়া ঘুমাই রইছি। ব্যাস্ । চোখ যখন খুললাম দেখি টীলার মাথায় রৌদ্র কেমন ঝিলিক মারছে। হি হি ।

বৃদ্ধা : শোন, মাইয়ারা। এইভাবে না খাইয়া থাকলে তোরা মইরা যাইবি। তোরার বাপে মায়ে ফিরাও তাকাইতো না।

রাইমা : বাপ মায়ের কি দোষ, দোষ তো আমরার কপালের।

বৃদ্ধা : কপালের দোষ হইলে পইরা মর। মইরা শেষ হইয়া যা। শোন, একটা কথা কই— তোরা টীলা লইয়া জুম শুরু কর।

সাইমা : হ আমরা জুম করমু। নানী, পাহাড় পুইড়া জুমের ফসল ফলামু — ধান, তিষি, শশা, লাউ, কুমড়া।

রাইমা : কছ কি বইন? কুনু পুরুষ ছাড়া আমরা কেমনে জুমে জামু? কেমনে ফসল ফলামু?

বৃদ্ধা : আরে ঘরে বইয়া থাকলে পুরুষ জুটবো কেমনে? জুমের টীলায় পা রাইখ্যা দেখ, এমন রাজকুমারীর লাইগ্যা লেবাং পোকার মতো কেমনে ছুইট্টা আইয়ে পুরুষ।

রাইমা : ইস্— তোমার মুখে কুস্তা আটকায় না।

বৃদ্ধা : তর বড় বইনের লাজ হইছে [দৌড়ে চলে যায়] বাতাস লাগছে শরীলে। সিকলা হইছে। দেখ, পুরুষের কথা কইতেই মুখটা কেমন লাল হইয়া উঠল।

সাইমা : রাখ তোমার কথা। আমরা কাইলকা ভোরে গিয়াই টীলায় আগুন ধরামু।

সূত্রধার : রাইমা সাইমা একটা টীলা জ্বালাইয়া জুম চাষ শুরু করল। কয়দিন যাইতে না যাইতেই নানীর কথা সত্য হইল— ফসলের গন্ধ পাইয়া লেবাং পোকা ঠিক আইয়া পড়ল।

দৃশ্যান্তর

[হাসতে হাসতে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে ঢোকে, এর মধ্যে রাইমা সাইমাও আছে। প্রত্যেকের পিঠে লাঙ্গা। হাতে টাক্কাল। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি।]

ছেলে-১ : ঐ মাইয়ারা — এইটা কেমুন কথা কও? এই যে আমরার দাঙ্গু - দাঙ্গুক্রুই, হে মাইলুমারে বিয়া করনের লাইগ্যা দুই বছর ধইরা জামাই খাটতাছে, কিন্তু মাইলুমা এতদিনে একবারও ভুলে তার দিকে চাইয়া হাসি দিছে না। (সবাই হাসে) ঐ তোমরা জবাব দেও— দুই বছরে একটা হাসিও বুজি দেঅন যায় না।

মাইলুমা : হাসি অত সস্তা না। যেমনে তেমনে যারে তারে বিলান যায় না।

সাইমা : মাইলুমা কিয়ের দেবী জান নি? ধান চালের দেবী। ঘরে ধান চাল বোঝাই কইরা আনতে পারলেই হাসি মিলব—

ছেলে-২ : আরে বাবা, নতুন সিকলাও মুখ খুলছে। এক্কেবারে শালিকের মত — কিচির মিচির কইরা উঠছে— [সবাই হাসি] এমুন শালিক পাইলে আমি দানা শস্য হইতে রাজি [সবাই হাসি]

সাইমা : উঃ কত সখ —

মাইলুমা : তোমরার যে বন্ধু— তার সম্পর্কে আমি দুইখান কথা কই। আমার দিকে ফিরা তাকাইবার তার সময় কই? আমার বাপ মায়েরে খুশি করতেই তার সময় শেষ। আমারে এই দিকে দেখলে— ওই দিকে পালায়। [সবাই হাসি]

দাঙ্গু : পালাইতামনা কেরে? শাশুড়ি মায় প্রথম দিনেই কইয়া দিছে মন লাগাইয়া কাম কাজ করবা। আমরারে কাম কাজে সন্তুষ্ট করতে পারলেই আমার মাইয়ার লগে বিয়ার কথা চালু করন যাইব। কিন্তু, সাবধান আমার মাইয়ার দিকে যদি ভুলেও চাইছ, তাইলে লগে লগে বিদায়। [সবাই হাসি]

মাইলুমা : বুদ্ধি থাকলে হক্কলের চোখ এড়াইয়াও সামনে আওন যায়-—। এক ফোঁটা সাহস নাই—

ছেলে-১ : কিতা কইলা— সাহস নাই। শুনছো— কয় আমরার দাঙ্গুর বুলে সাহস নাই।

মেয়েরা : নাই, ঠিকই কইসে — সাহস নাই ই।

ছেলে-২ : এমুন কথা সহ্য করন যায় না। দাঙ্গু তুমি বইয়া থাইক্য না, একটা কিছু কর।

দাঙ্গু : আমার কিন্তু খুউব ইতান উঠতাছে

ছেলেরা : কি উঠতাছে?

দাঙ্গু : রাগ। লাঙ্কা রাগ উঠতাছে শরীলে।

ছেলে-১ : আরে রাগ না, রাগ না। উঠতে দিও না। রাগে কাম হইত না— সাহস। সাহস চাই। অখনই তুমি উইঠ্যা গিয়া মাইলুমার হাত ধর। তার চোখে চোখ রাইখ্যা কও অঙনন্ হামজাগ।

দাঙ্গু : এ্যাঁ?

সকলে : এ্যাঁ না হ্যাঁ। যাও উঠ দেখি — আগাইয়া যাও, দেখাইয়া দাও সিকলার দলরে তোমার সাহস।

দাঙ্গু : [ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়, বড় বড় শ্বাস নেয়। এক পা এক পা এগিয়ে যায় মাইলুমার দিকে] জয় বাবা গড়িয়া—

সাইমা : [হাসতে হাসতে] দ্যাখ, মনে হয় যেমুন জুমের ক্ষেতে শিয়াল ঢুকছে। [সবাই হাসে]

মাইলুমা : না - না। মনে হইতাছে গর্তের মধ্যে কাঁকড়া হাটতাছে। [মেয়েরা হাসে]

ছেলেরা : বুকে বল আন, শক্ত হও — আগাইয়া যাও

রাইমা : এইবার মনে হইতাছে, কলা বাগানে বান্দর ঢুকছে— [সবাই হাসি। দাঙ্গু-মাইলুমার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়]

ছেলেরা : হাতে ধর - ধর হাতে—ধইরা ফালা। ধর—
[দাঙ্গু একটু দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত তার জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ে]

ছেলেরা : কিতা হইল?

দাঙ্গু : ভয় করে। [মেয়েরা হাসতে থাকে। মেয়েরা গান ধরে]

মেয়েরা : (গান) ও ছেলেরা ছেলেরা, বলতো দেখি
তোমরা কেন মোদের সামনে ভয়ে এত কাবু
ছেলেরা : ও মেয়েরা ও মেয়েরা, বল তো দেখি
কোন যাদুতে এমুন ভয়ে কর মোদের কাবু?
মেয়েরা : জঙ্গলেতে বাঘ ভাল্লুক আর জন্তু জানোয়ার
রক্ষা করবে সবার থেকে কর অঙ্গীকার।
নারীর তরে ভয় যদি পাও
কেমনে হবে তবে?
পুরুষ নামের কলঙ্ক
তোমরা করবে সবে।।
ছেলেরা : জঙ্গলেতে বাঘ ভাল্লুক ডরাই নাকো তারে
ডরাই নারীর চোখের তারায়
যখন আগুন জ্বলে।
রৌদ্র বৃষ্টি গায়ে মাখি
ডরাই না শত্রুরে
নারীর কাছে গেলেই শুধু
পা দুটি যে কাঁপে।।

[হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক। আনন্দে বাধা পড়ে।]

রাইমা : চাইয়া দেখ— পূব আকাশে কালা কইরা মেঘের পাহাড় জমছে।

ছেলেরা : ঐ তো ঝড় আইতাছে। পালাও — পালাও সব— যে যার গাইরিঙে গিয়া ওঠ।

মাইলুমা : ও মাগো— কেমন রাক্ষসের মতো ছুইট্টা আইতাছে ঝড়—

[মাইলুমা দৌড়ে গিয়ে দাঙ্গুর সামনে দাঁড়ায়। গপ করে তার হাত ধরে, তারপর ছুটে পালায়। অন্যরা মাথার কাপড় ধুলে ঝড়ের আবহ তৈরী করে। সবাই চলে যায়। শুধু পড়ে থাকে দুই বোন, রাইমা আর সাইমা।]

সাইমা : গড়িয়ারে ডাক, জঙ্গলের দেবতারে ডাক।

সাইমা : হে জঙ্গলের দেবতা। আমরা দুই বোনেরে রক্ষা কর। তুমি এমন কাউরে পাঠাও বাবা— যেন আমরারে এই মহা দুর্যোগে একটা গাইরিঙ বানাইয়া দেয়— দ্যাখ বাবা, সবার গাইরিঙ আছে। কেবল আমরার গাইরিঙ নাই। বাবা। বাঁচাও আমরারে। আমি কথা দিতেছি দেবতা, কেউ যদি আমাদের একটা গাইরিঙ বানাইয়া দেয়, তাহলে, তাইলে আমি তারে বিয়া করমু— হ্যাঁ, বাবা— আমি তারে বিয়া করুম।

রাইমা : বাঁচাও জঙ্গলের দেবতা— আমরারে বাঁচাও। একটা টংঘর বানাইয়া দেও।

[বাদ্য বাজনা বাজতে থাকে। সঙ্গে ঝড়ের আওয়াজ। সব ভেদ করে একটা

হিস্ হিস্ শব্দ। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই একটি অজগর সাপ মঞ্চে প্রবেশ করে, দুই বোন ভয়ে চিৎকার করে ওঠে]

দুই বোন : ও মাইও— সাপ— অজগর সাপ

সাইমা : অ বাই— পলাও পলাও। নয়তো অজগরে গিল্লা ফালাইব।

রাইমা : হ চল। চল বইন। [ওরা দৌড়ে বেরিয়ে যায়। অজগর এপাশ থেকে ও পাশে যায়। এক কোনে স্থির হয়। আলো নেভে]

[ঝড় থেমে গেছে। সব শান্ত। মঞ্চের এক কোনে একটি সুন্দর টংঘর। গোধূলির আলো এসে পড়ছে এর উপর। রাইমা সাইমা পা টিপে টিপে ঢোকে। সাপের ভয়ে এখনও সন্ত্রস্ত তারা]

রাইমা : নাই, নাই। চইল্লা গেছে। আয় সাবধানে আয়।

সাইমা : বাই - আমার ডর লাগে। যদি কুনু দিকে লুকাইয়া থাকে—

রাইমা : আরে— ঐ গাইরিঙ কই থাইক্যা আইল! ওমাইঅ দেখ, কি সুন্দর গাইরিঙ—

সাইমা : কেটা বানাইল এইটা? কি আচানক— ও বাই , কুন সময় বানাইল ইটা?

রাইমা : সাইমা এই জঙ্গলে কেউ আছে? এমুন সুন্দর কারিগর

সাইমা : মনে হয় কুনু দেবতার কারবার। বাই, তুমি না জঙ্গলের দেবতারে ডাইক্যা কইছিলা, দেবতা তোমার ডাক শুনছে।

রাইমা : বইন, আমরার বাইর করতে হইবো — কেটায় এমুন চোখ জুড়াইন্যা গাইরিঙ বানাইছে।

সাইমা : যে খুশি বানাক, আমরা গাইরিঙ পাইছি, ব্যস্। রৌদ্র ঝড়ে আমরার আর চিন্তা নাই।

রাইমা : কি কস্? যে বানাইল এমুন সুন্দর গাইরিঙ, সে জানি দেখতে কত না সুন্দর হইব।

সাইমা : বাই, তুমি কিন্তু তারে বিয়া করবা কইছ।

রাইমা : হ। করুম তো। আমি তারেই বিয়া করমু। ডাক না বইন- তারে একবার ডাক না-

সাইমা : ঐ শুনছ নি— কেটা এই গাইরিঙ বানাইছ? তাড়াতাড়ি আইঅ ।

[দুজনে এদিক ওদিক খোঁজে]

রাইমা : কইরে বইন- কেউ দেখি আইয়ে না। ভালো কইরা আরেকবার ডাক না-শুনছনি

সাইমা : কেডায় এই গাইরিঙ বানাইয়া দিছ— আইও তোমার বকশিস্ লইয়া যাও। শুনছো— শুনতাছ— [আবার হিস্ হিস্ শব্দ, দুই বোন সন্ত্রস্ত, তারা দেখে পাহাড় থেকে নেমে আসছে সেই অজগর] বাই—

রাইমা : দাঁড়া, দাঁড়াইয়া থাক। পলাইছ্ না। এ্যাই, কেটা তুমি? তুমি আইছ কেরে?

সাইমা : আমি তো ডাকছি তারে যে আমরার গাইরিঙ বানাইয়া দিছে। যাও তুমি ফিরে যাও।

রাইমা : আরে, তুমি কথা শুন না? তুমি বইয়া রইছ কেরে? যাও — বিদায় হও।

অজগর : এই গাইরিঙ আমিই বানাইছি।
রাইমা : ওমা কয় কিতা? তুমি বানাইছ? তুমি কিতা কইরা বানাইবা, মিথ্যুক।
অজগর : ভাইঙ্গা আবার বানাইয়া দেখামু?
সাইমা : না— না— ভাঙনের কাম নাই।
রাইমা : ঠিক আছে— হামবাই। এইবার তুমি আস।
সাইমা : হ— হ— এইবার আস। আমরাও বাড়ি যামু।
অজগর : বড় জন— তুমি কিন্তু কথার খেলাপ করতাছ।
রাইমা : কি — কি— কথা?
সাইমা : বাই— তুমি যে বিয়া করবা কইছ— হেই কথা কয়। এখন কিতা হইব?
রাইমা : আমি— আমি কিতা কইছি?
অজগর : তুমি ভাল কইরাই জান, তুমি কি কইছ—
রাইমা : আমি— আমি কইছি, যে গাইরিঙ বানাইয়া দিব— আমি আমি- আমি তারে বিয়া করমু—
অজগর : তাইলে?
রাইমা : তাইলে কিতা?
অজগর : তাহলে কিতা হয় দেখ।
সাইমা : কিতা হয়। আজগররে - একটা জন্তুরে বিয়া করবো আমার বাই? এইটা কুনুদিন হইত না। যাও তুমি এইখান থাইক্যা যাও।
অজগর : ঠিক আছে । আমি তাহলে যাই।
রাইমা : এ্যাঁ, তুমি যাইবা গিয়া?
অজগর : তোমার বইন যে যাইতে কইল।
রাইমা : না - না - তুমি - তুমি যাইও না—
সাইমা : তুমি কিতা কইতাছ বাই? এরে যাইতে দাও— মতলববাজ সাপ—
অজগর : এ্যাই, গালাগাল একদম না। মাথায় বিষ তুইল্ল না। বিপদ হইব তাইলে।
রাইমা : সাইমা তুই চুপ কর। আমি রাজি।
সাইমা : কিতা রাজি?
রাইমা : জঙ্গলের দেবতারে সাক্ষী রাইখ্যা আমি কথা দিছি। আমি এই কথার খেলাপ করতে পারতাম না।
অজগর : তুমি আমারে বিয়া করবা?
রাইমা : হ । সাইমা, জঙ্গলের লতা পাতা ফুল দিয়া দুইটা মালা বানাইয়া লইয়া আন
সাইমা : তুমি কি পাগল হইছ?
রাইমা : উপজাতি মাইয়ারা কথার খেলাপ করে না।
সাইমা : আমি কিছু জানি না। তোমার যা খুশি কর । [প্রস্থান]

অজগর : আমার কিন্তু কুনু ঘর বাড়ি নাই। এই জঙ্গলেই আমার বাস।
রাইমা : সাপের আবার বাড়ি ঘর থাকে নাকি? রোদ বৃষ্টিতে এইখানেই আশ্রয় নিবা। এই গাইরিঙে— [সাইমা মালা নিয়ে আসে]
সাইমা : এই যে মালা । লও ধর—
রাইমা : একখানা তারে দে।
সাইমা : আমি পারতাম না। আমার ভয় করে, তুমি লও। [মুখ ঘুরিয়ে থাকে]
অজগর : ভয় কিসের। তুমি তো আমার শালী। [সাইমা দৌড়ে বেরিয়ে যায়]
রাইমা : লও। এইবার মালা বদল করতে হইব। লও— তোমার মালা ধর। ওমা তুমি কেমনে মালা বদল করবা। তোমার ত হাতও নাই,
[সাপ একটি আলোর বৃত্তে উঠে দাঁড়ায়। বাদ্য বাজতে থাকে। সাপের পোষাক ছুড়ে ফেলে। এক সুদর্শন যুবক মালা নিয়ে এগিয়ে এসে রাইমার হাত ধরে। রাইমা অবাক। উপজাতি সঙ্গীতের তালে ওরা মালা বদল করে]
স্থাপক ও সূত্রধার : মিলন হইল গো
নয়নে নয়ন মিলন হইল।
প্রেমের জোয়ারে ভাসিল পরাণ
মানিল না কোন বাধা।
আকাশে বাতাসে কি যে ধ্বনি বাজে
শুন সবে মন দিয়া।
তোরা জয় দে জয় দে
সমবেত : জয় দে, জয় দে
দুটি প্রাণের যুগল মিলন জয় দে জয় দে
সমবেত : জয় হোক, জয় হোক। জয় হোক
জয় হোক [সকলের প্রস্থান]

দৃশ্যান্তর

[একটা বাঁশের মাচানের উপর আসন। এতে চেপে বসে অভিনেতা। বাকিরা কাঁধে করে একে নিয়ে মঞ্চে ঢোকে । সামনে দু'জন একটি বাঁশে মৃত হরিণ ঝুলিয়ে নিয়ে তালে তালে ঢোকে]
বাহকরা : চোধরী বাড়ি- হেইও
অনেক দূর - হেইও
জোরে ছোটো - হেইও
তালে তালে - হেইও ।
হরিণ মারছি - হেইও

ভেট দিমু - হেইও
চোধরী খুশী - হেইও
বহাল সর্দার - হেইও

সর্দার : এই খারা।— থাম। থাম তো দেখি। ঐ তোরা আগাইয়া যা [হরিণ বাহকরা চলে যায় । সর্দার নামে মাটিতে]
আরে জঙ্গলে টীলার উপরে এমুন সুন্দর
গাইরিঙ কেটায় বানাইল! ঐ কেটায় বানাইছে? ও মাইও

বাহকরা : আমরা জানি না সর্দার।

সর্দার : তোরার ময়ালে এমুন সুন্দর গাইরিঙ, তোরা তার খবর জানছ না?

বাহকরা : এই ময়ালে আমরা আই না, এইটা তো অন্য গোষ্ঠীর ময়াল।

সর্দার : জুমের ক্ষেতে যারা কাজ করে, তারারে ডাক—

বাহক-১ : হুই— কেটা কোন খানে আছ— তাড়াতাড়ি ছুইট্টা আইও— সর্দার আইছে—
হুই— কেটা কোনখানে আছ—তাড়াতাড়ি ছুইট্টা আইও— সর্দার আইছে হুই–

সর্দার : কোন্ মানুযে এমুন গাইরিঙ বানাইতে পারবে— হুঁ হুঁ— কি কও তোমরা?

বাহকরা : না— না সর্দার পারতো না।

সর্দার : এ্যাঁ—

বাহকরা : পারবো পারবো মনে লয়।

সর্দার : পারবো?

বাহকরা : এ্যাঁ, পারলে পারতে পারেও, আবার নাও পারতে পারে—

সর্দার : ধ্যুর- গর্দভের দল। ফাইদি— ফাইদি, ইয়াং ফাইদি
[তিনজন জুমিয়া কৃষকের প্রবেশ]

জুমিয়ারা : সর্দার — খুলুম খা।

সর্দার : খুলুমখা। এই টীলায় কেটায় জুম করে?

জুমিয়া : আইগ্গা সর্দার, রাইমা সাইমা

সর্দার : সিকলা?

জুমিয়া২ : হ, সর্দার।

সর্দার : বাপের নাম কি?

জুমিয়া৩ : আইজ্ঞা নগ্রাই, অচাই

সর্দার : অচাই কি জুম ক্ষেতে আইয়ে?

জুমিয়া১ : না হুজুর।

সর্দার : তইলে এই গাইরিঙ বানাইল কেটায়?

জুমিয়ারা : ও মাইও। এমন সুন্দর গাইরিঙ, কই থাইক্যা আইল এইখানে - ওমা।

জুমিয়া২ : কাইলকাও তো এইখানে কুস্তা আছিল না।

সর্দার : কছ কিথা? এক রাইতেই এত সুন্দর গাইরিঙ?

হুঁ হুঁ— এ্যাই তোরা কি কছ?

বাহকরা : সর্দার, বানাইলে বানাইতে পারে, আবার নাও বানাইতে পারে।

সর্দার : ইস্, ইটির লাঙ্গির নেশা অখনও কাটছে না। ঐ শোন, [জুমিয়াদের] তোমরারে জিগাই, এ্যাই সিকলা দুইটায় নি বানাইল?

বাহকরা : [জুমিয়াদের] এ্যাই সিকলা দুইটায়নি বানাইল?

জুমিয়ারা : বানাইলে বানাইতে পারেও - আবার নাও বানাইতে পারে।

বাহকরা : অ্যাই ধইরা ফালাইছি। সর্দার। এইটিও লাঙ্গি টানছে।

সর্দার : এ্যাই চুপ। চুপ কর। এমুন কারিগর আমরার ময়ালে আছে। আর যদি দুই বইনে বানাইয়া থাকে! তাইলে—

জুমিয়া১ : তাইলে কিতা হইব সর্দার

সর্দার : আমি তারারে পুরস্কার দিমু—

জুমিয়া ১ : কিতা পুরস্কার সর্দার?

সর্দার : আমার দুই পোলার সঙ্গে তারার বিয়া দিমু।

জুমিয়া ২ : আরে বাপরে বাপ। এমুন বড় পুরস্কার। পুলার বৌ— ঐ শুনছনি? রাইমা সাইমারে সর্দার তার পুলার বৌ করব।

জুমিয়া১ : হেরা বড় দুখী। এইবার বুঝি হেরার কপাল ফিরব।

সর্দার : [জুমিয়াদের] শোন, তরা। নগ্রাই অচাইরে খবর দাও। আমার সঙ্গে দেখা করত। এ্যাই চল। [মাচাং-এ বসতে বসতে]

বাহক ১ : সর্দার, এইটা কেমুন কথা হইল, জঙ্গলে আইছ জানোয়ার শিকার করতে, আইয়ানি পুলার বৌ শিকার করলা? [সবাই হাসি, আলো নেভে]

সূত্রধার : একদিকে সাইমা রাইমা দিনের পর দিন মাসের পর মাস জুমে কাজ করে চলে। প্রতিদিন দুপুরে তারা যে খাবার নিয়ে আসে— তা তারা তিনজনে ভাগ কইরা খায়। আর এতে মাইয়া দুইটার শরীর শুকাইয়া একেবারে পাটকাঠি।

রাইমা : বইন, একবার তোর কুমুইরে ডাকছ না।

সাইমা : কি কও তুমি?

রাইমা : হ, একবার তারে ডাক না বইন, আমি তারে একবার দেখতাম।

সাইমা : আরে অজগর সাপ— গিইল্লা ফালাইব

রাইমা : গিইল্লা ফালাক, যা খুশি করুক, হে তো আমার স্বামী।

সাইমা : বাই, তোমার কিতা হইল?

সাইমা : কুমুই, ও কুমুই— কু- মু -ই— ও জামাই বাবু—
কু- মু - ই— [গান ধরে]
কুমুই কুমুই মাইচানা ফাইদি বা (২)
[ধীরে ধীরে অজগরকে দেখা যায় টং ঘরের মধ্যে]

রাইমা : ঐ তো— ঐ তো হে আসার আওয়াজ। [দৌড়ে টং ঘরের কাছে যায়। হাঁফাতে থাকে]

সাইমা : আমার ভয় করে। আমি এইখানে থাকতে পারতাম না। [দৌড়ে বেরিয়ে যায়]
[রাইমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে অজগর রূপী সুদর্শন যুবক। এখন সে মানবরূপী। হাতে নিয়ে আসে ফুলের মালা]

রাইমা : ওমা তুমি এইখানে। আমি তো তোমারে খুঁজতাছি। বা বা কী সুন্দর সাইজ্জা আইছো তুমি।

অজগর : এইবার আমিও তোমারে মনের মত কইরা সাজামু।

রাইমা : আইচ্ছা, আমি তোমারে কি নামে ডাকুম?

অজগর : কি নামে ডাকবা? তোমার যে নামে ভাল লাগে সেই নামেই ডাক।

রাইমা : তাহলে তাহলে আমি তোমায় ডাকুম— দঙ্গই।

অজগর : দঙ্গই, মানে প্রিয়তম—

রাইমা : সাইমা তোমারে ভয় পায়।

অজগর : তুমি ভয় পাওনা (রাইমা মাথা নাড়ে) সর্পরাজ অজগরকে তুমি ভয় পাও না?

রাইমা : না। কারণ আমি জানি, এইটা তোমার ছদ্মবেশ।

অজগর : ভুল জান তুমি। আমি সর্পরাজা, এই জঙ্গলের প্রতিটি লতাপাতা জন্তু জানোয়ার তারা আমার শক্তির প্রমাণ পাইছে অনেকবার।

রাইমা : কিন্তু তোমার ভেতরের পুরুষ; যে তোমারে অমন বলবান আর তেজী কইরা তুলছে, তারে আমি দেখছি।

অজগর : কি সব আজে বাজে, কাল্পনিক কথা কও তুমি।

রাইমা : হোক কল্পনা, তবু তারে আমি সত্য মানি।

অজগর : নিজের উপর অমন বিশ্বাস তোমার?

রাইমা : একটাই বিশ্বাস, তুমি যেই হও, তুমি আমার স্বামী।

অজগর : তুমি জান, জঙ্গলের ভিতরে যখন আমি ছুটি, দুই দিকের সবুজ পাতারা ভয়ে নীল হইয়া যায়। আমার হিস্ হিস্ শব্দে, জন্তু জানোয়ার সব শ্বাস বন্ধ কইরা খাড়া হইয়া থাকে। আমার চোখের ঝিলিকে আকাশের বজ্র ভয় পায়। একমাত্র তুমিই আমারে ভয় পাও না।

রাইমা : ভয় দেখানোর মধ্যে কোন বাহাদুরি নাই। ভয় জয় করতে পারলেই বাহাদুরি, আমি ভয় জয় করছি।

অজগর : ভয় দেখানের ভঙ্গি আমি জানি। কিন্তু ভয় জয়ের মন্ত্র আমি জানি না। তুমি আমারে সে মন্ত্র শিখাও।
[আলো পরিবর্তন। রাইমা হাত ধরে আজগর রূপী সুদর্শন যুবককে মঞ্চের এক কোনে আলোর বৃত্তে নিয়ে যায়। সঙ্গে প্রবেশ করে একই পোষাকে আরো দু দু'টি ছেলে মেয়ে]

ছেলে ১ : কি দেখ তুমি অমন পলকহীন চোখে?
মেয়ে ১ : তোমার রূপ। আমার দু'চোখে যে ধরে না তোমার এত রূপ।
মেয়ে ২ : তুমি কি দেবতা, নাকি মানুষ, না অন্য কিছু?
ছেলে ২ : তুমি যেভাবে আমারে দেখবা, তোমার জন্যে আমি তাই।
মেয়ে ১ : তাইলে কিসের লাইগ্যা তোমার ছদ্মবেশের আড়ালে এই ছলনা?
ছেলে ১ : সে অনেক কথা। আইজ থাক। রাইমা— নারী যদি এত সুন্দর; তবে এই সুন্দরের জন্য আমি বার বার মরতে রাজি। [রাইমা যুবকের মুখে আঙ্গুল ঠেকায়]
রাইমা : এ কেমন কথা কও? মরণের কথা কও কেরে তুমি? [যুবক তার ঠোঁটের উপর রাখা রাইমার আঙ্গুল হাতে নেয়]
যুবক : তোমার আঙ্গুলের এই ছোঁয়া আমার মনের ভেতরে যেন এক সঙ্গে শত শত চমপ্রেং বাজাইয়া দিল। স্বর্গ বুঝি নাইম্যা আসে মাটিতে।
[মঞ্চের তিনটি জায়গায় ছেলে মেয়েদের কম্পোজিশান]
অজগর : তোমার খোপায় এইটা কি ফুল?
রাইমা : ওমা— এইটা চিন না। এইটা তো খুম্পুই।
অজগর : আমি যদি তোমার আগে মরি, আমারে যেখানে মাটি চাপা দিব, তার উপরে দেখবা ফুটব এই খুম্পুই।
রাইমা : না— না— এইটা কুনু সময় হইত না। কুনু সময় হইত না। [আলো নেভে]

দৃশ্যান্তর

[সর্দারের প্যায়াদা অচাইকে টানতে টানতে নিয়ে আসে]
প্যায়াদা : সর্দার— লইয়া আইছি সর্দার। অচাইরে লইয়া আইছি।
সর্দার : [এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল] খুলুম খা অচাই ঠাকুর। অই অচাইরে বইতে দে।
সর্দার : লও হুক্কা খাও— পান লও
অচাই : তুই — তুই নুংনানি।
সর্দার : অই অচাইরে জল দেও— [একজন চোঙায় জল দেয়] হে - হে - জুমের ফসল কেমন হইছে?
অচাই : জুম - ফসল - সর্দার আমি কুস্তা জানি না।
সর্দার : মাইয়া দুইটায় সব করে। ভাল, খুব ভাল। জুমের টীলায় গাইরিঙ কেটায় বানাইছে?
অচাই : আমি বানাইচি না সর্দার, ইতা আমি দেখছিও না।
সর্দার : তাইলে মাইয়া দুইটায় বানাইছে
অচাই : যেই বানাক সর্দার, তুমি হুকুম দাও— আমি অখনই ভাইঙ্গা দিমু।
সর্দার : ঐ গাইরিঙ যে ভাঙব, তার মাথা আমি চৌচির করমু—
অচাই : তাইলে ভাঙতাম না। কাউরে ভাঙতে দিতাম না। কেটায় ভাঙে আমি দেইখ্যা লমু তারে —

সর্দার : শোন, অচাই। মাথা ঠাণ্ডা কইরা শোন, অমন গুণী তোমার দুই মাইয়ার সঙ্গে আমি আমার দুই পুলার বিয়া দিমু—

অচাই : জল খামু— তুই— তুই— [জল খায়] আবার কও সর্দার— কিতা কইছ

সর্দার : তোমার দুই মাইয়ার সঙ্গে আমার দুই পুলার বিয়া দিতাম। জমি,শূয়র, মোরগ যা চাও সব পাইবা— তুমি খালি রাজি হও।

অচাই : কিতা কও সর্দার? সর্দার তার পুলার বৌ বানাইব আমার দুই মাইয়ারে— আর আমি অমত হমু। অতনি বুরবক আমি। লও— আমি রাজি। ভাদ্র মাস পার হইলেই বিয়ার দিন ক্ষণ স্থির হইব।

সর্দার : ঐ তোরা আগে লাঙ্গি ভিজা। অচাই রাজি হইচে। আগে লাঙ্গি খাউ সক্কলে। শূয়র মার একটা। অচাইরে পেট ভইরা খাওয়াইয়া দাও। অচাই রাজি হইছে রে। [সবাই হৈ হৈ করে উঠে]

সবাই : অচাই রাজি হইছে রে। [বলতে বলতে বেরিয়ে যায়]

[আলো নেভে]

দৃশ্যান্তর

[বাদুরাই ঢোকে। খুব মন খারাপ। মুখে বিড় বিড় করতে থাকে]

বাদুরাই : এইটা কেমন কথা হইল, সর্দারের পুলা তারে বিয়া করব! কিতা হইছে? না— সুন্দর গাইরিঙ বানাইছে— কিন্তু তারে যে আমার ভালা লাগে - আমি কেমনে থাকুম। [অন্যরা ঢোকে। সবাই কাজ থেকে ফিরছে। কাঁধে বাঁশ]

দেবেন্দ্র : হই— তুই এখানে একলা একলা বইয়া কার সঙ্গে কথা কস্?

দাঙ্গু : সাইমার বিয়া হইব সর্দারের পুলার সঙ্গে - ইতার লাইগ্যা তার মন খারাপ—

বাদুরাই : দাঙ্গু - আন্দাজে কথা কইস্ না - মাথা ফাটাই লামু—

দাঙ্গু : এমা আমি কিতা কইলাম। আমার উপরে রাগ কেরে। রাগ গিয়া সর্দারের উপরে দেখাও—

মাইলুমা : থাম তোমরা। আসল কথায় না গিয়া, তোমরা খালি ঝগড়া কর।

দেবেন্দ্র : আসল কথা কিতা?

মাইলুমা : এই গাইরিঙ নিশ্চয় কুনু বুড়াছায় বানাইছে।

বাদুরাই : বুড়াছা— অপদেবতা! তোমারে কেটায় কইছে?

দাঙ্গু : ওমা টীলায় টীলায় ছড়াইয়া গেছে এই কথা, রাইতের অন্ধকারে বুড়াছা এক সুন্দর পুলার রূপ ধইরা ঐ গাইরিঙ বানাইছে। ঐটার ভিতরে যে যাইব, হে মরব, ঐটা একটা মরণ ফাঁদ।

বাদুরাই : এইটা কিতা কস্? ঠিক নি? সাইমা যদি এই গাইরিঙে ঢুইক্যা যায়, তাইলে?

দেবেন্দ্র : এই বাদুরাইটা সাইমারে লইয়া মজছে। তুই যে সাইমারে এত ভালা পাস—

ইতা সাইমা জানে নি?

বাদুরাই : জানব। জাইন্যা থাকবো।

মাইলুমা : কেমনে জানব? তুমি মনের কথা তারে কইস?

বাদুরাই : না, কিন্তু জানে হে।

দাঙ্গু : ধুর, এইটা সাইমার লাইগ্যা পাগল হইছে। এটারে অখন ঐ গাইরিঙের ভিতরে ঢুকাও। সাইমা করতে করতে মরব।

মাইলুমা : তুমি থাম। হে মরত কেরে? ঐ বাদুদাদা কও তাই কেমনে জানছে?

বাদুরাই : আমি হের দিকে চাই, এও আমার দিকে চায়। চাইয়া হাসে। [সবাই হাসে]

দেবেন্দ্র : খালি হাসলে কাম হইত না।

দাঙ্গু : না— না— হ, মনের ভিতরে মন হামাইতে হইব। আমার আর মাইলুমার মতো। নাগো মাইলুমা—

মাইলুমা : কিতা যে কয় মাথা মুন্ডু। সাহস বেশি বাইরা গেছে— দাঁড়াও মারে কইতাম।

দাঙ্গু : না— না— সাহস, টাহস আমার কুস্তা নাই। তোমার মারে কইও না। তাইলে কাইলঐ বিদায় করব।

বাদুরাই : সর্দাররে আমি গিয়া কমু। ঐ গাইরিঙ রাইমা সাইমা বানাইছে না— বানাইছে বুড়াছা—

দেবেন্দ্র : তাইলে কিতা হইব?

বাদুরাই : ঐ দেবেন্দ্র তোমার মাথায় শূয়রের ল্যাদা। সর্দার যখন জানব ঐ গাইরিঙ রাইমা সাইমা বানাইছে না, তাইলে তো বিয়া ভাইঙ্গা যাইব।

দেবেন্দ্র : তোর মাথায় মোরগের বিষ্টা। বিয়ার সব ঠিকঠাক হইয়া গেছে— আর ঐ বেটা নাচে অন্য তালে। কিন্তু, ঐ গাইরিঙ আসলে কেটায় বানাইল- ইটা লইয়া রাইমা সাইমার মায়ের মনেও সন্দেহ। ঐ হক্কলে বাঁশ লও - ঘর বানাও।

[বাঁশ দিয়ে দুটো ঘর বানায় ছেলে মেয়েরা। একটি ঘরে মাদুরে শুয়ে আছে রাইমা সাইমা। অন্য ঘরে অচাই, তার বৌ। ছেলে মেয়েরা কুকুর, শিয়াল, বাদুরের আওয়াজ করে । মাতাল অচাই টলতে টলতে প্রবেশ করে]

অচাই : সর্দার আমার বেয়াই হইব। মোরগ, শূয়রে ঘর ভর্তি হইয়া যাইব। ঐ শুনতাছ? ওঠ— ওঠ — সর্দার আমার বেয়াই হইব!

অচাইবৌ: উঃ কিতা হইছে? আমি মরি আমার জ্বালায়, তাইনে নেশা কইরা বাড়ি ফিরছে। শুন— আমার মনে কু ডাকে।

অচাই : তো আমি কিতা করতাম?

বৌ : কুনু বিপদ আছে সামনে।

অচাই : কি বিপদ?

বৌ : হেরা আমার পেটের মাইয়া, আমি জানি, অমন গাইরিঙ তারা বানাইতে

পারতনা।

অচাই : তইলে কেটায় বানাইছে?

বৌ : হেইটাই তো কথা, আমার মনে লয় কুনু গণ্ডগোল আছে। দাঁড়াও, আমি অখনই বাইর করুম।

অচাই : অত রাইতে কি করবা তুমি?

বৌ : খাড়াও । [পাশের ঘরে গিয়ে সাইমাকে ডেকে তুলে সাইমা, এ্যাই সাইমা, ওঠ।

সাইমা : কিতা হইছে? [ঘুম চোখে]

বৌ : আয়, আমার লগে। [পাশের ঘরে নিয়ে যায়] চোখে মুখে জল দে—জল দে— [জল ছিটিয়ে দেয়]

সাইমা : আঃ এই রকম করতাছ কেরে?

বৌ : সইত্য কইরা ক — জুমের টীলায় গাইরিঙ কেডায় বানাইছে?

সাইমা : আগেই তো কইলাম আমরা দুইজনে বানাইছি—

বৌ : মিথ্যা কথা কইলে মাইরা ফালামু

সাইমা : আমি সত্যই কইতাছি।

বৌ : না, সইত্য কইতাছস না।

অচাই : আরে, যে-ই বানাক, সর্দার বুইঝা লইছে হেরাঐ বানাইছে। আর কুনু ঝামেলা নাই।

বৌ : আছে, ঝামেলা আছে। আমার মাইয়ার উপরে কু-নজর পড়ছে। হের লাইগ্যাই দুইটার শরীল ভাইঙ্গা এমুন চিমসা হইছে। [চুলের মুঠি ধরে] ক— ক— সইত্য কথা ক—

সাইমা : ছাড় লাগতাছে ছাড়।

বৌ : গড়িয়া বাবার নাম লইয়া ক, সইত্য কইতাছস।

সাইমা : [কাঁদে] অন্য একজন বানাইয়া দিছে।

অচাই : আরে, কছ কি?

বৌ : কেটা হে? কি নাম তার, বাড়ি কই?

সাইমা : নাম ধাম কুস্তা জানি না।

বৌ : কেমনে আইল হে? কে তারে ডাকল?

সাইমা : আমরা্ ডাকছি।

অচাই : সর্বনাশ কইরা ফালাইছে। অন্য কেউ বানাইয়া দিছে, সর্দার এই খবর পাইলে তো বিয়া লাটে উঠবে—

সাইমা : একটা অজগর—

বৌ : অজগর— অজগরে গাইরিঙ বানাইয়া দিছে? এইটা কেমনে হয়? আমরারে বুরবক পাইছস্?

সাইমা : না মা, এইটাই সইত্য
সাইমা : ঝড়ের হাত থাইক্যা বাঁচবার লাইগ্যা বাই জঙ্গলের দেবতারে কইছে - গাইরিঙ বানাইয়া দিতে। যে বানাইয়া দিব তারে বাই বিয়া
অচাই : বিয়া?
সাইমা : হ বিয়া করব।
অচাই : বিয়া করছে?
সাইমা : হ করছে
দুইজনে : কারে বিয়া করছে? ওই অজগরটারে
সাইমা : হ, অজগররে বিয়া করছে
বৌ : হায় হায়রে সব শেষ হইয়া গেল।
অচাই : একটা জন্তুরে বিয়া— না— না— এইটা হইতে পারে না। ঐ অজগরটারে কালকে তুই আমারে দেখাইতে পারবি?
সাইমা : পারমু। ঐ অজগররে বাই খুব ভালবাসে।
অচাই : ইস্, ইতা শুনলে কান পইচ্যা যায়। এই কথা আরেকবার কইলে তোর জিহ্বা কাইট্যা লমু। যা আমার চোখের সামনের থাইক্যা দূর হ। যা।
[সাইমা ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে যায়। মিউজিক। বৌ আর অচাই কি যেন পরামর্শ করে। ঘর থেকে টাক্কাল বের করে নিয়ে আনে অচাই। টাক্কালে ধার দিতে থাকে। টাক্কালের ধার দেওয়ার আওয়াজে ঘুম ভাঙে রাইমার। ঘরের বাঁশগুলি ভেঙ্গে রাইমাকে ঘিরে কম্পোজিশন তৈরি করবে। যেন রাইমা বন্দী। বাঁশের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে ছুঠে বেরিয়ে যায় রাইমা] [বৃদ্ধা প্রবেশ করে]
রাইমা : নানী— অ নানী — শুনছনি
বৃদ্ধা : কেটা রে— ভোর রাইতে কেটায় ডাকে?
রাইমা : আমি রাইমা [বৃদ্ধা আসে]
বৃদ্ধা : অ মা— কিতা হইসে? অসময়ে কেরে আইছস? [রাইমা বুড়িকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে] কিতা হইছে? কান্দস কেরে? ক, কান্দস কেরে?
রাইমা : বড় বিপদ হইছে।
বৃদ্ধা : কিতা বিপদ? [রাইমা কাঁদে] ক— ক— কান্দিস না, ক— নানীরে ক।
রাইমা : তুমি আমারে বাঁচাও নানী।
বৃদ্ধা : কি হইছে আগে ক।
রাইমা : তুমি আমার সব। তুমি-ই কও আমি কিতা করতাম।
বৃদ্ধা : আরে, কুস্তা না কইলে আমি কিতা করতাম
রাইমা : বাপ মায়ে আমার বিয়া ঠিক কইরা লাইছে।
বৃদ্ধা : বিয়া। তাইলে কান্দস কেরে মাইয়া— আনন্দ না করবি, কার সঙ্গে বিয়া হইবো।

রাইমা : সর্দারের পুলার সঙ্গে।

বৃদ্ধা : কছ কিতা সর্দারের পুলা। অমাই— তইলে তো রাজরানী হইবি। কত জমি, টীলা, শূয়র, রাই, মোরগ— ওরি বাপরে। আয় আয় একটু নাইচ্যা লই। যৌবনের আগুন এইবার মাইট্টা তেল পাইব। উঃ কেমনে জ্বলব দাউ দাউ কইরা।

রাইমা : আমি আরেক জনরে বিয়া কইরা ফালাইছি।

বৃদ্ধা : কছ কিতা? কারে বিয়া করছস? কবে করছস?

রাইমা : একটা পুলারে- যে অজগর সাপের রূপ ধইরা থাকে।

বৃদ্ধা : হায়রে ইতা কেমনে হয়? মানুষ কেরে সাপের রূপ লইয়া থাকবো?

রাইমা : হেরার গোষ্ঠীর কুলদেবতা নাকি অজগর।

বৃদ্ধা : কুল দেবতা? দাড়া— দাড়া— কুলদেবতা অজগর— আইচ্ছা। শোন কুলদেবতার মইধ্যে অজগর হইল হক্কলের নীচে। আজকের থাইক্যা বহু বছর আগে আমরার পূর্ব পুরুষ এক একটা পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া থাকত । এক একটা দলের এক একটা কুলদেবতা;— কার কুলদেবতা? ইতা লইয়া লাগত যুদ্ধ। যে দল হারত, তারা জয়ীদের কুলদেবতারে মানতে বাধ্য হইত [মঞ্চের একদিকে একজন দলপতি সমস্ত অনুগামীদের উত্তেজিত করছে]

দলপতি : জম্বু দ্বীপের এই অঞ্চলের পাহাড় পর্বতে, যত গোষ্ঠী আছে, হক্কলের মইধ্যে আমরার কুলদেবতা বৃষই শ্রেষ্ঠ। বল বৃষদেব কি —

সবাই : জয়

দলপতি : বৃষদেব কি

সবাই : জয়

দলপতি : যারা আমরার দেবতা বৃষদেবেরে মানে না— তারা বিধর্মী, তারা আমরার শত্রু।

সবাই : হ, তারা আমরার শত্রু।

দলপতি : শত্রুদের খতম কইরা, তাদের জমি, ফসল, পশু সব আমরার অধীনে লইয়া আনতে হইব। তাইলেই আমরার দেবতা খুশী হইব। আমরা স্বর্গে যামু—

সবাই : হ, তইলেই আমরা স্বর্গে যামু—

দলপতি : কুলদেবতা অজগর হইল সব থাইক্যা নীচে। ঐ দলের মাইনসের ছায়া যেইখানে পড়ে, সেইখানে গাছপালাও মইরা যায়। পাহাড়ী ছড়ায় নামলে, জল শুকাইয়া যায়। এরা আদিম, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ। হেরারে নাশ কইরা, আমরার কুলদেবতারে খুশী করতে হইব। বল হক্কলে বৃষদেব কি—

সবাই : জয়

দলপতি : আক্রমণ— [সবাই তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে হৈ হৈ করে উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। দলপতি পরিবর্তন হবে। অনুগামীরা একই। এইবার থাকবে দন্ডের উপর বৃষের সিং। একবার থাকবে অজগরের মুখ।]

অন্য দলের দলপতি : আমাদের কুলদেব অজগররে যারা হেয় করে, গালি গালাজ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তারার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করমু, কও তোমরা রাজি?

সবাই : হ, রাজি

দলপতি : বল সবে— অজগর দেব কি—

সবাই : জয়- জয় জয়—

দলপতি : কুলদেবতার মইধ্যে কুনু উচ্চ নীচ নাই। কিন্তু যে সকল দলের জনবল বেশী, জমি পশু বেশী, হেরা ক্ষমতা দেখায়। হেরাই অন্য কুলদেবতারে হেয় করে। আমরা এইটা মানতাম না।

সবাই : হ, আমরা মানতাম না।

দলপতি : আমরা মরমু, তবু কুলদেবতার অপমান সহ্য করতাম না। ঐ শোন পাহাড়ের দল ছুইট্টা আইতাছে, তারা অন্য কুলদেবতারে সহ্য করতে পারে না। এইটা আমরা মানতাম না।

সবাই : হ, আমরা মানতাম না।

দলপতি : জান যাক, জমি যাক, চল আক্রমণ—

[বাজনার তালে তালে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যায়।]

বৃদ্ধা : যুদ্ধের পর যুদ্ধে অজগর কুলদেবতার দল ধীরে ধীরে হাইরা গেল। কিন্তু, তারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যে কয়েকজন বংশধর বাইচ্চা আছে, তারা নাকি এখনও অজগর বেশ লইয়া চলে, সাপের মতো চলে —

রাইমা : হ, এমনই একজন অজগর বেশধারী আমার স্বামী—

বৃদ্ধা : হায়রে। মন প্রাণ সব দিয়া, অখন কাঙালিনী হইছে, শুন একটাই পথ আছে, হেরে লইয়া চুপে চুপে তুই পলাইয়া যা। দূর দেশে পলাইয়া যা। নাইলে মরবি।

রাইমা : নানী, আমার যে ভয় করে।

বৃদ্ধা : ধুর মাইয়া, ভয় কিয়ের? তোর ভালবাসাই তোরে শক্তি দিব, জোর দিব, ওঠ। শোন— [কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যায়]

দৃশ্যান্তর

[সব ছেলেদের নিয়ে কম্পোজিশন। প্রত্যেকের হাতে টাক্কাল। হামিং ও মুভমেন্ট। সাইমা বাবাকে নিয়ে সন্তর্পনে ঢোকে। সাইমা ও অচাই উপরের প্লাটফর্মে উঠে।]

অচাই : ডাক, ডাক তোর কুমুইরে — ডাক

[সাইমা ভয়ে ভয়ে ডাকতে থাকে]

সাইমা : কুমুই — - — ও — কুমুই— খাইয়া যাও আইয়া। কুমুই। বাবা ঐ তো আইয়ে

বাবা : যা — তুই ঘরে যা । আমি তারে দেখি।

[লুকিয়ে থাকে। অজগর ঢোকে]

অজগর : রাইমা— অ রাইমা— তুমি কই ? বুঝছি, তুমি আমার সঙ্গে লুকালুকি খেলতাছ। এইখানে আমি বইলাম, কিন্তু তুমি কাছে থাকলে তো, আমি তোমার শরীলের গন্ধ পাই, তোমার খুম্পুই ফুলের গন্ধ পাই, আজকে তো অরেকটা অচেনা গন্ধ। তোমার ছলাকলা কিছুই বুঝি না। তাড়াতাড়ি খাওন দেও, খিধা পাইছে। নাও আমি চোখ বন্ধ করলাম। এইবার আস দেখি প্রাণসখি। চল, আজই আমরা পলাইয়া যামু, অনেক দূর। [পিছন থেকে বাবা টাক্কাল দিয়ে কোপ দেয়। কোরাসরা নির্বিচারে সারা মঞ্চে কোপাতে থাকে]

দৃশ্যান্তর

[খাবারের পুটলি নিয়ে ঢোকে রাইমা। এদিক ওদিক অজগরকে খোঁজে। সাইমা আসে সন্তর্পণে]

রাইমা : সাইমা আমি তারে খুজতাছি। তুই কুন সময় আইছস—

সাইমা : ঐ তো তোমার আগে আগেই আইছি।

রাইমা : সাইমা— বইন— তোর কুমুইরে ডাক— তার লাইগ্যা খাওন আনছি—

সাইমা : বাই—

রাইমা : ডাক দে না বইন —

সাইমা : কুমুই— কুমুই— ও কুমুই— খাইতা আইও— কুমুই—

রাইমা : কই তুমি ? শুনছ নি— আইও— দঙ্গই - দঙ্গই - মাইচানা ফাইদি বা—

সাইমা : কুমুই— কু - মু - ই— [কাঁদতে থাকে]

রাইমা : সাইমা— কিতা — হইছে— হে আইয়েনা কেরে ? কিতা হইছে বইন— ভালা কইরা ডাক— শুনছোনি — [সাইমা দৌড়ে পালায়। বৃদ্ধা ঢোকে] নানী হে যে আইয়ে না। অত কইরা ডাকি— শুনছো— দঙ্গই—

বৃদ্ধা : হে আর কুনু দিন আইত না রে—

রাইমা : কিতা কও তুমি ? কেরে আইত না ? কও— কেরে আইত না হে—

বৃদ্ধা : তোর বাপরে দেখছি ছড়ার জলে রক্তমাখা টাক্কাল ধুইতাছে, কাপড়ের রক্তের দাগ ধুইতাছে— হিংসার রক্তের দাগ — শত ধুইলেও যাইত না রে—

রাইমা : কি— কও তুমি ? হা—

বৃদ্ধা : সব শেষ। যা— যা— সর্দারের পুলার লগে এখন বিয়া ব গিয়া, নইলে তোর বাপে তোরে কাইট্টা ফালাইব। যা - যা - [বেরিয়ে যায়]

রাইমা : শুনছ নি— আমি কারো কথা বিশ্বাস করি না। তুমি আইও— আমরা পলাইয়া যামু অনেক দূরে, শুনছ—। তোমার ভিতরের মানুষটারে কেউই দেখলো না গো। কেউ দেখলো না। এত ভেদাভেদ কিসের লাইগ্যা ? বনের পশু পাখি, জন্তু জানোয়ার আমরার বন্ধু হতে পারতো না ? ও দঙ্গই, তুমি আমারে নিয়া যাও।

[পাহাড়ের ঢালে ফুটে আছে খুমপুই ফুল। রাইমা ফুলের কাছে যায়।]

নেপথ্যে অজগরের কণ্ঠ : আমি যদি তোমার আগে মরি, আমারে যেখানে মাটি চাপা দিব, তার উপরে দেখবা ফুটবো এই খুমপুই।]

রাইমা : ও দঙ্গই, তুমি আমারে নিয়া যাও। এই হিংসার দুনিয়ায় আমি থাকতাম না।

[পাহাড়ের উপর থেকে একটি সাদা কাপড় মাথায় করে জলের ঢেউয়ের মতো নিয়ে চলে রাইমা। পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে। সাইমা ছুটে এসে দেখে, বাই (দিদি) জলের স্রোত হয়ে গেছে। চিৎকার করে বলে—]

সাইমা : ও বাই, তুমি আমারে ফালাইয়া একলা একলা কই যাও? আমারে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও। আমি তোমারে ছাড়া কেমনে থাকুম বাই ? আমারে সঙ্গে লইয়া যাও—

[সাইমা আরেকটি লম্বা সাদা কাপড় মাথায় করে ঢেউয়ের মতো বয়ে চলে রাইমার অভিমুখে]

সূত্রধার : [গান] রাইমা সাইমা চোখের ধারায় গো
আজও নিরবধি
বইয়া যায় গোমতী নদী।।
ভালোবাসা ঘৃণায় মেশা গো
সেই লোক কাহিনী

সবাই : বইয়া যায় গোমতী নদী।

লেখক : সঞ্জয় কর, ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, নাটককার ও নাট্য পরিচালক।

জর্জ ফ্লয়েড, উই কান্ট ব্রিদ টু

বিভু ভট্টাচার্য

[তিনজন সাদা শার্ট, প্যান্ট, জুতা ও তিনজন কালো শার্ট, প্যান্ট, জুতায় ছয়জন পুরুষ অথবা মহিলা শিল্পী হলে ভাল, ১,২,৩ /১,২,৩ করে ক্রমান্বয়ে সকলে যোগ দেবে]

১ : সারা পৃথিবী উত্তাল

২ : অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর।

৩ : কালোদের জন্য ইউনাইটেড স্টেটস অব অ্যামেরিকা এমনিভাবে কেঁপে উঠবে, এ যে কল্পনাতীত।

১ : অ্যামেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের ইতিহাসতো কয়েক শতাব্দী পুরোনো।

২ : কালোকে নিগ্রহ করা, বলা যায় অ্যামেরিকার আদি-পাপ, অরিজিনাল সিন।

৩ : বর্ণবিদ্বেষের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ নিধনের ইতিহাসও অ্যামেরিকায় বহুল প্রচলিত।

১ : পাশাপাশি বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনও সেখানে নতুন কিছু নয়।

২ : ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ কালো মানুষের অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বার বার গর্জে উঠেছেন।

৩ : কালো মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য হয়েছে বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধ মিছিল।

১ : কিন্তু এতসব সত্বেও এবারের আন্দোলন নজিরবিহীন।

২ : নিজের জীবন দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন জর্জ ফ্লয়েড।

৩ : ১৯৬০ এর দশকের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে এই মাত্রায় প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন মানুষের কল্পনাতীত!

১ : জর্জ ফ্লয়েড। সারা পৃথিবীর বর্ণবিদ্বেষের আন্দোলনে তুমি ইতিহাস।

২ : জর্জ ফ্লয়েড। তুমি এই মহান আন্দোলনের জন্মদাতা।

সকলে : শহীদ জর্জ ফ্লয়েড। তোমার প্রতি অ্যামেরিকা সরকারের লাঞ্ছনার কথা আমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেব। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়ে। শোন, মানব সভ্যতা, শোন। আমরা বর্তমান প্রজন্ম, তোমাদেরই উত্তরসুরী, আমাদের একটাই আবেদন, উই ওয়ান্ট জাস্টিস।

১ : আমাদের কণ্ঠে জেগেছে আজ নিগ্রো ভাইদের গান, কালো অ্যামেরিকাই প্রকৃত অ্যামেরিকা।

২ : এতদিন পদাঘাতে তাড়িয়েছ আমাদের। আমরা হেসেছি, গেয়েছি গান, আর চুপি চুপি করেছি শক্তি সঞ্চয়।

৩ : আমাদের কালো মুখের জন্য তোমাদের ছিল কত না লজ্জা। আমরা বাইরে বেরোলে বিশ্বের দরবারে তোমাদের মাথা কাটা যেত।

১ : কিন্তু যুগে যুগে আমরা যে প্রতারিত। খ্রীষ্টপূর্ব বছরগুলি থেকে যা চলছিল আজও তাই চলছে।

২ : আচ্ছা প্রভু যীশুর রঙ কি ছিল ! যীশু কি সাদা ছিলেন না বাদামী ?

৩ : নিগ্রো কাঁদলে গান সৃষ্টি হয়, না! কী মহান আমাদের ধর্মসঙ্গীত, পল-রোবসনের কণ্ঠে, না!

১ : আমাদের ফ্রীডম-মার্চ রাজধানী অভিমুখে, সে ও খুব ভাল।

২ : অথবা নির্বাচনে অমুককে ভোট দিয়ে জেতাবার জন্য আপ্রাণ সমবেত প্রচেষ্টা।

৩ : ন্যায়বিচারের খোঁজে শ্বেতকায় আইনের তুষারশীতল বক্ষে আচড় কেটে আদর আদায়ের চেষ্টা!

১ : অথবা মার্টিন লুথার কিং-এর পেছনে শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন - ঢোকে ঢোকে বাতাস পান চমৎকার, খালি হাতে স্রেফ মুষ্টি উত্তোলন।

২ : এমন কি হস্তে ধৃত পোষ্টারে এব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতিচ্ছবি — বড় সুন্দর এসব।

৩ : মাঝে মাঝে শ্বেতাঙ্গ দস্যু কর্তৃক বোমায় ওড়ানো ছাদহীন গীর্জায় মিটিং আর অগ্নিস্রাবী ভাষণ। শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক হবার দুর্জয় আরাধনা!

১ : আর আজ! পরিস্থিতি পাল্টেছে। সাধারণ মানুষের, মানুষ হয়ে উঠার আকাঙ্খা দৃঢ় হয়েছে। বিশ্বের লড়িয়ে মানুষ বলছে ডেকে, বর্ণ নয়, জাত নয়, ধর্ম নয়, মানুষ। অ্যামেরিকা থেকে কঙ্গো, ব্রাজিল হয়ে শাহিনবাগ, পৃথিবীর সর্বত্র একই মিছিলে আজ সব মানুষ একাকার।

২ : এ লড়াই শুধু কালোর নয়, সাদা, কালো নির্বিশেষ, নিপীড়িত মানুষের।

৩ : রঙ নয়, চেহারা নয়, মনুষ্যত্বই, মানুষকে মানুষ হতে শেখায়।

১ : হায়রে, লোকে বলে নিগ্রো যখন কাঁদে, সে কান্নাও নাকি গান গয়ে উঠে।

২ : আমরা দেখেছি প্রকৃতির ঊষাকালে— ধমনীর রক্তপ্রবাহের চেয়ে পুরাতন নদনদী, সমুদ্র।

৩ : আমাদের আত্মা আজ নদী সমুদ্রের চেয়েও গভীর!

১ : আমরা স্নান করেছি ইউফ্রেটিস নদীতে, পৃথিবীর নবীন প্রদোষে।

২ : কঙ্গো নদের তীরে বেঁধেছি কুটীর — সে নদীর কল্লোল ঘুম পাড়িয়েছে আমাদের।

৩ : নীল নদের তীরে ইস্পাত দৃঢ় হাতে আমরা গড়েছি পিরামিড।

সকলে : বর্তমান পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতিলোভী ধনবান মানুষকে অঙ্গুনীহেলনে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাই চলো। শহীদ ফ্লয়েড, তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না। যত অত্যাচারই আসুক আমরা লড়ে যাব, মুনাফার পাহাড়ে বসে ওরা চায় আরো মুনাফা, আমরা চাই আমাদের শ্রমের মূল্য, ওদের কাছ থেকে চাই নিপীড়িত, শোষিত মানুষের অধিকার, মানবতার স্বীকৃতি।

সমবেত আবৃত্তি : অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ / যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি দেখে তারা / যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই-প্রীতি নেই / করুণার আলোড়ন নেই /

পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

[মুখোমুখি তিনজন বসে, সম্ভব হলে তিনটি বাক্সের উপর, বাকী তিনজন পেছনে দাঁড়িয়ে]

১ : কিন্তু বিষয়টা ভাল করে বুঝতে চাই।

২ : হ্যা, ঠিক তাই, কেন মারা হল জর্জ ফ্লয়েডকে?

৩ : অ্যামেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য মিনেসোটা । তার কেন্দ্রস্থল মিনিয়াপলিস।

১ : সেখানকার বাসিন্দা জর্জ ফ্লয়েড। বয়স ৪৬। সে ছিল বেস্‌বল খেলার জনপ্রিয় খেলোয়াড়।

২ : স্থানীয় একটি দোকানে ২০ ডলারের জাল মুদ্রা ব্যবহার করার অভিয়োগে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

৩ : সে বরাবরই বলে যে সে চুরি করেনি।

১ : এই নিয়ে কথাবার্তার মধ্যেই স্থানীয় ঐ বাজারে পুলিশ তাকে দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

২ : জর্জ বেরিয়ে এলে পুলিশ অফিসার তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে, কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে তার গলা চেপে ধরে।
[মঞ্চে হঠাৎ একজনকে প্যাঁচ দিয়ে মাটিতে ফেলে হাঁটু দিয়ে গলায় চেপে ধরে। অন্যজন দাঁড়িয়ে হাসে]

ফ্লয়েড : [চিৎকার করে বলতে থাকে] আমি চুরি করিনি।

পুলিশ : নিশ্চয়ই চুরি করেছিস।

ফ্লয়েড : না, আমি চুরি করিনি।
[দেখা যায় একজন হাঁটু দিয়ে অন্যজনের গলা চেপে হ্যাঁচকা চাপ দেয়]

পুলিশ : শালা নিগ্রোর বাচ্চা! তোরা তো ক্রীতদাস। বাপ ঠাকুর্দা, বংশানুক্রমে তোরা ক্রীতদাস। চুরি করা কালো আদমীর স্বভাব! বল আর চুরি করবি?

ফ্লয়েড : বিশ্বাস করো আমি চুরি করিনি।

পুলিশ : [হাঁটু দিয়ে হ্যাঁচকা দেয়] চুরি করিনি! বললেই হলো! শালা সাদা লোকটি কি মিছে কথা বলছে!!

ফ্লয়েড : আমি শ্বাস নিতে পারছি না।

পুলিশ : শ্বাস নেবার জন্য কি তোকে চেপে ধরা হয়েছে? শূয়রের বাচ্চা!

ফ্লয়েড : জল একটু জল।

পুলিশ : জল! হা হা হা ! [দাঁড়িয়ে থাকা অন্যজনও হাসিতে যোগ দেয়]

ফ্লয়েড : আমি শ্বাস নিতে পারছি না। আমি মরে যাব, ম ....

পুলিশ : শালা করোনায় যখন মরিসনি তো চিন্তা করিস না, আরো অনেকদিন বাঁচবি।

ফ্লয়েড : আই রিকোয়েস্ট ইউ প্লীজ সেভ মি। [কাতর অনুরোধ জানায়।] আমাকে একটু জল দাও।

পুলিশ : জল ! হা হা হা । শালা পেচ্ছাব খা। [হাঁটু দিয়ে হ্যাঁচকা দেয়]
ফ্লয়েড : ও মাই মাদার! প্লীজ গিভ মি ওয়াটার!
পুলিশ : শালা নিগ্রোর বাচ্চা! ছোটলোক! দেখ কেমন লাগে! [হ্যাঁচকা]
ফ্লয়েড : আই কান্ট ব্রিদ, মাই মাদার, আই কান্ট ব্রিদ।
[ক্রমে তার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে]
পুলিশ : হা হা হা [উঠে পড়ে]
সকলে : হায়, আই কান্ট ব্রিদ, আই কান্ট ব্রিদ — হামিং ....

[হামিং এর সাথে আবহ মিশে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য

১ : স্পষ্টতই এটা সাদা কালো বর্ণবিদ্বেষের নির্যাতন। প্রাচীন কাল থেকেই যা চলে আসছে। মানব সভ্যতা বহুদূর এগিয়েছে। কিন্তু সেই দাসপ্রথা মানসিকতার থেকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।
২ : কিন্তু অ্যামেরিকা তথা সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক বিকাশ এবং উৎপাদনের সমস্ত ঝুকিপূর্ণ কাজই তাদের করতে হয় অথচ সর্বত্র তারাই ব্রাত্য।
৩ : নিজেদের দেশেও তারা পরাধীন, যেন অন্য গ্রহের মানুষ।
১ : সাম্রাজ্যবাদের শীর্ষ অনুচরেরা দীর্ঘদিন ধরে কালোদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।
২ : সম্প্রতি অ্যামেরিকায় ব্যাপক করোনা সংক্রমণের জন্যও দায়ী করা হচ্ছে কালো মানুষদের।
৩ : মারাও যাচ্ছে কালো রঙের মানুষই বেশি। কারণ অ্যামেরিকায় সরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্য কর্মসূচী নেই বললেই চলে। বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গরীব মানুষের নাগালের বাইরে।
সকলে : কিন্তু এইভাবে তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না।
১ : বন্ধুগণ! আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো।
২ : কিন্তু জাত পাত ধর্ম দিয়ে বিচার নয়, যারা বর্ণবিদ্বেষী নয়, সাদা কালো সবাই এই আন্দেলনে স্বাগত।
৩ : যেখানেই জাতপাত, বর্ণ, ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষ রয়েছে, সেই দেশেই আমরা এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেব।
সকলে : শহীদ ফ্লয়েড নিজের জীবন দিয়ে যে লড়াইয়ের সূচনা করল তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

চতুর্থ দৃশ্য

[মঞ্চের একদিকে পাঁচ জনের জটলা। আন্দোলন পরিচালনার সমস্যা নিয়ে কথা চলছে]

১ : শুনুন, আহা শুনুন না, কিভাবে এই আন্দোলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব সে বিষয়ে এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কথা না বাড়িয়ে আলোচনায় যোগ দিন।

২ : দেখুন সারা পৃথিবীতে বর্তমানে করোনার প্রকোপ চলছে। এই পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিটি দেশ নাজেহাল। এখন কি আমরা এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দেলনকে অন্যান্য দেশে সম্প্রসারণ করতে পারব?

৩ : ইউরোপের অবস্থা তো ভীষণ খারাপ। এখন হিতে বিপরীতও হয়ে যেতে পারে।

৪ : এশিয়াতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ভারতের। পৃথিবীতে তিন নম্বর। অ্যামেরিকা ব্রাজিলের পরই ভারত।

১ : কিন্তু ভারতে তো অধিকাংশ মানুষের অবস্থাই বেশি খারাপ। প্রথমদিকে মাত্র চার/পাঁচ ঘন্টার মধ্যে সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করায় লক্ষ কোটি মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিক আটকা পড়ে গেছেন।

৫ : গত দুমাসে অ্যামেরিকায় লুট হয়ে গেছে চার কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা। হঠাৎ তাদের কাজ চলে গেছে এই ভয়ানক দুর্দিনে।

৬ : জীবিকা লুণ্ঠনের খাড়া ঝুলছে আরো বারো কোটি মানুষের উপর।

১ : ভারতেও রয়েছে লক্ষ কোটি পরিযায়ী শ্রমিক। কাজের জায়গায় তারা থাকতেও পারছেন না এই ভেবে যে যদি এসে কাজ পাওয়া না যায়! আবার বাড়ীও আসতে পারছেন না দূরত্বের কথা ভেবে বা টাকা না থাকায়।

২ : আসার পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকে মৃত্যু বরণ করেছেন। এমনকি রেলেও কাটা পড়েছেন অনেকে।

৩ : দেশে বেকার বাড়লে কর্মীরা কম পয়সায় কাজ করতে বাধ্য হন, কারণ তারা জানেন এবং মালিকরাও জানে আরো কম টাকায় কাজের জন্য অনেক বেকার লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

২ : কিন্তু আন্দোলন চলা কালীন সময়ে অনেক বড় বড় দোকানও লুট হয়েছে। এটাকে আমরা কিভাবে দেখব।

১ : হ্যা ঠিক আমরা ভাঙচুর লুটপাটের ছবি দেখেছি কিন্তু জীবিকা লুট হওয়ার ছবি তো দেখছিনা। দেখলেও আমরা তাকে লুণ্ঠন বলে চিনতে পারছি না।

২ : এখন একটা দোকান লুট হচ্ছে বলে বলছ!তোমরা যে লুঠ করেছ আমাদের শস্য।

৩ : এখন একটা স্যুটকেস লুঠ হচ্ছে বলছ! তোমরা তো লুঠ করেছ আমাদের কয়লা খনি।

৪ : ঢিল দিয়ে শোকেস ভেঙ্গেছে বলছ, সমস্ত সরকারী সম্পদ বেসরকারী করে আমাদের

সম্পত্তি লুঠ করনি?

২ : মুনাফা হয়নি বলে আমাদের মজুরী কমাওনি? তোমরা তো আমার খাবার লুঠ করেছ।

৩ : আমাদের কাজের সময় ৮ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১২ ঘন্টা করোনি? তোমরা তো আমাদের জীবন লুঠ করেছ!

১ : একটা গলার হার লুঠ হয়েছে বলছ! তোমরা যে আমাদের কণ্ঠ লুঠ করেছ!

২ : একটা গেঞ্জির বাক্স লুঠ হয়েছে বলছ! তোমরা যে আমাদের বুকের পাঁজর লুঠ করেছ!

৩ : দামী একটা চামড়ার বেল্টের বাক্স লুঠ হয়েছে বলছ! তোমরা যে আমাদের গায়ের চামড়া লুঠ করেছ!

১ : একটা টিভি সেট লুঠ হয়েছে বলছ! কিন্তু তোমরা যে আমাদের বাউল গান লুঠ করেছ।

২ : একটা জলের ড্রাম লুঠ হয়েছে বলছ! তোমরা যে আমাদের কালো যীশুকে লুঠ করেছ!

সকলে : লজ্জা করে না তোমাদের? বলি লাজ লজ্জার কি মাথা খেয়েছ?

১ : বন্ধুগণ! এই লুণ্ঠনের জন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী নয়। দায়ী সিস্টেম।

সকলে : এসবের জন্য দায়ী প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সিস্টেম!

১ : এমন বিপদের দিনে এই সিস্টেম, কর্মীদের জীবন জীবিকার জন্য কোন দায় স্বীকার করে না।

২ : ব্যবসার প্রয়োজনে যে কোন সময়ে কর্মীদের বিদায় জানানোর স্বাধীনতা চায় সে। যেকোন মূল্যে মুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য। কত মুনাফা চাই, আরো আরো মুনাফা।

৩ : মনে রাখতে হবে এই বিপদের দিনে বহু ব্যবসায়ীও অস্তিত্বের লড়াই করছেন। বহু ছোট ব্যবসা লাটে উঠেছে। পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও সমস্ত কর্মীদের বহাল রাখার সাধ্যই নেই তাদের।

সকলে : এই প্রক্রিয়া ধনতন্ত্রের স্বভাবধর্ম।

১ : অতিমারিতে আর্থিক সংকট এইভাবেই পুঁজির অতিকায় বড় হয়ে উঠার পথ প্রশস্ত করে।

২ : সারা বিশ্বের ১ শতাংশ মানুষের হাতে পৃথিবীর ৫০ শতাংশ সম্পদ কুক্ষীগত।

৩ : ৮৫জন ধনী মানুষের হাতে সম্পদের পরিমান ৩৫০ কোটি মানুষের সম্পত্তির সমান। এই বিরাট বৈষম্য দূর করা কিভাবে সম্ভব?

সকলে : এই পাহাড় প্রমাণ সমস্যার সমাধান কি পুঁজিবাদের পক্ষে সম্ভব?

১ : বন্ধু! রাষ্ট্রের স্বভাব আকাশ থেকে পড়ে না। দেশের রাজনীতিই তাকে বিপন্ন মানুষের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করে।

২ : সবার জন্য দরকার নুতন চেতনা, নুতন বোধ, নুতনভাবে পৃথিবীকে দেখা।

৩ : পুরোনো ভাবনার আধিপত্যে ঘা দেওয়া

সকলে : তার জন্য চাই দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলন।

১ : কিন্তু ওরা যে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, মিডিয়া সহ সমস্ত দখল করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী সমাজনীতি গড়ে তোলার আন্দোলন তৈরী করতে হবে।

২ : যে লড়াই ক্ষমতাবানদের বাধ্য করবে দুর্বলের জীবিকা ও জীবনের দায়িত্ব স্বীকার করতে।

৩ : আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন কিন্তু হারিয়ে ফেলা সহজ।

১ : অগণিত মানুষের জীবন জীবিকা লুঠ হয়ে যাচ্ছে, বড় পুঁজি ছোট পুঁজিকে গ্রাস করছে, সরকারি সাহায্যে মুনাফাখোররা গিলে খাচ্ছে জল স্থল আকাশের প্রাকৃতিক সম্পদ!

২ : এত বড় অতিমারীতে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও অপূর্ণ। প্রয়োজনের সময় স্বাস্থ্য সহ সর্বক্ষেত্রে গরীব মানুষদের দায় সরকার অস্বীকার করছে।

৩ : অথচ প্রতিদিন সরকার নুতন নুতন কথার ফানুস উড়াচ্ছে! শুধুমাত্র স্বপ্নের ফেরি করছে।

সকলে : এই অবস্থায় শ্রমজীবি মানুষের কাছে আন্দোলন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। দেয়ালে তো আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে, কি আর হবে, জীবন তো একটাই, গেলে যাবে!

সকলে : শুরু হোক আন্দোলন, দেশে দেশে, সারা পৃথিবীতে। শুরু হোক আন্দোলন, দেশে দেশে, সারা পৃথিবীতে। [আবহ তীব্র হয়]

১ : এ আন্দেলন শুরু হয়েছিল অ্যামেরিকার মিনিয়াপোলিসে, অগণিত মানুষের প্রচেষ্টায় সেটাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল, এমনকি ইউরোপ, এশিয়া পর্যন্ত।

২ : "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" এই আন্দোলনে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল এখন উত্তাল।

সকলে : উই ওয়ান্ট জাস্টিস্। উই ওয়ান্ট জাস্টিস্। [এই নাট্যাংশে সকলে যোগ দিলে ভাল লাগবে।]

[পাইপ মুখে দাস-ব্যবসায়ী পায়চারি করে ১জন সহযোগী। কতিপয় দাস খালি পায়ে চারপাশে হামাগুড়ি দিচ্ছে]

১ : পাইপ মুখে ঐ যে লোকটি, সে হলো সতের শতকের একজন বড় দাস ব্যবসায়ী। ইংলণ্ডের ব্রিস্টলের অধিবাসী। নাম - কোলস্টন, পাশের লোকটি হেল্পার আর বাকীরা দাস। মানে স্লেভস। অ্যামেরিকা কলোনীতে তার ব্যবসা। আফ্রিকা থেকে দাস এনে অ্যামেরিকা বা অন্যত্র সাপ্লাই করত। আমরা ইতিহাসে পাই যে ১৬৭২ - ৮৯-এর মধ্যে সতের বছরে এই লোকটি মানে কোলস্টন নারী, পুরুষ, শিশু মিলিয়ে মোট ৮৪০০০ মানুষকে আফ্রিকা থেকে কিনে অ্যামেরিকায় রপ্তানি

করেছিল।

কোল : হাই হ্যারিসন!

হ্যারি : ইয়েস স্যার! [ফাইল হাতে আসে]

কোল : মেইনলি কোন জায়গা থেকে আমরা স্লেভস ইম্পোরট করি?

হ্যারি : স্যার মেইনলি ফ্রম ওয়েস্ট আফ্রিকা।

কোল : ওকে! আফ্রিকান্স আর ব্ল্যাক।

হ্যারি : ইয়েস স্যার, তাইতো ওরা ক্রীতদাস।[কথার ফাঁকে ক্রীতদাসের গায়ে টোকা মারে]

কোল : ও, আর ইউ ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান?

হ্যারি : ইণ্ডিয়ানতো স্যার সব ছোটলোক।

কোল : ছোটলোক, ছোটলোক মিনস্!

হ্যারি : ছোটলোক মানে— এ - ন্যাষ্টি, ন্যাষ্টি, savages! Heathens !

কোল : ও নেষ্টি, আচ্ছা, তো হ্যারি মুসলিম, মুসলিম!

হ্যারি : হোয়াট আর ইউ টেলিঙ স্যার! মুসলিমরা তো ভয়ঙ্কর, মোস্ট ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি!

কোল : [এক লাফ দিয়ে সরে যায়] এঃ বলে কি! ও মাই গড। [বুকে ক্রশ আঁকে] আচ্ছা এই স্লেভদের কোথায় সেল মানে বিক্রি করা হয়?

হ্যারি : স্যার আমাদের কলোনী অ্যামেরিকায় আমরা বিক্রি করি, সেখানে হাই রেট স্যার!

কোল : ওকে! হ্যারি ক্যান ইউ টেল মি, আমাদের ব্যবসার শুরু থেকে, আই মিন ফ্রম ১৬৭২ - ১৬৮৯ কতজন স্লেভস্ টোটালি, আমরা আফ্রিকা থেকে ইম্পোরট করে অ্যামেরিকায় এক্সপোর্ট করেছি! ইউ সি, আই এম টু সেন্ড এ রিপোর্ট টু দ্য কমনওয়েলথ।

হ্যারি : ইয়েস স্যার, হোয়াই নট? দিস ইজ ভেরি ইজি।

কোল : ইজ ইট? ওকে টেল মি।

হ্যারি : [খাতা দেখে] হিয়ার ইজ দ্য এপ্রোক্সিমেট ডিটেল ফিগার স্যার। মেল- ৬০০০০, ফিমেল - ২০০০০ এন্ড চিলড্রেন - ৪০০০। টোটাল - ৮৪০০০।

কোল : ওকে ফাইন! এই হ্যারি, কালো মেয়েগুলো দেখতে কেমন ।

হ্যারি : দেয়ার হেলথ ইজ ভেরি গুড কিন্তু স্যার দেখতে —

কোল : দেখতে? [সম্ভব হলে একটি মেয়ে দাসের সঙ্গে কুরুচিকর ব্যবহার দেখানো যেতে পারে]

হ্যারি : ব্ল্যাক, স্যার ভেরি মাচ্ ব্ল্যাক।

কোল : ওকে নো মেটার, হ্যারি, একটা স্টেটমেন্ট করে আনো। আমি এটা হেড অফিসে পাঠাব।

হ্যারি : ওকে স্যার।

কোল : শোন শোন হ্যারি, এই ক্রীতদাসদের আমরা আফ্রিকা থেকে কিভাবে ক্যারি করে আনি?

হ্যারি : ভেরি সিম্পল স্যার, দাসগুলোকে কিনেই তাদের কপালে আমাদের কোম্পানীর একটা সিল দেয়া হয়। রয়েল আফ্রিকান কোম্পানী। এটা একটা আই ডি। মানে আমাদের সম্পত্তি।

কোল : বাহ, ফাস্ট ক্লাস!

হ্যারি : তারপর অ্যামেরিকার জাহাজে ঠেসে তুলে দেওয়া হয়।

কোল : তো আফ্রিকা টু অ্যামেরিকা শিপ জার্নিতে কতদিন লাগে?

হ্যারি : দুমাস স্যার দুমাস। কিন্তু গত দুবছর স্যার আমাদের খুব ক্ষতি হয়ে গেছে।

কোল : ক্ষতি, আই মিন লস! কেন কেন?

হ্যারি : এই সী-জার্নিতে গত দুবছর প্রায় ১৯০০০ দাস কলেরাতে মারা গেছে স্যার।

কোল : ও হো! শীয়ার ওয়েস্টেজ! কিন্তু এত ডেড বডি কি করলে?

হ্যারি : সমুদ্র, সমুদ্র, আটলান্টিকে হাঙর আছে না স্যার? দাস দেখলে হাঙরেরও মেলা বসে যায়। হী হী হী।

কোল : হা হা হা। এই হ্যারি! নেক্সট টাইম আমার জন্য একটা বাচ্চা হাঙর আনবে? আমি পোষ মানাব এজ এ পেট। কুমীর আর ভাল লাগে না। কুমীর তো অনেকদিন পুষলাম!

হ্যারি : নিশ্চয়ই স্যার, নেক্সট টাইম আনার ব্যবস্থা করব।

কোল : চল, আমায় স্টেটমেন্টটা দেবে। [দাসের সঙ্গে একটু খেলা, সবার প্রস্থান]

১ : এই দাসমালিক কোলষ্টন অগাধ সম্পত্তি রেখে ১৭২১ সালে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে মারা যায়। প্রায় ১৭৫ বছর পর ১৮৯৫ সালে ইংলণ্ড সরকারের উদ্যোগে তার সম্মানে এই শহরে তার ব্রোঞ্জ মূর্তি গড়া হয়। ফলকে লেখা "শহরের অন্যতম সুপুত্র। গুণবান ও জ্ঞানবান"।

[টেপে শোনা যায় যৌবনের শ্লোগান সমুদ্র গর্জনের মত]

ক) ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার - ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার / খ) উই ওয়ান্ট জাস্টিস্ - উই ওয়ান্ট জাস্টিস্। গ) উই ডিম্যান্ড ফেয়ার ওয়েজ ফর ফেয়ার ওয়ার্ক — ফেয়ার ওয়েজ ফর ফেয়ার ওয়ার্ক। (ঘ) টপল দ্য রেসিস্ট —টপল দ্য রেসিস্ট — টপল দ্য রেসিস্ট ।

২ : আমরা কালো হতে পরি, কিন্তু মানুষ। মানুষ কিন্তু অসাধ্য সাধন করতে পারে। পৃথিবীব্যাপী সাধারণ মানুষের আন্দোলনের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের শীর্ষনেতা মাটির তলায় বাংকারে আশ্রয় নিয়েছে।

৫ : বহু যুবক যুবতী নিজেদের কালো ক্রীতদাসের বংশধর বলে ঘোষণা করে বলেছেন ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার।

সকলে : বংশানুক্রমে আমাদের পূর্বপুরুষদের শোষণ করা হয়েছে। উই ওয়ান্ট জাস্টিস্ (গর্জন করে)।

৬ : তারা বলেছেন, ব্রিস্টলের এই রাস্তাটায় আসলে পূর্বপুরুষদের অপমান ও অবর্ননীয় যন্ত্রণার কথা মনে পড়ে।

৪ : একমাত্র গায়ের রং কালো বলে ঐ রেসিষ্টরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ইতরের মত ব্যবহার করেছে।

৫ : কোলষ্টন, ক্লাইভ বা লিউপোল্ডের মূর্তি আমরা এখানে রাখতে দেব না কারণ তারা মানব জাতির কলঙ্ক।

৩ : আমরা জানি মূর্তি উপড়ে ফেললেই রেসিষ্ট শেষ হয়ে যাবে না, কিন্তু একটা বিতর্ক উস্কে দেয়া যাবে।

১ : বর্তমানে সারা পৃথিবীতে চলছে অদ্ভূত বিপরীত কার্যকলাপ।

৬ : একই মহাদেশ অর্থাৎ ইউরোপের ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরের সতের শতাব্দীর দাস ব্যবসায়ী কোলষ্টন বা লিওপোল্ডের মূর্তি উপড়ে ফেলা হয়।

২ : আবার একই সময়ে জার্মানীর জেলসিক্রিচেন নগরীতে হিটলারের ন্যাৎসীবাদকে পরাস্তকারী বিশ্বমানবতাবাদী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মূর্তি উন্মোচন করা হয়।

৫ : মানবজাতির ভবিষ্যৎ কি! পুঁজিবাদের রমরমা দিন কি তাহলে শেষ হয়ে আসছে?

৪ : সাম্রাজ্যবাদীর অনুচরেরা বুঝবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে মানুষের সহানুভূতি আদায় করা যায় না।

৩ : আন্দেলনকারীরা কোলষ্টনের মূর্তিটির গায়ে মুখে লালকালি লেপন করে বলছেন “ক্রীতদাসের রক্ত”। তাদের শুধু গৌরব গাঁথাই লেখা থাকবে তাতো হয় না, তাদের কুকীর্তির কথাও মানুষ জানুক। [সমবেত কণ্ঠে শোনা যায়][এবার যিনি কোলষ্টন সাজবেন তিনি মূর্তির অভিনয় করবেন। তাকে উপড়ে ফেলা হবে, বাকী সবাই ছাত্র] নেপথ্যে শ্লোগান চলছে, অল রেসিষ্ট গো টু হেল / ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার / উই ওয়ান্ট জাস্টিস্।
[মনে করি ১ মূর্তি, বাকীরা সবাই মঞ্চ জুড়ে দড়ি ধরে টানে, মনে হবে সমুদ্রের জলে ফেলবে, বহু লোকের হৈ চৈ শোনা যায়। সঙ্গে গানও চলতে পারে]

৬ : এই ধরো, ধরো।

৫ : হ্যা, এই তো, কোনদিকে ধরবো।

৪ : ওদিকটায়, হ্যা ঠিক আছে। এই দড়ি নিয়ে আয় না!

৩ : এই তো দড়ি। নাও বাঁধ।

২ : হ্যা জোরে বাঁধ, হ্যা এদিকটায় আরেকটু ছাড়ো, হ্যা হ্যা ব্যস, নাও টানো।
[বাঁধা হয়, টানা শুরু হয় গান গেয়ে গেয়ে]

৫ : [টানতে টানতে] দড়ি ধরে মারো টান, সকলে- রাজা হবে খান খান --------
[শেষ অবধি চলবে] [সমবেত কণ্ঠে শোনা যায়]

দড়ি ধরে মারো টান, - রাজা হবে খান খান ।
দড়ি ধরে মারো টান - রাজা হবে খান খান ।

(জনতার উল্লাস, শ্লোগান আর আবহ মিলেমিশে একাকার)

লেখক : বিভু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকার।

Presenting the official website of Tripura Theatre, A new destination for theatre lovers

www.tripuratheatre.com

নাট্যপ্রেমীদের জন্য সুখবর
ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যদলের নতুন অনলাইন ঠিকানা।